ভারত
ও
জার্মানরা

অনুবাদক : ভবানী মুখোপাধ্যায়

This is a co-production of
Horst Erdmann Verlag & Co
Tübingen, West Germany
and
M. C. Sarkar & Sons Private Ltd.
Calcutta--12, India

ভারত ও জার্মানরা

পাঁচশত বৎসরের ভারত ও জার্মান সংযোগ

ওয়ালটার লাইফার

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এ. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড্
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট : কলিকাতা-১২

১৩৪১ বঙ্গাব্দ
মূল্য : দশ টাকা

Bengali Translation
of
India and the Germans
by
Walter Leifer

মুদ্রক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১বি, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলি-৬

সূচীপত্র

ভারত ও জার্মানরা

মুখবন্ধ

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। ··

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভারততীর্থ)

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ মানবিক কল্পনাকে—চঞ্চল করেছে। আলকুনির পুস্তিকা (opusculum Alcuini) কারোলিঙ্গির যুগের রচনা, এই গ্রন্থে সীজারের "গল্প" (Totus orbis in tres dividitur partes, Europam, Africam et Indiam) নামক প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত স্মরণে তখনকার য়ুরোপের মানুষের ধারণা ছিল পৃথিবী তিন ভাগে বিভক্ত (ইয়োরপাম, আফ্রিকাম আর ইনডিয়াম)। আরো পরবর্তী যুগের লেখকগণ, যথা: অরলিনের থিওডুলফ, পৃথিবীকে অনুরূপ ভঙ্গীতে ভাগ করে দেখিয়েছেন। এইভাবে 'ইনডিয়া' কথাটি যেন এশিয়ার বিকল্প ছিল। তবু 'ইনডিয়া' এই নামটিই ছড়িয়ে পড়ে। সেণ্ট্রাল ও ওয়েষ্ট এশিয়ার অংশগুলিরও এই পরিচয় ছিল। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ সর্বজন পরিচিত, আজ যেমন ইন্দোনেশিয়া, যেমন ইথিওপিয়া এবং মাদাগাসকারের সুবৃহৎ দ্বীপ। বর্তমান কালে এতদ্বারা নিউ-ওয়ার্লড বা ওয়েষ্ট ইনডিজ বোঝায়।

ভারত মহাসাগরের ভিতর ভারতবর্ষের ভৌগোলিক কেন্দ্রীয় অবস্থান তার আধ্যাত্মিক আকৃতির সঙ্গে মিশ খেয়ে গেছে। বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষ বুদ্ধের সন্তানগণের কাছে অতি পবিত্র ভূমি। শ্রীলঙ্কা (সিংহল), ব্রহ্মদেশ, তাইল্যাণ্ড, লাওস ও কমবোডিয়ার অধিবাসীরা "হীনয়ান" তন্ত্রের কঠোর সাধনার পথ গ্রহণ করেছেন ; চীনদেশ, কোরিয়া, জাপান ও ভিয়েতনাম নিয়েছেন মহান সাংযোগিক ধর্ম-সাধনা "মহাযান" তন্ত্র ; আর তিব্বত-মঙ্গোলীয় অঞ্চলে এতাবৎ 'বজ্রযান' তন্ত্র অনুসরণ করা হচ্ছে। ভারতবর্ষ যদিও সর্বতোভাবে হিন্দুধর্ম প্রভাবে আচ্ছন্ন, এর অপর এক দিক মক্কা, জেরু-সালেম, রোম, এবং ভিট্টেনবার্গের একেশ্বরবাদে* দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। এই ভারত ভূমিতে মানব সমাজ মুসলিম মোগল সাম্রাজ্যের উত্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। খ্রীষ্ট ধর্ম এই দেশে সাধু-সন্তদের কাল থেকেই স্থায়ী বসবাসের অধিকার লাভ করেছে। বৃটিশ শাসকবর্গের সাংস্কৃতিক প্রয়াস এবং পাশ্চাত্য

খ্রীষ্টানদের মিশনারী ক্রিয়াকলাপ পরবর্তী যুগে য়ুরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভাবধারাকে সামনে এনে ধরেছে। ভারতীয় খ্রীষ্টানরা বিভিন্ন নামে পরিচিত, তারা সিরিয়ার ধারায় অভিহিত, এই সিরিয়ার এনটিঅক এবং এদেসা একদা মহান্ অধ্যাত্ম কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল। এরা লাতিন এবং লুথারের নামানুসরণে নাম ধারণ করেন। ঐক্যের সন্ধানে এই খ্রীষ্টানগণ অনেক ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

এই ভারত বিপরীতের মিলন ক্ষেত্র, যা নৈবক্তিক আর যা অতি-আধিভৌতিক তা মিলেছে। এই দেশ একদা সেই বৈপ্লবিক প্রতীক দান করেছিল তার নাম শূন্য (জিরো), আবার মানুষের গৃহবিরহজনিত আগ্রহকে সজীব করে রেখেছে উপকথা আর রূপকথার মাধ্যমে।

দীর্ঘকাল ধরে পাশ্চাত্য জগতের মানুষের চোখে ভারত শুধু ভারত-তাত্ত্বিকদের গবেষণা এবং শব্দতাত্ত্বিক আবিষ্কারের প্রেরণার উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। ভারততত্ত্বের পরিধির মধ্যে আন্তর্জাতিক মনোভংগীর মতো একটা বস্তু ছিল যা গবেষকদের সুযোগ দিয়েছে পরস্পরকে সন্ধান করার। এইভাবে, ভারত শুধু ধর্মীয় নয় তীর্থযাত্রার বৈজ্ঞানিক গন্তব্যপথে পরিণত হয়েছে 'মহামানবের সাগর তীরে'। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক এই অর্থে একথা বলেন নি। কিন্তু কবির স্বপ্ন এক নব্য বাস্তবতার সামনে পিছিয়ে এসেছে। সাহিত্যিক উদ্ভটত্বের দিন (যে কালেও একজন রবীন্দ্রনাথ এমন মুনসীয়ানা দেখাতে পারতেন) আজ আর নেই, সে দিন চলে গেছে, তার অবসান ঘটেছে। আজ আমরা দেখছি জাতীয়, মনস্তাত্ত্বিক এবং বিশ্বব্যাপী সামাজিক অর্থনৈতিক বোঝাপড়া এবং হিসাবনিকাশের কাল সমাগত।

ভারতের ভাবমূর্তিও রূপান্তরিত। ভারতের স্বপ্নলোক গঙ্গানদীতে কাব্যিক তীর্থযাত্রার পর এবং বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার অতীতের শব্দতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে বিচরণ অন্তে আমাদের বর্তমান কালের টেক্‌নোলজিষ্ট এবং ইনজিনিয়ারগণ জাতিগত এক বৃহৎ সংযোগ-সেতু রচনা করেছেন। এই দিক থেকে ভারতের এক ভূমিকা আছে। অতীতের ভারত বিষয়ক উৎসাহের অনুভূতি থেকে সরে এসে বর্তমানের এই সংযত বিশ্লেষণের মধ্যে ও একদিকে আছে অনেক অযৌক্তিক উৎসাহ আর অন্য দিকে আছে সমালোচনা করার উৎকট অতি-আধুনিক প্রস্তুতি।

যাই হোক, একটি বিষয় আমরা যেন না ভুলি। যাঁরা এই দেশ ভ্রমণে আসেন তাঁদের, মনে এক বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যে প্রতিক্রিয়া অনেক সময় চরমে টেনে নিয়ে যায়। এই কারণে, সতর্কবাণী এবং বিশ্লেষণী ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে।

"ভারত এক অস্বচ্ছন্দকর দেশ। এই দেশ অনেক সময় যুক্তি বা কোনো নতুন ভংগী গ্রহণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আপনি ভারতকে ভালোবাসতে পারেন, আপনি তার কাছে ধরা দিতে পারেন। আপনি তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন, কিন্তু আপনি কখনই এই দেশ বা এই দেশের জনগণের মোহিনীমায়ার আকর্ষণকে এড়িয়ে যেতে পারবেন না।"

একজন ভারতীয় নারীও অনুরূপ মনোভংগী প্রকাশ করছেন। পর্যটনের এই যুগে (ট্যুরইজম্) ভ্রমণ করা সহজ, হাজার রকম জিনিষ গ্রহণ করা যায় তথাপি ব্যস্ততার জন্য বহু জিনিষ এড়িয়ে যেতে হয়। তবে দূরত্বের অবসান সর্বদাই যে সুবিধাজনক তা নয়।

"পৃথিবী আজ কারিগরি সুযোগ সুবিধার ফলে ছোট হয়ে এসেছে, ভাবধারার আক্ষরিক সম্প্রসারণ এবং ভাবমূর্তি প্রকৃতপক্ষে আদর্শ স্থানীয় হয়ে উঠেছে। এতদ্বারা, ভুল ব্যাখ্যাজনিত ভুল বোঝাবুঝির গোড়াতেই হ্রাস পায়। বিংশ শতাব্দীর মানুষ ভ্রমণ করতে ভালোবাসে। বিগত শতাব্দীর মানুষের চেয়ে একালের মানুষ আপনাকে অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে খাপ খাইয়ে নিতে অতি সহজেই পারে। একথাও নিশ্চিত, অবিবেচকের মত বেশী বাড়াবাড়ি করলে, এর ফলে অনেক সময় ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়—আমাদের একথা স্মরণ করা উচিত যে ফ্যাসন এবং সংস্কৃতির ব্যাপারে বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্যকে শুধু নতুনত্ব এবং চাকচিক্যের মোহে গ্রহণ করলে তাকে বিনা মন্তব্যে অনুমোদন করতে হয়।"

বর্তমান প্রচেষ্টায়, সমালোচনামূলক মন্তব্য ও বিশ্লেষণটাই বড়ো করে ধরা হয়নি শুধু মাত্র ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক তথ্যগুলি যেমন যেমন ঘটেছে এবং যেভাবে ঘটে চলেছে জার্মান ও ভারতীয় সংযোগে তা প্রকাশ করা হয়েছে।

আমরা, যাঁরা জার্মান, তাঁদের ভারতের সঙ্গে একটা বিশেষ যোগ আছে।

আমাদের গ্রন্থাবলীর ভাষা ও আঙ্গিক কালের গতিতে পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু ভারত উপমহাদেশে যা কিছু ঘটছে সেই বিষয়ে আমাদের উদ্বেগ আজো

নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি। প্রয়োজনের সময়, অনেকেই সেই অঞ্চলের জনগণের জন্য অর্থ দান করতেও কুণ্ঠিত হ'ন নি।

এই ভাবে, ইতিহাসের প্রতি চকিতে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে তার সঙ্গে মূলতঃ অপরিবর্তিত মিত্রতার সাহিত্যিক ও শব্দতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে, এবং প্রকৃত পক্ষে প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে। সমাজ নীতি ও রাজনৈতিক ব্যাপারে যে সব ঘটনা ঘটেছে তাকে নথীভূক্ত করা হয়েছে।

আমি একজন জার্মানের দৃষ্টি ভংগী নিয়ে ভারতের সঙ্গে জার্মান যোগাযোগের কথা লিখেছি। হয়ত একদিন আমি প্রত্যুত্তর পাব ভারতীয় তরফ থেকে যার মধ্যে আমাদের সুবিধার জন্য ভারতীয় মনোভংগীকে নথীভূক্ত করা হবে। পরিশেষে, আলাপ আলোচনা, সংলাপ বস্তু বিশেষের ওপর আলোকপাত করে এবং জনগন যে মৌল অধ্যাত্মসূত্র থেকে আলোক পায় তা প্রকাশিত করে।

এই মনোভংগী নিয়ে আমি এই গ্রন্থের বিচার ভার পাঠকের ওপর অর্পন করছি।

ওয়ালটার লাইফার

মধ্যযুগীয় তীর্থ পথিক
ও
কবিদের স্বপ্নলোক

Man sagit, daz dar in halvin noch sin
die dir Diutischiu sprechen,
ingegin India villi verro.

(ওরা বলে, সেই অঞ্চলে এখনও জার্মান ভাষায় কথা বলে
এমন মানুষ আছে,—অনেক দূরে ভারতের দিকে।)
দ্বাদশ শতাব্দীর 'এ্যানোলায়েড্' থেকে উদ্ধৃত—
(কলোনের আর্চবিশপ এননোর প্রশস্তি গীতি।)

ভারত ও জার্মান ভাষী পশ্চিম-যুরোপের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে একটা সংযোগ আছে, বিশেষতঃ ভাষার ক্ষেত্রে। ইন্দো-জার্মানিক রিসার্চ-এর প্রচেষ্টায় জার্মানীর বিদগ্ধ-প্রান্ত থেকে এই সব সম্পর্ক সুস্পষ্ট ভাবে দেখানোর ফলে ইন্দো-জার্মান জাতির সঙ্গে আদিম যুগের সম্বন্ধ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ফ্রানংস বোপ্ কর্তৃক উদ্ভাবিত ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতির প্রতি ধন্যবাদ। এখন আমরা তার সাহায্যে মূল ইন্দো-জার্মান বুলির ধ্বনি এবং গঠন পদ্ধতি এবং যৌলিক শব্দ প্রভৃতি জেনেছি, যার প্রাথমিক পর্বেও ভাগ লক্ষ্য করা যায়— 'হানড্রেড' শব্দটিকে সেনটাম ও শতেম গোষ্ঠির অন্তর্গত বলে বোঝা যায়। প্রাচ্য দেশের 'শতেম' গোষ্ঠীর ভাষা ইরানীয়, ফ্রাইজিয়ান, আর্মেনিয়ান, থ্রেসিয়ান, আলবেনিয়ান ও বালটিক-শ্লাভনিক ইন্দো-ইরানীয় ভাষা নিয়ে যেমন গঠিত তেমনই পাশ্চাত্যের সেনটাম ভাষাগোষ্ঠী গ্রীক, ইলিরিয়ান, ভাষা ব্যতীত তুখারিয়ান ও হেথাইট, কেলটিক, ইতালিক, এবং জার্মানিক ভাষাগুলিকে জড়িয়ে আছে। কথ্যভাষার পার্থক্য ছাড়াও ইন্দো-জার্মান জাতিগণের মধ্যে আরও সামাজিক ভাগ দেখা যায় পশ্চিমের হালচাষী এবং প্রাচ্যের যাযাবর মেষপালকদের মধ্যে। যাই হোক, এই সামাজিক ভাগ সেনটাম ও শতেম গোষ্ঠির ভাষা বিভাগের সঙ্গে সব সময় মেলেনা—যদিও বর্তমানে এটা তেমন সুস্পষ্ট নয়। মূল ইন্দো-জার্মান অঞ্চল (লেক অফ অর‍্যাল এবং কাসপিয়ান হ্রদের মধ্যবর্তী

কোনো এক জায়গায় এই অঞ্চল মিলবে) থেকে কিছু মানুষ এসেছে যারা তাদের ধারণানুসারে আঙ্গিক, বাক্যরীতি, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন শ্রেণীর জাতি ও ভাষার ওপর চাপিয়েছে আর সেই ভাবেই বিশ্ব-রঙ্গভূমিতে বিশেষ ধরণের অভিনেতা গড়ে উঠেছে, এদের বৈশিষ্ট্য ও আকৃতি ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

দীর্ঘকাল ধরে সাধারণতঃ এই জাতীয় একটি গৃহীত ধারণা ছড়িয়েছিল ইন্দো-জার্মান জাতির শৈশবস্থা বিষয়ে। প্রধানতঃ অনুমিত হত যে দক্ষিণ সাইবেরীয় অঞ্চল—এমন কি তা ছাড়িয়ে দক্ষিণ ইউরাল এবং মধ্য য়ুরোপীয় আপল্যাণ্ড বা উচ্চ-ভূমির মধ্যে কোথাও এই অঞ্চলটি ছিল। ক্যুলটুর গেসখিখ্‌টে দেশ দয়েৎশেন ভোকস্ বা জার্মান জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস নামক গ্রন্থে আরো অনেকের মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডের হেনে আম রাইন সংক্ষেপে এই মতবাদ প্রকাশ করেছেন:

তথাপি আর্যজাতিগণ এবং ভাষা সমূহের সর্বজনীন উপকথা এবং শব্দ সংগ্রহ থেকে ভাষা গোষ্ঠীর শৈশবস্থার নিম্নলিখিত বিবরণ আমরা যথাসম্ভব বিশ্বাসযোগ্য বলে অনুমান করতে পারি:

এই ভূমি ছিল কিঞ্চিৎ শীতল ও নিরানন্দময় স্থান। বরফ, তুষারপাত, মেঘ, কুয়াশা এবং বৃষ্টি সেখানে সুপরিচিত ও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই দেশ পর্বতসঙ্কুল, এমন অনেক পর্বত-শিখর ছিল যাকে 'দাঁত' বলা হত, পার্বত্য ফাটল এবং গিরিসঙ্কট (সংস্কৃত ও নর্স গ্যাপ: নর্স নরওয়েজীয় কথা), জলাভূমি, নদী, হ্রদ ও পুষ্করিণীতে পরিপূর্ণ। এই ভূমি সমুদ্রের উপকূলবর্তী কিনা সে বিষয় সংশয় আছে। এখানে বার্চ এবং ফার গাছ ও সেই সঙ্গে নানা জাতের শস্যাদি জন্মাত; গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উদ্ভিদাদি যেমন অপরিচিত তেমনই অজ্ঞাত ছিল সিংহ, ব্যাঘ্র, গর্দভ, উষ্ট্র, হস্তী প্রভৃতি জন্তু অথচ নেকড়ে এবং ভাল্লুকে এই অঞ্চল পরিপূর্ণ ছিল। বীভার তৈরী করত তার জলাধার আর অতিশয় বিরক্তি-জনক উপস্থিতি ছিল ইঁদুরের। ষাঁড় (বলদ) এবং গরু এবং সেই সঙ্গে ছাগল, ভেড়া, শূকর প্রভৃতির প্রজনন ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়া হাঁস ও মুর্গীও ছিল। এখানকার বাসিন্দাদের পশুপাল ছিল, তাদের দেখাশোনার জন্য রাখাল বালক ও মেষপালক ছিল, পোষা কুকুর পাহারা দিত; এরা আবার গোশালা পরিচালনা করত। এ ছাড়া, এখানকার অধিবাসীরা কৃষিকর্মের দ্বারা জীবন যাপন করত, রুটি সেঁকতে পারত, মাধ্বী বা মধু থেকে উৎপন্ন মদ্যপান করত,

মেষগাত্র থেকে পশম ছাটাই করে সেগুলি থেকে বয়ন করে পশমের বস্ত্র তৈরী করে শিলাই করে জামা কাপড় বানাত। অশ্ব ছিল পরিচিত জন্তু কিন্তু প্রজনন ব্যবস্থা ছিল না কিংবা অশ্বারোহণের রীতিও ছিল না। বন্যপক্ষীদের মধ্যে পেচক এবং বটের পাখি পরিচিত ছিল। অধিবাসীরা রাজপথ এবং সাঁকো বানাতো (তখনও অবশ্য সেতু নির্মাণ সুরু হয়নি); ঠেলে জাহাজ চালাতে পারত, দাঁড় বহা নৌকাও চালাতো (আধুনিক জার্মান ভাষায় নাখেন : সংস্কৃতে —নাও, নাব ; প্রাচীন জার্মান, নউএন) দাঁড় কথাটির সংস্কৃত অর্থ-অরিত্র। মাটির পাত্রাদি গড়ত, হাতুড়ি পিটিয়ে কাঠের বাড়ি বানাতো, দরজা বসাতো, মুগুর, কুড়ুল, তীর ধনুক, বর্শা, তরবারি প্রভৃতি দিয়ে লড়াই করত, এই সব হাতিয়ার সম্ভবতঃ পাথরে গড়া হত (ধাতুর ব্যবহার সুপ্রমাণিত হয়নি), এঁরা কতকগুলি জায়গা এবং পল্লী সুরক্ষিত রাখতেন—(সংস্কৃত পুরী, পুর : গ্রীক—পোলিশ :—লিথুয়ানিয়ান-পাইলিস)-কিন্তু শহর নয়। এঁরা সংখ্যা গণনা করতে পারতেন। এক হাজারে পৌছে তাঁরা থেমেছিলেন—কালগণনা করতেন বৎসর এবং মাসের হিসাবে, চিন্তা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁদের অপরিচয় ছিল না, সাধারণ ওষুধপত্রের ব্যবহার জানতেন। আমাদের পরিচিত আত্মীয়তার স্তর বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান ছিল। এই সমাজে পরিবার পদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। উপজাতীয় রাজন্যবর্গ, সম্রাট (অবশ্য-লঘু ধরণের), ব্যবস্থাপক সভা এবং সর্বজন গৃহীত আইন-কানুন রচিত হয়েছিল এবং বিচারকও ছিলেন। গান গাইতে জানতেন। উপকথা এবং কাহিনী রচিত হত, সাধারণতঃ দানবাকৃতি অতিকায় প্রাণীকর্তৃক মানবকে প্রলোভিত করার কাহিনী। কিংবা মানুষের জন্য তারা কাজ করত এইভাবে কাহিনী রচিত হত। এদের আকৃতি অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক পশুর মত। দেবতার আকৃতি কখনও কোনো বিশেষ ধরণের জন্তুর মতো কখনও বা মানুষের মতো। স্বর্গীয় জ্যোতিলেখার অর্চনা করতেন এঁরা, বিশেষতঃ সূর্য, চন্দ্র, উষা, অগ্নি ও বজ্রের পূজা হত। এরা তাদের পূর্বপুরুষদের 'মানুষ' 'মানবিকা সত্তা' ও বীরপুরুষদের শ্রদ্ধা জানাতো (সংস্কৃত : বীর, লাতিন-: ভীর) এবং আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাসী ছিল।

সমগ্র মধ্যযুগে জার্মান পশ্চিম য়ুরোপে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে ইরান অতিক্রম কালে—ingegin India vili verro—এমন অনেক মানুষ আছেন যারা জার্মান বলেন। অর্থাৎ আরব দেশগুলি অতিক্রম করে সহসা এমন এক ভাষার সামনে এসে দাঁড়াতো যাকে মোটেই বিদেশী ভাষা মনে হয় না। দ্বাদশ

শতাব্দীর পদ্য রচনা 'এ্যানোলায়েড'—গ্রন্থের মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায় (এ-১৮ শ্লোকাবলী—৩১৫-৩১৭)। এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। ইন্দো-জার্মানিক কমপারেটিভ ফাইলোলজির গবেষণা প্রকাশের অন্ততঃ সাতশ বছর পূর্ব থেকেই এই ধারণা প্রচলিত আছে।

প্রাচীন জার্মান এবং মধ্যযুগীয় জার্মান সমাজের ভারতের চিত্রকল্প গ্রীক ও রোমান ক্লাসিকের ভিত্তিতেও বিশেষতঃ গোড়ার দিকের প্যাটরিষ্টিক সাহিত্যের (খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের যে অংশ প্রাচীন খৃষ্টীয় ধর্মাচার্যগণের মত সম্পর্কে আলোচনা থাকে)—ওপর গড়ে উঠেছিল। যে সব গ্রন্থে এই সব তথ্য আছে তার মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ De Moribus Brachmanorum (The Customs of the Brahmins Vol: 2. P. 1131-32)—গ্রীকভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন মিলানের মহত্তম বিশপ সেন্ট এমব্রোস। এর মধ্যে সন্ন্যাস এবং ব্রাহ্মণদের বহুবিধ ধর্মীয় আচার-আচরণ বিষয়ে মূল্যবান তথ্যসম্ভার আছে। জার্মানিক যুগের লেখকরা—বিশেষ করে যাঁরা এমব্রোস এবং তাঁর প্রধান শিষ্য আগষ্টিনকে তাঁদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন—শেষোক্তকে গ্রহণ করেছিল তার কারণ জার্মানিক জনগণ এবং জার্মানিক আদি জাতি সম্পর্কে অনেকটা মানবিক মনোভংগী তাঁর ছিল। আর প্রথমোক্তকে শ্রদ্ধা করার কারণ তিনি আগষ্টিনের গুরু হিসাবে পরবর্তীকালের জার্মানপ্রেমী "আগষ্টিন ওয়ার্লড"-এর স্রষ্টা। সমগ্র মধ্যযুগের মধ্যে প্রভাবশালী দুই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, যাঁদের একজন ধর্মীয় শিক্ষক এবং অপর জন তাঁর মহান শিষ্য। দুজনেই মিলানের মানুষ, এটা একটা প্রতীকি ব্যাপার—কারণ মিলান উত্তর-এ্যান্টিক ও মধ্যযুগীয় জগৎকে ভবিষ্যৎ-কালের প্রবক্তা দান করেছেন। এই ব্যাপারে শিক্ষক প্রাচ্য ভারতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আর তাঁর শিষ্য বিশ্ব জাগতিক রাজনীতিতে সদ্য প্রবেশ-কারী সেইকালের জার্মানিক জনগণ বিষয়ে একটা নির্মোহ ধারণা সৃষ্টি করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ৫৭২ থেকে ৭৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানিক লোমবার্ডিক সাম্রাজ্যের রাজধানী পাভিয়াতে আগষ্টিনের দেহাবশেষ সমাধিস্থ করা হয়েছে।

সার্লেমানের* চতুষ্পার্শ্বস্থ চক্র শুধু যে নিকটস্থ গ্রীক-বাইজন্তীয়প্রাচ্যকে তাঁদের

---

* সার্লেমান (চার্লস দি গ্রেট)। ফ্রাঙ্কের সম্রাট। পরে পশ্চিম অঞ্চলের সম্রাট হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ AIX-LA-CHAPELLE-এ জন্ম হয় ৭৪২

রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশের মধ্যে ধরেছিলেন তা নয় ভারতের বৈশিষ্ট্যতাও তাঁরা অবলোকন করেছিলেন। ফ্রাঙ্কিস সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু আচেনে (Aix-la-Chapelle) এই সুদূরস্থ ভূমি ঐশ্বর্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উৎস বলে পরিচিত ছিল। সার্লেমান-এর রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি বিষয়ে তাঁর জীবনীকার আইনহার্ড তাঁর Vita Karoli (সার্লেমান জীবনী) গ্রন্থের ষোড়শ পরিচ্ছেদে বলেছেন—

পারস্যের সম্রাট হারুণ যিনি ভারত ব্যতীত সমগ্র প্রাচ্যদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন তাঁর সঙ্গে সার্লেমানের এমনই বন্ধুতার সম্পর্ক ছিল যে পৃথিবীর রাজা ও সম্রাট বন্ধুদের চেয়ে সার্লেমানের বন্ধুত্ব ও অনুগ্রহ হারুণের কাম্য ছিল।

তৃতীয় চার্লসের রাজত্বকালে (তাঁর ডাক নাম মোটা)—ক্যারোলিঞ্জিয়ান সাম্রাজ্যের পতনের মুখে ৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে টাইবুরের ব্যবস্থা সভা ডায়েটের বৈঠকের কিছু পূর্বে সার্লেমানের ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ভবিষ্যৎ শান্তির সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রেরণা শক্তি সঞ্চারের জন্য ফ্রাঙ্কিস সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাকে স্মরণ করা হয়। সেন্ট গলের সাধু নটকের 'গেসটা কারোলি' (সার্লেমানের কর্মকাণ্ড) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এর দ্বিতীয় খণ্ডে সার্লেমানের রাজদরবারে পারসিক আরবিক দূতেরা হাতি, বানর, সুরভি নির্যাস, জটামাংসী সুগন্ধি, নানাবিধ মলম, মশলা, সুগন্ধি, নানাধরণের আয়ুর্বৈদিক লতা-পাতা ইত্যাদি উপহার এনে উজাড় করে দেয়, যেন পূবের ভাণ্ডার উজাড় করে এনে পশ্চিমের ভাণ্ডার ভরে দিচ্ছে।

প্রাচ্যের প্রতিনিধির ভাষণ এই ধরণের :

> "Nos persae vel Medi, Armenii vel Indi, Parthi et
> Elamitæ omnesque orientales multo magis vos
> quam dominatorem nostrum Aaron timemus."

(আমরা পারসিকগণ, মেডেস্, আর্মেনীয় অথবা ভারতীয়, পার্থীয়ান অথবা এলামাইটস এবং সমগ্র প্রাচ্যবাসী আপনাকে আমাদের শাসক হারুণের চেয়ে অধিক ভয় করি।)

খৃষ্টাব্দে। স্যাকসন বিজেতা এই সম্রাট ৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেন। য়ুরোপের বহু জায়গায় তিনি সম্রাটদের দমন করেছেন। সার্লেমান পড়াশোনা ভালোবাসতেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অসীম অবদান। তিনি-স্বয়ং ব্যাকরণ রচনা করেন এবং লাতিন ভাষায় কিছু কবিতা লিখেছেন।

অদ্ভুত মনে হয় যে বাগদাদের আরব খালিককে সেই কালে পারসিক বলে গ্রহণ করা হত, তার আরবীয় ব্যক্তিত্ব এবং শাসনকর্ম বিষয়ে চোখ ফিরিয়ে থাকা হত। মধ্যযুগীয় জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীই এর জন্য দায়ী। তাঁরা পারসিকদেরই পৃথিবীর একমাত্র 'আইনগত' জাতি বলে মনে করতেন। অধিকন্তু, পারস্য সব সময় অবাধে ভারতকে মনোভংগী জানাতেন। 'ইনডিয়া' এই কথাটি যেন একটা যাদুমন্ত্রময় নাম, বারবার সম্পদ, রাজকীয় আড়ম্বর এবং সুখ-সমৃদ্ধির স্মারক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাবানুষ মাউরুস নামক ফুলডার মঠাধ্যক্ষ যিনি পরে মেইনজের আর্চবিশপ হয়েছিলেন তাঁর দ্বারাই ভারতের এই চিত্রকল্প বিশেষ ভাবে গড়ে উঠেছিল। তিনি ডি য়ুনিভার্সো (দি ইউনিভার্স) নামক তাঁর গ্রন্থে প্রিসেপটার জার্মেনি বা জার্মানীর শিক্ষক সেই সুদূর দেশের পরিচয় পাঠকদের কাছে দিচ্ছেন একটি নদীর নামে—(India vocata ab Indo flumine···) এই দেশের নামকরণ করা হয়েছে, এই গ্রন্থ সত্য তথ্য এবং দুঃসাহসিক কাহিনীর সংমিশ্রণে গড়া। তাঁর মতে, ইনডিয়া উদীয়মান সূর্যের কাছ থেকে ককেশাস পর্যন্ত বিস্তীর্ণ; তাপরোবেণের দ্বীপে হাতি এবং বহুমূল্য পাথর পাওয়া যায় এবং ক্রাইসা এবং আরগাইরিশ দ্বীপ দুটি সোনা এবং রূপায় মণ্ডিত। গঙ্গা, ইনদস, এবং হাই-ফাসিস (বিপাশা) প্রভৃতি নদীর নাম রাবানুষ মাউরুসের কাছে সুপরিচিত। তিনি লিখেছেন ভারতে বাদামি রঙের মানুষের বাস এবং হস্তী, একশৃঙ্গী পৌরানিক জন্তু ইউনিকরণ ও কাকাতুয়া, আবলুস কাঠ, দালচিনি, লঙ্কা প্রভৃতি সে দেশে পাওয়া যায়। রাবানুষ অদ্ভুত পর্বত এবং বিরাটাকৃতি জন্তুর কথা বলেছেন (হয়ত হিমালয়ের মানুষ, ইয়েতি প্রভৃতি যে সব জন্তুর অস্তিত্বের কথা আজো অনেকে বিশ্বাস করেন এই জন্তু তাদের মডেল ?)

"Ibi sunt et montes aurei, quos adire propter dracones et gryphes et immensorum hominum monstra impossibile est."

(সেখানে সোনার পাহাড়ও আছে তবে তার কাছে যাওয়া কঠিন, কারণ সেখানে ড্রাগন, গ্রিফিন, বা শ্যেন-সিংহ (প্রাচীন রূপকথায় বর্ণিত এক জাতের দৈত্য) এবং অতিকায় অসুরাকৃতি মানুষ প্রভৃতি থাকে।)

তথাপি রাবানুষ এমন এক ভারতবর্ষের বর্ণনা দিয়েছেন যা প্রকৃতই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

"ipsa etiam aurum sapientiae et argentum eloquentiae gemmasque omnium virtutum sufficienter habuit—"

(তিনি স্বয়ং অবশ্য জ্ঞানের সুবর্ণ এবং ওজস্বিতার রজত স্পর্শের অধিকারী। সকল প্রকার সদ্গুণের রত্নরাজি তাঁর কাছে প্রচুর পরিমাণে আছে)।

ভারতের স্বপ্নপুরীর নামের যাদু ব্যতীত সেখানকার জ্ঞানের সুবর্ণজ্যোতি স্পষ্টতঃই পাশ্চাত্যের মানুষকে মোহগ্রস্ত করেছে। অতঃপর ভারতের দুটি আকৃতি, একটি দিক সোনা এবং বহু মূল্য রত্নরাজিতে সমুজ্জ্বল, আর অপর দিক সাধুর প্রজ্ঞাদীপ্ত সন্ন্যাসের গরিমায় উদ্ভাসিত।

ভারতের বাস্তবতা সম্পর্কিত এই বাহ্যিক জ্ঞান ছাড়া পাশ্চাত্যের মানুষ ইনডাস এবং গঙ্গা নদীর এই দেশ যে রত্নভাণ্ডার তা জেনেছিলেন উপকথা এবং রূপকথার মাধ্যমে। সংস্কৃত 'কথাসরিৎ সাগরের অনুবাদ—'এ্যান ওসান অফ ষ্টোরী টেলস'—কাশ্মীর থেকে সংগৃহীত কাহিনী—পশ্চিমে এসে পড়ে। এই সব রূপকথা হয়ত আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের সৈনিকদের সঙ্গে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছে। জার্মান জগতে মধ্যযুগের শেষ পর্বে এদের সন্ধান পাওয়া যায়। তুলনাহীন এক বিজয় যাত্রায় এই সব ভারতীয় কাহিনী বিশ্বের সাহিত্যকে জয় করেছে। গ্যয়টের 'রাইনেকে ফউখস' (রেনার্ড দি ফক্স) যা ১৪৯৮-এর সুদূর কালে ল্যুবেকে লো-জার্মান রূপান্তরে প্রকাশিত হয়, তার উৎস সূত্র ভারতীয় রূপকথা সংগ্রহ 'পঞ্চতন্ত্রে'র মধ্যে পাওয়া যাবে।

কিন্তু তারও পূর্বে, জার্মান পোষাকে ভারতীয় কাহিনীর একটি সংকলন গ্রন্থ আনুমানিক ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে, তার নাম "সাইনে লোকো এট এ্যানো" এবং ১৪৮৩ ও ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উলমে অনুমোদিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এনটন ফন ফোর কর্তৃক লিখিত বুখ দার বাইসপীয়েল দার আলটেন ভাইসেন (প্রাচীন সাধকদের জ্ঞানের দৃষ্টান্ত সম্বলিত গ্রন্থ) য়ুরোপীয় ধারায় গুরুত্ব লাভ করে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত থিওডোর বেনফি সগর্বে এই দিকে নির্দেশ করে বলেছেন—

"একটি চমৎকার জার্মান অনুবাদ—কাউণ্ট এবারহার্ড অফ ভয়েরটেমবার্গের আনুকূল্যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরের মধ্যে রচিত হয়। তিনি ছিলেন একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি এবং বিদ্যোৎসাহী। এই অনুবাদ গ্রন্থ জার্মান মুদ্রণ শিল্পের প্রথমতম অবদান হিসাবে স্বীকৃত। অবশ্য শোচনীয়ভাবে জীর্ণ কপি থেকে এই গ্রন্থের কয়েক শতাব্দী ধরে কয়টি সংস্করণ মুদ্রিত হয় এবং বিশেষভাবে

স্পেনীয় অনুবাদকে প্রভাবিত করে। স্পেন প্রভাবিত করে ইতালীকে, আর তার ওপর ভিত্তি করে রচিত হয় ফরাসী এবং ইংরাজী সংস্করণ। এইভাবে প্রকৃতপক্ষে জার্মান রসবিচার এবং জার্মান প্রচেষ্টার ফলে এই গ্রন্থের গোড়ার যুগের য়ুরোপে প্রচার সম্ভব হয়। যে ভাষায় এ গ্রন্থ প্রথম লিখিত হয়েছিল তা থেকে প্রস্তুত জার্মান অনুবাদ আমি দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করব—বৃহত্তর পরিধিতে এই নতুন সংস্করণ স্মৃতিকে সঞ্জীবিত করার কাজে সহায়তা করবে আমি বিশ্বাস করি।

প্রসঙ্গতঃ, বেনফি এই মত পোষণ করতেন যে একমাত্র ঈশ্বরের গল্প ব্যতীত ভারতবর্ষ সকল প্রকার কাহিনী ও উপকথার উৎপত্তিস্থান। বিশেষজ্ঞদের কাছে বেনফি তাঁর "ইনডিয়া থিয়োরী"র জন্য পরিচিত। এই সিদ্ধান্তের শেষ মহত্তম উদ্গাতা হলেন ইমানুয়েল কস্ক্যুইন; যাই হোক, তিনি নিজেই একতরফা ভারত বিজড়িত মতবাদ পরিবর্ধন করেন এবং ১৯২১-এ মৃত্যুর আগে এই ধারণা পোষণ করেছিলেন যে উপকথা রচনা করার সৃজনশীল সম্ভাব্য প্রতিভা সব জাতিরই আছে। কিন্তু এই 'কথাসরিৎসাগর' সৃষ্টি করে ভারত কি পরিমাণ প্রেরণা সঞ্চার করেছেন সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। জোহানেস হারটেল 'তন্ত্রাখ্যায়িকা' নামক অনুবাদ গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন বেনফির স্মরণে। তিনি বেনফির অতিরঞ্জিত দাবীর কথা উল্লেখ করে বলেছেন শেষ পর্যন্ত তা শুধু তাঁর ভারততত্ত্ব বিষয়ক প্রয়াসকে সাহায্য করেছে এবং উপকথা ও রূপকথা বিষয়ক তুলনামূলক গবেষণায় সহায়ক হয়েছে। বেনফি, যিনি নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের পথিকৃৎ-এর সম্মান দাবী করতে পারেন হয়ত মাঝে মাঝে ভুল করে থাকতে পারেন। জোহান গটফ্রিড কোসিগারটেন সম্পাদিত মূল সংস্কৃত ভিত্তি করে অনুবাদ করেছেন এবং দক্ষিণ ভারতের আদর্শ গ্রহণ করেছেন। লাতিন ভাষায় লিখিত ভূমিকায় কোসিগারটেন উৎসাহভরে লিখেছেন যে 'পঞ্চতন্ত্র' এবং "কালিলা" (আরবী রূপান্তর) তুলনা করে তিনি আনন্দ পেয়েছেন। এই আরবী অনুবাদ আবার পারসিক অনুবাদকদের 'কালিলা ওয়া ডিমনা'র ভিত্তিতে রচিত। জার্মান ভাষা অঞ্চলে কোসেগারটেন সংস্করণ অনন্য। পরবর্তীকালে এফ কীয়েলহোর্ণ এবং জে. জি. বুহলের অধিকতর বিস্তারিত একটি সংস্করণ বোম্বাই শহরে প্রকাশ করেন। অধিকন্তু জার্মানীতে সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত রূপকথার একটি ল্যাতিন সংস্করণ পাওয়া যায় যার মধ্যে প্রাচীন ফরের (Pforr) কাজের ছাপ দেখা যায় এবং সেটি আবার ভারতীয় কাহিনীর অবলেপ

শতাব্দীর লেখক জন অব কাপুয়া কৃত লাতিন রূপান্তর—Directorium vitae humanae (Directory of Human Life) স্মরণ করিয়ে দেয়।

সেই কাল থেকে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীর অসংখ্য অনুবাদ হয়েছে। লুডভিগ গ্রিথসে এবং রাইনহার্ড স্থমিউটের অনুকরণে অন্যতম এবং শেষতম জার্মান ভারততত্ত্ববিদ ছিলেন হামবুর্গের লুডভিগ এলসদোরফ তিনি তাঁর গ্রন্থের পরিশিষ্টে এই কাহিনী বিষয়ে বলেছেন—

"পঞ্চতন্ত্রের কি উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থকার ভূমিকাংশে তা বিধৃত করেছেন। তিনি কূটনীতির একটি পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন। এই গ্রন্থ রাজপুত্রদের জন্য রচিত প্রথম পাঠ। সুখের বিষয় তিনি আগাগোড়া বিষয়গত ব্যাপারে কাহিনীগুলিকে আবদ্ধ রেখে পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা করেন নি। রাজনৈতিক পাঠ যদি শিক্ষাদানে অসফল হয় এই আশংকায় তিনি একটি করে চমৎকারকাহিনী বলেছেন নিজের প্রয়োজনে। এই ভাবেই তিনি শুধু জন্তু-জানোয়ারের গল্পে তাঁর বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ রাখেন নি—এই জাতীয় কাহিনী ভারতে বিশেষ সমাদৃত এবং রচিত হয়। এদেশ পুনর্জন্মের দেশ—কিন্তু তাই বলে মানবিক কাহিনী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই। কিন্তু অধিকাংশ কাহিনী এবং ইতঃস্তত: ছড়ানো শত শত পদ্যাংশের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক নীতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সেগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংকলিত। তথাপি, এই সব কাহিনী সচেতন ভাবে, ঠাণ্ডা মাথায় এবং কূট রাজনৈতিক চালে রচিত। সাফল্যের জন্য যে কোনো মাধ্যম যুক্তিসিদ্ধ এবং স্বাভাবিক নীতি বিশেষভাবে নস্যাৎ করা হয় যখন তা রাজনীতির স্তরে পৌছায়। সুতরাং, যদিও অনেক অংশে কাহিনীর নীতি স্পষ্টতই দুর্নীতিমূলক তথাপি পাঠকের বিস্মিত হওয়ার কোনো হেতু নেই। সদ্‌গুণ নয়, চতুরতা প্রচার করেছে পঞ্চতন্ত্র; যাই হোক, পাশাপাশি দুরকমই থাকতে পারে তাই কাহিনীর মর্যাদা বা নীতি কোনো মতেই বর্জন করা যায় না।"

এলসডর্ফের অনুমানে 'পঞ্চতন্ত্রের' অন্ততঃ দু শত কাহিনী অনুসরণে লিখিত হয়েছে এবং ৫৪টি ভাষায় তা অনূদিত হয়েছে। এর প্রচার এতই বিস্তৃত যে বাইবেলের প্রচারের সঙ্গে তুলনীয়, এ ছাড়া 'হিতোপদেশে'র এবং প্রখ্যাত 'কথাসরিৎসাগরের' আরো দুটি সংকলন আছে, যার মধ্যে সব রকমের গাথা, উপকথা, রূপকথা এবং কাহিনী আছে। জোহানেস হার্টেল তাঁর ভারতীয় রূপকথা নামক গ্রন্থে যথাযথ ভাবে বর্ণনা করেছেন—

"যদিও শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'রূপকথা' তথাপি কলাকৌশলগত দিক থেকে য়ুরোপের বিজ্ঞানসম্মত নিরিখে এই অভিধা বোধগম্য হবে না কিন্তু সাধারণভাবে কথা ও কাহিনী বিভাগের বর্ণনামূলক কাহিনী হিসাবে গ্রহণ করা যাবে। বর্ণনামূলক কাহিনীর নানা বিভাগ, রূপকথা, পরিহাস, উপকথা, ঔপন্যাসিকা, গাথা, গল্প, অলৌকিক কাহিনী ইত্যাদি, য়ুরোপীয় জীবনধারা এবং তাঁদের সাহিত্যগত আঙ্গিকের ভিত্তিতে এইসব কাহিনী রচিত হয়; যারা আমাদের চেয়ে বিভিন্ন প্রকারের দৃষ্টিকোণ দিয়া চারদিকের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করেন সেই ভারতীয়দের কাছে এর কোনো রকম যুক্তিযুক্ততা নেই।"

একটি বিচ্ছিন্ন কাহিনীর পথ পরিক্রমণ করার মধ্যে চমক আছে। হারম্যান ভার্ণহাগেন একটি কাহিনীর পর্যটন পথ অনুসরণ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জীবনের একটি ঘটনা নিয়ে রচিত এই রূপকথা, যে কাহিনীতে একজন ঐন্দ্রজালিক মহারাজকে একটি যুবকের শবদেহে তাঁর আত্মাকে প্রবিষ্ট করতে বাধ্য করে। তারপর সেই কুশলী ঐন্দ্রজালিক মহারাজের দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তরুণের দেহধারী মহারাজকে ফাঁসী দিয়ে নিহত করে নিষ্ঠুর রাজা হিসাবে দেশে রাজত্ব করতে থাকে।

এই রূপকথার কয়েকটি বিভিন্ন রূপান্তর আছে। চীন এবং পারস্য, বাগদাদ থেকে জেরুসালেম এবং সেখান থেকে গ্রীক এবং য়ুরোপীয় ক্ষেত্রে পড়ে এই কাহিনী আরো রূপান্তরিত হয়েছে।

জার্মান ভাষা অঞ্চলে হানস সাখস্ এই বিষয়টি তাঁর ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত মহৎ সঙ্গীতে (দার হখফারটিগ কাইজার বা উদ্ধত মহারাজ) রূপায়িত করেন। কবি গুরুনবার্গ এই রোমক সম্রাটের নাম দিয়েছিলেন জোভিয়ানুস এবং এই একই বিষয়বস্তু তিনি ১৫৫৬-খ্রীষ্টাব্দে পরিবেশন করেন। ইতিমধ্যে তিনি কাহিনীটি সম্পূর্ণ পালটিয়ে দেন, মহারাজের নামটিও বদলে দেওয়া হয় (কমেডি, ন'জন অভিনেতা সহঃ জুলিয়ানুস সম্রাট, পঞ্চম অঙ্কে সমাপ্ত)। 'নাখ্‌টবুখলীন' বা নৈশ পুস্তিকায় ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যালেনটিন সুমান এই কাহিনী ব্যবহার করেছেন। সেই কাহিনীটি সম্পর্কিত বিবরণঃ একটি তাস খেলোয়াড়ের কাহিনী, সেন্ট পিটার তিনটি বর দিয়েছিলেন তাকে, এই তাসখেলোয়ার কিভাবে সেই বরগুলি নিজের সুবিধার্থে প্রয়োগ করেছিল এই কাহিনী তার বিবরণ।

যাইহোক এইসব কাহিনী এবং নাটকের লিখনশৈলীর কৃতিত্ব অবশ্যই

শতকের দুজন অষ্ট্রিয়ান লেখকের। এরা দু'জনেই বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এঁদের নাম স্ট্রাইকার এবং উইলডোনির হেরয়ানড্। পরিশেষে ভারণহাগেন হানস্ রোজেনব্লুট, লুডভিগ বেথষ্টাইন, জোহানেস রোমোল্ড্ট্ এবং লাংবায়েন প্রভৃতি লেখকের মধ্যে কাহিনীবস্তুর সন্ধান পেয়েছেন। এই সঙ্গে তিনি প্রখ্যাত প্রচারক সাংটাক্লারার আব্রাহাম এবং জেসুইট-ফাদার জেকব বিদারমানের সাহায্যে মূল বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করেছেন।

এশিয়া এবং য়ুরোপীয় রচনার মাধ্যমে যে অসংখ্য কাহিনী প্রচারিত হয়েছে এই দৃষ্টান্তটি তার অন্যতম। এই কাহিনী দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে কাহিনীর চোখ ধাঁধানো জৌলুষ কিভাবে একই কাহিনী বার বার নবভাবে রচিত হয়ে পরিবেশিত হওয়ার জন্য লেখকদের মনে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। বর্তমানে আমরা বিশ্লেষণের যুগে বাস করছি। সাধারণভাবে রূপকথার ক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে ভারতীয় রূপকথার বিশ্বব্যাপী শ্রেষ্ঠ মণীষীদের অন্যতম হলেন ফ্রিডরিশ ফন দার লেয়েন। এঁর কাছে আমরা ঋণী, এই সব মনোহর সাহিত্যিক রত্নরাজির প্রকৃতি এবং প্রতিক্রিয়া বিষয়ে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির জন্য, যা বিভিন্ন জাতি সমূহের মধ্যে আধ্যাত্মিক লেন-দেনের আনন্দ এবং প্রীতিবর্ধন করেছে।

রূপকথা ছাড়াও ভারত আমাদের দাবা খেলার কৌশল উপহার দিয়েছে—সংস্কৃত নাম চতুরঙ্গ, চারটি শ্রেণীর সেনাদল নিয়ে সংগঠিত। আমাদের কাছে এই সেনা পারস্যের শাহের রাজকীয় ক্রীড়া হিসাবে এসেছে—আর তাস খেলার মূল ছাঁচও ভারত থেকে আমদানী। অধিকন্তু বিশ্বাস করার হেতু আছে যে আনুমানিক ২০০০ খৃঃ পূঃ কালে ইনডাস-উপত্যকা সভ্যতার মহেঞ্জোদারো এবং হারাপ্পার পল্লী-পত্তনীগুলি ছিল খেলার পুতুলের আদিভূমি। নাটকের ক্ষেত্রে আলব্রেখট ওয়েবারের দৃঢ় বিশ্বাস গ্রীক প্রভাবে (মঞ্চ—'যবনিকা'—গ্রীক আয়োনীয়ানদের নামানুসারে নামাঙ্কিত)—কিন্তু তিনি স্বীকার করেন যে গ্রীক ও ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের মধ্যে কোনো সংযোগ ঘটেনি। যাইহোক, আরনেষ্ট ভিনডিশ্ ঠিক এই কথাই অনুমোদন করেন।

তথাপি, শুধুমাত্র হালকা ধরণের রূপকথার তরঙ্গ সমুদ্রের মাধ্যমে ভেসে আসেনি। এক জাতি থেকে অন্য জাতির মধ্যে প্রতীকও ছড়িয়ে পড়েছে। বহুমূল্য রত্নরাজিও তার বর্ণগত প্রতীকত্বের কথা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়—হলুদ রঙের পোষাক সর্বদাই বিশেষ অর্থ বহন করে এনেছে। জাফরানী-পীত-রঙ প্রাচ্য দেশ থেকে যে সব দেবতা এসেছেন তাঁদের

অংশভুক্ত, অন্তদের মধ্যে ডায়োনিসস বাচ্চুস (জেডলায় তাঁর "য়ুনিভার্সাল লেকসিকন" নামক অভিধানে বলেছেন—"প্রাচীন ভূতাত্ত্বিকরা বলেছেন প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ৫০০০ সুন্দর নগরী ছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল নিশা। অনেকের বিবেচনায় এই জায়গাটি বাচ্চুসের জন্মভূমি)। আজও ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীদের পরিচ্ছদের এই রঙ। জ্যাসন থেকে হেলেন অব ট্রয়, এন্টিগোন থেকে এণ্ড্রোমিডা—জাফরানী হলুদ রঙ মর্যাদার রঙ বলে বিবেচিত হত। গ্রীকদের কাছ থেকে জার্মান জাতিদের মধ্যে এই ধারা প্রবাহিত হয়। ভারতীয় রাজা-মহারাজা, ইরানীয় শাসকবর্গ, হেলেনিক, রোমান এবং জার্মানিক রাজন্যবর্গ তাঁদের পদমর্যাদা প্রকাশে জাফরানী হলুদ বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। সং অব সলোমনে উল্লিখিত কারকোম বা ক্রোকাস থেকে জাফরান জয় করে আনা হয়—ভারতীয় ভাষায় কুঙ্কুম থেকে এই অভিধা পাওয়া যেতে পারে। এই একইভাবে 'পেপার' এই নামটি পাশ্চাত্য জগতে এসেছে। উদ্ভিদ এবং জীবজন্তুর ক্ষেত্রে যা ভারতীয়দের মনে একটা প্রতীকি চরিত্র নিয়ে উপস্থিত—প্রতীকের অর্থ অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় নামের সঙ্গেই হস্তান্তরিত হয়েছে।

প্রতীকের কথাই ধরা যাক। ভারতীয় দেবী যিনি প্রজ্ঞার অধিশ্বরী তাঁর বাহন ময়ূর (পশ্চিম ভারতে ময়ূর সরস্বতীর বাহন হিসাবে গৃহীত)। সেই কারণে গ্রীক এবং রোমানরা হেরা-জুনোকে এই সুন্দর পাখিটি দান করেছেন। তথাপি হিন্দু-দেবদেবীদের সেনাপতি কার্তিকেয়—ময়ূর বাহন। অতএব এই পাখি আধ্যাত্মিক এবং ঐহিক শক্তি ও মর্যাদার প্রতীক। পাশ্চাত্য জগতে ময়ূর পরবর্তীকালে স্ত্রী জাতীয় চিহ্নে পরিণত হয়। যথা : বাইজানতীয় সম্রাজ্ঞীর অভিষেক প্রতীক। ধর্মীয় এবং ধর্ম নিরপেক্ষ শক্তির প্রতীক হিসাবে ময়ূরপুচ্ছ আজও পোপের শোভাযাত্রায় বাহিত হয়। এ ছাড়া প্রাচীন হিন্দু সৌরচিহ্ন (কারণ ময়ূরের এই অর্থও আছে), খ্রীষ্টজগতে পুনর্জন্মের জীবন্ত প্রতীক হিসাবে গৃহীত হয়। প্রসঙ্গতঃ 'অরবিস ক্রিষ্টিয়ানুস' (বা খ্রীষ্টীয় জগৎ) একটি ক্ষেত্রের কথা অবগত আছেন যেখানে অধিষ্ঠাতা সন্তদের বা পেট্রণ সেন্ট ময়ূরের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন। পাদেরবোর্ণের ওয়েষ্টফালিয়ান নগরের অধিষ্ঠাতা ছিলেন মুলের বিশপ সেণ্ট লাইবোরিয়াস অব-লেম্যানস—এ্যান্টিক যুগের শেষার্ধের এই সাধু সর্বদাই ময়ূর সমেত অঙ্কিত হয়েছেন। পণ্ডিতগণ অনেক সময় কেন যে এমন হল তা ভেবে বিস্ময়বোধ করেন। হয়ত লাইবোরিয়াস ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ

কর্মের দ্বৈত পদের সম্ভাব্য অধিকারী ছিলেন—অর্থাৎ একাধারে বিশপ ও নাগরিকদের সেক্যুলার কাউন্সিল বা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা পরিষদের অধিকর্তা ছিলেন—সম্রাট প্রথম ভ্যালেনটিয়ান ৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এক একটি জেলার জন্য এই পদ সৃষ্টি করেন। আর তার অভিধা ছিল 'ডিফেনসর সিভিটাটিস' বা রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষক। সেকালের গ্যালেরা প্রাচ্য দেশের সঙ্গে অনেক সংযোগ রেখেছিলেন যার ফলে 'ময়ূর' প্রতীক সম্বন্ধীয় তাঁদের জ্ঞান অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করা যায়। সেই কারণে হিন্দুদের সরস্বতী-কার্তিকের বাহন ময়ূর প্রতীক পরবর্তীকালে পূর্ব ওয়েস্টফালিয়ানে পাডের নদীর ধারে দুশ প্রস্রবণের দেশে আর্চবিশপের প্রাপ্য প্রতীকে পরিণত হয়। পাডেরবোর্ণের প্রাচীন Hochstift (ধর্মীয় প্রধান) এই প্রতীক চিহ্ন তাই তেমন বিস্ময় সঞ্চার করে না।

তথাপি ভারতবর্ষ অনেক কল্পিত প্রাণীর প্রতীকও সরবরাহ করেছে। অন্যান্যের মধ্যে 'এক শৃঙ্গী' জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব ক্ষেত্র হল ভারতবর্ষ। গণ্ডার বিষয়ে অনির্দিষ্ট উপকথা এবং রূপকথা য়ুরোপীয় মানসে এমন এক প্রাণী সৃষ্টি করেছিল যার অস্তিত্ব বিষয়ে আধুনিক কালের গোড়ার দিকেও বিশ্বাস ছিল। রাবানুস মাউরাসের পর থেকে জার্মান লেখকরাও এই বাস্তু জন্তুর কাহিনী বর্ণনা করে গেছেন। কনরাড গেসনারের লাতিন হিসট্রি অব এ্যানিম্যালস্ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত সেকালের মানুষের কাছে প্রাণীতত্ত্বগত বাস্তবতা হিসাবে এই প্রাণী গৃহীত হয়। মধ্যযুগীয় মন ও হাটনের শতাব্দীর মধ্যবর্তীকাল পর্যন্ত সময় যে কোনও উদ্ভট ধরণের কাহিনী মানুষ চোখ কান বুজে মেনে নিত। হাটনের কালে আধুনিক ধরণের গবেষণা ও অনুসন্ধান রীতির প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ল। লুডারসের এবং এটিংহাসনের মত গবেষক পণ্ডিতগণ এক শৃঙ্গীর রহস্য ভেদ করে বলেছেন তাঁদের মতে ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারতের একটি অধ্যায় হল এই চমকপ্রদ কাহিনীর উৎস।

এই কাহিনীতে বলা হয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গ নামে এক তরুণ ঋষির কপাল থেকে হরিণের শিং গজিয়েছিল। তার পিতার নাম বিভাণ্ডক মুনি। এইভাবে হরিণ শৃঙ্গী বা ইউনিকরণ কথাটির উদ্ভব—মানব কল্পনায় এই উদ্ভট সৃষ্টি থেকে তার উৎপত্তি। ইউনিকরণ হল "পুরাণের বিশাল চিড়িয়াখানার প্রাণী"।

কাহিনীটি এইরূপ—একবার দারুণ খরার বছর—সেই খরা দূর করা সম্ভব যদি কোনো রাজকুমারী সাফল্যজনকভাবে কোনো এক শৃঙ্গীর প্রেমে বিজয়িনী হয়। এইভাবে কামসূত্রের দেশে যে রূপকথার মধ্যেও কামোদ্দীপক কাহিনী

প্রবেশ করবে সে আর আশ্চর্য কি—অথচ য়ুরোপে এই ইউনিকরণ কুমারীত্ব, পবিত্রতা ও সতীত্বের প্রতীক হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই কারণেই ধর্মীয় শিল্পবস্তুতেও তার স্থান হয়েছে।

সাহিত্য স্বাভাবিকভাবেই এই অতি পরিচিত এবং অজ্ঞাত ভারতকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। সাধু ল্যামপরেখট্ লিখিত রচনানুসারে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের বিষয়বস্তু জার্মান সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়েছে। মধ্যযুগের গোড়ার দিকের রোমান্স ম্যাসিডনের চমকপ্রদ চরিত্র থেকে সূত্র নিয়েছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে সরে এসে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকাণ্ডের বলিষ্ঠ হারকিউলিসের মত এক কাল্পনিক চরিত্র গড়ে উঠেছে। আর্মে হাইনরিখ (দরিদ্র হেনরী) এবং গটফ্রীড ফন ষ্ট্রাসবুর্গের 'ত্রিস্তান'—এই দুই কাহিনীর পটভূমিই পরিপূর্ণভাবে ভারতীয় না হলেও মোটামুটিভাবে প্রাচ্য দেশের বলা যায়। ওলফ্রাম ফন এসখেনবাখের 'পারজিভাল', 'উইলেহাম' ও লোহেনগ্রীন' সম্পর্কে এই একই কথা প্রযোজ্য। এখানে ভারতের প্রভাব আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশিত যেমন হয়েছে প্লায়ারের তানডারিস ও ফ্লোরেডিবেল-এর ক্ষেত্রে।

সুনিপুণ আকর্ষণের ভারত এখানে মানসিকতায় ভারত হয়ে এসে যোগ দিয়েছে। ওটো ফন ফ্রাইসিং-এর আখ্যানে ভারতীয় রাজর্ষির কথা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ প্রায় ১১৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত।

(জনৈক জন, যে দূর প্রাচ্যের পারসিয়া ও আর্মেনিয়া ছাড়িয়ে বাস করে সে তার অনুচরগণ সহ ক্রিশ্চান।)

উলফ্রামের 'পারজিভাল'-এ এই মধ্যযুগীয় চরিত্র অর্ধেক সত্য আর অর্ধেক কল্পনা। সে ভারতবর্ষের সহনশীল ফীরেফীজ ও রেপানসের তনয়। ইয়ুংগার তিতুরেল-এ পারজিভাল নিজেই রাজর্ষি।

ভারতবর্ষে এই অধ্যাত্ম তীর্থ যাত্রার যুগে শেষ পর্যন্ত একটি উপন্যাস রচিত হল যদ্বারা মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের কল্পিত দিকটি বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই উপন্যাসটি রুডলফ ফন এমস-এর 'বারলাম উণ্ড জোশাফাট'—। সমগ্র য়ুরোপীয় রচনায় এই সব কাহিনী ছড়িয়ে আছে-এইসব চরিত্র সম্ভবতঃ 'ললিতবিস্তার' নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া। জোহানেস ডামাসসেনুস তার সমকালীন গ্রীকদের মধ্যে বারলাম ও জোসাফাটকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই সব প্রজ্ঞাদীপ্ত ভাব বিনিময় ও সংযোগ এইসব কাহিনীকে জার্মান মধ্যযুগীয় রচনার অংশীভূত করেছে।

"জন, মানুষটি ভালো
সর্বদা ঈশ্বরে বিশ্বাসী
দামাসকাসের নামে তার নামকরণ হয়েছিল
সে বলেছে এই কাহিনী..."

জোনাকাট, এই উপন্যাসানুসারে ভারতীয় সম্রাট আভেনীয়ারের সন্তান, সে নিষ্ঠুরভাবে নিয়মিত ক্রিশ্চানদের ওপর অত্যাচার করে। যাই হোক তরুণ রাজপুত্র ক্রিশ্চান সাধু বারলামের দ্বারা দীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে খ্রীষ্টধর্মের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য বুঝলেন এবং নিজেই ক্রিশ্চান হলেন। বোধিসত্ত্ব কথাটির অপভ্রংশ জোসাফাট। মহাযান বৌদ্ধধর্মে এই কথাটির মহাযানে একজন সাধুর 'বুদ্ধ' হওয়া বা সাধনার চরম মার্গে পৌঁছে মোক্ষলাভের কথা আছে। এই মধ্যযুগীয় উপন্যাস এমন আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে আনন্দময় ভঙ্গীতে রূপায়িত যে সাহিত্যিক চরিত্রাবলী সাধুতে পরিণত হয়েছেন এবং মানুষ বিশ্বাস করেছে এঁদের প্রকৃত অস্তিত্ব ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য খ্রীষ্টানত্ব বারলাম ও জোসাফাটকে বেদীর সম্মানের অংশীদার করেছে। আস্তোয়ার্পে মধ্যযুগে এঁরা বিশেষভাবে পূজ্য বলে গণ্য হয়েছেন।

কিন্তু বোধিসত্ত্ব থেকে উদ্ভব হলেও অশোকের কাহিনী এবং তাঁর জীবনী হয়ত জোসাফাটের ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছে। জোসাফাট বৌদ্ধ অশোক অবদানের মধ্যে উল্লিখিত এই মহান্ ভারতীয় শাসকের জীবনের কিছু ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই মধ্যযুগীয় রচনাদি আধুনিক মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন। ঐতিহাসিক এবং অধ্যাত্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচারের অভাব আছে অনেক ক্ষেত্রে। অধ্যাত্ম এশিয়ার জনগণ এইসব কাব্যিক চরিত্র কিন্তু আধুনিক য়ুরোপীয়দের চেয়ে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া উত্তম। মধ্যযুগীয় রচনা সযত্ন গবেষণা এবং সতর্ক ব্যাখ্যার দাবী রাখে। এই ব্যাপারে মনে রাখতে হবে মধ্যযুগীয় মানুষের জগতের কথা, তার অধ্যাত্মতাত্ত্বিক বিশ্বজগৎ এবং একজন শিক্ষিত মানুষ প্রজ্ঞার সংহতি প্রয়াসী। রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের মধ্যে সমকালের সম্পর্ক একদিকে আর অন্যদিকে কবি ও তীর্থ পথিক, কবি ও নৃপতি এবং সম্রাট ও অন্যদের সঙ্গে যে সম্পর্ক তা অনুধাবন করতে হবে। তাহলে আমরা হয়ত সেইসব বাসনা ও কামনার দৃশ্যাবলীর ঐন্দ্রজালিক প্রভাব যা সুদূরের মহাদেশ ভারতকে ভৌগোলিক দিক থেকে স্থিতিশীল করেছে তার অন্তর্নিহিত মর্ম বুঝব।

সাধারণভাবে জার্মান মধ্যযুগের মহৎ প্রজ্ঞাসম্মত সৃষ্টি হোলি গ্রেইলের সাহিত্যকে আমাদের বিচার করতে হবে। হোলি গ্রেইলের রোমান্স উপন্যাসের চেয়ে বা তার কয়েকটি অংশের চেয়ে অনেক বেশী আকর্ষণীয়। ফরাসী আদর্শের কাঠামো থেকে অনেক অতীন্দ্রিয়। উলফ্রামের সাহিত্যসৃষ্টি গভীরভাবে অধ্যাত্মতাত্ত্বিক। এ এক অধ্যাত্ম ও ধর্মীয় বিশ্ব জগতের প্রতিকৃতি। এই কারণে উলফ্রাম ফন এসেখেনবাখের সৃষ্টি যেন একটি কবিতার মত কাব্যিক-রাজনৈতিক স্বপ্নকে নতুন আঙ্গিকে পরিবেশিত একটি কবিতা। সর্বোপরি, এই জার্মান কবি ভারতীয় রাজর্ষি জোহানসের দ্বারা সম্মোহিত হয়েছিলেন। জোহানেস পারজিভালের সতাত ভাই ফিয়েরফিজের পুত্র। প্রসঙ্গতঃ এই হল ভারত-জার্মান সম্পর্কের প্রথমতম সাহিত্যিক নিদর্শন।

অধ্যাত্মিক নেতৃত্বের এক প্রাচীনকালের স্মারক একটি রহস্যকে এই গ্রেইলের কাহিনী জার্মানজগতে রূপান্তরিত হয়ে উদ্‌ঘাটিত করেছে। উচ্চ আদর্শের অধিকারী একদল মানুষ পৃথিবীকে ভালোবাসা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারা পরিবর্তিত করতে চান—:ক সেই প্রজ্ঞাদীপ্ত প্রশ্ন করবে তার রহস্য আবিষ্কার করতে বিনম্র ভঙ্গীতে কথাগুলি উচ্চারিত। মানবিক গুণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যাত্মিক রাজনৈতিক গুণ ; গ্রেইলের রহস্য সাম্রাজ্যের পবিত্র ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত। জুলিয়াস ইভোলা তাঁদের অন্যতম যাঁরা বুঝেছিলেন গ্রেইলকে রাখার দায়িত্বের সঙ্গে মিশিয়ে আছে মধ্যযুগীয় ঘীবেলীনের আদর্শবাদ। যাইহোক সেখানে তিনি গির্জার বৈপরীত্যকে দেখলেন বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে, যার সংশ্লেষণই একদা লক্ষ্য ছিল। যাজকতান্ত্রিক পদকে রাজনীতিমুক্ত করলেন এবং একই সঙ্গে রাজকীয়রক্ষণশীলতার ঐতিহ্য সংরক্ষিত রইল, নাইটস অব দি গ্রেইলের এই ছিল মূল উদ্দেশ্য। ইভোলা গ্রেইলের রহস্যের সঙ্গে সাম্রাজ্যের রাজকীয় ঐতিহ্য মিশ্রিত করে ভালোই করেছিলেন – বিশেষ করে ঘিবেলীনদের ক্ষেত্রে (ঘিবেলীন—মধ্যযুগের ইতালীয় বৃহৎ রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্তদের ঘিবেলীন বলা হত—মহাকবি দান্তে ছিলেন এই দলভুক্ত)—তবে শুধুমাত্র পরিপূর্ণ পবিত্রতার মধ্যযুগীয় স্বপ্ন। যেমন একটি বৃক্ষ অন্তর্গত গোলকের মধ্যে সকল স্তর পরস্পর সংযুক্ত থেকে পারস্পরিক প্রেরণার উৎস হয়ে বিরাজ করে। গ্রেইলের অন্বেষণের ব্যাপারটি মধ্যযুগীয় বিশ্ব সাম্রাজ্যের চিন্তার মধ্যে বিজড়িত। শুধুমাত্র ধর্মপরায়ণই তার মর্ম বুঝবে। অবশ্য মধ্যযুগের প্রজ্ঞাসম্মত ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক অবস্থানকে সর্বপ্রথম বুঝতে হবে।

এইখানেই জুলিয়াস ইভোলা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে বিস্তারিত স্তরের ওপর জোর দিয়ে দেখিয়েছেন ঐতিহাসিক কোথায় অতি ঐতিহাসিকের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে।

"ইতিমধ্যে বিশ্লেষিত উপজীব্যের বৈশিষ্ট্যগত বিবরণ থেকে আর্থারের কাহিনীকে 'চক্রাকার প্রকটন' বা অবতার তত্ত্বের সাধারণ নীতি বলে গ্রহণ করতে হবে। ভারতীয় ঐতিহ্যে আমরা মহকচ্ছপের কাহিনী পাই—ইনি একটি পর্বতগহ্বরে নিদ্রামগ্ন কিন্তু শক্তির নব প্রকটনের মুহূর্তে শঙ্খধ্বনি করা মাত্র জেগে উঠবেন যেভাবে পূর্বে বুদ্ধের বেশে একবার আবির্ভূত হয়েছিলেন। এমন একটি ঘটনা 'পৃথিবীর প্রভু' বা চক্রবর্তীর আবির্ভাবের সঙ্গে সমতালে ঘটতে পারে— চক্র, চন্থ, আবার শঙ্খের সঙ্গে মেলে, শঙ্খ অর্থাৎ শক্তি—এক দ্বৈত প্রকটন— যদ্দ্বারা তন্দ্রার ঘোর থেকে জাগরণের ভাব প্রতিফলিত, এর মধ্যে আর্যদের "ভেল্টকোনিগ" (বিশ্ব-সম্রাট) আদর্শের অভিব্যক্তি প্রকাশিত, এবং সেই আদিম ঐতিহ্যের এক নতুন প্রকাশ যা এই কাহিনী অনুসারে অন্তর্বর্তী সংকটকালে শক্তির অভ্যন্তরে আপনাকে আবদ্ধ রেখেছিলেন বলে মনে করা হয়।"

এই কাহিনীর আভ্যন্তরীণ প্রতীকি অংশ থেকে মুক্ত হয়ে এসে ইভোলা দেখিয়েছেন কিভাবে ভারতের ঐ পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গী কবি এবং লেখকদের খাল্প কল্পিত সাম্রাজ্যের ভাবধারার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে। "আমাদের জন্য সংরক্ষিত অসওয়ালড কর্তৃক (অসওয়ালড দি ক্লীব) অপর একটি প্রবাদে বর্ণিত হয়েছে ২য় ফ্রেডারিক সাধু জোহানেসের কাছ থেকে অদাহ্য গিরিগিটি চর্মের একটি জোব্বা, তিনি চিরন্তন যৌবনের পবিত্র বারি, এবং তিনটি পাথরখচিত একটি অঙ্গুরী লাভ করেন। এই অঙ্গুরী হাতে পরলে জলে ডুববে না, কোনো কিছু দ্বারা আক্রান্ত হবে না, এবং অদৃশ্য থাকতে পারবেন। সাধু জোহানেসের পাথরের এই কাহিনী আনুমানিক ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের জার্মান রূপান্তরে উল্লিখিত আছে বিশেষতঃ অদৃশ্যকারী শক্তির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই সব কাহিনী অতিমাত্রায় শিক্ষাপ্রদ যদি বোঝা যায় যে সাধু জোহানেসের চরিত্রে আর কিছু নয় 'উচ্চতমকেন্দ্র' এই ধারণার মধ্যযুগীয় চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। এই রহস্যময় স্থানটি কখনও মধ্য এশিয়া, কখনও মঙ্গোলিয়া, কখনও বা ইনডিয়ায়, এমন কি ইথিওপিয়ায় অবস্থিত এই কল্পনা করা হয়—শেষোক্তটি অবশ্য সেই কালের রীতিতে কিছু বিভ্রান্তিকর এবং পরিবর্তনশীল অর্থবহ। তথাপি যেভাবে এই সাম্রাজ্য বর্ণিত হয়েছে—এর প্রতীকি প্রবৃত্তি প্রশ্নাতীত স্পষ্টতার মধ্যে প্রকাশিত। রাজর্ষি জোহানেস যেভাবে সম্রাট

আলেক্সারিককে 'উপহার' প্রদান করেছেন তাকে একদিক থেকে হোলি রোমান এম্পায়ার বা পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের সঙ্গে 'উচ্চতর কেন্দ্রে'র সংযোগ সাধনের জার্মান উদ্‌গাতাদের প্রতি একটা স্পর্ধিত আহ্বান বা চ্যালেঞ্জ বলা যায়।

এই জাতীয় অধ্যাত্মতাত্ত্বিক বা উপপত্তিক রাজনীতি বিজ্ঞানের দিক থেকে হোলি গ্রেইলের সমস্যা বিচার বিষয়ে পাঠকরা একটা সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারেন। তথাপি এতদ্বারা দেখা যায় যে হোহেনষ্টাফেন (ষ্টাফারস) এবং উত্তর হোহেনষ্টাফেন যুগে এমন এক শক্তি ক্রিয়াশীল যারা বিশ্বজাগতিক প্রকার এক অধ্যাত্ম সাম্রাজ্য গঠনের ভাবধারা মনে মনে পোষণ করেছেন। ইণ্ডিয়া-মীথ বা ভারতীয় পৌরাণিক ঘটনা এবং সাম্রাজ্যের ভাবধারা যে কোথাও একসূত্রে বাঁধা এই চিন্তা কোনো যুক্তিবাদী ঐতিহাসিক দ্বারা অগ্রাহ্য হতে পারে বিংশ শতাব্দীর সংশয়বাদের আলোকে। তথাপি ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাস্তবভূমিতে এই চিন্তা প্রকৃতই সাম্রাজ্য এবং বিশ্বজগতের ধ্যানের মধ্যে ছিল একটা বিভেদ বিন্দু। ইতালীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি দান্তে মানব সমাজের এই বিশ্বজাগতিক স্বপ্নের কথা কি তাঁর 'ডিভাইন কমেডি' নামক বিশ্বজনীন কাব্যে রূপায়িত করেন নি?

ভারতীয় আদর্শের ভিত্তিতে মধ্যযুগের আরো কয়েকটি জার্মান গ্রন্থ আছে, যথা কোনরাড ফন ভুরৎবুর্গের 'হারং মেয়ার'। এর মধ্যে শিয়ালকোটের রাসালু এবং তার স্ত্রী কোকিলান এবং প্রেমিক রাজা হোদির কথা একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ভারতীয় উৎপত্তির এই জাতীয় সাহিত্য কাহিনী যে যুগে এই সব কাহিনীর অধিকাংশের মাতৃভূমিতে সহজে প্রবেশ করা যেত না সেই কাল থেকে জার্মানীতে প্রচলিত। বেনফের মতে, "দাই স্খোন হিষ্টোরিয়া ফন এনগেলহার্ট অস বুরগুনৎ" (বার্গেনডির এনগেলহার্টের সুন্দর কাহিনী) এই উপাখ্যানের স্রষ্টার সম্মান ভারতের—এই ভারততত্ত্ববিদ ঘোষণা করেছেন যে পৃথিবীর কাহিনী রচনার সূত্রগুলি উদ্ভাবনের কাজটা ভারতই নিয়েছিল।

সব ধর্মেই তীর্থ পথিকরা শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে সম্মানিত চরিত্র হিসাবে স্বীকৃত। খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী পবিত্র সমাধিগুলিতে তীর্থ করতে যান—যেখানে মহাপুরুষদের দেহাবশেষ মৌলিকবস্তুর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। ভারতীয় ক্ষেত্রে অবশ্য জ্ঞান ও সত্যের সন্ধানী তীর্থ পথিক বিভিন্ন অঞ্চলে সেই সব ক্ষেত্রে দ্রুত ধাবিত হন যেখানে বিমূর্ত মহত্ত্ব এবং মানবিক দেবত্ব মেলে—যেখানে পবিত্র নদী, পবিত্র স্থান, পবিত্র হ্রদ এবং পবিত্র পর্বত সকল মানবিক পথের আদর্শের সোপান। ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় তীর্থ পথিকের সঙ্গে এই পার্থক্য।

যাই হোক, ভাগ্য বিভিন্ন ধারায় মানবিক সন্ধানের তীর্থপথকে জার্মানীতে এনে সম্মিলিত করেছে, য়ুরোপ ও প্রাচ্যের মৈত্রীর সংযোগ সাধন করেছে—যে ভাবে একদা মাজাই ইন কলোনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছিল।

১১৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন ধর্মীয় দান হিসাবে রাইনের নগরীতে পবিত্র দেহাবশেষ উপহার দেওয়া হয়—তখন তা যাজকতান্ত্রিক-রাজনৈতিক ঘটনার চেয়েও অনেক উচ্চতর ঘটনা। ধর্মত্যাগী লোম্বার্ড নগরী মিলান দ্বারা অধিকৃত হওয়ার পর সম্রাট প্রথম ফ্রেডারিক পবিত্র দেহাবশেষ চ্যান্সেলর রেইনালড ফন ডাসেলের (কলোনের আর্চবিশপ) কাছে জমা দিলেন, তিনি তা গ্রহণ করলেন যেন সম্রাটের হুকুমের সমর্থন—সেই প্রক্রিয়ায় তিনি প্রমাণ করলেন যে পবিত্রপন্থী ও সাম্রাজ্যিক শক্তির মধ্যে যে সংঘর্ষ চলছিল তার মধ্যে কি অপূর্ব সত্ত্বাধিকার তিনি তাদের দান করলেন। এইভাবে, প্রাচ্যের তিনজন জ্ঞানী যাঁরা লোয়ার রাইনের ধর্মীয় নগরীতে তাঁদের মুকুট সমর্পণ করলেন মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক চেতনার যুক্তিগত প্রমাণ।

এই তিনটি সাধুর স্বদেশ বার বার আরব সাগর অঞ্চলের কোথাও নির্দিষ্ট হয়েছে কিংবা 'প্রাচ্য হইতে' এই উক্তির জন্য এই ধারণা করাই সঙ্গত যে সেই অঞ্চলটি ইন্দো-ইরানীয় কোনো দেশ। এঁদের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে ভারতীয় তত্ত্ব ইদানীং ধীরে ধীরে কিছু সমর্থন লাভ করেছে। অনেকের মধ্যে হেলমুট মগী এই মত প্রকাশ করেছেন: "সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীতেও বিভিন্ন রচনায় জ্ঞানী ব্যক্তিদের নাম 'বিথিসারকা', 'মেলচিওর' এবং 'গথাসপা' নাম পাওয়া গেছে। নবম শতাব্দীতে এই নাম 'গ্যাসপার', 'বেলথাসার', 'মেলচিওর'-এ পরিণত হয়েছে।

কিন্তু মাজাই কোথা থেকে এলেন? জেরুসালেম থেকে কোন দেশ পূর্বাঞ্চলে? 'মা জোই' কথাটি থেকে অনেকের ধারণা হয়েছে যে কথাটির মধ্যে প্রাচীন পারসিক ধারা আছে। আবার অনেকের ধারণা মেসোপটেমিয়ার চালডিয়া মাজাইদের স্বদেশ। এছাড়াও অপরে যথা তেরতুলিয়ান প্রাজ্ঞদের স্বদেশ আরব দেশ বলে মনে করেন, কারণ স্বর্ণ এবং সুগন্ধি সেই দেশেই পাওয়া যায়। সুপণ্ডিত পর্যটক সাধু বোভার "৭২তম মন্ত্রমালা"র উপযুক্ত অর্থভেদের অভাবে আরবদেশ সংক্রান্ত তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মাজাই-এর উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে গির্জার যাজকদের ব্যাখ্যা পরস্পরবিরোধী।...এমন

কোনো কিছু নেই যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে যাযাবর জাতিগোষ্ঠীর প্রাচীন আরবরা বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী।

খ্রীষ্ট জন্মের কালে চ্যালডিয়ানদের প্রজ্ঞা তেমন প্রশংসিত হত না। কিন্তু ভারতীয় প্রজ্ঞা ছিল সর্বজনখ্যাত। পারসিক ঐতিহাসিকরা সেই প্রজ্ঞার প্রশংসা করতেন। তাঁরা ভারতবর্ষে যেতেন 'জ্ঞানবৃক্ষের সন্ধানে'। প্রাচীনতম যুগ থেকে ভারতীয় প্রজ্ঞা যে উচ্চশ্রেণীর তা ভুবনে বিদিত ছিল। ভারতের সাধুগণ যাঁদের 'ঋষি' বলা হত সর্বদাই এবং আমাদের কালেও সর্বদাই এমন "এক সামাজিক জাতিগঠন করে থাকেন সেই দেশের আর সকলের চেয়েও যাঁদের আসন শীর্ষে।"

ভারতবর্ষ এমন এক দেশ যেখানে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা ছিল। ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারতে এক স্বর্গীয় ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের ঘোষণা আছে—এই ত্রাণকর্তা মানুষকে তার সকল দুঃখ দুর্দশা থেকে ত্রাণ করবেন। তিনি অশেষ শক্তির অধিকারী এবং প্রতাপান্বিত শাসক হবেন। সংসারে তিনি শৃঙ্খলা ও সঙ্গতি আনবেন এবং সমস্ত অশুভ শক্তি বিনাশ করে তিনি পৃথিবীতে এক নব যুগ প্রবর্তন করবেন।…

ভারতীয় ভবিষ্যৎবাণী আকাশে এক অলৌকিক ঘটনার কথাও বলেছেন যা এই সংস্কারক ও মুক্তিদাতার জন্মের পর ঘটবে। আধুনিক ভারতীয় জ্যোতির্বিদ শ্রীস্বামীকান্নু পিল্লাই কেপলার এবং কার্ল এডামসের সমীক্ষা অনুশীলন করে দেখেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন যে নক্ষত্রটি তিনজন প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞানী ব্যক্তির পথপ্রদর্শক সেই নক্ষত্রের নাম বৃহস্পতি চন্দ্র এবং সূর্যের সঙ্গে তিনি সেই সময় যুক্ত ছিলেন—এবং সেই অবস্থায় তিষ্যানক্ষত্রের ঘরে প্রবেশ করেন।

সিংহলের পুরোহিত ফাদার এন্টোনিয়াস মাজাইদের যাত্রাপৎ পুনর্গঠন করেছেন এই সূত্র থেকে এবং এই বিষয়ে অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায়।

এঁরা নবজাতককে স্বর্ণ, সুগন্ধি ধূপ এবং সমুদ্র গুগ্‌গুল উপহার দেন। প্রাচ্যদেশীয় রীতি অনুসারে এই সব উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়ে থাকে—এইসব দ্রব্য উপহার দিয়ে তাঁরা নবজাতক শিশু নৃপতিকে সম্মানিত করলেন।

ভারতবর্ষে সুবর্ণের অস্তিত্ব ছিল। সুগন্ধি ধূপ এবং সমুদ্র গুগ্‌গুল প্রথমে 'সৌভাগ্যময় আরবদেশ' থেকেই এসেছিল একথা সত্য, তথাপি ভারতবর্ষেও যে তা আমদানি করা হত একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। ভারতের ঋষিদের

পক্ষে ঐতিহ্যগত উপহার স্বর্ণ, সুগন্ধি এবং সমুদ্র গুগ্গুল দান করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।"

যদি মাজাইরা ভারত থেকে এসে থাকেন তাহলে এই কাহিনী কি এক প্রতীকের মত মনে হয় না? রাইনে মাজাইদের প্রতি সর্বপ্রথম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় তার গৌরবের অধিকারী একটি জার্মান নগরী—'পবিত্র' এই নামে উল্লিখিত রাইন; হোলি কলোন "Hillige Kollen" এই নামটি বিশ্বাসীদের কাছে পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত। ভারতীয়রা পবিত্র-ভূমিকে বা স্থানকে সংস্কৃতে বলে 'দেবভূমি'। জার্মানীর পবিত্র কলোন হল ক্রিশ্চান জগতের দেবভূমি।

অধিকন্তু, মধ্যযুগের মানুষ সর্বদাই মনে করতেন যে মাজাইদের একজন ভারত থেকে এসেছিলেন। বালথাসার স্প্রেনগারের দৃষ্টান্ত ধরা যাক। তিনি মেরফারত (সমুদ্রযাত্রা) নামক তাঁর সমুদ্রযাত্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন কেরালার কোচিন প্রসঙ্গে—

"কোচিন এক বৃহৎ রাজত্ব। এখান থেকে অন্যতম এক মাজাই এসেছেন।"

সেণ্ট্ টমাস বা সংশয়বাদী শিষ্য হিসাবে উল্লিখিত এই সাধুকে সব সময়েই ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই শহীদের মৃত্যুর পর মাদ্রাজের নিকটস্থ মাইলাপুরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। এই শহরটি প্রাচীন তামিল মাইলাপুরম অর্থাৎ ময়ূরনগরী—যতদিন না সিরিয়ান ক্রিশ্চানরা আনুমানিক ২৩২ খ্রীষ্টাব্দে সেই দেহ এডেসায় সমাহিত করেন ততদিন সেখানেই ছিল সেণ্ট্ টমাসের দেহ। দক্ষিণ ভারতের ক্রিশ্চান সম্প্রদায়ের সঙ্গে সিরিয়ান ক্রিশ্চানরা ঘনিষ্ঠ সহযোগ রাখতেন। আনুমানিক ১১৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেখানেই ছিল সেই পবিত্র দেহাবশেষ পরে তুর্কীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কিয়োসে নামক দ্বীপে এই দেহাবশেষ পাঠানো হয়।

এরপর এইসব দেহাবশেষ সম্পর্কিত নথিপত্র জার্মান রাজকীয় ইতিহাসের এক উত্তেজনাময় পরিচ্ছেদ হয়ে উঠেছে। হোহেনষ্টাফেন সম্রাট ২য় ফ্রেডারিকের পুত্র রাজকুমার ম্যানফ্রেড ফ্রেঞ্চ অভিমুখী পোপের নীতির বিরোধের ওপর দক্ষিণ ইতালীতে নিজের রাজত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেন। মধ্যযুগীয় আপুলিয়া (পুলে) নামক অঞ্চলে তিনি প্রিন্স অব ট্যারেণ্ট (টারানটো) হিসাবে হোহেনষ্টাফেন প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। ৪র্থ কনরাডের (১২৫৪) দেহাবসানের পর তিনি রাজনৈতিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে হোহেনষ্টাফেনের গৌরব উদ্ধারে সচেষ্ট হন। পবিত্র দেহাবশেষের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন এই জাতীয় এক পন্থা। ম্যানফ্রেডের

পরিকল্পনা ছিল সুদূরপ্রসারী। আলেকজাণ্ডারের মত তাঁর নজর প্রসারিত হয় প্রাচ্যদেশের দিকে। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী হেলেন প্রিন্স অব এপিরাস-এর কন্যা। ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যানফ্রেড স্বয়ং সম্রাটের পদে আপনাকে অভিষিক্ত করেন কারণ কোনরাডিনের মৃত্যুর একটা গুজব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইনিই ছিলেন আইনসঙ্গত হোহেনষ্টাফেন উত্তরাধিকারী। আলেকজান্দ্রিয়ার মত ম্যানফ্রেডোনিয়া বিশ্ব-সাম্রাজ্যের পীঠভূমি হবে এই প্রকল্প করা হল এবং সেই বছরই ম্যানফ্রেড চিওস থেকে সেণ্ট টমাসের পবিত্র দেহাবশেষ তাঁর সাম্রাজ্যে স্থানান্তরিত করার আদেশ দিলেন। ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর এই মূল্যবান জিনিস নিয়ে জাহাজ বন্দরে এসে পৌঁছালো। এইভাবে শেষতম মহান হোহেন-ষ্টাফেন যিনি বলিষ্ঠ কল্পনার অধিকারী ও উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রথম ফ্রেডারিকের পবিত্র দেহাবশেষ নীতি পালন করলেন। তাঁর নিজের রাজত্ব ওরটোনায় তিনি সেণ্ট টমাসের পবিত্র দেহাবশেষ নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। এইভাবে গির্জা রাষ্ট্রের সীমানায় যাঁকে পোপ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সেই রাজকুমার গির্জা ও ধর্ম সম্পর্কীয় ব্যাপারে আপনার আগ্রহ সপ্রমাণে প্রয়াসী হলেন এবং একটি বৃহৎ তীর্থস্থান প্রতিষ্ঠা করলেন। অধিকন্তু ওরটোনা—যা তাঁর পূর্বেকার উত্তরাঞ্চলে সগৌরব প্রত্যাবর্তনের প্রতীক—হোহেন-ষ্টাফেনদের উৎপত্তিভূমি। অন্য কোনোদিক থেকে নিরাপত্তাহীন সীমান্ত অঞ্চল ওরটোনাকে একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করা কোনো অর্থই হত না। যাই হোক ম্যানফ্রেডের স্বপ্ন পূর্ণ হল না। ওঁদের দক্ষিণ সাম্রাজ্যে হোহেনষ্টাফেনদের বিয়োগান্ত সমাপ্তি ঘটল—আর কোনোদিন তা উত্তরে ফিরল না। তথাপি পারগেটোরিও নামক অংশে 'কমেডিয়া ডিভাইনা' নামক কাব্যগ্রন্থে দান্তে ম্যানফ্রেডের প্রশংসায় কয়েকটি লাইন লিখেছেন।

জার্মান লেখকরা তাঁদের জার্মান ও লাতিন রচনাদিতে বারবার টমাসকে ভারতের প্রথম সন্তদেব বলে উল্লেখ করেছেন। এই জাতীয় উল্লেখ ক্যারোলিঙ্গিয়ান দিন থেকে পরবর্তী কালের গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়—দৃষ্টান্ত হিসাবে—'এ্যানোলায়েড' গ্রন্থের লেখক ওয়ানডালবার্ট যিনি ৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রুম-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং অষ্ট্রিয়ান গ্রন্থ 'রাইমড ক্রনিক্যাল'-এ উল্লেখ আছে। সেণ্ট এ্যানো, কনোনের আর্চ বিশপ তাঁর সম্পর্কে—'এ্যানোলায়েডে' এক অনন্যসাধারণ শ্রদ্ধাঞ্জলিতে বলেছেন সাধু যে সব অঞ্চল স্বয়ং প্রভুর প্রাপ্যাংশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সেখানে দেখা যায়—

স্বর্গ থেকে তাঁরা শক্তি আহরণ করেছেন
কাফেরদের জয় করার জন্য।
রোম পিটার কর্তৃক পরাভূত
গ্রীকদের পরাভূত করলেন প্রাজ্ঞ পল,
সেণ্ট এনড্রুর মৃত্যু হল পাতরাসে
আর ভারতবর্ষে সাধু টমাস।

অষ্ট্রিয়ান 'রাইমড ক্রনিক্যলে' আশা প্রকাশ করা হয় এ্যাবট, হেনরী অব-এডমণ্ট, ক্রিশ্চান সমাজে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেন। পোপের সিংহাসন ছাড়া আর কোথায়? এইভাবে—'ভারত' এই ম্যাজিক শব্দ—সেই উজ্জ্বল শব্দ যার মধ্যে একজন সাধু দ্বারা ক্রিশ্চানত্বে দীক্ষিত এক দেশের আকৃতি মনে ভেসে ওঠে—একজন রাজবংশীয় পুরোহিত যেখানে শাসক ছিলেন-এই চিন্তা স্বভাবতই লেখকের মনে জেগেছে—

সাল্জবুর্গের জনগণ আশা করেছিলেন—
তিনি পুরোহিত জনের সান্নিধ্য পাবেন,
ভারতের সেণ্ট টমাসের সঙ্গে দেখা হবে,
আর সেইখানে প্রধান পুরোধা হবেন।

সেণ্ট টমাসের প্রতি শ্রদ্ধা এমন এক পর্যায়ে পৌছেছিল যে অনেকে মনে করতেন এই মহাত্মা জার্মানীতেও এসে থাকবেন। কারণ তিনি কি খ্রীষ্টের সর্বোচ্চ পর্যটনকারী শিষ্য ন'ন? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দেও সন্তদের এক অভিধানের সম্পাদক সেণ্ট টমাস বিষয়ে সেণ্ট ক্রিসোসটোমোসের মন্তব্যের ওপর নিম্নলিখিত তথ্য সংযুক্ত করেন:

"তিনি হয়ত জার্মানীতেও প্রচার করতেন যদি 'কারামানিয়াম' এর পরিবর্তে 'জার্মানিয়াম' বলতেন।"

রাজ-পুরোহিত জোহানেসের সম্পর্কে যে সব কাহিনী প্রচলিত আছে তা যদি আরোপ করা যায় তাহলে বলা যায় সেণ্ট টমাসের জার্মানীতে কিছু খ্যাতি ছিল। ম্যানফ্রেডের ক্রিয়াকলাপের পর সেণ্ট্রাল য়ুরোপের তীর্থযাত্রীদের আর প্রাচ্যদেশে ক্লান্তিকর তীর্থযাত্রায় বেরোতে হত না, রোমযাত্রী তীর্থ পথিকরা তাঁদের যাত্রাপথেই সেণ্ট টমাসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারতেন।

জার্মানী থেকে ভারতবর্ষে এই সাধুর শহীদত্বের ভূমিতে ক'জন খাটি তীর্থপথিক জার্মান গেছেন তা আমাদের জানা নেই। নিশ্চিত হয়ে বলা

আর ত্যুরের সেণ্ট গ্রেগরী ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছেন যে জনৈক থিওডোর সেণ্ট টমাস যেখানে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন সেই স্থানটি দেখেছেন। এই থিওডোর কি একজন ফ্রাঙ্কিস পর্যটক? সম্রাট আলফ্রেডের রাজত্বকালে সীগ্‌হেলম ও এথালষ্টান নামক দুজন তীর্থযাত্রী ভারতবর্ষে গমন করেন—এঁরা সেণ্ট টমাস এবং সেণ্ট বার্থোলমিউ গিয়েছেন। সুতরাং গোড়ার দিকের মধ্যযুগীয় জার্মানভূমির তীর্থ পথিক নিশ্চয়ই সেখানে গিয়েছেন। হয়ত সর্বাপেক্ষা পরিচিত জার্মান তীর্থ পথিক যিনি ভারতে গিয়েছিলেন তাঁর নাম হাইনরিখ ফন মরুনগেন—তিনি—মারগ্রেভ অব মাইসেন টু দি হোলী ল্যাণ্ডের সঙ্গে ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভ্রমণে বেরিয়ে পরে প্রাচ্যদেশ পর্যটনে যান। তাঁর সংক্রান্ত জীবনী-মূলক তথ্যাদির মধ্যে একটা মূল্যবান তথ্য হল তিনি আশীর্ব্বাদপূত টমাসের ভূমি দর্শন করেছেন—অর্থাৎ ভারতস্থ তাঁর মৃত্যুর ক্ষেত্র তিনি দেখেছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর অবসানে নাইট আরনল্ড ফন হারফ ভারতবর্ষে তীর্থযাত্রী হিসাবে গিয়েছেন প্রকাশ আছে। স্বদেশে ফেরার আগে তিনি প্যালেষ্টাইনের পবিত্র ভূমিগুলি পরিদর্শন করেন। পরে তিনি কলোনে মাজাইদের সমাধিতে সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। তাঁর নিজের লেখা ভারতভ্রমণ কাহিনী (অন্য তথ্যের ভিত্তিতে) অতিশয় বিতর্কমূলক, যদিও ব্রিটিশ পণ্ডিত ম্যালকম লেটস এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে নাইট অব হারক সোমালিল্যাণ্ড এবং সকোট্রা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। এই দৃষ্টান্ত ব্যতীত তীর্থযাত্রীরা ভারতভ্রমণের কোনো কথা ব্যক্ত করেন নি। তবে একথাও সত্য যে তীর্থযাত্রী মাত্রেই কিছু সুশিক্ষ ভ্রমণকথা লেখক ন'ন।

মধ্যযুগের শেষ ধাপে জার্মান ও য়ুরোপীয় ইতিহাস সাধারণ সংস্কার সাধনের জন্য সম্রাট সিগিসমুণ্ড-এর সংগ্রামের কাহিনীতে পূর্ণ, এই সব সংস্কার রাজনৈতিক-সরকারি এবং চার্চ-ধর্মসংক্রান্ত। সম্রাটের ক্রিয়াকলাপের ফলে রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে দুটি বিধানসভা সৃষ্টি হয়েছিল। একটি কনসটানসে, যেখানে পোপের মতভেদ বা দলাদলি সার্থকভাবে মেরামত করা গিয়েছিল এবং বাসলে শহরে একটি রিফর্মেটরী বা সংস্কারমন্দির স্থাপিত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ কাউন্সিল অব কনষ্টানসের রিপোর্টে স্যাকসন ওর্য়াল্ড ক্রনিকল তার চতুর্থ অনুচ্ছেদে ভারতীয় চার্চভুক্ত প্রতিনিধির উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে।

"চারজন সাধু সাগর পার থেকে, সুদূর ভারতবর্ষ থেকে এসেছিলেন, এদের কপালে ক্রসের পোড়া চিহ্ন অঙ্কিত।"

এই সব ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকায়, এটা বিস্ময়ের কথা নয় যে সেইকালে পাশ্চাত্য-দেশের ব্যক্তি ও ঘটনা সম্পর্কিত কাহিনী ভারতবর্ষেও এসে পৌঁছেছিল। তন্মধ্যে শার্লমেন ও পরবর্তী পর্যায়ে যাঁরা জেহাদ পরিচালনা করেন সেইসব সম্রাটদের কথা সুপরিচিত ছিল। মহান ফ্রাঙ্কিস শাসক এবং পুণ্যভূমির (হোলি ল্যাণ্ডের) জন্য যুদ্ধের যুগ আজও কেরালায় 'সিরিয়ান' ক্রিশ্চানদের নৃত্য ও জনপ্রিয় সঙ্গীতের বিষয়বস্তু। এর নাম "চরিত্তু নাটকম্"।

সম্রাট সিগিসমুণ্ড 'ভারতীয় সমস্যা' নিয়ে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন—রাজর্ষি জোহানসের প্রশ্নটির সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁর একটা উচ্চ আশা ছিল। তিনি—'রেক্স-সেকেরডস' (রাজা ও পবিত্রতার সমন্বয়) সিনথেসিস—ঠিক ভারতীয় পুরাকাহিনীগুলিতে যেমন লিপিবদ্ধ আছে। এই সংস্কার কার্যসূচী একটি অতি সুললিত দলিলের দ্বারা প্রচারিত হয়, সাধারণতঃ তার নাম 'রিফর্মেশন অব সিগিসমুণ্ড' যার প্রতিক্রিয়া প্রথম ম্যাকসিমিলিয়ান ও লুথারের জার্মান জাতির ক্রিশ্চান ভদ্র-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বাণী। সম্রাট স্বয়ং এই দলিলটি রচনা করেছিলেন কিনা সে কথায় তেমন কিছু এসে যায় না। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে সম্রাট স্বয়ং এই ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যার থেকে তাঁর নীতি সহজেই নির্ণয় করা যায়। সম্রাট সিগিসমুণ্ড চার্চ ও রাষ্ট্র সম্মিলিত নীতি গঠনে তাঁর প্রয়াসকে নিয়োজিত করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই জাতীয় আগ্রহের ফলে তাঁকে নিশ্চয়ই 'সিসারোপেপিষ্ট' বা ধর্মীয় একচ্ছত্র নায়কত্বের অপরাধে নিন্দিত করা হত। যাই হোক, সিগিসমুণ্ড প্রাথমিক ভাবে চার্চ এবং ধর্ম্মনিরপেক্ষ শক্তির আভ্যন্তরীণ বিরোধকে রোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। এই ব্যাপারে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল ভারতীয় অধ্যাত্ম সমাজের সঙ্গে সংযোগ—অথবা ভারত সম্পর্কে যা কল্পনায় ছিল তা উক্ত দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

> "ধারা : একজন সম্রাটকে শিক্ষিত হতে হবে ; তাঁকে অন্ততঃ আইন এবং আইনবিধি বিষয়ে স্নাতক হতে হবে। তিনি স্বয়ং যদি পুরোহিত হন তাহলে তিনি খুবই যোগ্য ব্যক্তি হবেন এবং যাবতীয় সাংসারিক আইন-কানুন তাঁর অধীনস্থ থাকবে ; তিনি ধর্মগ্রন্থ বা সুসমাচার পাঠ করবেন যার অর্থ তিনি অধ্যাত্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির পৃষ্ঠপোষক হবেন ; প্রকৃতপক্ষে তিনি যীশু এবং পোপ উভয়েরই প্রবক্তা। তিনি দেখবেন উভয়বিধ বিধান খ্রীষ্টের হৃদয় থেকে প্রবাহিত।

> মেলখিসেডেখ ছিলেন একজন যাজক এবং জেরুসালেমের অভিষিক্ত নৃপতি ; ভারতবর্ষে একজন যাজকই সম্রাট। যাজক না হলে তিনি সম্রাট হতে পারেন না।"

এইভাবে একটি ঐন্দ্রজালিক অনুপ্রেরণা সমগ্র মধ্যযুগ ধরে ভারত থেকে প্রবাহিত হয়েছে। এ যেন এক স্বপ্ন বিশেষ। এই স্বপ্ন কবি এবং তীর্থযাত্রী, রাজকুমার ও গির্জাপ্রধানরা, সম্রাট এবং রাজা—প্রকৃতপক্ষে প্রায় সমগ্র জনগণ—দেখেছেন। অনেকেই আবার ভাবেন নি যে এর অংশবিশেষ হল ইচ্ছা-পূরণের স্বপ্ন-মায়া। লোকে কিন্তু একথা ভাবেনি যে ভৌগোলিক বাস্তবতার ভারত ছাড়া—একটা ভারতীয় স্বপ্নলোকও বর্তমান—মায়ার আবরণে আবৃত—তা কখনও বাস্তবকে অস্পষ্ট করে তুলেছে এবং বিভিন্ন বস্তুকে অযৌক্তিক ও অতি প্রাকৃতের আবরণ দিয়েছে। তথাপি এই অযৌক্তিকতা থেকেই কিছু অমূর্ত বাস্তবতা কল্পনার ছত্রচ্ছায়ায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। বৈপরীত্য ও কাকতালীয় ব্যাপারের অন্তহীন বিতর্কিত বিষয় তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্ব জগতের ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডে ও মানব মনে।

পোর্তুগীজ বিজয় অভিযানের কালে

"শুধু 'কর্কশ গান', লুষিআডসই থেকে যায়।"

—রাইনহোলড স্নাইডার

আইবেরিয়ান প্রান্তে জনগণ এমন এক জগতের স্বপ্ন দেখতেন যার নাম ভারতবর্ষ। পোর্তুগীজ আফ্রিকার উপকূল ধরে এগিয়ে চলেছে, স্প্যানিয়ার্ডরা জেনোয়ার লোক শিয়রে নিয়ে অনিশ্চিত আটলান্টিকের সন্ধানে চলেছেন। তথাপি তাদের লক্ষ্য ছিল বরাবরই ভারতবর্ষ। ভৌগোলিক দূরত্ব সত্ত্বেও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া এই আইবেরিয়ান স্বপ্নের একক প্রতীক।

সেই কালটিতে, সেণ্ট্রাল ও ওয়েষ্টার্ণ য়ুরোপের জনগণ যা কিছু নতুন ও যা কিছু অজানা তার সন্ধানে আকুল হয়ে উঠেছিলেন। মধ্য য়ুরোপে এই অনুসন্ধানের ফলে মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভাবিত হয়—এবং সংস্কারকর্ম পরিশেষে চূড়ান্ত সার্থকতায় পৌঁছায় বুদ্ধিজীবিদের নিন্দাবাদ ও বিরোধীতা সত্ত্বেও।

মধ্য য়ুরোপের জনৈক ব্যক্তি সমুদ্রের আহ্বানে আকুল হয়ে পশ্চিমপ্রান্তে চল্‌লেন। এই লোকটির নাম ন্যুরেনবার্গের মার্টিন বেহাইম। ফ্ল্যানডার্স হয়ে তিনি লিসবনে যান—সেখানে তিনি সম্রাটের বিজ্ঞান-বিষয়ক উপদেষ্টা হন। পোর্তুগীজদের তিনি আধুনিক নৌবিদ্যায় শিক্ষাদান করেন। একটা বিষয় বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক যে তাঁর আগমনের পর লিসবন সরকার ভারত যাত্রার পথের সন্ধানে আফ্রিকার চার পাশে অভিযান সুরু করেন। এই রকম এক যাত্রায় দিয়েগো কাও-এর সঙ্গে মার্টিন বেহাইম যাত্রা করেন এবং কাবো নেগ্রো ও কাবো লেডো গিয়ে পৌঁছান। তাঁর সাফল্যে যারা ঈর্ষান্বিত, তাঁরা এইসব যাত্রা, যার লক্ষ্য ভারত, তাতে বেহাইমের কৃতিত্বের অংশ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করার জন্য সচেষ্ট। কিন্তু এ কথা সত্য যে পোর্তুগালের সম্রাট জন ন্যুরেনবার্গের এই জ্ঞানী নৌবিদ্যাবিশারদ ও ভূগোলবিৎ তাঁর প্রচেষ্টার জন্য, তাঁর আফ্রিকা নৌযাত্রার অবসানে পদবী দ্বারা সম্মানিত করেন। লিসবনে অবস্থানের কালে বেহাইম ক্রিসটোফার কলম্বাসের সঙ্গেও দেখা করেন। পরে বেহাইম এজোরেস ফেয়াল শহরে গমন করেন। সেখানে তাঁর শ্বশুরমহাশয় ছিলেন ফ্লেমিশ উপনিবেশের শাসনকর্তা। এই উপনিবেশ ছিল

ডাচেস ইসাবেলা অব বার্গেনডির কল্পনার ফসল। পোর্তুগীজ প্রিন্স হেনরীর তিনি ভগ্নী, তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল 'সমুদ্রযাত্রী'। ডাচেসের বাসনা ছিল তাঁর ভাইকে একদল মানুষ উপহার দেবেন যাঁরা নৌবিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং বাণিজ্য ও দিগন্তের প্রসার সাধনে উদ্যোগী। ন্যুরেনবার্গে শেষবারের মত প্রত্যাবর্তন করে মার্টিন বেহাইম তাঁর বিশ্বজগতের 'গ্লোব' রচনা করেন। জার্মান মানচিত্র বিদ্যার ক্ষেত্রে এটি একটি স্থায়ী প্রেরণার উৎস। কলম্বাস কর্তৃক আবিষ্কৃত ভূমির নাম স্পেনীয়রা দিয়েছিলেন 'লাস ইনডাস' এবং মার্টিন ভ্যালডেসম্যুলার (১৪৭০-১৫২০) এর নতুন নাম দিলেন আমেরিকা। এতদ্বারা তিনি ইতালীয় আমেরিগো ভেসপুচিকে এক মহা সম্মান দান করলেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন অপর জার্মান ভূগোলবিৎ ও মানচিত্রকার হলেন গারহার্ড ক্রেমার (১৫১২-১৫৯৪)। তাঁর লাতিন নাম মারকেটর নামেই তিনি অধিকতর পরিচিত। এখনও বলা হয় মারকেটরস প্রজেকসন বা মারকেটর প্রকল্প। পৃথিবীর ও আকাশের গোলক বা গ্লোব এবং বিশ্বজগতের মানচিত্রের সাহায্যে বেহাইমের এই সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মানচিত্র বিজ্ঞানকে তার আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

মার্টিন বেহাইম তাঁর কাজকে জোহানেস মুলারের কাজের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। জোহানেস ফ্রাঙ্কোনিয়ার কোনিগসবার্গের অধিবাসী যিনি নিজের নাম রেজিওমনটানুস (১৪৩৬-১৪৭৬) করেছিলেন। তাঁর গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যা এবং পঞ্জিকা সংস্কার ও নৌবিজ্ঞান সংক্রান্ত রচনাদির জন্য তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর এফিমেরিডেস (১৪৭৫-১৫০৬) পরবর্তীকালের সামুদ্রিক তত্ত্বাদির পক্ষে আদর্শস্বরূপ। বিজয় অভিযানের জাহাজের (Conquistadors) কাপ্তানের টেবিলে এইসব বিছানো থাকত— ভাস্কো ডি গামার সঙ্গে ভারতে, কলম্বাসের সঙ্গে ও আমেরিগো ভেসপুচির সঙ্গে এগুলি আমেরিকায় গিয়েছে। জার্মান পাণ্ডুলিপি ভিন্ন আইবেরিয়ান অঞ্চল থেকে এইসব দুঃসাহসিক আন্ত-মহাসাগরীয় অভিযান যে দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে তা সম্ভবপর হত না।

উপকূলচারী পোর্তুগীজদের যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন ছিল তা সত্যে পরিণত হওয়া অনিবার্য ছিল। উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে তারা উপকূলের জলাঞ্চল ত্যাগ করে মহাসাগরের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য জড়িত করেছিল; এইভাবে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে তারা ভারতের মালাবার উপকূলে কালিকট নামক স্থানে অবতরণ করল।

জার্মানরা নিবিড় আগ্রহে পোর্তুগীজদের এই সব নৌ-অভিযান লক্ষ্য করছিল। তাঁদের অনেক সহকর্মী দীর্ঘদিন লিসবনে বাস করতেন এবং তাঁরা সেখানে সেণ্ট বার্থোলমিউ-কে তাঁদের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে গ্রহণ করে যে এক ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা নিছক সৌসাদৃশ্য মাত্র নয়। সেণ্ট টমাস ব্যতীত এই সাধুপুরুষ একজন মহাত্মা হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন, মিশনারি পর্যটক হিসাবে ভ্রমণসূত্রে তাঁকে ভারতবর্ষে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং ভ্রাতৃত্বের সংগঠন তাঁকেই যে পৃষ্ঠপোষক সাধু হিসাবে গ্রহণ করেছিল তাতে বিস্ময়ের কারণ নেই।

লিসবনের ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে 'ব্রাদারহুড অব সেণ্ট বার্থোলমিউ' সংক্রান্ত সকল নথিপত্র ধ্বংস হয়ে যায়। 'ব্রাদারহুড অব সেণ্ট বার্থোলমিউ অব দি জার্মানস' ছিল এই সংগঠনের সরকারি নাম—এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বকালেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে খ্যাত ছিল। 'ইরমানদেদ' নামক পোর্তুগীজ নাম দ্বারা তাই বোঝায়, কারণ ব্রাদারহুডের সম্পূর্ণ পোর্তুগীজ নামকরণ ছিল—"ইরমানদেদ দ্য এস, বার্থোলমিউ ডস আলেমেস এম লিসবোআ"। যদিও দলিলগত প্রমাণ দ্বারা এই কথার যাথার্থ্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়, এর প্রতিষ্ঠা সেণ্ট বার্থোলমিউ-র প্রতি উৎসর্গীকৃত একটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর গির্জা ঘরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই চ্যাপেল রাজা ডোম ডিনিংস (১২৭৯-১৩২৫) এবং জার্মান সওদাগর ওভারেষ্টদৎ কর্তৃক বিনিময়কৃত একটি জমির ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত ; পোর্তুগীজরা ডিনিংসকে-কে বলতেন সোবরেভিলা। তেজো নদীর উপকূলস্থ এই ভূখণ্ডে—সেণ্ট জুলিয়ানের রাজকীয় গীর্জা বর্তমান টাউন হলের জায়গাটিতে নির্মিত হয়। জার্মানদের সেণ্ট বার্থোলমিউ-র নামাঙ্কিত একটি চার্চ স্থাপনার সত্বাদি দেওয়া হয়। সেই গীর্জায় ধর্মীয় এবং জার্মান ঐতিহ্যাশ্রয়ী ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়। এই ব্রাদারহুড আজো সুপ্রতিষ্ঠ। ফ্রাঙ্কফুট-অন-দি-মেইন এর অধিষ্ঠাতা দেবতা এই সেণ্ট বার্থোলমিউ—এই শহরে জার্মান সম্রাটরা নির্বাচিত হতেন—তিনি আবার মদ্য ব্যবসায়ী, মুচি, কসাই, বই-বাঁধাইকারী দপ্তরী, রাজমিস্ত্রী, বাতি জ্বালাবার কর্মীদের সহকারী, লবণ ব্যবসায়ী এবং দর্জিদের রক্ষাকর্তা। জার্মানীর বহুবিধ ব্যবসায়ের রক্ষাকর্তা পৃষ্ঠপোষক সাধুমহাত্মা যে লিসবনে অধিষ্ঠান করেন তা এক প্রতীকি—তিনিই আবার ভারতে প্রচারকার্য করেছেন তাই স্মরণীয় হয়ে আছেন ; প্রকৃতপক্ষে, জার্মান সম্প্রদায় যাঁরা মধ্যযুগে হাজার আত্মার নিরন্তর সংস্থা গণনাকার ছিলেন,

তাঁরাও এই ভ্রাদারহুডের দ্বারা ত্রাণলাভের বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করতেন। যারা দূর দিগন্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন সেই সব মানুষের এটা সম্মিলনক্ষেত্র ছিল—এবং ভারত ছিল তাঁদের কল্পনাবিলাসের অন্যতম যা আকারলাভ করছিল।

লিসবনের সঙ্গে সংযোগ এমনই গভীর ছিল যে ভারতের দিকে পোর্তুগীজদের যাত্রার ব্যাপার বিশেষ করে উত্তর জার্মানী অঞ্চলে আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করা হত। ভারতের যাত্রাপথ আবিষ্কার সমগ্র বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় বিপ্লব সূচিত করবে। সেই কারণে ইতালীয় সওদাগরী দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রার সময় পোর্তুগীজদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে জার্মান ব্যবসায়ীরাও লিসবনের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করতে উদ্যোগী হলেন। ফলে, অগসবার্গের ওয়েলসারগণ তাঁদের প্রতিনিধি পাঠালেন ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ম্যানুএলের দরবারে। এই প্রতিনিধির নাম সাইমন সেইৎস্। সেই বছরের ১৩ই জানুয়ারী সম্রাট ম্যানুএলের সঙ্গে জার্মানদের একটা চুক্তি দস্তখত করা হল—সম্রাট ম্যানুএলকে আবার সুখী ঐম্যানুএল বলা হত—এই চুক্তির ফলে জার্মান তরফে অনেকগুলি সুবিধা দান করা হল। ওয়েলসারস্ অব অগসবার্গের এবং ভোলিন্স্ অব মেমিনজেনের প্রতিনিধিত্বে এই চুক্তির জার্মান অংশীরা ভারতীয় বাণিজ্যে একটা অংশলাভের আশায় প্রথমতঃ আগ্রহী ছিলেন। ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট সেইৎস-এর উত্তরাধিকারী লুকাস রেম এই প্রত্যাশা যার দ্বারা পূরণ হল সেই চুক্তির সংবাদ স্বদেশে পাঠালেন। ব্যবসায়িক সংক্ষিপ্ততার সঙ্গে তিনি তাঁর বার্তা পাঠালেন :

"১লা আগষ্ট আমরা পোর্তুগীজ সম্রাটের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করলাম—ভারতে তিনখানি জাহাজ সাজিয়ে-গুছিয়ে পাঠানো হবে।" তাই হল। জার্মানরা কালবিলম্ব না করে জাহাজ তিনটি উপযুক্ত যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। তাদের নাম হিরোনিমাস, র‍্যাফেল ও লিওনার্ড। সমৃদ্ধ জার্মান সওদাগরগণ উপযুক্ত মূলধন দ্রুততালে সংগ্রহ করলেন। ওয়েলসাররা দিলেন ২০,০০০ ড্যুকাট, ফ্যুগারসরা ৪,০০০ ড্যুকাট; এবং হখসটেটারস ইমহফস, হারস্‌ভোগেল্‌স্ ও গসেমব্রটস্ কর্তৃক সংযুক্তভাবে প্রদত্ত হল ৩৬,০০০ ড্যুকাট। এইভাবে ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সওদাগরদের সর্বপ্রথম "ভারতীয় বাণিজ্যগোষ্ঠী" সংগঠিত হল।

দুজন তরুণ জার্মান হানস মেয়ার এবং বালথাসার স্প্রেনগারকে সওদাগরী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধি হিসাবে লিসবনে পাঠানো হল। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ ভারতে প্রথম পোর্তুগীজ ভাইসরয় ডম ফ্রানসিসকো দ'আলমিডার

জাহাজগুলির সঙ্গে তাঁরা দু'জন জার্মান জাহাজে লিসবন ত্যাগ করে যাত্রা করলেন। দুদিন পরে জাহাজ উন্মুক্ত সাগরে গিয়ে পড়ল। হানস মেয়ার ছিলেন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির তরফে র‍্যাফেল জাহাজের পত্রলেখক ; এদিকে স্প্রেনগারও (সব সময় আপনাকে যিনি অগসবার্গের ওয়েলসারদের প্রতিনিধি বলতেন) লিওনার্ড জাহাজে যাত্রা করেন। এই সর্বপ্রথম জার্মান ভারতযাত্রার বিবরণ দুজনেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। মায়ারের বিবরণ পোর্তুগীজ ভাষায় হস্তলিখিত বিবরণ। স্প্রেনগারের বিবরণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর প্রকাশিত হয়, তার বিরাট শিরোনাম-(এর পূর্ব্বে তার এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সেই বিবরণের সঙ্গে আমাদের এখানে প্রয়োজন নেই)।

> "প্রবল প্রতাপান্বিত পোর্তুগীজ সম্রাট ইমান্যুয়েল দ্বারা
> আবিষ্কৃত, প্রাপ্ত, অধিকৃত, এবং বিজিত বহু-স্বীকৃত-দ্বীপপুঞ্জ
> ও সাম্রাজ্যে সমুদ্রপথে যাত্রার অভিজ্ঞতা ও বিবরণ। সেই অঞ্চলে
> বসবাসকারী জনগণ ও প্রাণীগণের বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক সংঘর্ষ,
> জীবন, জীবনধারা, চরিত্র, ক্রিয়াকলাপ এই পুস্তিকার মধ্যে পাবেন
> ঠিক যেমনটি আমি বালথাসার স্প্রেনগার কিছুকাল আগে দেখেছি
> ইত্যাদি। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত।"

এইটি হল সর্বপ্রথম মধ্য য়ুরোপীয় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ—এ ছাড়া একটি লেখকের নামহীন পুস্তিকা—কলকোয়েন (কালিকট) ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে এনটোআর্পে প্রকাশিত হয়। এর লেখক ছিলেন একজন অজ্ঞাত নাবিক যিনি ভাস্কো দা গামার দ্বিতীয় নৌ-যাত্রায় সহযাত্রী ছিলেন এবং তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ কিঞ্চিৎ অপরিচ্ছন্ন ভঙ্গীতে লিখে রেখেছেন।

স্প্রেনগারের "মেরফারত" আরও একটু নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে দেখা যাক। লেখক পর্যবেক্ষক হিসাবে নিপুণ। মাঝে মাঝে অসমর্থিত তথ্য নির্ভর করে লিখলেও তিনি সহৃদয় ব্যক্তি। সব কিছু শেখার দিকে তাঁর আগ্রহ আছে এবং যে সব দেশ তাঁর জাহাজ স্পর্শ করেছে সেই সব দেশ সম্পর্কে তাঁর মন উন্মুক্ত রেখেছেন। সেই কারণে তাঁর ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ খুব মূল্যবান। তিনি সেই সুদূর অঞ্চলের মানুষগুলিকে প্রকৃত মানবিক বলে ধরেছেন। কোনোরকম তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। আনন্দের কথা দুর্ভাগ্যবশতঃ মন বিক্ষিপ্ত হলেও—এমন একটি পাণ্ডুলিপি ভারতবর্ষ ভ্রমণ বিষয়ে জার্মান সাহিত্যের প্রারম্ভিক যুগে সম্ভব

হয়েছিল। সেই সঙ্গে স্প্রেনগার এমন এক ভঙ্গীতে লিখেছেন যা পরবর্তীকালে রচিত নৃজাতিতত্ত্ব সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়। রাটজাল-এর পর থেকে জার্মান ভূগোলতাত্ত্বিকরা সম্পূর্ণভাবে স্প্রেনগারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। বালথাজার স্প্রেনগার মালাবার উপকূল সম্পর্কে সুবিবেচনা করেছেন, তিনি এর অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বহুবিচিত্র অধিবাসীদের বিষয় লিখেছেন।

"কালকালন—হয়ত কায়নকুলাম—কোচিন ও কুইলনের মধ্যে এই সাম্রাজ্য। বহুমূল্য রত্নপ্রস্তর ও সুগন্ধি মশলায় এই ভূমি সমৃদ্ধ। এখানকার নর-নারীর মাথায় ঘন কালো চুল এবং নগ্ন অবস্থায় বিচরণ করে, শুধু গোপন অঙ্গগুলি বস্ত্র খণ্ডে আবৃত থাকে। এখানে বহু জাতির বাস, যথা নায়র: যারা সম্ভ্রান্ত। মাগুয়া, বুয়র, ব্রাহ্মণ, যাদের হাতে এই দেশের সব ব্যবসা পত্র। এদের মধ্যে ইহুদীরাও থাকে। ওদের হাতে লড়াই করার মত অস্ত্র আছে। একদলের হাতে আছে তীরধনুক। অন্যপক্ষের হাতে থাকে ঢাল আর উন্মুক্ত তলোয়ার। একটা মুখ তীক্ষ্ণ, গোড়ার দিকটা গোলাকার। কেউ কেউ ছোট ছোট বর্শা নিয়ে ঘোরে এবং সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থার মধ্যে থাকে। এ অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা সবাই সাদা পোষাক পরে। তাদের মাথায় সাদা কাপড়ের বেড়। এদের মধ্যে অনেক তুর্কী আছে, এরা কন্নানোর অঞ্চলে ব্যবসা চালায় এবং ভারতে এদের অনেক জাহাজ আছে। এই জাহাজে করে ওরা মাঙ্গালোর ও ক্যামবে এবং অন্যান্য অঞ্চলে বাণিজ্য করে বেড়ায়। এ ছাড়া এই দেশের অন্য যে সব অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে সেই সব দ্বীপ ও ভূমিতে যায়।—যদি কোচিনের মহারাজা ছোট জাহাজে করে প্রমোদ ভ্রমণে যাতায়াত করেন, তাঁর সম্ভ্রান্ত অনুচরবৃন্দ সামনে ও পিছনে অস্ত্র হাতে বসে থাকে। রাজা তাদের মধ্যে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকে। সর্বদা তাঁর সামনে একটি লোক একটি গোলাকার ছত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রাজার মুখে রোদ না লাগে তার জন্য ছায়া করে—রাজার হাতের কাছে সব সময় একটা লোক থাকে। যদি তিনি পদব্রজে ভ্রমণে যেতে ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা তাঁর আগে পিছে যাবেন, তাদের হাতে ঢাল এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি থাকে। এরা তুরী ভেরী শৃঙ্গা ইত্যাদী নানা যন্ত্রাদি বাজিয়ে আনন্দ করে।

স্পেনগারের এই বিবরণ সংক্ষিপ্ত হলেও এ এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। দ্বিতীয় পোর্তুগীজদের ভারত পথে সমুদ্রযাত্রার সম্পর্কে ফ্লেমিশ নাবিকের কয়েক পৃষ্ঠা বিবরণের ওপর আর এক পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়। এটিও ষোড়শ শতাব্দীর তারিখাঙ্কিত। কাউন্ট ক্রিসটোফ ফার্ণবার্গার অব এগেনবার্গ কর্তৃক ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। দানিয়ুবের কোথাও তাঁর জন্মভূমি—ভারতে তিনি দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। কোনোদিন কি আমরা এই সব মুদ্রিত আকারে দেখতে পাব?

যাই হোক, বালথাসার স্প্রেনগার আরো বহু বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার দাবী রাখে। ফ্রানৎস সুথউলৎসে* পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী তারিখাঙ্কিত ট্রাসবুর্গ প্রকাশনের মধ্যে এই পাণ্ডুলিপিকে বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতিদান করা হয়েছে। সুথউলৎসের কাছে, স্প্রেনগার বিজয় অভিযাত্রীদের যুগের পর্যটক লোকদের এক প্রকৃত ব্যতিক্রম:

> "শুধু লোরেনের লেখকবৃন্দ মার্টিন ভ্যালডসিম্যুলার, ফ্রাইসিয়ুস, লুড এবং রিংমান তাঁদের মানচিত্র ও রচনাদির জন্য সেণ্ট ডাই-এ তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতিলাভ করেছেন—তাঁরা প্রাচীন ধ্রুপদী ভূগোলতাত্ত্বিকদের রচনা পাঠ থেকে সরিয়ে 'জীবনের স্বর্ণ বৃক্ষের' দিকে আকৃষ্ট করেছেন, আবিষ্কারের সমকালীন সমুদ্রযাত্রা, গ্যালিলিও যেমন বলেছেন: স্প্রেনগার ও তাঁর সমকালীনদের কাছে নবলব্ধ ভৌগোলিক জ্ঞান বিষয়ে শিক্ষক ছিলেন।
>
> জার্মানীতে সেই কালে প্রকাশিত অন্যান্য ভ্রমণকাহিনীর লেখকদের সঙ্গে এই বিশেষ জ্ঞানের অন্যতম অংশীদার। কিন্তু স্প্রেনগারের আরও একটি বিশেষ সদ্‌গুণ ছিল। আমরা জানি তাঁর প্রধান গুরুত্ব ছিল নৃজাতিতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে, বিসাগো, হটেনটট এবং ভারতীয়গণ সম্পর্কিত তাঁর রচনাবলীর মধ্যেই তা প্রমাণিত। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে যোহানেস বোহম এক প্রকার ভোলকারকুনডে (নৃজাতিতত্ত্ব) বিষয়কগ্রন্থ যা "Omnium gentium mores leges et ritus ex multis clari-

* মেরফার্ট-এর লেখক আগাগোড়া আপনাকে স্প্রেনগার হিসাবে উল্লেখ করেছেন—অথচ সুথউলৎস তাঁকে স্প্রেনগান বলে বর্ণনা করেছেন—প্রথমোক্ত নাম তার কাছে মুদ্রাকর প্রমাদ মনে হয়েছে।

ssimis serum scriptoribus" নামে প্রকাশিত হয়েছিল তা ছিল হেরোদৎ, ষ্ট্রাবো, সোলিনস, প্লিনি, টলেমি ইত্যাদির রচনার সারাংশের সংকলন; এর চল্লিশ বছর পরে প্রখ্যাত সেবাসতিয়ান ম্যুনষ্টার আফ্রিকা ও ভারতের জনসংখ্যা বিষয়ে উদ্ভট রূপকথা রচনা করেন প্রাচীন লেখকদের রচনা থেকে সংকলন করে (অনেকের মাথা নেই, তাদের বুকের ওপর চোখ / কারো বা একটি মাত্র পা এবং এই এক পায়েই তারা দ্বিপদের চেয়ে দ্রুত ছুটতে পারেন।) এর পরিপ্রেক্ষিতে স্প্রেনগারের ভ্রমণ বিবরণের মূল্য অনুধাবন করা সহজ হবে, তাঁর রচনায় আফ্রিকা ও এশিয়ার জনগণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন লেখকরা যেভাবে উদ্ভট কল্পনার আশ্রয় নিয়ে তাদের বর্ণনা করেছেন তিনি সেই পথ অনুসরণ করেন নি।

স্প্রেনগারের ভারত সম্পর্কিত গ্রন্থটি ছাড়া নূর্ণবার্গ (ন্যুরেমবার্গ) সওদাগরী অফিস হারসথ্‌ভোগেলের কর্মী জর্জ পোক ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মালাবার উপকূলের কোচিন থেকে যে পত্র লেখেন সেই পত্রটি ভারত বিষয়ে গোড়ার দিকের অন্যতম দলিল হিসাবে বিবেচিত হয়। পোক-ই প্রথম টমাস পন্থী ক্রিশ্চানদের দেশে লুথারের নাম এবং ধর্ম সংস্কার বিষয়ক সংবাদ দান করেন।

কিন্তু এই রিফর্মেশন বা ধর্মীয় সংস্কার সাধনের ব্যাপার নিয়েই জার্মান ও পোর্তুগীজদের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি হল। পরে যখন পোর্তুগাল স্পেনের সঙ্গে যুক্ত হল ভারতীয় বাণিজ্য ব্যাপারে জার্মান ব্যবসাদারদের আগ্রহের নবীকরণ ঘটল। ফলে, ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ভেল্‌সারস এবং ফুগ্‌গারস হাবসবুর্গদের (রাজকীয় জার্মান সাম্রাজ্যের এক সমান্তরাল বংশধারা) সঙ্গে একটা চুক্তি সম্পন্ন করলেন যদ্বারা এইসব বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়। জার্মান বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল গোয়া যেখানে আরো অনেকের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা পরিচিত জার্মান প্রতিনিধি ফার্ডিনাণ্ড ক্রোণ দীর্ঘকাল সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। তিনি এক প্রাচীন অগসবার্গ বংশের সন্তান। ১৫৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দের এ্যাংলো-পোর্তুগীজ বিরোধের সময় সব জাতির মধ্যে জার্মানরাই তাঁদের দ্বিতীয় বাণিজ্যিক কেন্দ্র কোচিনে তাঁদের সম্পত্তির একটা বৃহৎ অংশ থেকে বঞ্চিত হলেন। তথাপি ক্রোণ সেই ঘটনাস্থলে রয়ে গেলেন। যাই হোক তাঁর পরিণত বয়সে তিনি কয়েকজন পোর্তুগীজ ব্যবসায়ীর ঈর্ষার শিকার হয়ে

পড়েন এবং ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে ঘুষখোর বিচারকরা তাঁকে কারাগারে পাঠালেন। জার্মান ব্যবসায়ীরা এই ঘটনায় ভীষণ আহত হলেন। এই ক্রোধ সংক্রান্ত ব্যাপারটিই এক বিরল দৃষ্টান্ত মাত্র নয়। পোর্তুগীজ আইন পোর্তুগালে জার্মান বাণিজ্যিক প্রভাব যা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল তা প্রতিরোধ করতে প্রয়াসী হন। এর ফলে, জার্মানীর অর্থাৎ পবিত্র সাম্রাজ্যের (হোলি এম্পায়ার) ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য হ্রাস পেয়ে শেষ পর্যন্ত একেবারে অবলুপ্ত হল।

অতএব জার্মান শাসকরা তাঁদের নিজস্ব প্রচেষ্টা প্রয়োগে উদ্যোগী হলেন। তবু এক অনন্তকাল লেগে গেল ভারতের সঙ্গে জার্মানীর একটা নিজস্ব বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিবর্তিত পরিমণ্ডলে পোর্তুগীজ এবং স্প্যানিসরা উভয়েই এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানালেন কারণ তখন তাঁরা বিশ্বের সমুদ্রাঞ্চলে এইভাবে মিত্রলাভে প্রয়াসী হয়েছিলেন, এবং ভূমিবেষ্টিত সাম্রাজ্য থেকে মহাসমুদ্রে আইবেরিয়ানদের কাছে কোনো গুরুতর বিপদাশঙ্কা ছিল না।

১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস মাদ্রাজের কাছে একটি ছোট্ট অঞ্চল কেনার জন্য উদ্যোগী হলেন, অষ্ট্রিয়ান নেদারল্যাণ্ডের অর্থনীতির উন্নতিসাধন করাটাও তার উদ্দেশ্য ছিল। রাজকীয় অভিযানের প্রধান ছিলেন ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের একজন ফরাসী অফিসার, তাঁর নাম গবলে দ্য লা মেরভিল। তাঁর মন্ত্রী কাউণ্ট ফিলিপ লুডভিগ সিনজেনডোর্ফ-এর পরামর্শে, সম্রাট ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে অসটেণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করলেন তার মূলধন হল ছ মিলিয়ন গিলডার। সিনজেনডোর্ফ বিশ্বজনীন সাম্রাজ্যের পরিবর্তে ফরাসীধরনে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনেই বিশ্বাসী ছিলেন। এই কোম্পানীকে ত্রিশ বছরের জন্য এক ইম্পিরিয়াল লাইসেন্স বা ছাড় দেওয়া হল পশ্চিম এবং বিশেষ করে পূর্ব ভারতের সঙ্গে ব্যবসা করার জন্য। কিন্তু আইবেরিয়ান যোজকের লাতিন শক্তিগুলি সম্রাটের প্রকল্প সমর্থন করলেও ডাচ নেদারল্যাণ্ডস প্রকাশ্যভাবে এর বিরোধীতা করল এবং ইংরাজরা গোপনে পরিকল্পনাটি বানচাল করার চেষ্টা করল।

বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান যাঁরা প্রচণ্ড লাভ করেছেন এবং যাঁদের শেয়ার বছরের পর বছর বেড়ে উঠেছে একটা সশস্ত্র সংঘর্ষের কারণ হয়ে উঠল, হ্যারেণহুসেনে ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ান নেদারল্যাণ্ডস-এর বিরুদ্ধে নেদারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড

বাণিজ্যশুল্কের লড়াই সুরু করলেন। দু'বছর পরে দ্বিতীয় জর্জ প্রদত্ত সিংহাসন অধিরোহণের বক্তৃতার ফলে লণ্ডন থেকে রাজদূতকে ফিরিয়ে আনা হল এবং ভিয়েনার ব্রিটিশ এ্যাম্বাসডারকে ফেরৎ যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল। তবে ইংলণ্ডের সঙ্গে স্পেনের যোগাযোগ হেতু সম্রাটের একঘরে অবস্থা সম্পূর্ণ হল। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে পীস অব ভিয়েনা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তিনি অসটেণ্ড ট্রেডিং কোম্পানীতে তাঁর দাবী পরিত্যাগ করলেন।

মাদ্রাজের কাছে কবলন (সদৎপত্তনম) এবং বাংলার বাঁকীবাজার (বনশীপুর—হুগলী, ব্যারাকপুর থেকে তিন মাইল উত্তরে)—সম্রাটের দুটি প্রধান প্রতিনিধি দপ্তর ছিল। সেখানকার ভারতীয় জনগণ একথা বিশ্বাস করতে চাইল না যে তারা সম্রাটের রক্ষণ ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়েছে। ইণ্ডিয়া অফিসের ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম ফসটার তাঁর রিপোর্টে ভারতীয়দের বিষয় বলেছেন:

> "ভারতীয়গণ অষ্ট্রিয়ান সম্রাটের পতাকা উড়িয়েছিল—এবং তারই ছত্র ছায়ায় বাণিজ্য চলল; কিন্তু ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এই জায়গাটা হুগলীর ফৌজদার কর্তৃক অবরুদ্ধ হল (শোনা যায় তার পিছনে ওলন্দাজ ও বৃটিশ উত্তেজনা ছিল) এবং সৈন্যদলের অস্ত্রাগার অবস্থা আশাহীন বুঝে তাদের বাণিজ্য জাহাজে উঠে পালালেন।"

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ অবশ্য ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফ্রেঞ্চ, সুইডিশ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে যোগ দেওয়ার জন্য কাজ ছাড়লেন। ডানিশরা তাঁদের নিজেদের কোম্পানীকে পুনর্গঠন করলেন প্রাক্তন অসটেণ্ড ট্রেডিং কোম্পানীর কর্মীদের দ্বারা।

অসটেণ্ড-এর ইমপিরিয়াল কোম্পানী যদি ইংরাজ এবং ওলন্দাজদের দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক ট্রেডিং কোম্পানী রূপে এমডেন কোম্পানী যা ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, তাকে অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান বলতে হবে।

রয়্যাল প্রুশিয়ান এশিয়া কোম্পানী হিসাবে প্রুশিয়ান সম্রাট দ্বারা প্রতিপালিত এই কোম্পানীকে দশ বছরের মত "চুঙ্গী" কর থেকে রেহাই দেওয়া হল আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য ব্যাপারে। প্রাশিয়ান দরবারের উপদেষ্টা এবং বাণিজ্যবিষয়ক মন্ত্রণাদাতা যারা কোম্পানীর ডাইরেক্টর হিসাবে কাজ করতেন তাঁরা মেসার্স হাইনরিখ, টমাস, ষ্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড কোং কে অধিকার

দিলেন ইষ্ট ফ্রিশিয়া ও ডাচি অব ক্লেভ-এ তাঁদের অধঃস্তন কর্মচারী এবং নাবিকদের নিয়োগপত্র সই করতে এবং কিং অব প্রুশিয়া (কোনিগ ফন প্রেউসেন)-এ চড়ে এশিয়া এমন কি দক্ষিণপূর্ব চীনের ক্যানটন পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি দিতে পারতেন। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জাহাজ এমডেন থেকে যাত্রা করল এবং সেখানে আবার ডকে রাখা হল ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের ৬ তারিখে। যাই হোক, ব্যবসা প্রত্যাশানুযায়ী হল না, এবং সাত বছর যুদ্ধের সময় ব্যবসাপত্র তুলে দেওয়া হল। কিন্তু দেউলিয়ার কাজ যদিও ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরু হল ১৭৬৫-র আগে সে কাজ সম্পূর্ণ হল না। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাসিয়ার সম্রাট কর্তৃক লাইসেন্স প্রদত্ত বেঙ্গল ট্রেডিং কোম্পানীও তেমন ভালো কিছু করতে পারেন নি। এক মিলিয়ন প্রাসিয়ান থালার (মুদ্রা) মূলধন নিয়ে দ্বিতীয় প্রাসিয়ান কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হল—কিন্তু প্রাসিয়ানরা তেমন উপযুক্তভাবে এ প্রতিষ্ঠান চালাতে পারলেন না। সাত বছরের মধ্যে সাতখানি জাহাজ মোট লগ্নীর শতকরা সাতভাগ মাত্র লাভ নিয়ে এল। সুতরাং ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ১৭৮১-১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অন্য কোম্পানী প্রতিষ্ঠার নতুন প্রচেষ্টাও বিফল হল।

তবু এই কালটিও আরেক জার্মান উদ্যোগের দ্বারা চিহ্নিত। ইংলণ্ডের সঙ্গে মৈত্রী সত্ত্বেও লিসবন ও লণ্ডনের সঙ্গে সম্পর্ক উপনিবেশ ব্যাপারে মোটেই মধুর ছিল না। এই কারণে সম্রাট পঞ্চম জন (১৭০৬-১৭৫০) তাঁর ঔপনিবেশিক চাকুরীতে বহু সংখ্যক জার্মান আমদানি করলেন, এবং যে সময় মার্কুইস দ্য পোমবল (১৭৫০-১৭৭২) রাষ্ট্রনেতা হিসাবে তাঁর স্বদেশের ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করলেন, তিনি সমগ্র ঔপনিবেশিক বাণিজ্য জার্মানদের হাতে ন্যস্ত করলেন। যে সওদাগরি হৌসের ওপর তিনি এই প্রচণ্ড কর্তব্যভার দিলেন তাঁরা ১৭৮০-র দশকে লিসবনে এক সুবৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্র পরিচালন করতেন। ফেলিক্স ফন ওলডেনবার্গ সওদাগরি হৌস এক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র, এঁদের বেশী অংশ ছিল ব্রেজিলের বাণিজ্য ব্যাপারে এবং লাতিন আমেরিকান পত্তনী এবং আন্তর্জাতিক তামাকের বাজারে। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই কোম্পানীকে পোর্তুগীজ ভারতে বাণিজ্যের এক চেটিয়া অধিকার দেওয়া হল। পোর্তুগীজদের কাছে ইনডিয়া বলতে বোঝায় এই উপমহাদেশের পশ্চিমাংশ, দিউ থেকে সুদূর দক্ষিণ মালাবার উপকূল। এই কারণে কোরমণ্ডল উপকূল ও বাংলা বিশেষভাবে চুক্তিতে উল্লিখিত হয় যার মধ্যে চীনদেশের বাণিজ্য

ব্যবস্থাও জড়িয়ে নেওয়া হল। এইভাবে ফেলিক্স ফন ওলডেনবার্গের সওদাগরী প্রতিষ্ঠান যে শক্তি অর্জন করলেন কোন বেসরকারি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান তা পোর্তুগীজ বাণিজ্য ব্যবস্থার ইতিহাসে আগে লাভ করেন নি। কিন্তু ভারতে বাণিজ্যের এই বিশেষ এক চেটিয়া অধিকার দীর্ঘস্থায়ী হল না। মনে হয় স্বয়ং প্রকৃতি দেবীই যেন ঈর্ষাকাতর। কারণ ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর যেদিন পশ্চিম জগতের তখন পর্যন্ত যে সর্ব বৃহৎ ভূকম্পে লিসবনের গৌরবরবি অস্তমিত হয় সেই দিন থেকে ওলডেনবার্গদের শক্তিও যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। পাঁচবছর পরে তাঁরা দেউলিয়ার আবেদন দাখিল করলেন আর তাদের সঙ্গেই মৃত্যু হল প্রাচীন পোর্তুগীজ বিজয়ী অভিযাত্রীদের।

জার্মান বাণিজ্যিক কেন্দ্র যা রাজনীতিতে ইম্পিরিয়াল ধারা পছন্দ করত তারা এক নতুন উদ্যোগের অভিলাষী হল। সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসা (১৭৪০-১৭৮০) উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে তাঁর পিতার আগ্রহের অংশী ছিলেন। আরো অনেক বস্তুর সঙ্গে তাঁর পিতা "প্রাগমাটিক স্যানকস্যন" নামক বিধির সাহায্যে কন্যার জন্য সিংহাসন অধিকারে আগ্রহী হওয়ায় ভারতীয় বাণিজ্যিক অধিকার ত্যাগ করেছিলেন—কন্যা তার পুনরুজ্জীবনে উদ্যোগী হলেন। ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক আদেশ দ্বারা একটি নতুন কোম্পানী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করলেন। এইবার তার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র হল ভূমধ্যসাগরের ত্রিয়েস্তে। এই মহান সম্রাজ্ঞীর সিদ্ধান্তের ফলে ত্রিয়েস্তে এক প্রধান আন্তর্জাতিক বন্দরে পরিণত হল।

সেই সময় ইংরাজের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন প্রাক্তন কর্মী ভিয়েনায় এসে হাজির হলেন। তাঁর নাম উইলহেলম বোলটস—তিনি ওয়েসেলের অধিবাসী। এই উন্মুক্তমনা রাইনল্যাণ্ডীয় ভদ্রলোক ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে একটা নেতৃস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময় ঐ সব গোষ্ঠীর সাহচর্য থেকে সরে আসার জন্য এবং এই চক্রের আনুসঙ্গিক আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বাসনা হয়েছিল তাঁর। তাই তিনি অবস্থা উন্নয়নে চেষ্টা করেন এবং ন্যায় ও সুবিচার যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন। এই সব কাজ-কর্মের জন্য তিনি জনপ্রিয়তা হারালেন এবং একটা দলের পক্ষে "বিপজ্জনক অধিবাসী" হয়ে উঠলেন। (সিক্রেট কমিটি অব দি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেঙ্গল গ্যারিসনের কম্যাণ্ডার ইন চীফ কর্তৃক লিখিত ২৪শে নভেম্বর ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পত্রাংশ)। তবু উইলহেলম বোলটস শুধু যে একজন সৎ এবং নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন তা নয় তিনি একজন উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে

তিনিই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠায় পরিকল্পনা করেন। এই প্রসঙ্গে জে. নটরাজন মন্তব্য করেছেন :

"এই সূত্রে এ কথা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় সর্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন মিঃ উইলহেলম বোলটস ; সেই বছর গোড়ার দিকে তিনি কোম্পানীর কাজ থেকে পদত্যাগ করেন এবং কোম্পানীর তাঁবে বে-সরকারী বাণিজ্য ব্যাপারের কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স কর্তৃক নিন্দিত হন। এই নতুন উদ্যোগে প্রয়াসী হয়ে তিনি বিজ্ঞাপন দিলেন—'সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত অনেক তথ্য পাণ্ডুলিপি অবস্থায় তাঁর কাছে আছে।' সুতরাং সরকারী মহল স্পষ্টতঃই এই ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁকে বাংলা দেশ ত্যাগ করে মাদ্রাজ যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল এবং সেইখান থেকে সোজা য়ুরোপ।"

দুর্নীতি বিরোধী উইলহেলম বোলটসের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে যে ব্যবহার করা হল দুর্ভাগ্যক্রমে তা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু মেরিয়া থেরেসা ছিলেন এমন এক মহিলা যিনি উচ্চ রাজনীতিকেও একটা গ্রহণযোগ্য নীতির ভিত্তিতে গড়তে চেয়েছিলেন। যা সত্য তা গ্রাহ্য। ব্যক্তি-গত জীবনেও তাঁর এই নীতি, সুতরাং তিনি এই পর্যটকের কথা শুনলেন। তিনি তাঁর ওপর ভার দিলেন ভারতে কিছু এজেন্সি স্থাপন করতে। তিনি কিন্তু একটা বিশেষ সর্ত আরোপ করলেন : এইসব কেন্দ্রগুলি শুধুমাত্র বাণিজ্যিক দপ্তর মাত্র হবে, সশস্ত্র গ্যারিসন খোলা এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। সর্বপ্রথম রাজকীয় বাণিজ্যকেন্দ্র খোলা হল মাদ্রাজের নিকট। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বোলটস গ্যারিসন ব্যতীত আরও তিনটি বাণিজ্য কেন্দ্র খুললেন। এরজন্য তিনি মহীশূরের শাসক হায়দর আলির কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি সংগ্রহ করলেন। কারওয়ার ভারতীয় ক্রেতাদের কাছে জার্মান মাল সরবরাহের একটা বড় বাজার হয়ে উঠল।

কিন্তু মূলভূমির কয়েকটি অঞ্চল ছাড়িয়ে উইলহেলম বোলটস কোম্পানীর প্রভাবক্ষেত্র অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করলেন। বিশেষ করে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। সেই থেকে, আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জার্মানভাষী জাতিসমূহের বিশেষ প্রিয় অঞ্চলে পরিণত হল। বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের অন্তর্গত নিগ্রোজাতিরা বৈজ্ঞানিকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠল। প্রাগের অধিবাসী

জোহান উইলহেলম হেলফার ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আন্দামানের প্রকৃতি বিষয়ে গবেষণা করেন এবং সেই বছরেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পদাঙ্কানুকরণ করে কলিকাতা উদ্ভিদশালার কিউরেটর বা অধ্যক্ষ ম্যানিকের স্থলপিৎস কুরৎস, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এই দ্বীপে ভেষজতত্ত্ব বিষয়ে আরো গবেষণা করেন। ১৮৬৯ এবং ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ফার্দিনান্দ স্টোলিকৎকা আন্দামান ও নিকোবরের মানুষের প্রাগৈতিহাসিক আবাস সম্পর্কে আগ্রহ নিয়ে সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে একজন নৃজাতিতত্ত্ববিদ ও প্রত্নবিদ এফ. জ্যাগর তাঁকে অনুসরণ করেন। আধুনিক নৃজাতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে আইকষ্টেডটের কাউন্ট ইগন প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দের শীতকাল স্ত্রীসহ আন্দামানে 'ইণ্ডিয়ান সাউথ ইষ্ট এশিয়ান মাইগ্রেসন' বিষয়ক থিসিস বা তত্ত্ব রচনার জন্য ক্ষেত্রকর্মে ব্যাপৃত থাকেন। পরিশেষে, হুগো এ. বারণাৎসিক-এর উল্লেখ প্রয়োজন, তিনি মহৎ উদ্ভাবকদের অন্যতম, তিনি তাঁর নৃজাতিবিষয়ক কর্মের সহযোগী হিসাবে থিও ক্রোণারের মত পদস্থ ব্যক্তির সহযোগিতা প্রয়াসী হন। তিনি তখন ঐ দ্বীপে বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট প্রণয়নে ব্রতী ছিলেন। এইসব কথা আবার ডব্লু. স্ববোদা এবং আর. সখোট কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ব্যারণ ফন মেডেলের নেতৃত্বে এক অভিযাত্রী বাহিনী ভ্রমণে এলেন।

নিকোবর (ইন্দো-জার্মান স্থানীয় ইতিহাসের একটি অংশ হিসাবে এই দ্বীপে একটা অংশ দাঁড়িয়ে আছে) মোরাভিয়ান ব্রিদ্রেণ বা ভ্রাতৃত্বের হারেনহতের শাখার একটি মিশন স্টেশনের কর্মকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হত ১৭৬৮ থেকে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। জন গোটফ্রীড হেনসেল ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে নিকোবর ত্যাগ করেন, তিনিই শেষতম মিশনারী। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার শেষ বছরগুলির কাহিনী বলেছেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে 'লেটারস অন দি নিকোবর আইল্যাণ্ডস' এই নামে গ্রন্থাকারে কাহিনীটি প্রকাশিত হয়। ১৭৭৮ থেকে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিকোবর ছিল হোলি রোমান এম্পায়ারের প্রোটেকটরেট. রেসিডেণ্ট গটফ্রীড স্টাহলের অধীনে। তিনি আবার উইলহেলম বোলটসের অধীনস্থ ছিলেন। পরবর্তীকালে এইসব দ্বীপপুঞ্জে য়ুরোপীয় সহযোগিতা সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়। বহু সংখ্যক জার্মান ও দিনেমার যুদ্ধ জাহাজ গ্যালথিয়ার (১৮৪৬-র প্রথম দিকে) অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন। বিশেষ করে জীবতত্ত্ববিদ কীয়েলের বেহণ এবং বাণিজ্য বিশারদ এলটোনার নপটিশথ্ এই অভিযানের সাফল্যের জন্য বৈজ্ঞানিক

ও কারিগরিগত ক্ষেত্রে মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন। সমানভাবে অষ্ট্রিয়ান ক্ষুদ্র যুদ্ধ জাহাজ 'নোভারা'র নিকোবর যাত্রা জার্মান ভূতত্ত্ববিদ ফার্ডিন্যাণ্ড ফন হখসটেটার কে সেই দ্বীপে গবেষণাকর্মের সুযোগ দান করেছিল। শতাব্দীর ঠিক শেষ দিকে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কার্ল চুনের অধীনে জার্মান গভীর সমুদ্র অভিযান এই দ্বীপপুঞ্জে এসেছিলেন।

হোলি রোমান এম্পায়ারের দি ট্রিয়েস্ত ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পার হওয়ার কথা নয়। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে উইলহেল্‌ম বোলটস স্বদেশে ফিরে এলেন। নিকোবরের রেসিডেন্টের ওপর ভার দিয়ে এলেন। বোলটস কর্নেলের পদে উন্নীত হয়ে কর্ম জীবন থেকে অবসর নিলেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে তাঁর মৃত্যু হয়; ফার্স্ট এম্পায়ারের অবসানের ঠিক অল্পকাল পরে এই ঘটনা ঘটে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "কনসিডারেশ্যনস্ অন ইণ্ডিয়ান এ্যাফেয়ারস" নামক গ্রন্থরচনা করেন; তার উদ্দেশ্য ছিল কলিকাতা শহরে অশোভন অবস্থা বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ। এই গ্রন্থটি বিসংবাদমূলক ইতিহাস গ্রন্থে পরিণত হয়। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্রন্থটি পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করেন।

ত্রিয়েস্তে উদ্যোগের অবলুপ্তির পরও মহারাণী (যিনি ইতিমধ্যে পরলোক গমন করেন) বিজয়িনী ছিলেন। কারণ ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহের জনগণ তাঁর প্রতিকৃতিযুক্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তাঁদের অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল ধরে চালু রেখেছিলেন। প্রথম দিনের মুদ্রা ভিয়েনা এবং হলের টাঁকশালে ঢালাই হয়। বিধবার বেশে সম্রাজ্ঞীর আকৃতি এইজন্য নির্বাচন করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মত আগের যুগে কারষ্টেন নাইবুহর বলেছেন আরব সওদাগরগণ (যাঁদের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য বোম্বাই এবং কলকাতা থেকে জাঞ্জিবার এবং মোম্বাসা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল) তাঁরা মেরিয়া থেরেসা থালেরের মুদ্রাই বেশী পছন্দ করতেন। ইষ্ট-আফ্রিকান উপনিবেশগুলি থেকে ব্রিটিশ এবং ইতালীয়গণ এটি সরাবার চেষ্টা করে—কিন্তু ইষ্ট-আফ্রিকান কলোনীর ব্যবসায়ীবৃন্দ—একটি অ-ঔপনিবেশিক শক্তির মুদ্রাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রইল। এশিয়াতে বোম্বাই ছিল একমাত্র টাঁকশাল—সেখানে তাঁরা মারিয়া থেরেসা থালেরের মুদ্রাও ঢালাই করতেন আরো প্রায় আধ ডজন টাঁকশালে এই মুদ্রা ঢালাই হত, তাদের সঙ্গে এই মুদ্রাও চালু ছিল। এমনকি আজো, থালেরের মুদ্রা অন্যান্য জাতীয় নোট এবং মুদ্রার পাশাপাশি চালু আছে এমন অবস্থা আফ্রিকা ও এশিয়ায় কোনো কোনো অঞ্চলে দেখা যাবে। অদ্ভুত অথচ প্রীতিকর মনে

হয় যে আফ্রিকা ও এশিয়ায় একজন নারীর মুদ্রা এমনভাবে স্বেচ্ছায় গৃহীত হয়েছে, এই রমণী এই সব মহাদেশের জনগণের কাছে মানবিক আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়।

অতীতে, ভারতে জার্মানদের বাণিজ্যকেন্দ্র তেমন ভালোভাবে চলেনি। কিন্তু প্রবল ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের যুগেও এই সব প্রচেষ্টা কোনো ক্ষেত্রে সামরিক নীতির ছাপ নিয়ে যে উপস্থিত হয়নি তা এক প্রীতিকর চিহ্ন রেখে গেছে। হানরিখ হাইনে একদা বলেছিলেন মনের বাণিজ্যকেন্দ্র এই কারণে অধিকতর সমৃদ্ধ ছিল।

যাঁরা বীর শুধু তাঁদের মৃত্যুর পর কবিরা কথা বলেন। তখন তাঁদের কর্ম হয়ে দাঁড়ায় খ্যাতির সমাধি-ফলক। লুসিআডস-এর সমতুল কিছু দেওয়ার জন্য কোনো জার্মান ক্যামোস ছিল না। এর হেতু এই যে বিজয় অভিযাত্রীদের সেই হিড়িকের পর এক নতুন যুগের মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন চিত্ত জয় করার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে। আশা করা যায়, ভারত সম্পর্কে বিদগ্ধ সংযোগ ব্যবস্থা আরো অনেক কাল ধরে সচল থাকবে।

জার্মান গবেষণায় দক্ষিণ ভারত

যখন আমি দেখলাম যে তার মধ্যে রয়েছে জীবন নীতি এবং এমন সাম্যনীতি যা অনুপযুক্ত নয় তখন আমি মালবারি ভাষা থেকে উচ্চ জার্মান ভাষায় তা অনুবাদ করার ইঙ্গিত পেলাম। আমরা যাঁরা ক্রিশ্চান তাঁদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে যে যথোপযুক্ত সুনীতিগত নিয়মনির্দেশ নেই যে বিধর্মীদের কাছ থেকে তা শিক্ষা করতে হবে—কিন্তু শুধু মাত্র এইটুকু দেখানোর জন্য যে একজন বিধর্মী, আমাদের ধর্মগ্রন্থ বিষয়ে যাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা শুধুমাত্র স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা কিভাবে নীতিজ্ঞান লাভ করেছে এবং কিভাবে এই মালবারি বিধর্মীরা লাতিন ও গ্রীক বিধর্মীদের শুধু সমকক্ষ নয় তাদের সম্পূর্ণ অতিক্রম করে গেছে।

আরো বিস্তারিত জানার আগ্রহ যাঁর থাকবে তিনি মৎকর্তৃক রচিত ও য়ুরোপে প্রেরিত 'বিবলিওথেকাম মালবারিকম' পড়তে পারেন, এবং সেই সঙ্গে অপর দুটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা যা আমি মালবারি থেকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছি তাও এই সঙ্গে পড়তে পারেন।

বার্থলোমস ৎসাইগেনবালগ যে সব মিশনারীদের নাম ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও শ্রদ্ধা সহকারে উল্লিখিত হয় সেইসব মিশনারীদের অন্যতম। যে সব প্রোটেস্টাণ্ট মিশনারী ও পণ্ডিতগণ বিশেষভাবে দক্ষিণাঞ্চলকে তাঁদের কর্মক্ষেত্র বলে নির্বাচন করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমতম। এইখানে তাঁরা এক অধ্যাত্ম জগতের অন্তর্নিহিত রূপ দেখলেন এবং তার অনাড়ম্বর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে য়ুরোপের মানুষের কাছে এই প্রাচীন সংস্কৃতির শিক্ষক ও দোভাষী হিসাবে এক বিদগ্ধ জগতের সংবাদ বহন করে নিয়ে এলেন। এতকাল য়ুরোপে এই প্রাচীন সংস্কৃতি বিষয়ক তথ্যের পথ অবরুদ্ধ ছিল।

দক্ষিণ ভারতে মিশনারীদের কাজকর্মের সঙ্গে ভারতে ডেনমার্কের বাণিজ্য নীতির ঘনিষ্ঠ সংযোগ। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে দিনেমার সম্রাট চতুর্থ ক্রিশ্চিয়ান

বার্থলোমস ৎসাইগেনবালগ—যা মালবারি নৈতিক দর্শন—'নিদি উনপা' নামক গ্রন্থের জার্মান অনুবাদের জন্য ৩০শে আগস্ট ১৭০৮ তারিখে লিখিত ভূমিকাংশ।

ভারত এবং সংলগ্ন এশিয় রাজ্যগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সংগঠন করেন। হলষ্টিনের ডিউক এবং স্থেলসৃভিগের রাজকুমার হিসাবে ডেনমার্কের সম্রাটরা সেইকালে জার্মান রাজ্যগুলির অধিপতি ছিলেন আবার সেই সঙ্গে হোলি রোমান এম্পায়ারের সেই সব অঞ্চলের তাঁবেদারও ছিলেন।

নবগঠিত কোম্পানী সিংহলের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে সেই দ্বীপের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তুললেন। এই অবস্থা পোর্তুগীজদের আতঙ্কিত করে তুলল, তারা অচিরাৎ দিনেমার প্রভাব থেকে সিংহলকে সরিয়ে আনলেন। সিংহলের অধিপতি অভিযাত্রীবাহিনীর হাতে বেদনাদায়কভাবে পরাজিত হওয়ার পর এই অবস্থা ঘটল। এই ঘটনার ফলেই তামিলনাদের তানজোরের রাজা রঘুনাথ নায়ক (অচ্যুতাপ্পা নায়ক নামেও পরিচিত) দিনেমারদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করতে উদ্যোগী হলেন। করমণ্ডল উপকূলের ত্রাণকুয়েবর নামক ক্ষুদ্র গ্রামখানি তিনি ওদের ইজারা দিলেন। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর তারিখে রঘুনাথ কর্তৃক দস্তখতকৃত রাজকীয় সনদ দ্বারা দিনেমার কোম্পানীর ডানেব্রোগ পতাকা ত্রাণকুয়েবরের ভূমিতে ওড়ানো হল।

নব্বুই বছর পর, ডেনমার্কের প্রথম প্রোটেস্টাণ্ট মিশনারী দল এই ক্ষুদ্র বন্দরযুক্ত অঞ্চলে এসে হাজির হলেন। সেইকালে ডেনমার্কের বহির্জাগতিক স্বার্থ ছিল সম্পূর্ণভাবে সাংস্কৃতিক। তখনকার কালে তার অর্থ মিশনারী কাজকর্ম বোঝাতো। প্রকৃতপক্ষে জার্মান দেশসমূহের ক্রিশ্চান ধর্মবিশ্বাসের এই সব রাষ্ট্রদূতের ক্রিয়াকলাপ যাদের কাছে তাঁরা ধর্মীয় মত্যের সংবাদ বহন করে এনেছেন তাদের নিজস্ব অধ্যাত্মিক সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এইদিক থেকে, লাতিনরা অনেকটা সহনশীল মনোভঙ্গী অবলম্বন করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন টম্যাস ক্রিশ্চানদের সম্পর্কে পোর্তুগীজদের মনোভাব দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে গোয়াতে একজন প্রথম দিকের পর্তুগীজ প্রচারক এই সব সুপ্রাচীন ক্রিশ্চানদের চার্চ-সাহিত্যকে পাষণ্ডের কাজ বলে অসহিষ্ণু হয়ে দগ্ধ করেন (মালাবার, উপকূলের সিরিয়ান সম্প্রদায়ের অন্যতম হলেন এই সব প্রাচীন ক্রিশ্চানরা) এবং তদ্বারা অধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের এক প্রধান অংশীদারীত্ব থেকে তাঁদের বঞ্চিত করে রাখেন।

বার্থলোমস ৎসাইগেনবালগ (১৬৮২-১৭১৯) লুথেরিয়ান ঈশ্বরবেত্তা

এবং মিশনারী হিসাবে ভারতে এসেছিলেন, তিনি ত্রাণকুয়েবরে বসবাস করতে মনস্থ করেন। পরে তিনি দ্রাবিড়বেত্তা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন—দ্রাবিড়দের ভাষা এবং ধর্ম উভয় বিষয়ে গবেষণায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আজও তাঁর রচনাবলী সারা পৃথিবীতে বিশেষজ্ঞ মহলে সমাদৃত। লুথারের 'লিটল্ ক্যাটেচিসম' তিনি তামিলভাষায় অনুবাদ করেন—এশিয়াখণ্ডে এই সর্বপ্রথম খ্রীষ্টধর্মে মৌলিক মতানুযায়ী শিক্ষাসম্বন্ধীয় গ্রন্থ ক্যাটেচিসম প্রবর্তিত হল। পরে ৎসাইগেনবালগ বহুসংখ্যক চার্চ সঙ্গীত এবং বাইবেলের 'বুক অব রুথ' পর্যন্ত অনুবাদ করেন। স্বয়ং মিশনারী হওয়ায় তিনি চেষ্টা করেছিলেন একটি দেশী প্রোটেস্টান্ট যাজক সম্প্রদায় গড়ে তোলার। এ ছাড়া তিনি একটি তামিল অভিধান ও তামিল ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। এছাড়া মালাবারের দেব-দেবী সংক্রান্ত একটি মৌলিক গ্রন্থ ও বহু তামিল গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এর ওপর হালের এ. এইচ. ফ্রাঙ্কের এই শিষ্য সাফল্যজনক শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্তি স্থাপনা করেন— যা মোটেই বিস্ময়কর নয়। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে সর্বপ্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

ৎসাইগেনবালগকৃত মালাবারের দেব-দেবী সংক্রান্ত গ্রন্থ এবং 'মালবারিয়ান পেগানইজম' দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সেই কালে য়ুরোপীয়গণ 'মালবারিয়ান' এই কথাটির দ্বারা সমগ্র দক্ষিণ-ভারতকেই বুঝতেন—তামিল এবং কেরালার দেশগুলি তার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে অবশ্য এই অভিধায় শুধু মাত্র দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমাঞ্চল বোঝায়।

কি উৎসাহে ৎসাইগেনবালগ তামিল পঠন-পাঠন এবং তামিলভাষা শিক্ষায় আগ্রহী হন তার পরিচয় পাওয়া যায় সেই সময় তিনি য়ুরোপে যে সব চিঠি-পত্র পাঠান তার মধ্যে। এইরকম একটি পত্রে তিনি লিখেছেন—

"আমি একটা অভিধান সংকলন সুরু করেছি। আমি এই পদ্ধতিতে কাজ করছি—প্রথমে সব কথা মালাবারি লিপিতে লিখছি তার পাশে লাতিন শব্দ দিয়ে কিভাবে নির্ভুল উচ্চারণ করা যায় তার নির্দেশ রাখছি। আর তারপর থাকছে অর্থ। ইচ্ছা হয় এই ভাষা ইংলণ্ডে শেখানো হোক এবং আর সব রকম প্রাচ্য দেশীয় ভাষার মত আগ্রহ নিয়ে লোকে তা শিখুক। মালাবারিয়ানরা মহৎ এবং অসংখ্য মানুষ। এই কাজের ফলে ঈশ্বরের কৃপায় বিধর্মীর অন্ধত্ব থেকে ত্রাণ করে তাদের সহায়তা করা যাবে। একাজ সম্ভব হয় যদি সব প্রোটেষ্টাণ্ট রাজন্যবর্গ এবং অধিপতিবৃন্দ

এই ব্যাপারে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন। এতদ্বারা তাঁদের নিজেদেরও সুবিধা হবে। কারণ তাঁরা এদের রচনাদি থেকে তাদের ধর্মতত্ত্বের ও দর্শনের আরকানুম বা সুগভীর রহস্য জানতে পারবেন তার মধ্যে যা উত্তম এবং যুক্তিগ্রাহ্য তা পাবেন যেমনটি এরিষ্টটল বা অন্যান্য বিধর্মী লোকদের রচনায় পাওয়া গেছে। আমি নিজে স্বীকার করতে বাধ্য যে আমার সত্তর বছর বয়স্ক শিক্ষক এমন সব প্রশ্ন আমাকে করেন তার দ্বারা আমি বুঝি যে আমাদের স্বদেশের অনেক মানুষ এঁদের ধর্মতত্ত্ব যতটা যুক্তিহীন বলে ধারণা করে আছেন, অবস্থা কিন্তু তেমন নয়। এরা এতই বুদ্ধিমান যে যদি শোনে য়ুরোপে পণ্ডিতরা যুক্তি বিদ্যা, ছন্দপ্রকরণ, তত্ত্ববিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন বক্তৃতা দেন তাহলে পরিহাসের হাসি হাসবে। মনে করবে এই শিল্পরীতি সাধারণ দুঃখ জালার সর্বাধিক বিচ্যুতি, পৃথিবীতে এর মত দুর্দশাকর আর কিছু আবিষ্কৃত হয়নি।”

ৎসাইগেনবালগের পত্রে উল্লিখিত এই অভিধানটি ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে সালের হলে অর্ফানেজ প্রিন্টিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এর লাতিন নাম-লিপি বা টাইটেলটি সুবৃহৎ—তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল,

তামিল ব্যাকরণ—যার মধ্যে অনেক দৃষ্টান্ত, নিয়ম এবং প্রয়োজনীয় শব্দাদি। তামিল ও মালাবারিয়ান ভাষাসমূহ শিক্ষার সহজতম পদ্ধতি প্রাচ্য ভারতে এই ভাষা প্রচলিত এবং এখনও এই ভাষা য়ুরোপে অজ্ঞাত।

ৎসাইগেনবালগ ভারতীয় ধর্মীয় জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য তার প্রাপ্য সম্মান পাননি বলে হারমান বেথান তাঁর তামিল ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। জার্মানীতে ভারততত্ত্ব বা ইনডোলজী বিজ্ঞান হিসাবে এক শতাব্দীকালের প্রাচীনত্ব লাভ করলেও তামিল-জার্মান এবং জার্মান-তামিল অভিধানের অস্তিত্ব দুইশত বছরেরও প্রাচীন।

অধিকন্তু বেথান ত্রাণকুয়েবর থেকে প্রেরিত রিপোর্ট-এর একটি উল্লেখ্য অংশের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন:

> “করমণ্ডল উপকূলে অবস্থিত ত্রাণকুয়েবর…এ্যানো ১৭১২। একটি মালাবারি অভিধান রচনা সম্পূর্ণ হল…এতে প্রায় ৪০,০০০ হাজারেরও বেশী শব্দ আছে…এই ব্যবস্থায় প্রথমে আছে আদি শব্দ তার নীচে তার উৎপত্তি এর উপর আছে কিছু প্রবাদ বাক্য। এই কাজই প্রায় দু' বছর আগে সুরু করা হয়। তার

মধ্য থেকে 'এ' এই অক্ষরটির কাজ সম্পূর্ণ করে য়ুরোপে পাঠানো হয়। কিন্তু যেহেতু এই পদ্ধতিতে কাজ করলে প্রচুর সময় এবং যথেষ্ট কাগজ খরচ আর মালাবারি তালপাতায় একজনকে সব লিখতে হয়.....অন্যথায় অবশ্য সমস্ত মালাবারি গ্রন্থাদি থেকে প্রায় ২০,০০০ শব্দের এক অভিধান পূর্বে সংকলিত হয়েছে। একজন স্বহস্তে কাগজের ওপর লিখেছিলেন। যথা, প্রথমে মালাবারি লিপিতে নিজস্ব মালাবারি শব্দ। পরে সেটি লাতিন ভাষায় কিভাবে উচ্চারিত হবে। আবার সেই সঙ্গে তার জার্মান অর্থ আবার তার পাশাপাশি একটি সম্পূর্ণ জার্মান সূচী—এ সবই করা হয়েছিল ভবিষ্যতের কর্মীদের সুবিধার জন্য। যদিও কাউকে এই উপদেশ দেওয়া যায় না যে এই রকম একটি ভাষা শুধু অভিধান মারফৎ শেখা যাবে। বরং এই ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি পাঠে তা সম্ভব। তাই থেকে ব্যবহৃত শব্দাদি পাঠকের কাছে যা অপরিচিত তা টুকে রাখবেন এবং পরে তা মুখস্ত করবেন।"

ত্রাণকুয়েবর তার বিশেষ খ্যাতির জন্য ৎসাইগেনবালগের গ্রন্থাদির কাছে ঋণী। এই স্থানটির বর্তমান নাম তামিল অপভ্রংশ তরঙ্গমবাদি অর্থাৎ কল্লোলিনী সাগর তরঙ্গের ভূমি। যে স্থানটিতে অনন্তকাল ধরে সাগর তরঙ্গ শোনা গেছে, সেই স্থান আজ এক নতুন ধ্বনির দ্বারা আক্রান্ত। এ ধ্বনি আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রের এবং তারপর মুদ্রণ শিল্পের যন্ত্রাদি। এইভাবে গুটেনবার্গ-এর দেশের সন্তান মেইনৎসের অধিবাসীর 'ব্ল্যাক-ম্যাজিক' ভারতের এই অঞ্চলে প্রবর্তিত করেছেন।

১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে ৎসাইগেনবালগ তামিলদের নিজস্ব ভাষায় লিখিত বাইবেল উপহার দিলেন। ক্রিশ্চানদের এই পবিত্র গ্রন্থ অনুবাদে তাঁর অনেক বছর লেগেছে। সেই বছর যখন ত্রানকুয়েবরে এই গ্রন্থটি মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া গেল পাশ্চাত্যের ক্রিশ্চানদের সঙ্গে ভারতের জনগণের মধ্যে একটা নতুন সম্বন্ধ গড়ে উঠল। আজ যা অতি প্রচুর, তামিল অঞ্চলের ক্রিশ্চান সাহিত্যের ধর্ম পিতা হলেন বার্থলোমস ৎসাইগেনবালগ। আর ত্রাণকুয়েবরে শুধু প্রোটেস্টাণ্টদের ধর্মগ্রন্থাদি মুদ্রিত হল তা নয় পরবর্তীকালে ক্যাথলিক পণ্ডিতগণের রচনাদিও এইখানে মুদ্রিত হল।

তাঁর অন্যান্য রচনাবলী এবং অজস্র চিঠিপত্র যা ভাষাতাত্ত্বিক এবং

ঐতিহাসিকদের কাছে স্বর্ণখনিবিশেষ; বিশেষতঃ যাঁরা মিশনারী ইতিহাস, রাজনৈতিক, আঞ্চলিক এবং বুদ্ধিগত ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা কর্মে মনোনিবেশ করতে চান। সমাজতাত্ত্বিক, পুরাণের মিত্রাদি এবং দক্ষিণভারতীয় সাহিত্য, নৃজাতিতত্ত্ব ও লোককথা নিয়ে গবেষণা করবেন, বা যাঁরা ঈশ্বরতাত্ত্বিক এই সকলের জন্য ৎসাইগেনবালগ 'বিবলিওথেকা মালাবারিকা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। যাদের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচিত তাঁদের কথা গ্রন্থের শিরোদেশে মুদ্রিত। তাঁর দুখানি নাতিবৃহৎ গ্রন্থ ডব্লু. কালানড কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 'নিদি উনপা' গ্রন্থের মুখবন্ধের উপরকার শিরোভূষণ হিসাবে মুদ্রিত বাণী এই দুটি গ্রন্থেও ছিল। 'নিদি উনপা' (কথাটি ৎসাইগেনবালগ দুটি বিভিন্ন শব্দে ভাগ করেন) এই কথার অর্থ সুনীতি বিষয়ে ছন্দোবদ্ধ একশত শ্লোক। মালাবারিদের সুনীতি এবং আচার আচরণ বিষয়ে ৎসাইগেনবালগের এই গ্রন্থে—যে দেশকে তিনি তাঁর আবাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সেই দেশের মানুষের প্রতি পক্ষপাতহীন সুগভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির পরিচায়ক। 'নিদি উনপা'র ভূমিকাংশের প্রারম্ভিক কথাগুলিতে ৎসাইগেনবালগের অন্যান্য রচনা ও চিঠি পত্রের মত এই মনোভঙ্গী প্রমাণিত:

"য়ুরোপের অধিকাংশ ক্রিশ্চানের ধারণা এই যে বিধর্মী মালাবারিগণ অসভ্য বর্বর প্রাণী। এদের নৈতিকজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য নেই। এই সবই তাদের ভাষা সম্যকরূপে না জানা থাকার ফল। কিছু না বুঝে বাহ্যিক আকার দেখেই তৎক্ষণাৎ একটা সিদ্ধান্ত করে নেওয়া হয়েছে। আমি স্বয়ং স্বীকার করতে বাধ্য যে আমি যখন বিধর্মীদের মাঝে সর্বপ্রথম এলাম তখন তাদের ভাষা যে রীতিগত এবং তাদের জীবনধারা যে যথাসঙ্গত তা আমার পক্ষে অনুধাবন করা অসম্ভব ছিল। আমি তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা করে নিয়েছিলাম—বিশ্বাস করেছিলাম ওদের মধ্যে কোনো রকম সুসভ্য এবং নৈতিক আইন প্রচলিত নেই। এই কারণে আমার পক্ষে তাদের ক্ষমা করা সহজ যারা কখনও বিধর্মীর সংস্পর্শে না এসে আমার মত অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। কারণ এই বিধর্মীদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কাটানোর পরও আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল। এই ভ্রান্তি থেকে আমি ক্রমে ক্রমে মুক্ত হয়েছি এবং তখন থেকে আমি তাদের সম্বন্ধে অনেক উত্তম ধারণা পোষণ করতে পেরেছি। আমি যখন পরিশেষে ওদের গ্রন্থাদি পাঠ করার সম্পূর্ণ শক্তি অর্জন করলাম। তাদের সেই সব দার্শনিক নিয়মানুবর্তিতা

শিক্ষাদান করা হয়, ঠিক যেমন ভাব বিনিময় ঘটে য়ুরোপের পণ্ডিত সমাজে। তাদের উপযুক্ত লিখিত আইন বিধি আছে যদ্বারা সমস্ত ঈশ্বরতাত্ত্বিক বক্তব্য আহরণ করা হয় এবং অনুশীলিত হয়, তখন আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। আমার মনে প্রচণ্ড বাসনা জাগল ওদের নিজস্ব রচনাবলীর মাধ্যমে ওদের বিধর্মী আচার বিষয়ে শিক্ষা করি। এর পর আমি একের পর একটি করে গ্রন্থ পাঠ করতে লাগলাম। সময় এবং অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য করিনি —অবশেষে এখন আমি নিরন্তর ওদের গ্রন্থাদি পাঠ করে, ওদের ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিতদের সঙ্গে আলোচনা করে আমি এখন নিশ্চিত হয়েছি ওদের সম্বন্ধে এবং সব কিছুর হেতু উপলব্ধি করতে পেরেছি। তথাপি এ এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সুতরাং কেউ যদি এর বিষয় বিস্তারিত কিছু লিখতে চান তাহলে তার প্রচুর সময় ও প্রচুর পাঠের প্রয়োজন। আমার যেহেতু উভয়বিধ বস্তুর অভাব ছিল আমি শুধু সম্পূর্ণ সংক্ষেপে এই ভূমিকায় বিধর্মীদের বিষয় সর্বাপেক্ষা যেটুকু জানা প্রয়োজন এবং যা মূল্যবান তাই লিখছি।"

'কনডেই ওয়েনডেন' বা মালাবারী সুনীতিমালা নামক ৎসাইগেনবাল্‌গ ৩৯ সংখ্যক স্তবকের নীচে সংযোগ করেছেন—এই নীতি উত্তর-ভারতীয় নীতির বিপরীত। একাদশ শতাব্দীর মহাণ দক্ষিণ-ভারতীয় শাসক রাজেন্দ্র চোলদেব (প্রথম) হয়ত এই নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পেগু, মালাক্কা এবং শ্রী বিজয়ের সাম্রাজ্যে দ্রাবিড় তাঁবেদার রাষ্ট্র স্থাপনে উদ্যোগী করেছিল। এই স্তবকটি (কালান্দ কর্তৃক অনূদিত এবং ইণ্ডিয়া অফিসের আধুনিক তামিল পাঠানুসারে যা পাশে দেওয়া আছে) এই রকম…

"সমুদ্র পার হয়েও রত্ন আহরণ করো—"

ৎসাইগেনবাল্‌গ তার এই নির্বাচিত স্বদেশের দেবদেবী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দান করেছেন। তাঁর মালাবার দেবদেবীর বংশতালিকা নামক গ্রন্থ ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। ১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ ভাবে মাদ্রাজে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই 'জিনিয়ালজি'র ভূমিকায়—ৎসাইগেনবাল্‌গ বলেছেন তিনি আরও একটি বই সম্পূর্ণ করেছেন দেবদেবী সম্পর্কে দু'বছর পূর্বে। এই গ্রন্থটি 'মালাবারী বিধর্মীবাদ' সম্পর্কে রচিত, ডব্লু কালান্দ কর্তৃক সম্পাদিত এবং ১৯২৬-এ নেদারল্যাণ্ডস কোনিক্লিজকে আকাদেমি ভ্যান ভেটেনস্খাপেন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ৎসাইগেনবাল্‌গ দক্ষিণ-ভারতীয় হিন্দুধর্ম বিষয়ে সকল দিক উদ্‌ঘাটিত করেছেন। অসংখ্য দেবদেবী থেকে সুরু করে, তিনি

প্রার্থনা, পাপ, তীর্থযাত্রা, খাদ্য এবং আহার গ্রহণের অভ্যাস সংক্রান্ত প্রশ্নাদি এবং সেই সঙ্গে মহাকাশবিদ্যা এবং শিল্পকলা বিষয়েও আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির একাদশ ও অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে এই পণ্ডিত এবং মিশনারী কবি ও কবিতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তামিল বিদগ্ধ সমাজের ক্রিয়াকাণ্ড বিষয়ে ৎসাইগেনবাল্‌গ কত গভীর এবং নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তা এই পরিচ্ছেদের ভূমিকাংশে পরিস্ফুট :

"এই বিধর্মীদের মত কবিতার মতো আর কোনো শিল্পই এত বেশী সার্বিকত্ব লাভ করেনি। এর কারণ এদের ধর্ম সংক্রান্ত সকল গ্রন্থাদি কবিতায় রচিত, এবং তাদের সম্প্রদায়ে যা কিছু গীত হবে তা কাব্যধর্মী হওয়া চাই। সুতরাং পরিণত বয়সের ছেলেরা তাদের সমস্ত বিদ্যালয়ে কাব্যপাঠ করে এবং প্রত্যেকে যতটুকু গ্রহণ করতে পারে ততটুকু শিক্ষা করে। আর যাদের এই দিকে আগ্রহ থাকে তারা পরবর্তী কালে পেশা হিসাবে কবিতা রচনার বৃত্তি গ্রহণ করে এবং তদ্বারা জীবিকা অর্জন করে। এই কাজের জন্য অনেক রকমের গ্রন্থাদি আছে যেখানে এই শিল্পের ভিত্তিগত কথা বিধৃত করা হয়েছে, যথা: (১) তোলকাবিয়াম—এই গ্রন্থে কাব্যের সর্বপ্রকার শিল্পরীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে, (২) দিগম্বরম এবং নেগেনডু—গ্রন্থ দুটি কাব্য অভিধানের মত, এর মধ্যে পাওয়া যাবে অজস্র শব্দরাজি, (৩) নান্নুল—এতে কি ভাবে বাক্য, শব্দাদি ব্যবহার করতে হবে এবং কিভাবে একটা সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুকে বিস্তারিত করা যেতে পারে তার শিল্পরীতি প্রকাশিত হয়েছে, (৪) কারিগেই—এর মধ্যে পদ্যাংশের লিঙ্গ প্রকরণের ব্যাখ্যাদি দেওয়া আছে। কারণ এর ভিতর সম্পূর্ণ ভাবে বিদেশী ভাষার ব্যবহার আছে এবং সম্পূর্ণ এক বিভিন্ন ভাষা সৃষ্টি করে যা কোনো মালাবারী বুঝিতে পারে না এই বিষয়ে কিঞ্চিত শিক্ষাপ্রাপ্ত না হলে এবং কাব্যিক শব্দাদির সঙ্গে বিদ্যালয়ে যদি পরিচয় ঘটে না থাকে। পদ্যে এইসব শব্দ সাধারণ গঠনরীতি থেকে বিচ্যুত এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধারায় প্রতিফলিত। এতদ্বারাও অনেক অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এদের পদ্যে এর চার রকমের পাণ্ডমের মধ্যে (প্রকার) পার্থক্য বিচার করে, প্রথমটির নাম 'আস্থ'—এটি সবচেয়ে সহজ এবং সহজেই শেখা যায় বোঝা যায়। পরবর্তী রীতির নাম 'মাতুরম'। এই জাতীয় পদ্যের মাত্র অর্ধাংশ বোঝা যায়। তৃতীয় ধারার নাম 'চিন্দিরাম', যার অর্থ এই জাতীয় পদ্য তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং অজ্ঞাত ভাবধারার জন্য কারো পক্ষে

অর্থগ্রহণ করা সম্ভব নয়, এমনকি একালের কবিরাও সম্যক বুঝতে পারেন না। চতুর্থ রীতির নাম 'উপটারুম'। তার মধ্যে সেই জাতীয় পদ্য আছে যার বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত। এই ধারাও অতি সামান্য বোধগম্য হবে। এর ওপর ওদের ৩২ প্রকার লিঙ্গ প্রকরণ আছে, তার দ্বারাই সকল পদ্য প্রকরণ করতে হবে।

'কল্লোলিনী সাগর তরঙ্গের দেশ' যেখানে ৎসাইগেনবাল্‌গ এবং তাঁর সহযোগী মিশনারী হাইনরিস্ প্লুটসথাউ শব্দতত্ত্বে এক পুরুষের মিশনারীদের শিক্ষিত করেছিলেন, সেই দেশ দীর্ঘকাল ধরে শুধু যে মিশনারীদের কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল তা নয়—ভারত তত্ত্ব—বা দ্রাবিড়তত্ত্বের এবং অন্যবিধ বৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্র ছিল।

বার্থলোমাস ৎসাইগেনবাল্‌গের অতি খ্যাত উত্তরসূরীদের অন্যতম ছিলেন জোহান ফিলিপ ফ্যাবরিসিয়স—তিনি ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'এ মালাবার অ্যাণ্ড ইংলিশ ডিকসনারী' নামক অভিধানের প্রকাশনে ক্রিশ্চিয়ান ব্রিথাউপটের সহযোগী ছিলেন। সেই সময় ত্রানকুয়েবরে যে সব জার্মান পণ্ডিতগণ কাজ করেছিলেন তাঁদের গ্রন্থাদি আংশিক জার্মান ও আংশিক তামিলে প্রকাশ করলেও বেশীর ভাগ করেছেন ইংরাজীতে বা তামিল ও ইংরাজীতে সংযুক্তভাবে। আজো কিছু সংখ্যক প্রোটেষ্টাণ্ট তামিল জার্মান ভাষা শিক্ষা করে থাকেন, যেমন প্রখ্যাত লুথেরান তামিল পণ্ডিত বি, এস, জ্ঞানচারিয়ান, (মাদ্রাজের যাজক) অন্যান্য গ্রন্থদের মধ্যে ১৯৩৭-এ প্রিলেট রসের জার্মান ভাষায় লিখিত এক ধর্মগ্রন্থ মূল জার্মান থেকে অনুবাদ করেছেন তামিল ভাষায়।

ফ্যাবরিসিয়াস অভিধান কয়েকবার পুর্ণ সম্পাদন হয়েছে এবং প্রতিটি সংস্করণেই পরিবর্ধন করা হয়েছে। 'দি তামিল অ্যাণ্ড ইংলিশ ডিক্‌সনারী' (১৮৯৭)-তে বলা হয়েছে "জোহান ফিলিপ ফ্যাবরিসিয়াস"-এর ভিত্তিতে গঠিত। ভূমিকা পাঠে জানা যায় :

"প্রথম তামিল ও ইংরাজী অভিধান ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে 'এ মালাবার অ্যাণ্ড ইংলিশ ডিক্‌সনারী' নামে প্রাচীন জার্মান লুথেরান মিশনারী জোহান ফিলিপ ফ্যাবরিসিয়াস এবং ক্রিশ্চিয়ান ব্রিথাউপট কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এই অভিধানে প্রায় ৯,০০০ হাজার শব্দ ছিল এবং তার সঙ্গে শব্দ, প্রবাদ, ইত্যাদির প্রচুর সঞ্চয়ন ডাঃ রটলার এবং ডাঃ উইনস্লোর পরবর্তীকালে প্রকাশিত গ্রন্থের ভিত্তি রচিত হয়। এই অভিধানে প্রায় সবই গৃহীত হয় 'দি ওল্ড ডিক্‌সনারী' নামে। ...এই সংস্করণের পরিবর্তন স্বর্গীয়

রেভারেণ্ড ই. খেইফার কর্তৃক সুরু করা হয়। তিনি ত্রানকুয়েবরের ইভানজেলিক্যাল লুথেরান সেণ্ট্রাল হাইস্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন, এই কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন মিঃ এ. পাকিয়াম পিল্লাই, তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের হেডমাষ্টার ছিলেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকা 'এইচ. বি' এই সহিযুক্ত ছিল। ১৯১০ এর দ্বিতীয় সংস্করণ, ইতিমধ্যে যার নতুন নামকরণ করা হয় 'দি নিউ ডিক্‌সনারী' আবার মুদ্রিত হয় এবং 'ওল্ড ডিক্‌সনারী'র 'জোহান ফিলিপ ফ্যাবরিসিয়াস' রচিত গ্রন্থের ভিত্তিতে। ত্রানকুয়েবরে জার্মান পণ্ডিতদের নাম সগৌরবে উচ্চারিত হলেও সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে এসব নাম সুপরিচিত।

লঘু তামিল-ইংরাজী অভিধানাবলী অথবা ব্যাকরণ, আর সব গ্রন্থের মধ্যে যোহান পিটার রটলার কৃত (১৭৪৯-১৮৩৬) 'তামিল-ইংরাজী অভিধান' ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং এই গ্রন্থেও স্বীকৃতি থাকে 'ফ্যাবরিসিয়াস'-এর ভিত্তিতে রচিত, তামিল এবং ইংরাজী অভিধান, এবং ইংরাজীতে কার্ল থিওফিল এওয়ালড রেনিয়স (১৭৯০-১৮৩৮) কৃত "তামিল ব্যকরণ" ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

স্ট্রাসবুর্গের অধিবাসী যোহান পিটার রটলার ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ত্রানকুয়েবরে এসেছিলেন। তিনি অচিরাৎ ধারাবাহিকভাবে তামিল পাঠে মনোনিবেশ করলেন এবং উচ্চাঙ্গের উদ্ভিদতাত্ত্বিক হিসাবে প্রতিভার পরিচয় দিলেন। তিনি তাঁর বন্ধু গারলাথের সঙ্গে ভারতীয় মিশনারী কর্মের জন্য আবেদন জানালেন। রটলারের শিক্ষণ ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান সংক্রান্ত ক্রিয়াকাণ্ড তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী করল। মাত্র বারো মাস এই দেশে বাস করার মধ্যেই তিনি তামিলভাষায় ধর্ম প্রচার করতে সুরু করলেন। তিনি ভাষাতাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিষয় বস্তু নিয়ে বিস্তারিতভাবে লেখালেখি ও আলোচনা করতে লাগলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এরলানগেন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিক পি. এইচ. ডি ডিগ্রিতে সম্মানিত করলেন। ইতিমধ্যেই একজন উদ্ভিদতাত্ত্বিক হিসাবে তিনি প্রভূতি খ্যাতি অর্জন করলেন। য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তিনি দক্ষিণ-ভারতীয় উদ্ভিদাবলীর নমুনা পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর চেষ্টাতেই সেণ্ট্রাল এবং ওয়েষ্টার্ণ য়ুরোপে অনেক সংগ্রহের কাজ সুরু হয়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড নর্থ সিংহলে ব্রিটিশ গভর্ণর হিসাবে নিযুক্ত হলেন তখন উদ্ভিদতত্ত্বে সুপণ্ডিত একজনকে সেই দ্বীপে তাঁর অনুগমন করার জন্য প্রয়োজন

হয়। রটলারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল এবং তিনি তাঁর সঙ্গ নিলেন। এই যাত্রায় তিনি এক বিরাট সংগ্রহ নিয়ে এলেন এবং পরে তা লণ্ডনের কিংস কলেজ উদ্ভিদশালায় উপহার দিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই সংগ্রহগুলি কিউ-তে স্থানান্তরিত হল। রটলারের ক্রিয়াকাণ্ডের একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁর রিপোর্টে—"উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ ত্রানকুয়েবর থেকে মাদ্রাজ, ওয়াণ্ডেয়াস থেকে কুড্ডালোর হয়ে এবং ১৯শে ডিসেম্বর (১৭৯৯) থেকে ১৬ই জানুয়ারী ১৮০০ আবার ত্রানকুয়েবর এম. বি. বেরীর ভারপ্রাপ্ত মার্মালোঙে-এর মাদ্রাজস্থ বোটানিক্যাল গার্ডেনে অবস্থানের সময় পরিদর্শিত উদ্ভিদ বিষয়ে মন্তব্য। এই সব পর্যটন কাহিনীর দ্বারা একজন আজন্ম উদ্ভিদ তাত্ত্বিকের পরিচয় ধরা পড়ে এবং এইভাবে সারা য়ুরোপে তাঁর খ্যাতি প্রচারিত হয়। জার্মান মিশনারী পীৎসোলড যখন ভেপারি ত্যাগ করলেন (এই ভেপারি ছিল তাঁর মিশনারী কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল) কলকাতায় তামিল অধ্যাপনা করার জন্য তখন রটলার সাময়িকভাবে তাঁর কাজ গ্রহণ করলেন। পীৎসোলডের প্রত্যাবর্তন এবং আকস্মিক মৃত্যুর পর রটলার ভেপারির ভার নিয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে তিনি হেলে মিশন সোসাইটি ছেড়ে চার্চ অব ইংলণ্ডে কাজ করছেন। তাঁর কর্মকালে তিনি জার্মান এবং ইংরাজী প্রার্থনা গ্রন্থ তামিল ভাষায় অনুবাদ করেন। মাদ্রাজের সেণ্ট ম্যাথুজ গির্জায় একটি ফলকে এই সার্বভৌম জ্ঞানের অধিকারী ও সেই সঙ্গে গির্জার কাজে উৎসর্গীকৃত প্রাণ যাজকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

পশ্চিম প্রাসিয়ার গ্রদনেৎসের অধিবাসী মিশনারী রেহনিয়াস ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসেন। পাঁচবছর পরে মাদ্রাজের তথাকথিত ব্ল্যাক টাউন ডিসট্রিকটে তিনি একটি প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় স্থাপনা করেন। পরে পালাম-কোট্টা ও তিনেভেলীতে তিনি কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'দি এসেন্স, অর দি ট্রু বেদ' ধর্মীয় সহনশীলতার সহিত ধর্মীয় মতবাদ ব্যাখ্যায় তাঁর প্রয়াসের পরিচায়ক। তিনি বাইবেলের অংশ বিশেষ তামিল ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর তামিল ব্যাকরণের পর আরও ব্যাকরণ গ্রন্থ ও সংক্ষিপ্ত অভিধানাদি প্রকাশিত হয়, এর মধ্যে কার্ল গ্রাউলের 'আউটলাইন অব দি তামিল ল্যাংগুয়েজ' (১৮৫৫) এবং 'দি ফার্স্ট থাউস্যাণ্ড ওয়ার্ডস ইন তামিল' 'ইংলিশ অ্যাণ্ড জার্মান' (সম্ভবতঃ দোয়োদারলীন কর্তৃক প্রকাশিত), ত্রান-কুয়েবরে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ও. কাহল কর্তৃক মুদ্রিত হয়।

যোহান পিটার রটলারের ডঃ বার্ণহার্ড সথীমিড (১৭৪৭-১৮৫৭) মিশনারীর কাজের সঙ্গে উদ্ভিদতত্ত্বে এবং ভাষাতত্ত্বের কাজে গভীর শ্রদ্ধায় সংযুক্ত হয়েছিলেন। প্রখ্যাত পত্র বিনিময়ের মধ্যে তিনি উদ্ভিদতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতাপূর্ণ বিস্তারিত মতামত দান করেন। তাঁর সঙ্গে যাঁদের পত্র বিনিময় ঘটে তাঁদের মধ্যে ব্যারন ফন হুগেল, নীস ফন এসেনবেক এবং স্যার উইলিয়াম হুকার (কিউ গার্ডেনসের বিশ্বজাগতিক প্রাকৃতিক সম্পদের ভারপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ) প্রভৃতি। সথীমিড মুখ্যত ক্রিপটোগামস (পুষ্প উৎপাদক নয়) শ্রেণীর উদ্ভিদাদি পর্যবেক্ষণ করেন। তামিলনাডের সমতলভূমিতে স্বাস্থ্য হানি ঘটায় তিনি নীলগিরি পর্বতে স্থানান্তরিত হয়ে ওটাকামণ্ডে বাসা বাঁধলেন। সেইখানে তিনি তামিল রচনাদি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করলেন এবং জার্মান গ্রন্থাদি তামিলে অনুবাদ করেন। তাঁর একটি অতি খ্যাত উদ্ভিদতাত্ত্বিক সমীক্ষা হল 'নীলগিরি' ফার্ণ। এই সমীক্ষার কথা সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 'লীনাইয়া' (৮ম খণ্ড, জুলাই ১৮৫১ খৃঃ) বিস্তারিতভাবে অধ্যাপক কুনে কর্তৃক বর্ণিত হয়। 'দি ম্যাডরাস জার্নাল অব লিটারেচার অ্যাণ্ড সায়ান্স' সথীমিড কর্তৃক লিখিত 'নীলগিরি' শ্যাওলা বিষয়ে একটি অতিরিক্ত সমীক্ষা (৫ম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৮৫৭) প্রকাশ করেন। এই সব সমীক্ষা ভারতীয় উদ্ভিদ তত্ত্বালোচনায় এক প্রবল প্রেরণা সঞ্চার করে। এবং যখন সথীমিড ৭০ বছর বয়সে কালিকটে পরলোক গমন করেন তখন তাঁর মৃত্যু ভারতীয় এবং জার্মান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক প্রচণ্ড ক্ষতি হিসাবে শোক প্রকাশ করা হয়।

আরেকজন যিনি মিশনারী কাজ কর্মের পরিধি অতিক্রম করেছিলেন তাঁর নাম ক্রিশ্চিয়ান ফ্রীডরিশ স্‌খওয়াৎ্স (১৭২৬-১৭৯৮), ইনিও ত্রানকুয়েবর অঞ্চলে কাজ করেছিলেন। হাল, পোলজেনহাগেন এবং হুটেমান প্রভৃতি অঞ্চলের সহযোগী মিশনারী বৃন্দ সহ তিনি ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে এদেশে আসেন এবং প্রায় এক দশক কাল এইখানে ছিলেন, পরে তিনি মূলভূমির দিকে আকৃষ্ট হয়ে আরো ভিতরে প্রবেশ করেন। 'দি সোসাইটি ফর প্রমোটিং ক্রিশ্চিয়ান নলেজ' স্‌খওয়াৎ্সকে তিরুচিরাপল্লী ত্রিচিনাপল্লীতে কাজের সুযোগদান করে এবং তিনি সেইখানে একটি স্কুল এবং গির্জা ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশনারীর খ্যাতি একজন দূরদর্শী পণ্ডিত ও শিক্ষক হিসাবে সকল ক্ষেত্রে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ইনি ইংরাজী শিক্ষার অনুকূলে ছিলেন এবং এই 'জার্মান স্বামিজী' সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। যখন সখওর্য়াৎস তানজোরের

পথে ত্রিচিনাপল্লী ত্যাগ করলেন তখন সেই দেশের অধিপতি রাজা তুলাজী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। ক্ষণিকের সেই সাক্ষাৎ তার নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হল। রাজা জার্মান মিশনারীর জন্য তানজোরে একটি চার্চ নির্মানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যাই হোক, অতি দ্রুত তহবিল নিঃশেষিত হল এবং সথাওয়ার্ৎস মাদ্রাজ অঞ্চলে অর্থসংগ্রহ করার উদ্যোগ করছিলেন এমন সময় ব্রিটিশ সোসাইটির ভারতস্থ সদর দপ্তর তাঁকে অচিরাৎ ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। মাদ্রাজে উপস্থিত হওয়ার পর তাঁর পুরোহিতের আচকান সাময়িক-ভাবে খুলে রেখে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের গাউন অঙ্গে তুলে দক্ষিণ-ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক মহীশূরের হায়দার আলির দরবারে পাঠানো হবে। যেহেতু এই দ্রাবিড় অঞ্চলে শান্তি বিঘ্নিত হয়েছিল বিস্মিত মিশনারী এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। তিনমাসকাল তিনি হায়দর আলির দরবারে একজন বন্ধু ও সম্মানিত অতিথি হিসাবে রইলেন। যখন তিনি সেই দেশ ত্যাগ করে আসেন তখন এই শাসক যাঁর আদবকায়দার খ্যাতি সুপরিচিত তিনি তাঁকে তিনশত টাকা পাথেয় স্বরূপ দিলেন। এ এক অস্বাভাবিক আচরণ বলা যায়। সৈন্যদলের যেসব অফিসার সথওয়ার্ৎসকে পথ প্রদর্শন করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, টাকাটা নিতে রাজী হলেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিনিধির সাফল্য সহাস্যে লক্ষ্য করলেন বটে তবে অর্থ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। পরিশেষে সথওয়ার্ৎস এই অর্থ তানজোরে একটি অনাথাশ্রম নির্মাণে ব্যয় করলেন। দক্ষিণ-ভারতে যে থমথমে ভাব চলছিল সেইখানে সথওয়ার্ৎসের এই শান্তি প্রচেষ্টা স্বস্তির অবকাশ এনে দিল। যাই হোক ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হায়দর আলির ইংরাজ এবং তাঁদের মিত্র হিন্দুদের সঙ্গে সংঘর্ষ নতুন করে বেড়ে উঠল। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে হায়দর আলির মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন টিপু সুলতান। অল্পকাল পরেই, ব্রিটিশ আবার এই মিশনারীকে তাদের দূত হিসাবে পাঠালেন নতুন শাসকের কাছে। যুদ্ধ চলা সত্ত্বেও সথওয়ার্ৎস বিরোধী শাসকের সদর দফতরে প্রবেশ করতে পারলেন কিন্তু তিনি এই দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। তথাপি সথওয়ার্ৎস এমনই এক শান্তির প্রবক্তা ছিলেন যে যুযুধানদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের পথ রচনা করলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের মাঙ্গালোর চুক্তি এই বিরোধের অবসানকে পাকা করল।

সথওয়ার্ৎস তানজোরে ফিরে এসে, সেইখানে একটি নতুন চার্চ নির্মান

করলেন। ভারত সম্পর্কে সুপরিচিত পর্যটন প্রদর্শক বা ট্রাভেল গাইড 'মারে' এই চার্চের কথা উল্লেখ করেছে। যেমনটি প্রসঙ্গত ১৯১৪-এ প্রকাশিত জার্মান পথিকৃত বিডেকার ভারত প্রসঙ্গে করেছিলেন।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে স্‌থওয়র্‌াৎস একটি নতুন শিক্ষন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করলেন যদ্বারা স্বদেশীভাষার উপর ইংরাজী ভাষা বিশেষতঃ ইংরাজী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রশিক্ষণের সুবিধা হল। স্‌থওয়র্‌াৎস প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমকালের মনোভংগী অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। যাইহোক, তাঁর তামিলনাদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত টি. বি. ম্যাকলের 'মিনিট অন এডুকেশনে'র প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল পূর্বের প্রাচীন। ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ভূমি যার ঐতিহ্য প্রায় প্রাগৈতিহাসিক সেই তামিলবাদে যে বৈদগ্ধ্যের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল তার পিছনে ক্রিশ্চিয়ান ফ্রিডরিশ স্‌থওয়র্‌াৎসের দানের পরিমান কোনো মতেই কম নয়। জীবনের শেষ কয়েক বৎসরে স্‌থওয়র্‌াৎস তামিল সাহিত্য পাঠে মনোনিবেশ করেন এবং রাজার দত্তক পুত্র সেরফোজীকে শিক্ষাদান করতেন। রাজার মৃত্যুর পর তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মাদ্রাজস্থ রাজ-পুরুষদের উৎকোচে বশীভূত করে সিংহাসন অধিকার করেন। সেরফোজীর দাবী উপেক্ষিত হল। স্‌থওয়র্‌াৎস তখন সেরফোজীর স্বপক্ষে আদালতে হাজির হলেন এবং দীর্ঘকালব্যাপী মামলার পর সেরফোজীর অনুকূলে মামলায় জয়লাভ করেন। এই কালের মধ্যে তাঁর নাম প্রায় প্রবাদে পরিণত। যখন স্‌থওয়র্‌াৎসের মৃত্যু হল তখন তাঁকে তাঁর গির্জার পাশে সমাধিস্থ করা হল। এই বেদীর অপর পাশে আজো তীর্থ পথিকরা এই মহান জার্মান গুরুকে স্বকৃতজ্ঞভাবে নির্বেদিত সেরফোজী লিখিত শ্লোক দেখতে পাবেন। ফ্লাকসমান কর্তৃক খোদিত সমাধি ফলকে দেখা যায় মরণোন্মুখ গুরুর হাত শিষ্য সেরফোজী ধরে আছেন। তথাপি সবচেয়ে মহৎ স্মারক হল সেরফোজী রচিত ইংরাজীতে লিখিত এই কবিতাবলী যার সাহিত্যিক ও মানবিক মূল্য অসীম। পাথরের উপর এই কবিতা উৎকীর্ণ আছে। ভারতীয় কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচনার প্রথম প্রচেষ্টার নমুনা। এইভাবে পীয়রসন তাঁর 'মেময়ার্স অব স্‌থওয়র্‌াৎস' নামক গ্রন্থে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করেছেন জার্মান যাজক এবং মিশনারীর কথা উইলকস তাঁর 'হিষ্ট্রী অব সাদারন ইনডিয়া' তাকে সম্মানিত করছেন এবং এঁর জীবনধারা বিশপ লিলজের 'দার কনিগ প্রীষ্টার' বা 'রাজার পুরোহিত' নামক গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। এইসব ভারতবর্ষে

আধুনিক সাহিত্যিক বাঁধ ভাঙার প্রেরণা এনেছে। সেরফজীর ইংরাজী কবিতা তার শিল্প কারুকলাবর্জিত সারল্যের জন্যই পাঠকচিত্তকে অভিভূত করে। সমাধি ফলকের লিপির ভূমিকার সঙ্গে এই কবিতা এইখানে উধৃতির দাবী রাখে।

"রেভারেণ্ড ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডরিক স্‌ওয়র্‌ৎস ; লণ্ডনস্থ অনরেবল সোসাইটি ফর প্রমোটিং ক্রিশ্চিয়ান নলেজ প্রতিষ্ঠানের মিশনারী। যিনি এই জীবন পরিত্যাগ করে গেছেন একাত্তর বছর চার মাস বয়সে ১৭৯৮ খৃঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, তাঁর পবিত্র স্মৃতিরক্ষিত :

ছিলে তুমি দৃঢ়,
অমায়িক অথচ প্রাজ্ঞ
সৎ, পবিত্র, মুখোসমুক্ত মানুষ,
অনাথের পিতা, বিধাতার সহায়
সব দুঃখের শান্তিদাতা।
হে আলোক পরিবেশক
হে মহান, যা সত্য, যা ন্যায়
সে দিকেই তুমি আলোকপাত করেছ।
রাজকুমার, সাধারণ আর আমাকে
দিয়েছ তুমি আশীর্বাদ।
হে পিতা, আমি যেন যোগ্য হতে পারি।
তোমার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী।
আপনার
সেরফোজী জানায় এ কামনা, এ পার্থনা।"

জার্মান-তামিল ব্যাকরণের গ্রন্থমালায়, বিশেষ করে হারমান বেথানের গ্রন্থটি পরিশেষে উল্লেখ প্রয়োজন। এই চমৎকার বিজ্ঞানাভিত্তিক ধারাবদ্ধ কর্মও ত্রানকুয়েবরের বাতাবরণে পরিপূরিত। বেথানের ব্যাকরণ জার্মান-তামিল গবেষণার উচ্চমান অক্ষুন্ন রেখেছে।

মিশনারী আদর্শে পূর্ণ হলেও তাঁর জীবন ছিল বৈদগ্ধের প্রাণরসে সমুজ্জ্বল। তাঁর শেষ পরিণাম অতি দুঃখজনক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষভাগে জার্মানীর যে সব অঞ্চলে সোবিয়েত সেনাবাহিনী প্রবেশ করেছিল সেইসব জায়গায় যেমনটি ঘটেছিল এখানেও অনুরূপ কাণ্ড ঘটে। সোবিয়েত সিক্রেট সার্ভিসের

লোকজন এসে একদিন হেরমান বেথানের দরজায় এসে করাঘাত করল তারপর তাঁকে নিয়ে চলে গেল। তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এই তাঁর অন্তিম সংবাদ।

বেথানের ব্যাকরণের ভূমিকাংশ সুরু হয়েছে দ্রাবিড় জনগণ সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা দিয়ে। তিনি হয়ত তাঁর তালিকায় বেলুচিস্তানে ব্রাহুইদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারতেন:

> "তামিল ভাষা—য়ুরোপীয়গণ গোড়ার দিকে যাকে 'মালাবারিয়ান' বলতেন—দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত। এই তালিকাভুক্ত ভাষাগুলির মধ্যে তামিলি ভাষার সম্পর্কিত লিখিত ইতিহাস থেকে যায় অতীত দ্রাবিড় কালের সঙ্গে এ ভাষা সংশ্লিষ্ট। সংরক্ষিত তামিল রচনাসম্ভার তার প্রতিবেশী ভাষাগুলির চেয়ে অনেক শতাব্দী প্রাচীন। এর পূর্বে ছিল আরও কয়েক শতাব্দীর সাহিত্যিক ক্রিয়াকাণ্ডের পরিচায়ক রচনাবলী। দুঃখের বিষয় সেই সব হারিয়ে গেছে। যাই হোক, গোড়ার দিককার সংরক্ষিত গ্রন্থাবলী থেকে বোঝা যায় যে সেইগুলি কি বিস্ময়কর উন্নততর মানের অধিকারী। সুতরাং দ্রাবিড় ধরণের ভাষার সারাংশ বিষয়ে কেউ কিছু জানাতে ইচ্ছুক হলে শুধু তামিল পাঠ দিয়েই তিনি কাজ সুরু করতে পারেন। দ্রাবিড় ভাষাগুলি অন্তত আশী মিলিয়ন জনগণ দ্বারা কথিত হয়ে থাকে। এ তাবৎ তাদের এক সমজাতিক শ্রেণী হিসাবে গ্রহণ করা হত এবং এই ভাবেই মানচিত্রাদিতে দেখানো হয়েছে। যাই হোক, এমন ধরণের সমজাতিক ভাষা নেই যা দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাদের এভাবে বহণ করে নিয়ে যায়। যাঁরা এই ভাষায় কথা বলেন তাঁরা বিভিন্ন নির্দিষ্ট জাতি গোষ্ঠীর অর্ন্তভূক্ত। ভাষার সীমানা কোনো জায়গায় এমনভাবে জাতীয় সীমানার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেনি। আজকাল আমরা ভারতের তিনটি প্রধান জাতির মধ্যে পার্থক্য বিচার করি ; উত্তর ভারতের বিরাট সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে বলি ইওরোপিড জাতি, এক অনুন্নত ইওরোপিড শ্রেণীকে প্যালিও ইওরোপিড বলা যায়, এদের প্রতিনিধিত্ব করে 'ওয়েডিডস'। এর মধ্যে আছে মধ্যভারতের পার্বত্য ও আরণ্য অঞ্চলের 'গোণ্ডি' আর 'মালদি'— এরা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। ভারতের

তৃতীয় জাতিগোষ্ঠী থাকে সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে, এদের বৈশিষ্ট্যকে বলে 'মেলানিড গোষ্ঠী' (কালো-ভারতীয়)। এই সব মেলানিডসরা ইথিওপিয়দের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই অবস্থার কথা ইতিপূর্বে হেরোদৎ লিখেছেন, কারণ তিনি এদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন 'ইথিওপিয়ানস অব দি ওরিয়েন্ট'—পূর্বাঞ্চলের ইথিওপিয়ান। যাই হোক অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে পারস্পরিক জন্ম সূত্রে এদের মৌলিক চিহ্নাবলী মুছে গেছে, শুধু কালো গাত্রবর্ণটুকু আছে। যারা তামিল ভাষায় কথা বলেন তাঁরা বেশীর ভাগ এই জাতিভুক্ত। এইসব জনগণের এই শ্রেণী বিভাগ যথা ওয়েডিড, মালিদ, এবং মেলানিড কাউন্ট এগন ফন আইকস্টেডটকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি মেলানিডগণের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে এই বৈপরীত্যমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হন—

"এই সব মানুষকে এখনও 'শ্বেতজাতি'র অন্তর্গত করা যায়। শুধু কালো রঙটুকু যা অন্তরায়।"

আরেকবার আমরা বেথান থেকে উধৃতি দিচ্ছি। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, ভারতের বাইরে যথা—বর্মা, মালয়, দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকায় যাঁরা থাকেন তাঁদের সুবিস্তারিত পরিবেশন সত্ত্বেও—তামিল তার মাতৃভূমিতেও কোনো রকম পার্থক্যের পরিচয় দেয় না—আবার একই সঙ্গে তিনি বলেন যে মালয়ালম ভাষার উৎপত্তি তামিল থেকে :

মালায়মকে তামিলের এক প্রাচীন বুলি বলা যায়। কিন্তু দুটি বিভিন্ন শিরোনাম, যথা—সেনটামিলানতু ও কোনটুনটামিলানাতু দুটি বিভিন্ন বুলির ক্ষেত্রগত পার্থক্যের পরিচায়ক ; একটি হল পবিত্র ধ্রুপদী তামিলের ভূমি, অপরটি হল সাধারন ভূমি 'কঠিন' তামিল। মাদুরা, প্রাচীন পানডিয়া রাজ্যের রাজধানী, এই অঞ্চলটিকে ধ্রুপদী তামিলের কেন্দ্রস্থল মনে করা হয়। প্রায় পৌরাণিক যুগে, মাদুরা ছিল সঙ্ঘের পীঠস্থান, রাজকীয় সাহিত্য বিভাগের কবিদের সংঙ্ঘ বিশেষ, এই সঙ্ঘের সর্বোচ্চ সম্মানিত সদস্য হলেন স্বয়ং শিব। এই সঙ্ঘ কঠিন নিয়মানুসারে স্থির করতেন কাকে কবি বলা হবে এবং কে কবি নয়। উপকথার ঐতিহাসিক ভিত্তি হিসাবে একটি সুনিশ্চিত তথ্য জানা যায় যে পাণ্ডের সম্রাটদের আনুকূল্যে বিশেষ

ভাবে সাহিত্য কর্মাদি সম্পন্ন হয়েছে। এইভাবে উচ্চ তামিল বুলির উন্নয়ন ঘটে। কবিত্বময় এই ভাষার এই সুসংস্কৃত ধারা থেকে যা প্রকাশিত হল তার নাম সেনটামিল, 'উত্তম তামিল', অথবা 'তেল্লু তামিল'। 'পরিবর্তিত তামিল'—একে আবার 'উচ্চমানের তামিল'ও বলা হয়। এই উচ্চমানের তামিল যা কোনোদিন সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় পরিণত হয়নি পরবর্তীকালের প্রজন্মের সকল কবিদের দ্বারা ছন্দে এবং মুক্তছন্দে (উরাই মন্তব্যাদি) লিখিত হয়েছে সাধারণ মানুষের প্রতি নজর না রেখেই। এর ফলে সর্বক্ষেত্রেই মূলের সঙ্গে ব্যাখ্যা সংযুক্ত করার প্রয়োজন হয়েছে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অর্থ দিতে হয়েছে, কারণ যারা অ-বিশেষজ্ঞ, বা পণ্ডিত নন, তাঁরা ঐ প্রাচীন এবং আংশিকভাবে কৃত্রিম ভঙ্গী থেকে কিছুই বুঝবেন না। জনগণের ওপর কবিতার প্রভাব এই কারণে হ্রাস পেয়েছে বলা চলে। যাই হোক প্রাচীন তামিল রীতির ঐতিহ্য এবং সেই সঙ্গে কিছুটা আধুনিক ভঙ্গীর প্রভাব কোনো প্রকারে প্রাচীন কবিতার সুখ-সম্পদের ধারাবাহিকত্ব ক্ষুন্ন করেনি। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ছান্দসিকরা ছিলেন, আজো হয়তো আছেন। এই সব চারণরা সুদূর গ্রামাঞ্চলে আজো প্রাচীন কবিতার মূল্যবান সম্পদ পল্লী-প্রাঙ্গনে পাঠ ও আবৃত্তি করে শোনান। শ্রোতাদের অধিকাংশই গ্রামবাসী এবং তাদের মধ্যে অনেকেই আবার অশিক্ষিত। এইভাবে কিছু প্রকাশভঙ্গী এবং উচ্চ তামিলের কিছু কিছু শব্দাবলী সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জ্ঞান বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। যখনই কোনো গ্রাম্য স্কুল-মাষ্টার, কিষাণ বা নাপিত কাব্য আকারে কোনো সাময়িক কবিতাদি রচনা করেন তখন সেনটামিলের সঙ্গে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করার দিকে তাঁর লক্ষ্য থাকে। এই সব সূত্র থেকে, উধৃতি, বাচনভঙ্গী, এবং আঙ্গিক আধুনিক ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে। যার জন্য ছাত্রদের উচ্চ রীতিমাফিক 'উচ্চতামিলে'র ব্যাকরণের সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে হয়।

এই দেশ, বরং এদেশের সাহিত্য, আরেকজন জার্মানকে অনুপ্রাণিত করে তাঁর নাম ফ্রিডরিশ রুকেট। ইনি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বকীয় চেষ্টায় একটি জার্মান-

তামিল অভিধান সংকলনে ব্রতী হন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়নি। দুঃখের বিষয় এই পাণ্ডুলিপি কখনও মুদ্রিত হয়নি। ৎসাইগেন-বালগের অপ্রকাশিত কাগজপত্রের মত এরও প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন।

আরেকবার কার্ল গ্রাউলের নাম উল্লেখ প্রয়োজন। ইনিই প্রথম জার্মান যিনি সুবিস্তারিত 'বিবলিওথেকা তামিলুকা' গ্রন্থের পরিকল্পনা করেন। দুঃখের বিষয়ে তাঁর অকাল মৃত্যুর ফলে এই তামিল গ্রন্থাবলীর মাত্র তিনটি খণ্ডের অধিক প্রকাশিক হওয়ায় বাধা সৃষ্টি হয়। যাই হোক এর দ্বারা তামিল ভাষার প্রতি ও তামিল সংস্কৃতির প্রতি জার্মানদের আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়।

কার্ল গ্রাউল ছিলেন লাইপজীগের প্রোটেষ্টাণ্ট লুথেরিয়ান মিশন ইনষ্টিট্যুটের প্রধান। ডানিশ বাণিজ্য ঘাঁটিগুলি অবলুপ্ত হওয়ার পর এই প্রতিষ্ঠান প্রাচীন ডানিশ-হাল মিশন ঘাঁটিগুলি গ্রহণ করেন। গ্রাউল কত গভীরভাবে তাঁর কর্মভার গ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সুগভীর পড়াশোনার মধ্যে। তাঁর 'বিবলিওথেকা তামুলকা'র প্রথম খণ্ডে দ্রাবিড় ভারতকে উত্তেজনাময় প্রকাশের গুরুত্ব ও সুযোগ বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেন :

> 'দর্শনের ক্ষেত্রে যেহেতু ঘনিষ্ঠভাবে সংস্কৃত এবং তামিলভাষা পরস্পরের পরিপূরক হয়েছে সেই কারণে আমি আমার তামিল গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডটিতে সেই সব রচনা দিয়ে পূর্ণ করেছি যা গোঁড়া বেদান্ত মতানুগ। এর প্রথমতম গ্রন্থ (দি ফ্রেস বাটার অব ব্লিস'—আনন্দের তাজা মাখন) মাদ্রাজবাসী দ্বারা কয়েকবছর পূর্বে মুদ্রিত হয়েছে। উচ্চতামিল পদ্যে মূলগ্রন্থ 'তাণ্ডবমূরতিস্বামিগেল' কর্তৃক রচিত, ইনি 'নারায়ণ দেশিকা'র শিষ্য, অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের মন্তব্যাদি করেছেন পুরেই জারুর অরুণ শালা-স্বামিগেল (চন্দ্রনদী—ত্রানকুয়েবরের নিকটস্থ পোরিয়ের)। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি 'পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ' সাধারণ তামিল্ গদ্যে রচিত, এর লেখক জনৈক ভিত্তিজারনি স্বামিগেল, তিনি একজন বৈদান্তিক এবং একজন নৈয়ায়িকের মধ্যে একটা সংলাপ জুড়ে দিয়েছেন, প্রথমোক্তের সুবিধার জন্যই তা করেছেন। 'ফ্রান্সোনিয়ান'রা এই পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত হয়েছেন তাই মনে হয়—এ নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই গ্রন্থও দেশীয়

জনগণ কয়েকবছর পূর্বে দিস্কিগাল প্রেসে মুদ্রিত করেছেন। দুঃখের বিষয় এই সংস্করণটি অজস্র প্রমাদে পরিপূর্ণ। আমার কাছে একটি মূল পাণ্ডুলিপি আছে, সেটিও এর চেয়ে কিন্তু ভালো নয়। সতর্কতার সঙ্গে উভয় গ্রন্থ মিলিয়ে দেখে আশাকরি প্রকৃত অর্থভেদে হয়ত আমি সমর্থ হয়েছি। এই মূলগ্রন্থের অনুবাদ মুখ্যতঃ প্রথম পাণ্ডুলিপির অধিকতর ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে তাই আমি সামান্য পরিবর্জন এবং সংক্ষেপ করণে অধিকারী মনে করি। বিশেষতঃ প্রথম পরিচ্ছেদে—মাঝে মাঝে সংলাপের ভঙ্গীতে প্রয়োগ করেছি।

১৭৫ পৃষ্ঠায় যা লিখিত আছে তার থেকে তৃতীয় ক্ষুদ্র পাণ্ডু-লিপিটির অবস্থা পাঠক সহজে অনুধাবন করবেন। আমি এইটিতে এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছি যারা বেদান্ত দর্শন বিষয়ে নিজেদের সংক্ষিপ্ত ভাবে গড়ে নিতে চান তাঁদের সুবিধার্থে। সংস্কৃত মূল গ্রন্থ য়ুরোপে সম্ভবতঃ কম সংখ্যক মানুষের আয়ত্তে আসা সম্ভব তাই আমি এই গ্রন্থ তেলেগু লিপি থেকে অনুবাদ করেছি তা রোমান লিপি থেকে গ্রহণ করে মুদ্রিত করেছি। (হাবেরলিন সর্বপ্রথম তাঁর কাব্য-সংগ্রহ (কলিকাতা, ১৮৪৭) গ্রন্থে এটি মুদ্রিত করেন। আমি হাবেরলিন পাঠের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরটি যোগ করেছি, সাধারণভাবে অন্য পদ্যাংশের মত এটি তত সুন্দর নয়।)

'কুরাল' নামক গ্রন্থ, তামিল চর্চা কারক প্রথম জার্মান পণ্ডিত যে বিষয়ে জার্মানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর নাম কার্ল গ্রাউল, 'বিবলিওথেকা তামুলকা'র তৃতীয় এবং শেষ খণ্ডে এটিকে তিনি সংযুক্ত করেন। এই খণ্ড ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লাইপজিগে ভারতের বন্ধুদের কাছে উপহার দেওয়া হয় তখন তার শিরোনাম ছিল—'তিরুভাল্লাভরের কুরাল' এবং মানব সত্তার তিনটি লক্ষ্য বিষয়ে একটি অর্থব্যাঞ্জক কবিতা।

আলবার্ত সোয়াইৎসার ছিলেন 'কুরালে'র একজন উৎসাহী পাঠক। তিনি এই গ্রন্থকে (সোয়াইৎসার বল্‌তেন কুরূরাল) অতীন্দ্রিয় কর্মাদি থেকে উদ্ভূত এবং প্রেম পরিপূরিত। তিনি এই গ্রন্থকে বার বার সর্বত্র খ্যাত 'গীতা'র ও ওপরে স্থান দিয়েছেন—

যে সক্রিয় প্রেমের স্বর্গীয় ভাবাদর্শ আমাদের অজস্র কাহিনী গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে দেখতে পাই ভারতীয় লোক-তান্ত্রিক গ্রন্থে তা বেশ আগে থেকেই বর্তমান দেখা যায়। সর্বোপরি 'কুর্‌রালে'র মধ্যে যা পাই সম্ভবতঃ আমাদের দ্বিতীয় শতাব্দীতে তা রচিত।

কুররাল ১৩৩০টি শ্লোকের সংগ্রহ, এইগুলি দোঁহার আঙ্গিকে রচিত। এই বাণী তন্তুবায় তিরুবল্লভর কথিত। তবে এই পদকর্তা সংক্রান্ত বিষয়টি এইভাবে বুঝতে হবে যে সবগুলি পদ তিরুবল্লভরের একার রচনা নয়। তবে তিনি জনগণের প্রাচীন সম্পদ থেকে অনেকগুলি শ্লোকের প্রতিলিপি করেছিলেন। কুররালের অর্থ সংক্ষিপ্ত স্তবক। তিরুবল্লভর ঠিক একটা যথাযথ নাম নয় তবে দক্ষিণ ভারতে নিম্নশ্রেণীর জনগণের মধ্যে যে সব ধর্মীয় গুরুরা কাজ করেন তাঁদের উপাধি বিশেষ।

এই রচনাবলী তামিলভাষায় রচিত। কানারিজ ভাষার মত (যে ভাষাও দক্ষিণ ভারতের) এই ভাষা আদিম ভারতীয় ভাষা (দ্রাবিড়) ইন্দো-এরিয়ান গোষ্ঠীর অর্থগত নয়···

কুররাল আর চার শতাব্দী আগেকার মনু-র ধর্মশাস্ত্রে কি প্রভেদ। ব্রাহ্মণ মনোভংগী শাসিত মনুর ধর্মশাস্ত্র পৃথিবী এবং জীবনকে পাশাপাশি সহন করার নীতি মেনে চলে জগৎ এবং জীবনকে অস্বীকার করে। কুররালে জীবন ও জগতের অপহ্নব দূর আকাশের মেঘের চেয়ে অধিক নয়। গ্রন্থের শেষের দিকে ২৫০টি নীতিকথার মধ্যে ঐহিক প্রেমের প্রশংসা করা হয়েছে। পরবর্তী যুগে এর ব্যাখ্যা হয়েছে অন্যভাবে, কারণ এইসব শ্লোক আপত্তিকর মনে হয়েছে। তাই ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয়েছে এর মধ্যে আছে আত্মার ঈশ্বরপ্রেমের রূপক। মনু-র ধর্মশাস্ত্রের মত কুররালের নীতিকথার মধ্যে পুরস্কারের ভাবাদর্শ বর্তমান। সদ্‌গুণের পথ গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ তদ্বারা উত্তম জন্মান্তর হয় বা পুর্ণজন্ম থেকে প্রাণ পাওয়া যায়। এর পাশাপাশি আবার একটা অকপট মনোভংগীও পাওয়া যায় —চীনা নীতিবাদে এইভাবে তীব্র করা হয়েছে—তাতে দেখা যায় যে নীতিগত আচরণে পার্থিব সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়—দুর্দশার

পিছনে আছে নীতি হীনতা। যাই হোক নীতিকথা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে, বৌদ্ধধর্মে বা ভাগবদ্‌গীতায় যে রকম ফলপ্রসূ বলা হয়েছে কুররালের নীতিকথা তা নয়। ইতিমধ্যেই এর মধ্যে এই প্রতীতি পাওয়া যায় যে মঙ্গলের প্রয়োজনেই সৎকর্ম করা দরকার। এই প্রতীতি কিছু নীতি বাক্যের পাওয়া যায়…অথচ ভাগবদ্‌গীতা সক্রিয় জীবনে অধ্যবসায়ের কথা বলেছেন জোর করে এবং শীতল ভঙ্গীতে বলেছেন এই হল জাগতিক নিয়ম। কিন্তু কি প্রগতি—কুররাল এর সমর্থনে যুক্তি দিয়ে বলেছেন এ সব নীতিগত কর্ম করার ফল। কর্ম এবং জীবিকা মানুষকে সৎ হতে সমর্থ করে। কুররালের মতে কর্তব্য শুধু ভগবদ্‌গীতায় যা বলেছেন তা নয়, জাতিজাতভাবে করণীয় তা নয়, প্রকৃতপক্ষে সবকিছু যা কল্যাণকর।

কুররালের জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের মধ্যে যে দৃঢ়তা আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় কর্মের আনন্দের মধ্যে যা কদাচিত ভারতীয়দের মুখ থেকে শোনার আশা করা যায়।… বুদ্ধ এবং ভাগবদ্‌গীতার মত, কুররাল জগৎ থেকে আভ্যন্তরীন মুক্তির দাবী করে এবং ঘৃণহীনতার দর্শনে বিশ্বাসী। ঐ দুই নীতির মতো কুররাল অনুশাসন দিয়েছেন কাউকে হনন করোনা, কারো ক্ষতি করো না। জগৎ এবং জীবনের অপহ্নবের সমস্ত মূল্যবান নৈতিক ফলাফল কুররাল গ্রহণ করেছে। এবং এই আধ্যাত্মিক নীতির সঙ্গে যোগ করেছে প্রেমের জীবন্ত নীতি…

অতি সহজ ভঙ্গীতে কুরাল সরল ও নৈতিক মানবতাবাদের এক চিত্র এঁকেছেন। মানুষের আচরণ বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নের কথা কুররাল বলেছেন—নিজের এবং জগতের প্রতি সংবেদনশীলতা অথচ সহানুভূতি সহকারে সবকিছু আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। বিশ্ব সাহিত্যের ভোগে গ্রন্থে এত সুন্দর নীতিকথার সমাবেশ কদাচিৎ দেখা যায়।…

অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে প্রথমতম বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ ক্রাঙ্কোনিয়ান অঞ্চলে সুরু হয়। এ. এফ ধীমেয়ার 'পোয়েমস এ্যাণ্ড মাক্‌সিমস অব তিরুবল্লভর' নামে একটি প্রবন্ধ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ন্যুরেমবার্গে প্রকাশ করেছেন। এতদ্বারা

জার্মান পাঠক তাঁর নিজের ভাষায় তামিল রচনার স্বর্ণ যুগ সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারবেন—মাদুরার কবিদের সমাবেশ বা সঙ্গম সম্পর্কে ধারণা করা সহজ হবে।

উপকথায় বিজড়িত কালটির বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন ডব্লু. গ্রায়েফে, এই অধ্যাপক ভারতে কাজ করেছেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় (লিজেনডস এণ্ড মাইলষ্টোনস্ ইন দি হিসট্রি অব তামিল লিটারেচার—ইন পি কে গোদে কমিমরেশন ভল্যুম)। গ্রায়েফে সঙ্গম যুগের চরমতম বিকাশ ছয় থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে ঘটেছে মনে করেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রায়েফে আরেকটি পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করেন, তামিল সাহিত্যের আরেকটি দলিল জার্মান ভাষায় সংযোজিত হয়: নান্নুল।

অতএব, তামিল গবেষণা দীর্ঘকাল জার্মানীতে আশ্রয় পেয়েছে। মাঝে মাঝে সাধারণকে অতিক্রম করে উঠেছে যে সব গ্রন্থাদি তার দ্বারা বোঝা যায় এই গবেষণা কতদূর সার্থকতা লাভ করেছে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে "প্রোলেগোমেনা জু পাট্টানাট্টু পিল্লাই ইয়ারস পাদাল" এইচ. নাউ কর্তৃক ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পরিবেশিত হয়। এই বিশ্লেষণধর্মী সমীক্ষায় ৎসাইগেনবাল্‌গ এবং গ্রাউলের রচনাবলীর সুযোগ্য ধারাবাহিকত্ব রক্ষিত হয়।

তথাপি তামিলভাষা ব্যতীত, দক্ষিণ-ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে জার্মান গবেষণা অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষা বিষয়ের প্রতি প্রযুক্ত হয়। তেলেগু, মালায়ালাম ও কানারিজ (তুলু-সহ) প্রভৃতি সব ভাষা এমন সব দোভাষী পেয়েছিলেন যাদের দেশ আচেন (এইকস-লা-চ্যাপেল) ও পূর্ব-প্রাসিয়ার কোনিগসবার্গের মধ্যে অবস্থিত।

তেলেগুর ক্ষেত্র বিষয়ে গবেষণাকারী প্রথম দিকের একজন জার্মান গবেষক হলেন সথুলৎস (আনুমানিক ১৬৯০-১৭৬০) ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই সাহিত্য বিষয়ে একটি লাতিন সমীক্ষা প্রকাশ করেন, সেই গ্রন্থটির নাম— 'কনসপেকটাস লিটারেচার তেলুজিয়ে, ভল্‌গো ভারুগিকে (তেলেগু সাহিত্যের সারাংশ, যার অপর নাম ভারুগিক)।

জার্মান তেলেগু গবেষণার আরেকজন প্রবক্তা হলেন জে. সি. এফ. হেয়ার। তিনি বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশভুক্ত গণ্টুরে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে এসেছিলেন।

ধর্মীয় কর্মজীবন সত্ত্বেও তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক পঠন-

পাঠনে কখনও অবহেলা করেন নি। তিনি সম্ভবতঃ করমণ্ডল উপকূলের বুলিতে রচিত ধর্মীয় গীতি ও গদ্য রচনাদির জন্য অধিকতর পরিচিত। তিনি এই দ্রাবিড় ভাষা রীতি বা ইডিয়ম গভীরে প্রবেশ করে তার অন্তর্নিহিত ভাব এবং সারমর্ম গ্রহণ করেন যার ফলে তিনি সেই দেশীয় লেখকদের মতো অনায়াস ভঙ্গীতে কবিতাদি রচনা করেছেন।

প্রথম যে জার্মান পণ্ডিত উল্লেখযোগ্যভাবে মালায়ালাম চর্চা করেন তার নাম যোহান আর্নিষ্ট হ্যানকস্লেডেন (১৬৮৯-১৭৩২)। ফাদার পলিনস এ স্যাংটো বার্থালোমিউ তাঁকে সর্বোত্তম সংস্কৃত পণ্ডিত বলেছেন। ভারতের এই পবিত্র ভাষা বিষয়ে তাঁর সুগভীর জ্ঞানের আজ পর্যন্ত কোনো যুরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা যায়নি। তথাপি পলিনসের জন্মের কালে হ্যানকস্লেডেনের মৃত্যুর ষোলো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। হ্যানকস্লেডেন যখন য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতচর্চা শিক্ষার কাজ সুরু হয়নি তখনকার কালে হ্যানকস্লেডেন প্রকৃতপক্ষে একজন মহান ভারততাত্ত্বিক হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন। এইভাবে প্রোটেষ্টাণ্ট এবং ক্যাথলিক মিশনারী বৃন্দ হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তারিত ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সম্পদ বিষয়ে আপনাদের সংযুক্ত করেছিলেন।

হ্যানকস্লেডেন ছিলেন একজন ক্যাথলিক মিশনারী, তাঁর নাম ভারতে আজো স্মরণীয় হয়ে আছে, বিশেষতঃ কেরালায়। দক্ষিণ-পশ্চিম উপদ্বীপের মালায়ালামভাষী অঞ্চলের লোকজন আজো তাঁকে সশ্রদ্ধ চিত্তে 'আরনোস পাদ্রী' বলে উল্লেখ করেন। প্রথম মালায়ালি ব্যাকরণ প্রনয়ণ করে হ্যানকস্লেডেন ঠিক সেই জাতীয় পথিকৃতের কাজ করেছেন মালাবার উপকূলের প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে ঠিক যেমনটি করেছিলেন ত্রানকুয়েবরের মিশনারীবৃন্দ। ১৭০১-থেকে ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হ্যানকস্লেডেন কেরালায় বাস করেছেন এবং মালায়ালাম ভাষায় কবিতা রচনা করে শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তিনি 'পাথেনপানা' বা যীশুখ্রীষ্টের জীবন কথা প্রায় এক সহস্র শ্লোকে রচনা করেন, এ ছাড়া 'পর্বাঙ্গল' নামক আরেকটি ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন যার মধ্যে মানুষের অন্তিম পরিণাম আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে এই শেষোক্ত রচনাটির বারবার পূর্ণমুদ্রণ হয়েছে—দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভেরাপোলি এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এর্নাকুলমে সংস্করণ হয়েছে। ভালিয়া কোয় থাম্পুরণ কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের প্রাক্তণ রাজাদের দেশের প্রখ্যাত সাহিত্য অধিকারিক। ভালিয়া

কোর থাম্পুরণ মনে করেন মালয়ালাম ভাষারীতির প্রকাশভঙ্গী এবং রচনা শৈলী বৈশিষ্ট ও সৌন্দর্যে এই রচনাকে শুধু মাত্র এজহুথাচানের 'ভারতম' অতিক্রম করতে পেরেছেন।

এইমাত্র পলিনস এ স্যাংটো বার্থোলোমিউ উল্লিখিত হয়েছেন। এই কার্মেলিটান সাধু যাহান ফিলিপ ওয়েসডিন এই নামে অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত ম্যানেরড্রোফ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন (১৭৪৮-১৮০৬)। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হোলি অর্ডারে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে তিনি রোম নগরে গমন করেন। অনেকদিন ধরে প্রাচ্য দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য অপেক্ষা করে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর স্বপ্নের জগৎ মালাবার উপকূলে যাত্রা করেন। এইখানে তিনি চৌদ্দ বছর কাল বাস করেছেন। পোপ তাঁকে ভিকার জেনারেল এবং এপোষ্টলিক ভিজিটেটর হিসাবে নিয়োগ করেন। ফাদার পলিনসের সর্বশ্রেণীর জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। পরে তিনি একটি ভ্রমণ কথা রচনা করেন। এই গ্রন্থ পোপকে তিনি উৎসর্গ করেন। এই কারণে, গ্রন্থটি ইতালীর ভাষায় রচিত লেখক আপনাকে ফ্রা পাওলিনো দা এস বারটোলোমিউ নামে পরিচিত করেছেন। এই নামেই তাঁকে অধিকাংশ সময় উল্লেখ করা হয়। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর গ্রন্থ "ভিয়াগিগয়ো আল ইনডি ওরিএনতালি" রোমে প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত পণ্ডিত ও পর্যটক যোহান রাইনহোলড ফরষ্টার-এর পুত্র জর্জ ফরষ্টার জার্মান ভাষায় অনূদিত "শকুন্তলা" ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে আমাদের এই উপহার দেন। সেই গ্রন্থে এই সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে যে ফাদার পলিনস 'জার্মান ভাষাও পড়েন'। ফরষ্টার জানতেন না যে ইতালীর লেখকের নামের পিছনে একটি জার্মান নাম প্রচ্ছন্ন আছে। তিনি ভূমিকায় লিখছেন :

> এই গ্রন্থটি বিশেষ ভাবে প্রশংসা করা যায় এই কারণে যে এ গ্রন্থের লেখকের তামূল এবং মালাবারিয়ান বুলিতে অধিকার আছে। এছাড়া এবং এই ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে তিনি এত সুন্দর ভাবে কঠিন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেছেন যে তিনি সেই ভাষার একটি ব্যাকরণও রচনা করেছেন। এছাড়া তিনি ফরাসী ও ইংরাজী জানেন এবং কতকগুলি উধৃতি থেকে জানা যায় তিনি জার্মানও জানেন। ভারতবর্ষীয় ভাষা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান থাকায় তিনি দেশ, শহর, পর্বত, নদী ইত্যাদির নাম আমাদের এতকাল যা জানা ছিল তার চেয়ে অধিকতর নির্ভুল ভাবে জানেন।

এই ভূমিকা থেকে জানা যায় যে অনুবাদকরা মূল গ্রন্থকারদের বিষয়ে কত অল্প তথ্য জানতেন অথচ তাঁরা এইসব গ্রন্থকারদের জন্য বিরাট পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। এই ভ্রমণ কথায় প্রকৃতপক্ষে প্রচুর ভৌগলিক, আঞ্চলিক, পরিসংখ্যান গত ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তথ্যাদি পরিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে ধর্মীয় আচার-আচরণ, আইন, জাতি, বর্ণ এবং ভাষা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গীত, পঞ্জিকা, আইন, রীতি-নীতি, ঔষধ, ভেষজতত্ত্ব, জন্ম এবং শিক্ষাব্যবস্থা আবার সেই সঙ্গে হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে অনেক মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

ফাদার পলিনস অতি সত্বর ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার আস্থাভাজন হন। তিনি যেখানে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নের আলোচনা করেছেন সেইখান থেকে একটি অংশ উধৃত করছি কারণ এর মধ্যে ফাদারের ভাষা শিক্ষা বিষয়ে ও শিক্ষক হিসাবে কাজ করার আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাবে:

> সম্রাট যখন ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে নৌযুদ্ধ বিষয়ে আমাদের কয়েকটি সাধারণ প্রশ্নের জবাব দিয়ে তিনি আমাকে বিশেষভাবে জানতে চাইলেন আমি কতদিন মালাবারে আছি এবং কিভাবে মালায়ালি ভাষাটি এমন সহজে আয়ত্ত করতে পেরেছি। রাজা আরও বললেন, তিনি লক্ষ্য করেছেন অন্য সব য়ুরোপীয়গণ হয় কিছুই বোঝেন না নয়ত প্রকৃত উচ্চারণ রীতি জানা না থাকায় তাঁরা এমনই অস্পষ্ট ভঙ্গীতে কথা বলেন যে তাঁদের কথার মর্মগ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই কথার জবাবে আমি বললাম, আমি খুব মনোযোগ সহকারে অমর সিংহের ব্রাহ্মণ গ্রন্থ পাঠ করেছি। এই কথায় সম্রাটের চিত্তে অসাধারণ চমক সৃষ্টি হল। বলেন কি? আপনি আমাদের রচনাদিও পাঠ করেন? এই রাজার আমার প্রতি এই সহৃদয়তা এবং বিশ্বাস আমার সমগ্র মালাবার অবস্থানের কালে অক্ষুন্ন ছিল। তিনি তার প্রজাগণের রচনা এবং ধর্ম বিষয়ের একজন মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এখন যখন দেখলেন যে য়ুরোপীয়গণও বেশ ভালোভাবে সেইসব গ্রন্থাদি পড়াশোনা করছেন তখন তাঁর কাছ থেকে পরবর্ত্তী কালে এমন সব অনুগ্রহ পাওয়া গেল যার ফলে খ্রীষ্টধর্মের প্রভূত উপকার হল।...

এরপর রাজা মালাবারি রীতিতে রান্না করা রাজ কোষাগার

থেকে তার জন্য অর্থ ব্যয় করে আমার জন্য কয়েক পাত্র খাদ্য সামগ্রী জনৈক ব্রাহ্মণ, যিনি তাঁর মুখ্য অমাত্য তাঁকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। এই অন্যান্যসাধারণ অনুগ্রহ শুধু সেই সব লোকের প্রতি প্রদর্শিত হয় যাঁদের প্রতি মহারাজ আপনার শ্রদ্ধার সবিশেষ নিদর্শন প্রদান করতে চান।

মহারাজা ইংরাজী শিখছেন কয়েকমাস ধরে আর ভালো বলতেও পারেন। এখন আমাকে মালাবারি ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই বেশ দক্ষ বুঝে তাঁর মুখ্য অমাত্য পায়ামপল্লী কুরিপুকে আমার কাছে পাঠালেন সন্ধ্যার দিকে এবং অনুরোধ জানালেন আমি যেন তাঁকে মালাবারি ভাষায় ইংরাজী ব্যাকরণের 'পার্টস ওরেশনিস'-এর আটটি সূত্র বুঝিয়ে দিই। কারণ তিনি এখনও ঠিক বুঝতে পারছেন না। তাঁর অবশ্য একজন ইংরাজী শিক্ষক আছে কিন্তু তিনি এইসব গঠনগত প্রকাশভঙ্গী ঠিক ঠিক মালাবারি ভাষায় বুঝিয়ে দিতে পারেন না। আমি তৎক্ষণাৎ সেইগুলি কাগজে দুটি বিভিন্ন স্তম্ভে পাশা-পাশি সাজিয়ে মালাবারি এবং ইংরাজীতে লিখলাম।

আমার এই ব্যাখ্যা মহারাজের কাছে বিশেষ বোধগম্য হল। এরপর থেকে তিনি আমাকে বরাবর গুরু বা শিক্ষক বলে সম্বোধন করতেন। তিনি আমাকে তাঁর দরবারে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু চতুর ব্রাহ্মণরা তাঁকে তৎক্ষণাৎ নিরস্ত করল। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মাত্তিনকেরার শিবমন্দিরের পরিচালকবৃন্দ মিশনারীদের ধান বুনতে অনুমতি দিলেন না। এই জমি পূর্বে তাঁদের কাছ থেকে ইজারা নেওয়া হয়েছিল। এত অল্প নোটিশে আর কোনো জায়গা সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায় মিশনারীরা কোচিনের শাসনকর্তার কাছে অভিযোগ পেশ করলেন। যাই হোক, দেখা গেল ঐ সব জমির মালিক ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা সুতরাং কোচিনের গভর্ণর মিঃ ভ্যান এ্যাংগেলবেক এই ব্যাপারে কোনকিছু করতে পারলেন না। সুতরাং তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন দ্বিতীয়বার পদ্মনাভপুরমে যাত্রা করতে সেখানে গিয়ে মহারাজের কাছে আবেদন করে পুর্ণনবীকরণের অনুমতি নিতে। এই কারণে তিনি আমাকে কিছু সুপারিশ পত্রাদি সঙ্গে দিলেন। ২১শে এপ্রিল তারিখে আমি পদ্মনাভপুরমে পৌছলাম। আমি সঙ্গে করে মালাবার-পোর্তুগীজ-ইংরাজী ব্যাকরণ এনেছিলাম। আমি এই গ্রন্থ চিরাত্তিআত্তিতে রচনা করেছিলাম। মহারাজ আমাকে এইভাবে গ্রন্থটি প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন কারণ তাহলে তাঁর

অমাত্যদের পক্ষে মালাবারি ভাষার মাধ্যমে পোর্তুগীজ শিক্ষার সুবিধা হবে। মহারাজ আমার আগমণবার্তা শোনামাত্র আমার কাছে পদ্মনাভেনপুল্লা ও পায়েমপল্লী কুরিপুকে পাঠালেন। এই দুই তরুণ অমাত্যের প্রতি আদেশ ছিল আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে মহারাজের সঙ্গে দর্শন ঘটিয়ে দেওয়া। আমি দেখলাম মহারাজ বারান্দায় বসে আছেন অর্থাৎ তাঁর প্রাসাদের অলিন্দ, তিনি একটি পারস্যদেশীয় কার্পেটের উপর আসীন। তার একটি হাত স্বর্ণ কারুকার্যখচিত একটি ভেলভেটের তালিয়ার উপর ন্যস্ত। আমি তাঁর হাতে আমার ব্যাকরণ দিতে তিনি অবর্ণনীয়ভাবে আনন্দিত হলেন। আমার উপস্থিতিতে উপরিল্লিখিত দুই অমাত্যকে ডেকে পাঠান হল, আমার ব্যাকরণটি তাঁদের দেখালেন। উপদেশ দিলেন ভালোভাবে ব্যাকরণটি পাঠ করতে। রাজকুমার এবং মন্ত্রীদের পক্ষে এই ভাষাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বিশেষ প্রয়োজন, কারণ য়ুরোপীয়দের সঙ্গে নিরন্তর সংযোগ রক্ষা করতে হবে। এই উপলক্ষ্যে মহারাজ আমাকে একটি স্বর্ণ বলয় উপহার দিলেন, একটি সোনার কলম, তাই দিয়ে তালপাতার উপর লিখতে হয়। আর একটি ক্ষুদ্র ছুরিকা, এই ছুরি দ্বারা তালপাতা ঠিকমত কাটতে হয়। পারুরের সরকারী কর্তাদের নামে তিনি একটি পত্র দিয়ে তাঁকে নির্দেশ দিলেন আমাকে রাজদরবারের তুরগ সওয়ার হিসাবে তিনি নিযুক্ত করেছেন। এই সমস্ত উপহার সামগ্রী আভ্যন্তরীন বস্তুগুলি তেমন মূল্যবান নয় বটে, কারণ এর দাম হবে বার সেকুইনো; কিন্তু অন্তদিক থেকে তার মূল্য অপরিসীম কারণ মহারাজ শুধুমাত্র গুণী ব্যক্তিদের এইসব উপহার দিয়ে থাকেন। সমগ্র মালাবারে কেউ এ সব দ্রব্য মহারাজের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এই সব সম্মান দ্রব্য ঠিক যেভাবে রিবন বা রাজকীয় মর্যাদাবলী য়ুরোপীয় রাজন্যবর্গ দেওয়া হয় তারই সমতুল। যাদের এইসব দ্রব্য দেওয়া হয় তাঁরা কিছু কিছু সুবিধা ভোগ করে থাকেন। যথা রাজপুরুষরা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো রকম আইনগত ব্যবস্থা মহারাজের অনুমতি ব্যতিরেকে নিতে পারেন না। তারা যে কোনো স্থানে রাজপথ ব্যবহার করে যেতে পারতেন। তাদের পক্ষে মন্ত্রীদের গর্ভগৃহে অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তাঁরা কাউকে সম্মান প্রদর্শন করে আসন ছেড়ে উঠবেন না—এই জাতীয় আরো অনেক কিছু।

ফাদার পলিনস শুধু যে মালাবারিয়-ইংরাজী-পর্তুগীজ ব্যাকরণ রচনা করেছেন তা নয়, তিনি একটি সংস্কৃত ব্যাকরণও প্রণয়ন করেন। 'সিধরুবম'

নামে এই ব্যাকরণটি ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে রোম নগরে প্রকাশিত হয়। যাই হোক এই গ্রন্থ দেবনাগরী লিপির পরিবর্তে তামিল লিপিতে রচিত।

আমরা লাতিন ভাষায় আরো অনেকগুলি গ্রন্থ রচনার জন্ম ফাদার পলিনাসের কাছে ঋণী। ক্রিশ্চান ভারত, ব্রাহ্মণদের রীতি-নীতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর ভ্রমণ কথায় তিনি লাতিন ও সংস্কৃতের মধ্যে যে ঐক্যভাব দেখা যায় তার উল্লেখ করেছেন। এর সঙ্গে অনুবাদক লাতিন-লিথুনিয়ান ভাষার সংযোগের কিছু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফাদার পলিনাস ভাষাবিদ্ হিসাবে সংস্কৃতের বয়স এবং প্রাচীন ইরাণী ও জার্মান ভাষার সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে একটি সমীক্ষা প্রস্তুত করেন। এই ভাবে যোহান ফিলিপ ওয়েসডিন বা ফাদার পলিনাস ইন্দো-জার্মান তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের একটি সমীক্ষা রচনা সুরু করেন। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি একজন পথিকৃৎ।

মালায়ালাম ভাষা বিষয়ক আরেকটি ব্যাকরণ প্রকাশ করেন ডাঃ হারমান গুনডারট। এই ভাষায় এইটি প্রথমতম সম্পূর্ণ ব্যাকরণ। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মাঙ্গালোরে প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয় সংস্করণটিও ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মাঙ্গালোরেই প্রকাশিত হয়। হারমান গুনডারট 'মালয়ালম-ইংলিশ ডিক্সনারী'র সম্পাদক। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সেই শহরেই বাসেল মিশনের সি. ষ্টোলজ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

হারমান গুনডারট (১৮১৪-১৮৯৩) বাসেলের একটি অতি সুপরিচিত প্রোটেষ্টাণ্ট মিশন সোসাইটির সদস্য ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি মালয়ালাম, টুলু ও কানারিজ ভাষী অঞ্চলের কেন্দ্র হিসাবে মাঙ্গালোরকে নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। কেরালার জনগণ আজো গুনডারটকে তাদের ব্যাকরণ ও অভিধানের জনক বলে জানেন।

দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর চতুর্থ ভাষা কানাড়া বা কানারিজ ভাষা অন্য তিনটি ভাষার মত প্রীতিভরে জার্মান পণ্ডিতগণ শিক্ষা করেছেন। এফ. কাইটেল প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনারী এই অঞ্চলটিকে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার কেন্দ্র করার জন্য বিশেষ কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন।

এফ. কাইটেল একজন খেয়ালী মানুষ, এবং অভিধান রচনায় তাঁর আগ্রহ ছিল। কয়েক দশক ধরে নিরন্তর ধারাবাহিক রূপে সংকলন কার্য করে তিনি একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। কেরালার গুনডারটের গ্রন্থের মত তাঁর গ্রন্থটি

আজো অপরাজেয়। কাইটেলের কানাড়া-ইংরাজী অভিধান মাঙ্গালোরের বাসেল মিশনের গ্রন্থাগার থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই জায়গাটি দক্ষিণ কানাড়ার কেন্দ্রস্থল। এই চমৎকার গ্রন্থটিতে ১৭৫২ পৃষ্ঠা আছে এবং বাসেল ও লাইপজীগে মুদ্রিত। শুধু ভূমিকাংশটি পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী। সমগ্র গ্রন্থটিতে বৈজ্ঞানিক ভঙ্গীতে সংহতভাবে দ্রাবিড় ভাষা গবেষণার বিষয় বিধৃত। সংস্কৃত-দ্রাবিড় শব্দঘটিত সম্বন্ধ বিষয়ক প্রশ্নে দৃষ্টান্ত হিসাবে নিম্নাংশ পড়া যায়:

> কানাড়া সংস্কৃত থেকে অনেক শব্দ ধার নিয়েছে হয় প্রকৃত আকারে নয়ত তদভর আকারে, এবং এটি সর্বজনজ্ঞাত সত্য, সংস্কৃত অভিধানে কিছু পরিমাণে দ্রাবিড় শব্দ আছে জার্মান ওরিয়েন্টাল সোসাইটির জার্নালে ডাঃ এইচ. গুনডার্ট (২৩শ খণ্ড, ১৮৬৯), আর ডাঃ আর. কলডওয়েল তাঁর 'কমপ্যারেটিভ গ্রামার অব দি ড্রাভিডিয়ান লাঙ্গুয়েজস' (২য় সংস্করণ, ১৮৭৫) এবং এই অভিধানের প্রণয়ণকর্তা 'ডিক্সনারী অব দি বম্বে ইণ্ডিয়ান এ্যান্টি-কুয়্যারিতে' (আগস্ট, ১৮৭২ সংখ্যা) কিছুটা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

কাইটেলের কানাড়া কবিতা এবং কানাড়া কথ্য সংজ্ঞা (চণ্ডাসার ও শব্দমণি-দর্পণ) গ্রন্থদুটিকে অতুলনীয় উৎকর্ষের আদর্শ নিদর্শন বলা হয়। মহীশূর রাজ্যে এমন কোনো উত্তম স্কুল লাইব্রেরী নেই যেখানে এইসব গ্রন্থ নেই কিংবা যারা এই সব গ্রন্থ সংগ্রহে আপ্রাণ চেষ্টা করেন না।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর কাইটেল-এর এই মহাণ গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত হল একটি ক্ষুদ্রাকৃতি অভিধান 'কানাড়া-ইংলিশ স্কুল ডিক্সনারী' (১৯২৩) জে. বুচার দ্বারা মাঙ্গালোরে মুদ্রিত। এরপর ১৯২৯-এ ঐ একই জায়গায় এফ. জাইগলার কৃত 'ইংলিশ-কানারিজ স্কুল ডিক্সনারী' প্রকাশিত হয়। কানাড়ায় স্কুল-পরীক্ষাদির জন্য বাসেলের মিশনারী ডউরথ কৃত 'পোয়েটিক্যাল এনথোলজী' আজো প্রায়ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আরেকজন জার্মান পণ্ডিত যিনি কানারিজ গবেষণা করেছেন তাঁর নাম জে. ফর্নমেয়ার—যাঁরা স্বার্থশূন্যভাবে কানারিজ এবং তুলুভাষী অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করেছেন তিনি তাঁদের অন্যতম।

ব্রানকুয়েবরের মতো মাঙ্গালোরের নাম ইন্দো-জার্মান মৈত্রীর ক্ষেত্রে বিশেষ স্মরণযোগ্য। এই শহরে একই সাথে কানারিজ সাংবাদিকতার জন্য খ্যাতি

লাভ করে এবং তার কৃতিত্বের জন্য সংস্কৃতিবান জার্মান এবং জার্মানভাষী মিশনারীদের কাছে ঋণ কম নয়। দক্ষিণ কানাড়ার রাজধানী সম্পর্কিত এক সমীক্ষায় এম. জনার্দন এই তথ্য বর্ণনা করেছেন :

দক্ষিণ কানাড়ার জনগণ সর্বদাই সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণে রাখবেন জার্মান মিশনারীদের তাঁদের ধর্মীয় উৎসাহের জন্য, বাণিজ্যিক শিল্প এবং মুদ্রাযন্ত্রের জন্য। এই জেলার সাংবাদিকতার ইতিহাস তিনটি পর্বে মোটামুটি শ্রেণীভুক্ত করা যায় (১) ধর্মবিশ্বাস—১৮৪২-১৮৯৬ (২) স্বাধীনতা, (৩ জনকল্যাণ—১৯৪৭ এবং তার পরবর্তীকাল।

ধর্মীয় উৎসাহের প্রেরণায় মাঙ্গালোরে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাসেল মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এই মিশন একটি প্রেস স্থাপন করেন এবং তার মাধ্যমে সুসমাচার এবং সুসংবাদ মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন। এই মিশন তাঁদের প্রথম সংবাদপত্র কানাড়া-সমাচার নামক মাসিক ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। আমি শুনেছি কানাড়া-সমাচারে সৈন্য চলাচল সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সমাচারের পর প্রকাশিত কানাড়া-বর্তিকা (১৮৫৭) এবং খ্রীষ্ট সভাপত্র (১৮৬৯) সত্যদীপিকা (১৮৯৬) বৈদিক মিত্র (১৯১০); সুভর্ত প্রসারক (১৯২২) খ্রীষ্ট হিতবাদী (১৯২৪)। এইসব পত্রিকাগুলি বিভিন্ন কাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল এখন আর নেই ··

ইংরাজী সাংবাদিকতা যদিও সাফল্যলাভ করেনি, জেলা-গুলিতে তার অস্তিত্ব ছিল চমকপ্রদ। ১৯০৩-এ বাসেল মিশন প্রেস ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন।

রাওসাহেব এ. সি. পিনটো ১৯২৭-এ 'মাঙ্গালোর' সম্পাদনা করেন এবং সি. জে. ভারকীর 'ইণ্ডিয়ান এডুকেশন্যাল রিভিউ' ১৯৩৬ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯-এ 'দি ওয়ে অব ক্রাইষ্ট' আত্মপ্রকাশ করে।

অন্য সব ইংরাজী সাময়িকী গুলির নাম 'ভিশ্যন'; 'এডুকেটেড ইণ্ডিয়া', 'সানডে নিউজ', 'ইণ্ডিয়ান ক্রনিক্যাল' ও 'হিন্দুস্থান এ্যাফেয়ার্স' (উদিপি, ১৯৪০) ১৯৪২-এ প্রকাশিত 'ফ্রেণ্ড অব দি পুওর' ইংরাজী দৈনিক সংবাদ পত্রের ক্ষেত্রে প্রথমতম প্রচেষ্টা।···

দক্ষিণ-ভারত সম্পর্কে অধিকাংশ জার্মান রচনাবলী যেখানে ভাষাতত্ত্বের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র অতিক্রম করেছে বা ইতিহাস আশ্রিত হয়েছে সেখানে সাধারণ দ্রাবিড় প্রশ্নাদির প্রতি অধিকতর আলোকপাত করা হয়েছে। দ্রাবিড়দের উৎপত্তি বিষয়ক প্রশ্নটি এখনও এক উত্তেজক বিষয়। অনেক পণ্ডিত অনেক রকম মতামত প্রকাশ করেছেন। ওটো সথারডারকে দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক, তিনি একদা কীয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং আস্থেয়ার লাইব্রেরীর কিউরেটর হিসাবেও অনেক বছর কাটিয়েছেন। তিনি দ্রাবিড় ও মুণ্ডাদের বুলিতে ইউরাল-আলতাইক ভঙ্গীর সন্ধান পেয়েছেন। তিনি 'রিভিয়্যু ফর ইনডোলজী অ্যাণ্ড ইরানিষ্টিকস্' ৩য় খণ্ডে এই বক্তব্য পরিস্ফুট করেছেন।

কবি ফ্রিডরিশ রুকার্ট একদা দ্রাবিড় ও ফিনিস ভাষার মধ্যে একটা আত্মীয়তা লক্ষ্য করে এই সম্পর্ক বিষয়ে ইঙ্গিত করেন। অপরপক্ষে প্রফেসার হাইনে গেলডার্ন দ্রাবিড়দের আদিম বাসস্থান ইরাণ এইরকম সিদ্ধান্ত করেন। পি. ডব্লু. সথমিডটের স্মারক-গ্রন্থে এই বৈজ্ঞানিক মতবাদটি তিনি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন।

প্রাগের বিখ্যাত চেক পণ্ডিত বি. হোরৎসনি মনে করেন দ্রাবিড়দের উৎপত্তি ইন্দো-জার্মানিক, চেক শহর জার্মান সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত এবং প্রথম জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। আইক-ষ্টেডটের ব্যারন ইগন ইতিপূর্বে প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন।

অদ্যাবধি দক্ষিণ-ভারত সুদূর এপষ্টলিক যুগের সঙ্গে বিশ্বের খ্রীষ্টীয় মতবাদের সহিত সংযুক্ত। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রোটেষ্টানটবাদের ক্ষেত্রে প্রথমতম একজন পণ্ডিত সেণ্ট টমাস বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কেরালার টমাস ক্রিশ্চান-দের ঐতিহ্যকে মর্যাদা দান করে সকল গুরুত্বপূর্ণ পণ্ডিত এখন এই মত পোষণ করেন যে যীশুখ্রীষ্টের সংশয় পরায়ণ এই শিষ্য এখানে ছিলেন এবং ময়লাপুরে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। এম. এচ. হোহ্লেনবার্গ সেই গবেষক যিনি সর্বপ্রথম সেণ্ট টমাস সম্পর্কে এক বিজ্ঞান সম্মত আধুনিক সমীক্ষা করেছেন। তাঁর গ্রন্থটিতে পূর্ব-ভারতে ক্রিশ্চিয়ান চার্চের উৎপত্তি এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কোপেনহেগেন ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থটি 'দ্য ওরিজিনিবাস এৎ ফাতিস একলেসিয়া ক্রিশ্চিয়েন ইন ইনডিয়া ওরিয়েন্তালী' এই নামে প্রকাশিত হয়। হোহ্লেনবার্গ বিশ্বাস করতেন যে সেণ্ট টমাস গঙ্গা ও সিন্ধুর

মধ্যে এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে মিশনারী হিসাবে কাজ করেন। হোহ্লেন-বার্গের মতানুসারে ময়লাপুরে শহীদের মৃত্যু বরণের পূর্বে তিনি কালামিনাতেও ধর্মপ্রচার করেছেন। এই একই প্রসঙ্গে আথানাসিউস কিরচার তাঁর চীন বিষয়ক গ্রন্থে এই স্থানটির এক ব্যুৎপত্তিগত ও ভৌগোলিক সংজ্ঞা দান করেছেন। এই গ্রন্থ ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আমষ্টারডামে প্রকাশিত হয়। আলফনস ভাথ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন…

> আথানাসিউস কিরচার কালমিনার উৎপত্তি হিসাবে কালুর এবং মিনা এই সূত্র সন্ধান করেছেন, কালুর মানে শিলা এবং মিনা অর্থে উপরে, টমাস শহীদত্ব লাভ করেন একটি শিলাখণ্ডের উপর—তার নাম মহান শৈল। যাঁরা শহীদত্বের স্থানটি সম্পর্কে সন্ধান করবেন তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হল: মায়লাপুর কালুর মিনায় (মায়লাপুরের পাহাড়ে) সেই স্থান। কাল ক্রমে এই নামটি হ্রস্ব হয়ে কালুরমিনা হয়েছে। এর উৎপত্তি বিষয়ে কিরচারের তত্ত্ব অনেকের দ্বারা গৃহীত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে কাল বা কাল্লু কথাটি 'তারকা' এই কথাটির তামিল প্রতিশব্দ। তামিল ভাষার জনৈক ছাত্র আমাদের বলেছেন যে 'কালুরমিনা' অর্থাৎ পাহাড়ের উপর 'এই সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়'।

হেক, এর বিপরীত মত হিসাবে একেবারে আসল জায়গায় ঘা দিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস সন্ত সেণ্ট টমাস প্রসঙ্গে যে শহরের নামের প্রথমাংশ বার বার উল্লিখিত হয় তার দ্বারা দক্ষিণ ভারতীয় চোল সাম্রাজ্যের কথা মনে জাগে। ভাথ কথাটি এই বাক্যের দ্বিতীয়াংশ কালুরমিনা। তামিল 'মণ্ডলম্' কথাটি এর সূত্র। এই উভয় ব্যাখ্যাই সম্ভবতঃ নির্ভুল। এসবই কোরমণ্ডল উপকূলে গিয়ে পৌঁচেছে, সেখানেই প্রকৃত পক্ষে ময়লাপুর অবস্থিত।

সেণ্ট টমাসের জীবনী নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ডাঃ ডব্লু. জার্মান এবং মার্টিন হাউগ। কোট্টায়মের ময়লাপুরের টমাসের ক্রশ চিহ্নের যে লিপি আছে তিনিই সম্ভবতঃ তার সুস্পষ্ট এবং ঐতিহাসিক এবং বিজ্ঞান-ভিত্তিক পাঠ রচনা করেছেন। তিনি এই লিপির অক্ষর বিন্যাস সপ্তম শতকের পলহবী লিপির অনুযায়ী এই মত প্রকাশ করেছেন এবং নিম্নলিখিত ভঙ্গীতে তার অনুবাদ করেছেন:

"যিনি মেশায়া এবং উপরের ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং হোলি গোষ্টকেও বিশ্বাস করেন; যিনি ক্রশ চিহ্ন বহন করেছিলেন ইনি তাঁরই কৃপা প্রাপ্ত।"

জার্মান পণ্ডিতবৃন্দ যাঁরা টমাস বিষয়ে গবেষণা করেছেন তাঁরা কিছু পরিমাণে দক্ষিণ ভারতীয় টমাস ঘটিত ঐতিহ্য পরিহার করেছেন। অনেকের মধ্যে ও. ওয়েকার এবং যোশেফ ডালমান উল্লেখ্য। এঁরা উভয়েই শুধু উত্তর ভারতীয় সন্তকে গ্রহণ করেছেন। ঠিক এই প্রান্তে এসে তাঁরা বৌদ্ধতত্ত্ব এবং খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক সম্বন্ধ খুঁজে পেয়েছেন। যাই হোক, বিস্তারিত গবেষণার পর কার্ল হেক্ দক্ষিণ-ভারতকে কর্মক্ষেত্র এবং শহীদত্বের ভূমি বলে স্থির করেন এবং তার স্বকৃত প্রকাশিত সমীক্ষায় এই মতবাদের প্রতি জোর দেন। রিচার্ড গারবে সেণ্ট টমাসের ভারতীয় সন্ত সত্তাকে অসমর্থিত এই কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। পরিশেষে, আলফনস ভাথ উত্তর-ভারতে সাধুর প্রচার অভিযাত্রা 'সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত' হয়েছে এবং বলেছেন 'বিশেষভাবে সম্ভব' যে এই সাধু দক্ষিণ-ভারতেও অবস্থান করেছিলেন। ওরিয়েণ্টাল ক্রিশ্চানদেয় গির্জা সাহিত্যের সাম্প্রতিক গবেষণা ও গভীর সমীক্ষার ফলে কট্টর সংশয়বাদীর পক্ষেও সাধুর ভারতীয় কর্মকাণ্ডের বিপক্ষে বিশেষ যুক্তি থাকে না। আজকাল, সাধারণভাবে এই মত দক্ষিণ-ভারত সম্পর্কে প্রযোজ্য মনে করা হয়। এই ভাবে, খ্রীষ্টধর্মের সূচনাকালের সন্তদের গোড়ার যুগের ঘটনা বিষয়ে খ্রীষ্টিয় গবেষণার পক্ষে দ্রাবিড় অঞ্চল বিশেষ সুযোগ প্রদান করে।

প্রাচীন দ্রাবিড় ভাষা বিষয়ক সমস্যাবলী ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে এরলানগেনে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থের লেখক ক্লিমেন্স স্থোনের দ্রাবিড়-অভিধা বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে তামিল শব্দাবলীর অনুবাদ খুব কঠিন। যেমন গ্রীকরা লিখতেন 'চোলা'র পরিবর্তে 'সোরা'। 'আর' থেকে 'এল'-এ বা পালটা পালটি ভাবে অনেক ভাষার পক্ষে এ একটা বৈশিষ্ট বিশেষ। পিউটিংগার নকশা থেকে তা বোঝা যায় যেখানে 'সিথিয়া ডাইমিরাইস' এই লাতিন তামিল ভাষা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ভাবে রোম সাম্রাজ্য এবং প্রাচীন ভারতীয় রাজত্বের সঙ্গে যোগ ছিল প্রমাণ হয়। ৪র্থ শতাব্দী থেকে এই যে প্রাচীন রোমক নক্সা প্রাচীন পূর্ব-পশ্চিম সংযোগের প্রতিধ্বনি—এক সময় জার্মান মানববাদী কোনরাদ পিউটিংগারের কাছে এই নকশা ছিল।

ভারতীয় ভূমিতে দ্রাবিড় সাহিত্য প্রাচীনতম। চারণ ও গাথাগায়করাই গ্রীস জার্মানী এবং পাশ্চাত্য জগতের আর সব দেশের মত সর্বপ্রথম পুরাকাহিনী, গল্পকথা, উপকথা প্রভৃতি লঘু কাব্যমঞ্জুষার আকৃতিতে পরিবেশন করেছেন। সমগ্র দ্রাবিড় সাহিত্য ঐতিহ্য হিলকো ভিয়ারডো স্খোমেরুসের গবেষণার বিষয় বস্তু। এই পণ্ডিতের বিদগ্ধ আবাসভূমি ছিল দক্ষিণ-ভারত। ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ক তাঁর যে পরিচিতিগ্রন্থ প্রফেসর হেলমুথ ফন গ্লাসেনআপ সম্পাদনা করেছেন তার মধ্যে সাহিত্যিক ঐতিহ্যে দ্রাবিড় প্রভাব বিষয়ে এক বাহিরেখা প্রকাশ করেছেন। দক্ষিণ-ভারতের এই সাহিত্য জগত সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী দ্রাবিড় উত্তরাধিকার বিষয়ে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অপরিসীম অনুরাগে তিনি দীক্ষিত হয়েছেন :

তামিল জনগণের গৌরব তাদের ধর্মীয় পদ ও নৈতিক শাস্ত্র বিষয়ক সাহিত্য। এর প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় তার পরিপূর্ণ অধিকারী এই সাহিত্য। এর আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুর জন্যই শ্রদ্ধেয়। সংক্ষেপে সহজে স্মরণীয় বাক্যাবলী—এক, দ্বিপদী, বা চতুস্পদী কবিতাবলী তার বাক-প্রতিমা এবং রূপক ইত্যাদির মধ্যে তামিল জনগণ জীবন দর্শন বিষয়ে কি অতুল সম্পদের অধিকারী তার পরিচায়ক। এর জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায় এইসব প্রবাদ, ছড়া ইত্যাদির উৎপত্তি এবং তাদের রচনাকার সম্পর্কিত প্রচলিত কাহিনী ও উপকথায়। প্রায় আঠারোজন রচনাকার প্রায় সন্তদের সম্মান পেয়েছেন। উদ্দেশ্য, মূল্য এবং বয়সের দিক থেকে এইসব সংগ্রহের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থেকে যায়।...

বিশেষভাবে পূর্ব-উল্লিখিত আরুমুগা নবালার উত্তম গদ্যসাহিত্যের জন্য অনেক কিছু করেছেন। আদর্শস্থানীয় গদ্যে যে তিনি কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন তা নয়, তিনি গদ্যে কয়েকটি প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্য অনুবাদ করেছেন এবং যে কোনো য়ুরোপীয় তামিল গদ্যের ও বুলির উত্তম রচনা শৈলী বিষয়ে আগ্রহী তাঁর পক্ষে এই গ্রন্থ না পড়লে চলবে না। তিনি কয়েকটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন, এই সব বিদ্যালয়ে উত্তম তামিল গদ্য চর্চার প্রতি অধিকতর জোর দেওয়া হত। আরুমুগা নবালার ভিন্ন জার্মান মিশনারী এলভিন উত্তম গদ্য ভঙ্গী সৃষ্টির ব্যাপারে উল্লেখ্য অবদান রেখেছেন।

ক্রিশ্চান মিশন সর্বদাই তামিল চর্চাই তাঁদের প্রধান কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন মিশনের ছাপাখানা শুধুমাত্র জার্মান ও ইংরাজী গ্রন্থাবলীর

অনুবাদ মুদ্রিত করেছেন তা নয়, তাঁরা মাঝে মাঝে তামিল ক্রিশ্চানদের সাহিত্য প্রচেষ্টাও মুদ্রিত করেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে দুজন কিছু পরিমাণ সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতিলাভ করেন, একজন হলেন ক্যাথলিক বেদন্যায়গম পিল্লাই, তিনি অন্য বিষয়াবলীর মধ্যে কিছু ছোট গল্পও রচনা করেন এবং প্রোটেষ্টাণ্ট বেদন্যায়গম শাস্ত্রী, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। অজস্র ক্রিশ্চান গীতির ইনি রচয়িতা—আজো সেই সব গান অনেকে পছন্দ করেন এবং গীত হয়ে থাকে। তিনি তামিল সুসমাচার হারমনির কাব্যানুবাদ করেন, এ ছাড়া দক্ষিণ-ভারতীয় রাজ্যগুলির ইতিহাস বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।···

···কানাড়ী সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে দাশারা পদগলু—বা দাস-পদাবলী। দাস অর্থে ভগবান বিষ্ণুর ভৃত্য বোঝায়। বিভিন্ন শতাব্দী থেকে এমন হাজার হাজার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়···

জার্মান মিশনারী ডাঃ মোগলিঙ এই জাতীয় ৪০২টি গান সংগ্রহ করেন। জার্মান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির জার্নালের চতুর্দশ খণ্ডে ডাঃ মোগলিঙ এইসব সঙ্গীত বিষয়ে লিখেছেন :

নীতির পবিত্রতার দিক থেকে এবং বৈদগ্ধ্যের তারা বিশিষ্ট। এইসব সঙ্গীতে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত উৎসব ঘটিত জাঁক-জমক এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির নিন্দা করেছে। গভীরতাপূর্ণ ও উৎসাহ ব্যঞ্জক এই গীতাবলী এমনভাবে রচিত যে একজন পাশ্চত্য দেশবাসী ক্রিশ্চানদের এই সব পাঠ করলে অন্তর শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়, মনে একটা বিষাদও জাগে যে এমন প্রাণ-প্রাচুর্য, এমন হৃদয় ও অনুভূতি মানব ত্রাণ কর্তার এক অনুকৃতিকে উপলক্ষ্য করে এমন সব সুযোগ্য ভারতীয় দ্বারা রচিত—কারণ এই নাকি কৃষ্ণ এবং তাঁর বিপরীত রূপের অভিব্যক্তি।

এইসব কবিদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতিমান, প্রাচীনতম, ও সপ্রচুর পদাবলীর লেখক হলেন পুরন্দর দাস এবং কণক দাস, এঁরা আনুমানিক ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড় বুলিগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুরেলা হল তেলেগু ভাষা, সংস্কৃতে বলে অন্ধ্র ভাষা। প্রাচীন কালে চারটি তেলেগু রাজ্য ছিল—মহা অন্ধ্র অথবা দক্ষিণ কোশল, অন্ধ্র, কলিঙ্গ এবং ধনকটক। চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ কর্তৃক এই উল্লেখ আছে। তেলেগু ভাষী অঞ্চলে বেশ গোড়ার দিকেই বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত কিছু পালি এবং সংস্কৃত লিপির মধ্যে এই বৌদ্ধ যুগের সাহিত্যিক পরিচিতি আমরা পাই। প্রাচীনতম তেলেগু শিলালিপির

তারিখ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী। একটি তিব্বতী তথ্য থেকে জানা যায় যে নাগার্জুন বৌদ্ধ-ত্রিপিটকের তেলেগুতে অনুবাদ করেন, কিন্তু যদিও তা হয়ে থাকে তাহলে তা নষ্ট হয়ে গেছে।

মালায়ালাম ভাষা সম্ভবতঃ তামিল বুলি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। যাই হোক কালের প্রবাহে, এই ভাষা ধীরে ধীরে একটি ভিন্ন ভাষায় পরিণত হয়েছে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করে। এর প্রাচীন বাসভূমির নাম কেরালা...

তাম্রলিপিতে কয়েকটি ফলক ভিন্ন প্রাচীনতম সংরক্ষিত সাহিত্য সম্পদ হল 'রামচরিত'। এই গ্রন্থ কোনো এক মহারাজা কর্তৃক রচিত। সম্ভবতঃ গ্রন্থকার কোনো অঞ্চলের রাজা ছিলেন তবে তাঁর প্রকৃত নামটুকু সংরক্ষিত হয়নি। লিপির চরিত্র দেখে অনুমান করা হয় যে এই রচনাকালে মালায়ালাম ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব ছিল নগন্য।...

স্খোমেরুস তাঁর 'ট্রিলজি'র প্রথম অংশে ভারত এবং ক্রিশ্চানতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনাকালে লেখক ভারতীয় ভক্তিযোগ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। এই বিভাগে ভক্তি ধর্ম বিষয়ে তার মন্তব্যাবলীর বিশেষ গুরুত্ব আছে।

স্খোমেরুস পদ্মপুরাণের একটি কাহিনী থেকে হিন্দুধর্মের অলৌকিক প্রতীতিবাদের জগৎ, যার মধ্যে ভারতীয় ভক্তি ধর্মের অন্তর বস্তু বর্তমান তার ব্যাখ্যা করেছেন। এই ধর্ম মায়াবাদের ভাবধারার সঙ্গে গ্রথিত এবং মাঝে মাঝে তার অনীশ্বরবাদের মধ্যে তাঁর অবনতি ঘটেছে। আবার মাঝে মাঝে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বিরোধীভাবে অনুভূত, আরেকবার ঈশ্বরের সঙ্গে 'তুমি' সম্পর্ক স্থাপন করেছে আর সেইভাবে স্রষ্টার মানবিক প্রেম এবং চিরন্তন ঈশ্বরকে জীবনের ধ্রুবতারা করতে পেরেছে। অনন্ত বিষয়ে পরমতত্ত্ব বিষয়ে এই এক দ্রাবিড় প্রতিক্রিয়ায় ব্রাহ্মণের মধ্যে একটা মতবাদের সন্ধান পায়। গভীরতম সারাংশে এবং পথ রচনার ব্যাপারটি এমন ধারায় ঘটে যে যা প্রকৃত দিব্যবস্তু তাকে অগ্রাহ্য করে এক অদৃষ্টবাদী অনাদরের পথ গ্রহণ করা হয়। এই সূত্রে স্খোমেরুস এক বৃদ্ধার কাহিনী দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। এই বৃদ্ধা তাঁর দুটি পুত্রকে নিয়ে দ্রাবিড় দেশ থেকে এসেছিলেন, কর্নাটক হয়ে মহারাষ্ট্র এবং গুর্জরে। সহসা তিনি এক তরুণী রমণীতে পরিণত হলেন এবং দেখলেন তাঁর সন্তান দুটি মৃত্যু কবলিত হল। নারদ মুনিকে তিনি প্রশ্ন করলেন এই অলৌকিক ঘটনার হেতু কি, উত্তরে জানলেন তিনি হলেন ভক্তি ধর্ম আর তাঁর পুত্র দুটি জ্ঞান আর বৈরাগ্য। ওরা দুজনেই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হল,

তার কারণ ভক্তি এখন ওদের সহায়তা ভিন্ন একাই চলতে পারে। ভক্তি দর্শনের অনূদিত দৃষ্টান্ত দিয়েছেন স্খোমেরুস—ভক্তির কাব্যিক নারী প্রচারকের অভিব্যক্তি। এই স্তোত্রগুলি রচনা করেছেন মহিলা কবি করাইকলাম্মাইয়ার ও অনডাল। ভক্তিতত্ত্বের এই সব নারী প্রবক্তাদের কাছ থেকে ভক্তিতত্ত্ব উত্তর-ভারতে প্রচারিত হয়েছে। স্খোমেরুস তার এই বর্ননা দিয়েছেন:

> দক্ষিণ ভারতে তামিল ভাষায় এক সুবৃহৎ সাহিত্য বর্তমান।* প্রথম উত্তর ক্রিশ্চান যুগের তিনটি শেষতম দশকে এর উৎপত্তি একথা বলা যায়। এর মধ্যে ভক্তি ধর্মের তারুণ্য ও সতেজ সৌন্দর্য প্রকাশিত, অন্য প্রকার ধর্ম থেকে এই ধর্ম মুক্ত। কর্মের অপক্ষপাত, এবং অনুমান এখানে সম্পূর্ণভাবে পশ্চাৎপসরণ করেছে ভক্তির অভিব্যক্তি ও ঈশ্বরের সহায়ক হস্তের প্রতি বিশ্বাসের গভীরে। এবং তামিলদের দেশ থেকে দ্রাবিড়দের দেশ হয়ে ভক্তিতত্ত্ব উত্তর দিকে শতাব্দীকাল ধরে প্রবাহিত হয়েছে। কানারিজ, তেলেগু, মারাঠা বাংলা প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে আর রেখে গেছে এক অনপনেয় চিহ্ন এইসব ভাষায় রচিত ভক্তি সাহিত্যে, যা আজো বর্তমান এবং বিশেষ করে এখন আরো চোখে পড়ে। নিশ্চিত ভাবে বল্‌তে গেলে বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম প্রভৃতি পাষণ্ডী ধর্মের কাছে অবনত না হয়েও ভক্তিধর্মের অংশ বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

হিলকো ভিয়ারডো স্খোমেরুসের এই সব গ্রন্থাবলী ওরফানেজ বুক সপে মুদ্রিত অর্থাৎ হালের ফ্রাঙ্ক ফাউণ্ডেশনে মুদ্রিত। এইভাবে ক্রিশ্চিয়ান ক্রিয়া কলাপের প্রতি আলোকপাত করে দেখানো হয়েছে দ্রাবিড় গবেষণার মূলে ছিল জার্মান প্রচেষ্টা এবং কালজয়ী দায়িত্ব সংরক্ষিত করে রেখেছে। প্রকৃত-পক্ষে, বর্তমানেও, সুস্থ জগতের প্রতি বিশ্বাস রেখে বলা যায় আশা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে জার্মানদের সংযুক্ত ভূমিতে পুনরায় দূর দেশের ধর্মীয় ও অধ্যাত্ম প্রশ্নাদি আরেকবার আলোচিত হবে—এই দেশ থেকেই বার্থলোমিউ ৎসাইগেনবাল্‌গ এমন ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করেছিলেন।

একজন জার্মান নবাব

অনেক সময় মহৎ মানুষের দোলনা মহান মানুষদের প্রাসাদে রক্ষিত হবে, কিন্তু তাঁর সমাধি বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন হবে—অথচ অপরে দরিদ্র মানুষের পর্ণকুটির থেকে আরেকজন প্রাসাদে উপনীত হবেন। ভবিষ্যৎ বংশীয়দের বাধ্য করবেন তাঁর স্মৃতিসৌধ রচনা করতে আর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁর কর্মের বিবরণ নথীভুক্ত করবেন। এই পরবর্তী শ্রেণীর একজন মানুষ হলেন ওয়ালটার রেইনহার্ড। তিনি অতি সাধারণ বংশ থেকে উদ্ভূত। প্রকৃতপক্ষে কোথায় যে তাঁর জন্মস্থান তা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তাঁর রাজকীয় সমাধি কিন্তু যথাস্থানে সুদীর্ঘ কাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে, ভবিষ্যৎ বংশীয়দের তাঁর কীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

সেভেরিন নোটি

(Das Fürstentum Sardhana)

সারধানার ইতিবৃত্তকার জার্মান জেসুইট ফাদার সেভেরিন নোটি উত্তর ভারতের স্বল্প স্থায়ী জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিষয়ে এই কথাগুলি নিবেদিত। মানব জীবনে ভাগ্যের পরিবর্তনশীলতা, উত্থান-পতন, সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠা-নামা এবং অভিজ্ঞতা প্রবাহ ইত্যাদি তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। ভারতবর্ষ এবং প্রকৃতপক্ষে ইন্দো-এশিয়ান অঞ্চল এই জাতীয় ভাগ্য পরিবর্তনের এক আশ্চর্য খেলাঘর।

ইনডিয়া! এই নামটির মধ্যে একটা ম্যাজিকের সুর আছে। সেই কারণে এই দেশ চুম্বকের মত বিভিন্ন উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্পন্ন বিভিন্ন পরিবারের এবং বিভিন্ন ধরণের মানুষকে আকৃষ্ট করেছে এই দেশ। অভিযাত্রী এবং আবিষ্কর্তা ভিন্ন, প্রচারক, মিশনারী, ভাষা শিক্ষার্থী, এ ছাড়া দর্শন এবং শিল্প নিদর্শন দর্শনার্থী যাত্রীদল, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং কারিগরি শিল্পবিদ ছাড়াও ভাগ্যান্বেষীদের ভীড়ের কথাও স্মরণে রাখতে হবে। এই ধরণের মানুষকে সকলে সন্দেহ এবং আগ্রহের দৃষ্টি নিয়ে দেখে, এদের সম্পর্কে একটা মিশ্রিত ভাবাবেগ থাকে। তথাপি যে কোন ভাবেই এই সব ভাগ্যান্বেষীর

দল ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যান বা এদেশে বাস করে থাকেন তার মধ্যেই তাঁরা পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্কের মধ্যে একটা উজ্জল বর্ণের রঙ চড়িয়েছেন—তার মধ্যে একটা বলিষ্ঠ এবং সজীব সুর ছিল।

ভারত এবং ইন্দো-এশিয় অঞ্চলের অতিথি গ্রন্থের পৃষ্ঠায় দুঃসাহসিক ইতিবৃত্তের বিবরণে অনেক নাম লিপিবদ্ধ আছে। প্রকৃত পক্ষে সব গরিষ্ঠ য়ুরোপীয় জাতিপুঞ্জের মানুষেরই নাম পাওয়া যায়। জার্মানরা ব্যতিক্রম নয়। সত্যই, ইংরাজ (আইরিশ সহ) ও ফরাসী জাতির ওপর এই জার্মানদেরও দুঃসাহসিক জীবনের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল।

দৃষ্টান্ত হিসাবে জনৈক যোহান ভউষ্ট ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সেনাদলে নাম লেখান, পরে যখন জেনারেল পদে উন্নীত হলেন তখন তাঁকে 'কিং অব ইষ্ট ইণ্ডিয়া' উপাধি দিলেন মোগল সম্রাট। একথা জানা প্রয়োজন যে এই উপাধিটি নিছক সৌজন্যসূচক নয়, এবং যোহান ভউষ্টের জীবন আরো অসংখ্য দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপের মত পেশাদারের গানের মত ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল।

কিন্তু প্রায়ই এই সব অভিযাত্রীবৃন্দ যাঁরা বলিষ্ঠ স্বপ্ন দেখেছেন এবং মাঝে মাঝে সেই স্বপ্ন সফল করেছেন এশিয়ার প্রতিবেশী অঞ্চলে, তাঁদের আচার-আচরণটুকুও 'ভারতীয়' করে ফেলেছিলেন।

গুস্তাভ আর্নষ্ট হিউগো ওভারবেক (১৮৩০-১৮৯৪) এঁদের অন্যতম। লিপ্পি প্রদেশের লেমগোর অধিবাসী ছিলেন তিনি। ওভারবেক অনেক সমুদ্রে স্বচ্ছন্দ বিহার করেছেন। বহু পদের অধিকারী হয়ে বসেছেন এবং অনেক দেশের ছাড়পত্র পেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, যে জাতির মানুষরা স্বাধীনতার বেদীতে আত্মোৎসর্গ করে থাকেন তিনি ছিলেন তাঁদের দলের মানুষ। সান ফ্রানসিস্‌কোর এই স্বর্ণখনক, প্রশান্ত মহাসাগরের উভয় তীরে ভ্রাম্যমান সেলস-ম্যানের কাজ করেছেন, পরে গেলেন হংকং, সেখানে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পর অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের কনসালের প্রতিনিধির পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের কনসাল হলেন। পরবর্তী বৎসরে এর উপর হলেন সমগ্র চীনের মেকসিক্যান কনসাল। কিন্তু ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রাসিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে লড়াই বাধল ওভারবেক প্রাসিয়ার সঙ্গে সকল বন্ধন ছিন্ন করলেন, কারণ তিনি অন্তরের তাগিদে বিনা সর্তে অষ্ট্রিয়ান সম্রাটের পক্ষে কাজ করতে মনস্থ করলেন। ভিয়েনা নথীপত্রে তাঁর 'কারিকুলাম ভিটে'র মধ্যে

এই তথ্য পাওয়া যায়। সেই বছরেই ওভারবেক হংকং ও ম্যাকাও-এর অবৈতনিক অস্ট্রিয়ান কনসাল এবং চীনের মেকসিক্যান কনসাল হলেন। সম্রাট ম্যাকসিমিলিয়ানের হত্যার পর এই পদ তিনি পরিত্যাগ করেন। সমগ্র সাউথ-ইষ্ট এবং ইষ্ট অব এশিয়া বা দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব-এশিয়া বিষয়ে সব কিছু বিশেষভাবে জানতেন ওভারবেক। যে সব কাজে তিনি আগ্রহী ছিলেন তার মধ্যে 'অস্ট্রিয়ান-সায়ামিজ ট্রেড' বা বাণিজ্য ব্যবস্থা অন্যতম। এর ফলে তিনি 'কম্যাণ্ডার অব দি অর্ডার অব দি হোয়াইট এলিফ্যাণ্ট' এই পদ লাভ করলেন শ্যামদেশের রাজার কাছ থেকে। অনেক পূর্বেই তিনি নাইটহুড লাভ করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ওভারবেক 'ফ্রেইহের' বা ব্যারণের উপাধিলাভ করলেন। পরের বছর তিনি প্যারিস ভ্রমণে গেলেন, সেখানে ফ্রেঞ্চ রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট তাঁকে 'লিজিয়ঁ দ্য অনার' এই সম্মানে ভূষিত করলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ওভারবেক ব্রিটিশ সওদাগরী অফিস ডেন্টদের সঙ্গে যুক্ত হলেন এবং 'ডেন্ট অ্যাণ্ড ওভারবেক কোম্পানী' প্রতিষ্ঠা করলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল উত্তর বোর্নিও-র কাছ থেকে আঞ্চলিক অধিকার গ্রহণ করা। ব্রিটিশ ফরেন অফিস ও ভারতের ভাইসরয় এই পরিকল্পনায় বিশেষ আগ্রহ দেখালেন, কারণ এশিয়াতে কোনো কিছু ঘটলেই ভারতে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিবেচনা করতে হয়। ওভারবেক সাফল্যলাভ করলেন, তিনি নর্থ বোর্নিও-র প্রভু এবং সুলতান ব্রুনেই কর্তৃক সাবার মহারাজা পদে অধিষ্ঠিত হলেন। বর্তমানে মালয়েশিয়ার ব্যাপারে 'সাবার' নাম আবার আলোচিত হচ্ছে। এইভাবে, অতীত ও বর্তমানের বিশ্ব রাজনীতি এবং স্থানীয় রাজনীতি একীভূত হয়ে পড়ে, যার ফলে দুঃসাহসিক জীবনের নানা কাহিনী গড়ে ওঠে।

জার্মান মহারাজা হিসাবে যখন বোর্নিও-র একটি অঞ্চল শাসন করতেন তখন ভারতের ঐশ্বর্য বিষয়ে ওভারবেক অভিভূত হয়ে পড়েন। উপরন্তু তাঁকে গয়ার রাজা এবং সন্দকান উপাধি দেওয়া হল। পরবর্তী বছরে সুলু-র সুলতান যিনি সেই সময় ব্রুনেই-এর সুলতানের ওপর প্রভুত্ব বজায় রেখেছিলেন চুক্তি-গুলির নবীকরণ করলেন এবং সেই সঙ্গে ওভারবেকের ভারতীয় রাজকীয় উপাধিগুলিও নবীকৃত হল। এর ওপর সুলতান সুলু তাঁকে 'দাতো ভাণ্ডারা' এই নামের একটি মালয়ান উপাধি দিলেন। যাই হোক, ওভারবেক বেশীদিন মহারাজা রইলেন না। স্পেন এসে বাধা দিল এবং লণ্ডন ও মাদ্রিদের মধ্যে একটা বিশ্ব-রাজনীতির খেলা সুরু হল। ওভারবেক পরে দুঃসাহসিক

অভিযাত্রায় পরিপূর্ণ ঘটনাবলী ও অজস্র সম্মান, উচ্চপদ ও উপাধির ঐশ্বর্য মণ্ডিত হয়ে লণ্ডনে দেহত্যাগ করেন।

কিন্তু গ্রেট মোগলদের ভারতবর্ষে ফিরে আসা যাক। শুধু একজন জার্মান মহারাজা ছিলেন তা নয়, 'নবাব'—এই ইন্দো-মুসলিমের সম্মানে সম্মানিত হয়েছিলেন একজন জার্মান।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের অসংখ্য দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের অন্যতম এই জার্মান নবাব। তাঁর নাম ওয়ালটার বালথাসার রেইনহার্ড (রাইনহার্ড বা রাইনহার্ট উচ্চারিত হয়ে থাকে), তিনি এসেছিলেন রাইনল্যাণ্ড ফ্রাঙ্কোনিয়া থেকে। তার নাম সমরু, উত্তর মুগল যুগের তিনি একজন সুদক্ষ জেনারেল ছিলেন। দিল্লীর মোগল রাজধানীর বাইরে তিনি একজন শাসক পদে অধিষ্ঠিত হলেন।

ভারতীয় শহর আগ্রার ক্যাথলিক কবরখানায় যেখানে অতি জাঁকজমক-পূর্ণ ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য নিদর্শন বর্তমান সেখানে একটি সুন্দর সুপরি-কল্পিত সমাধি সৌধ আছে, ভারতের জার্মান প্রিন্সের শেষ বিশ্রামের জায়গা। তার দেয়ালগাত্রে পোর্তুগীজ ভাষায় উৎকর্ণ আছে—'এখানে ওয়ালটার রেইনহার্ড শায়িত আছেন, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়'।

জার্মানীর নবাবের কাহিনী ভারতের অতীত ইতিহাসের একটি পরিচ্ছেদ। ভারত নামক উপহার সামগ্রীর অধিকার নিয়ে সেই কালে ইংরাজ ও ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ চল্‌ছে। ভারতের মাটিতে পা দিয়ে রেইনহার্ড করমণ্ডল উপকূলে ফরাসী বাহিনীতে নাম লেখান। এইপদে তিনি বেশীদিন রইলেন না, উত্তরে কলকাতার পথে এসে সুইস বাহিনীতে যোগ দিলেন। তারা তখন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে কাজ করছেন। তাঁর গায়ের রং ছিল ময়লা এবং মাথার চুল ঘন কালো তাই রেইনহার্ডকে বলা হত 'সমবার'। এই নামটি পরবর্তী কালে ভারতীয় সেনাদের কাছে পরিবর্তিত হয়ে 'সমরু' হয়ে দাঁড়ায়। এটা একটা ব্যাখ্যা মাত্র, তবে প্রকৃত তথ্যের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। অজ্ঞাত কোনো লেখকের ভারতের রাজন্যবর্গ বিষয়ে ঐতিহাসিক রূপরেখায় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে :

"মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর যে সমস্ত ছোটোখাটো রাজ্য গজিয়ে ওঠে তার মধ্যে, সারধানা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার বিধবার দ্বারা এই রাজ্যটি পরিচালিত হয়ে থাকে, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল

ওয়ালটার রেইগনার্ড। জন্মে জার্মান। যদি পরে তিনি সামার্স নাম গ্রহণ করেন—দেশীয় লোকেদের কাছে নামটি সমরুতে পরিণত হয়।"

জার্মান অভিযাত্রীর মৌলিক নাম এখানে বিকৃত বানানে ব্যবহৃত। তাঁর ডাকনামের বানান ঠিক নেই। ইতিমধ্যে 'সমরু উপকথা' রচিত হতে সুরু হয়েছে। রেইনহার্ডের স্বদেশে যেটুকু স্বল্প তথ্য জানা গেছে তার থেকে উৎপত্তি।

একজন সমর নায়ক এবং পরে নবাব সমরু হিসাবে রেইনহার্ড একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে উঠেন। কিন্তু ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে জীবনকে জড়ানোর কল্পনা তাঁর ছিলনা তাই তিনি সন্নিকটস্থ ফরাসী বাণিজ্য ঘাঁটি চন্দননগরে পালিয়ে গেলেন। যে মানুষটি পূর্বে ফরাসী সৈন্যদল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল তার পক্ষে এ এক বিপজ্জনক ঝুঁকি নেওয়া বলা যায়। যাই হোক, তিনি একটা মিথ্যা নামের আড়ালে যোগ দিলেন এবং ফরাসী গভর্ণর যাকে পান তাকেই গ্রহণ করতে উন্মুখ ছিলেন।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ ইংরাজরা আক্রমণ করে ঘাঁটি অধিকার করে নেয়। ফরাসী পতাকার তলে মাত্র একমুঠো পেশাদার সৈন্য ইংরাজদের হাতে ধরা পড়া থেকে পালায়। রেইনহার্ড তাঁদের অন্যতম। তাঁদের অধিনায়ক ল-র অধীনে এক স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন করলেন যাঁরা মুর্শিদাবাদে অভিযান করে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার অধীনে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নিজের ছিন্নভিন্ন সেনাদলকে শক্তিশালী করার জন্য নবাব তাদের সাদরে গ্রহণ করলেন।

ক্ষুদ্র স্বেচ্ছাবাহিনী ক্রমশ সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। যুদ্ধের মধ্যে জেনারেল ল-যখন ধরা পড়লেন তখন রেইনহার্ড নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করলেন। তিনি সেনাবাহিনীকে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিচ্ছন্ন যোদ্ধ শক্তিতে পরিণত করলেন এবং তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে বহু ভারতীয় রাজন্যবর্গের কাছে কাজ করলেন। বিশেষ করে ভারতপুরের মহারাজা এই য়ুরোপীয় জেনারেলের সাহায্য নিয়ে তাঁর দেশকে একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রে পরিণত করলেন। এই রেইনহার্ড-ই আবার সাফল্যজনক ভাবে পরে মহান মোগলদের প্রাসাদ আক্রমণ করলেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতপুর থেকে আক্রমণ চালিয়ে আগ্রা দখল করলেন। রাজা যখন মারা গেলেন তখন রেইনহার্ড তাঁর সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে জয়পুরের রাজাদের অধীনে কাজ নিলেন। তিনি পুনরায় জয়পুরের রাজপুত

রাজাদের কাছে বেশীদিন রইলেন না। আবার ভরতপুরে ফিরে এলেন। সেখানের নতুন রাজা তাঁকে আগ্রার শাসক নিযুক্ত করলেন। প্রকৃতপক্ষে, রেইনহার্ড আকবর যে কাজ শুরু করেছিলেন সেই কাজ সুসম্পন্ন করতে ব্রতী হলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আগ্রায় একটি ক্ষুদ্র ক্যাথলিক চার্চ ছিল, অতিশয় সহনশীল মোগল সম্রাটরা এই চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন। রেইনহার্ড যখন গভর্নর হলেন তখন এই চার্চটি সম্প্রসারণে উদ্যোগী হলেন। তখন সেই চার্চটির মেরামতি কাজের ভীষণ প্রয়োজন ছিল। রেইনহার্ড সেই চার্চকে তাঁর নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাসের এক সৌধে পরিণত করতে প্রয়াসী হলেন। আজো একটি খিলানের উপর প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে—

SUMPTIBUS
D
WALTERY REINHARDT
CURA
R. P. F. X. W.
S. J.

এই লাতিন কথাগুলির অনুবাদ: "মিঃ ওয়ালটার রেইনহার্ড কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ থেকে এবং রেভারেণ্ড ফাদার এফ. জাভিয়ের ওয়েণ্ডেল, এস, জে-র প্রযত্নে এই গির্জা গড়ে উঠেছে।" এখানে উল্লেখ্য যে নোটি এই প্রায় উল্লিখিত লিপিটির পাঠ 'রেইনহার্ড' করেছেন। অথচ কীগান পাঠ করেছেন 'রাইনহার্ট'। এই রেভারেণ্ড ফাদার ওয়েণ্ডেল একজন জার্মান জেসুইট। তিনি তাঁর যাজকীয় এবং বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ভারতীয়দের কাছে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করেছেন।

যাই হোক, এই দ্বিতীয়বারও ওয়ালটার আগ্রাতে বেশীদিন টিকে রইলেন না। তাঁর খ্যাতি ইতিমধ্যে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল এবং প্রতিবেশী রাজ্যও ইংরাজদের হাত থেকে দুর্বল মোগল সাম্রাজ্যের রক্ষার প্রয়োজনে 'রেইনহার্ড-সোমরু'র প্রয়োজন হলো সর্বাধিক। প্রধান উজীর জুলফুক খান সমরু এবং তাঁর বাহিনীকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করে আনলেন। তাঁকে এবং তাঁর বাহিনীকে মাসে ৬৫,০০০ টাকা মাহিনা দিতে চাইলেন।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে সমরু যমুনার তীরবর্তী রাজধানীতে গমন করলেন। সেই

বছরই এক বিরাট গৃহযুদ্ধ সুরু হল যখন মোগল রাজকুমার নওয়াব সপতর খান বিদ্রোহ করলেন নিজের সৈন্যদল নিয়ে এবং প্রধান উজীরের পদ দখল করলেন। ভীষণ সংকটকালে সমরু সম্রাট শাহ আলমের (২য়) সিংহাসন রক্ষা করলেন সেই সঙ্গে মুদসুক খানের প্রধান উজীরত্বও বজায় রইল।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট এই জার্মান ভাগ্যান্বেষীকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করলেন তাঁকে একজন নবাব বানিয়ে, কারণ তিনিই তখন প্রধান সেনাপতি। নতুন নবাব 'সারদানা' অঞ্চলের জায়গীর পেলেন, এই অঞ্চল দিল্লী দরওয়াজা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সারদানা নগরীর ওপর তাঁকে দিলেন যুগ যুগব্যাপী ঐতিহাসিক খ্যাতি সম্পন্ন অঞ্চল পাণিপথ ও হস্তিনাপুর।

এই নতুন রাজত্ব বা জায়গীর আলতামঘা জায়গীর বা বংশানুক্রমিক জায়গীর জাতীয়। এই ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ পরে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান লালফিতার যাঁতাকলে রেইনহার্ড-সমরু পরিবারের শেষ বংশধরকে মালিকানা বিষয়ে দাবী প্রমাণ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। তাঁর নাম ডেভিড-অকটার লোনী-ডাইস (সমবার)।

নোটি সারদানার শাসক গোষ্ঠীর জায়গীরদারি সংক্রান্ত আইন যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

> মোগল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ জোতজমির সঙ্গে জার্মানিক জাতি সমূহের সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন জাতির দেশান্তর গমণাগমনের পর যে অবস্থা ছিল অনেকটা তদনুরূপ। যখন কেন্দ্রীয় মোগল রাজশক্তি ভেঙ্গে পড়ছিল এবং সামরিক শক্তির সমর্থনের প্রয়োজন যখন তার সর্বাধিক তখনই এইসব জোত জমিদারী একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সেই সময় জায়গীরের মালিক ক্রমশঃ সমস্ত সার্বভৌম অধিকার তাঁদের জমিদারীর মধ্যে গ্রহণ করে বংশানুক্রমিক জোত হিসাবে নিজেদের জমিদারী চালাতেন। সমরুর জায়গীর সম্পর্কে এই একই ব্যাপার ঘটল। কারণ আমরা জানি তাঁর বিধবা সমরুর জায়গীরে পূর্ণ অধিকার বিস্তার করলেন এমন কি জীবন ও মৃত্যুরও ওপর। জায়গীরের অধিকারীকে জায়গীরদার বলা হত—এই নামটি সামন্তান্ত্রিক ব্যারণের অনুরূপ। এইভাবে সমরু ব্যারণের অনুরূপ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আরো উচ্চ আসনে উন্নীত হলেন কারণ তার রাজত্বের

নাম হল সারধানা রাজ্য। আর ইংরেজরা সর্বদাই তাঁর স্ত্রীকে 'বেগম' বলে সম্বোধন করতেন। সমরু একজন বাদশা। ট্রাসবুর্গের উৎসাহী কলাকুশলী ব্যক্তিটির এই সম্মান প্রাপ্য ছিল। তাঁর চরিত্র যাই হোক, অনেক সময় তাঁর চরিত্র বিষয়ে কলঙ্ক প্রচার করা হয়েছে এবং অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, তাঁর সমকালীনরা সমরু-প্রতিভা স্বীকার করতে আপত্তি করতেন না।

সমরুর জোত, সারধানারাজ্য হিসাবে ১৮৩৬ পর্যন্ত যা খ্যাত ছিল, দোয়াব অঞ্চলে অধিষ্ঠিত ছিল, পূর্বদিকে যমুনা থেকে প্রায় গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত, উত্তরে মজঃফরনগর থেকে দক্ষিণে আলিগড়ের আশ-পাশ পর্যন্ত। এই রাজ্যের বাৎসরিক রাজস্ব বাবদ আয় ছিল ৬ লক্ষ টাকা। বিনিময় হার অনুসারে ১,২০০,০০০ মার্ক মুদ্রার অনুরূপ।

সারধানার নবাব হিসাবে ওয়ালটার রেইনহার্ড অনেকগুলি বিদ্রোহ দমনে গিয়েছিলেন। এই জন্য উৎকৃষ্টতম মোগল সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে তিনি গ্রেট মোগলদের দ্বারা আগ্রার গভর্ণর বা সুবাদার হিসেবে নিযুক্ত হলেন। এইভাবে একজন ভাইসরয়ের মত শক্তির অধিকারী হলেন দ্বিতীয়বার—সেইখানে তিনি এক জাঁকজমকপূর্ণ দরবার রেখেছিলেন।

তথাপি এই জার্মান নবাবের গৌরব দীপ শীঘ্র নির্বাপিত হল। সারধানার ইতিবৃত্তকারের রচনা থেকে উধৃতি দেওয়া যাক:

সমরুর তখন ৫৮ বছর বয়স, আগ্রার গভর্ণর পদে তিনি তখন পরিপূর্ণ ভাবে কাজ করছেন। এই সময় মৃত্যু দূত তাঁকে তাঁর জাগতিক কর্মকাণ্ড থেকে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে ডেকে নিলেন। পাদ্রিটোলা বা পাদ্রে সান্তো নামক স্থানের ক্যাথলিক গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হল। তাঁর শোকমগ্ন স্ত্রী তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে সেই সমাধির ওপর একটি সুদৃশ্য সৌধ নির্মাণ করলেন···

সমরুর একমাত্র, কিন্তু অবৈধ সন্তানে বয়স তখন মাত্র চোদ্দ বছর। ছেলেটির মানসিক গঠন অপূর্ণ ছিল এবং ইতিমধ্যেই অসৎ পথে তার তীব্র আগ্রহ দেখা যাচ্ছিল। সুতরাং পরিষ্কার ভাবেই দেখা যায় যে জোতদারির ব্যাপারে বা বাহিনীর অধিনায়কত্ব করার পক্ষে সে সম্পূর্ণ অক্ষম। তথাপি, শাহ আলম সমরুর

সহায়তার কথা স্মরণে রেখে মৃত ব্যক্তিকে তাঁর পুত্রের মাধ্যমে সম্মানিত করতে আগ্রহী হলেন ; ফলে তিনি যে জোতজমি এই তরুণের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার অনুমতি দিলেন তা নয়, তাঁকে সম্মানসূচক নবাব উপাধিও দান করলেন। সুতরাং সমরু তনয় সরকারি কাগজপত্রে নবাব বা নবাব জাফর খান এই নামে উল্লিখিত হয়েছেন। অপর দিকে সমরুর বিধবা পত্নীর পুরুষোচিত চরিত্র এবং দৃঢ়তার কথা যে শাহ আলমের অজানা ছিল তা নয়, সুতরাং তিনি তাঁর কর্মচারীদের অনুরোধানুসারে এই বেগমকে সেনা-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং জোতজমির প্রকৃত মালিকানা দিতে দ্বিধা করলেন। তাঁর নাম হল বেগম সমরু। এইভাবে ভারতবর্ষ সবিস্ময়ে দেখল পুরুষালি রমণীর প্রাচীন উপকথার কাহিনী সত্যে পরিণত হল। প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল এই আধুনিক 'পেন্থিশীলিয়া' একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর প্রধান হয়ে রইলেন। শুধু সেনাধিনায়ক নয়, বেগম হিসাবেও তিনি প্রায় ৫৮ বছর কাল ধরে একটি ক্ষুদ্র জাতির উপর শাসন ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। তাঁর দরবার ছিল জাঁক জমকপূর্ণ এবং তার বেসামরিক ও সামরিক শাসন ব্যবস্থা সর্বত্র তাঁকে (একটু স্বল্প পরিমাণে হলেও) তাঁর সমকালীন ক্যাথরিণ দি গ্রেটের সমতুল করে তুলেছে।

আমরা পূর্বেই দেখেছি সারধানার রাজত্বের ভার তরুণ এলয়স বালথাসার রেইনহার্ডের ওপর পড়েছিল তার পিতার মৃত্যুর পর। প্রথম নবাব রেইনহার্ড-এর দুইবার বিবাহ হয়। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী এশিয়া ও য়ুরোপের যে সব অঞ্চল ভারত সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ছিল সেই সব অঞ্চলে বেগম সমরু নামে খ্যাত ছিলেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে বেগম এবং তাঁর সপত্নী তনয় ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন। বেগম সারধানাকে সুন্দর প্রাসাদমালা ও বৃহৎ গির্জাদির দ্বারা শোভিত করলেন ; তিনি ইংরাজী ভাষায় ষোড়শ পোপ গ্রেগরীকে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখের এক পত্রে :

"হে পবিত্রপুরুষ, আপনাকে আমি আমার চার্চের লিথোগ্রাফিক প্রতিলিপি পাঠাচ্ছি। আমি বলতে গর্ববোধ করছি এই চার্চ ভারতবর্ষের আজো অতুলনীয় এবং সুন্দরতম বলে স্বীকৃতি পেয়েছে।" তৎকালে চার্চের বয়স ছিল ঠিক বারো বছর। ওয়ালটার রেইনহার্ডের গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত

কাজকর্মের এ এক পুনরাবৃত্তি—এই কাজ তিনি বিস্তারিতভাবে করেছেন বিশেষতঃ আগ্রা শহরে। যে সব প্রাসাদ তিনি গঠন করেছেন তার মধ্যে সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য উন্মুক্ত এক সুবৃহৎ দেবালয় বা মঠ অন্যতম।

সারধানার গির্জা যাকে ভারতস্থিত জার্মানরা 'ডোম ফন সারধানা' (সারধানা ক্যাথিড্রাল) বলে উল্লেখ করতে ভালবাসেন তার মধ্যে সেই প্রাণশক্তি বর্তমান যা আরো অনেকের মত প্রাক্তন পেশাদার ও ঘোড়-সওয়ার ওয়াল্টার রেইনহার্ড তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে আন্তর্জাতিকতার সুরে উৎসর্গ করেছেন। এই গির্জার প্রধান তোরণগাত্রে লাতিন ভাষায় উৎকীর্ণ আছে :

"বিশেষভাবে খ্যাত কর্ত্রী যোহান, সারধানার বেগম নিজব্যয়ে এই গির্জা নির্মাণ করেছেন। রোমান ক্যাথলিক রীতি ও আচারানুসারে ভার্জিন মেরীর আনুকূল্যে এবং নামে প্রভুর বৎসর ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে উৎসর্গীকৃত।"

এই লিপি গির্জার কাজ শেষ হওয়ার স্মারক, গির্জা নির্মাণের সূচনার কথা একটি পারসিক লিপিতে উৎকীর্ণ। লাতিন ভাষার লিপির ঠিক পরে তা উৎকীর্ণ আছে—এইখানে বেগম যোহানকে জেব-উন্নিসা বলে উল্লেখ করা হয়েছে :

"বা ইমদাদ-ই-খুদা-ফজল মাসিস, বাসল-ই-হাদসদে সাদ আসারিন-ও-আশনা বাদিল জেব-উন্নিসা উমদা আরাকিন বানা ফারমূদ আলিসান কালিসিয়া "(ঈশ্বরের সহায়তায় এবং খ্রীষ্টের কৃপায় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের এই গির্জা নির্মিত হল জেব-উন্নিসার অভিলাষানুসারে)।

ইন্দো-জার্মান শাহজাদা এলোয় বালথাসার রেইনহার্ড সমরুর বিবাহের ফলে এক কন্যা জন্মায়। তাঁর সঙ্গে সমরু বাহিনীর জনৈক কর্ণেল জর্জ ডাইসের বিবাহ হয়। এই বিবাহেরও একটি মাত্র সন্তান—ডেভিড অকটারলোনী ডাইস, বিবাহসূত্রে তিনি ব্রিটিশ লর্ড বংশের অন্তর্ভুক্ত এবং ওয়ালটার রেইনহার্ড এবং বংশের প্রত্যক্ষ বংশধর।

বর্তমান কালে অতীতের এই কাহিনী উপস্থাপনসূত্রে এইখানে উল্লেখ করা যায় যে কয়েক বছর পূর্বে অনেকগুলি ফ্রাঙ্কোনিয়ান শাখা সমূহের অন্তর্গত—রেইনহার্ড—রাইনহার্ট পরিবারে অনেকেই সারধানার সম্পত্তির অংশের জন্য আইনগত দাবী জানান। এই সম্পত্তি তখন বৃটিশ সরকারের

অধিকারভুক্ত। কিন্তু যেহেতু সমরু পরিবারের শেষ বংশধর ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে মারা যান সেই হেতু তাঁর সম্পত্তি তাঁর বিধবা পত্নীর অর্শে। সুতরাং সমগ্র ঘটনাটি ইতিহাসের পরিহাসে পরিণত হয়। সমরু এবং সারধানার বংশধরদের দ্বারা হাজার হাজার মানুষ লাভবান হয়েছেন। অংশতঃ সক্রিয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্রিটিশ বিরোধী নীতির জন্য তাঁরা কিছুতেই ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ত্যাগ করবেন না।

জার্মান শকুন্তলা অনুভব

যেথায় থাকে শকুন্তলা তার
অদৃশ্য সন্তান নিয়ে,
দুষ্মন্ত যেখানে তাকে নতুন করে পায়,
নতুন করে পায় বিধাতার কাছ থেকে,
সেই পবিত্র ভূমি তোমাকে প্রণতি জানাই,
তুমি ধ্বনির মধ্যে প্রধানতম
তুমি হৃদয়ের স্বর,
তুলে নাও আমাকে মাঝে মাঝে
সেই স্বর্গীয় স্তরের মাঝে, তুলে নাও।

—হেরদের

যোহান গট্‌ফ্রিড হেরদের (১৭৪৪-১৮০৩) এইভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রণতি জানিয়েছেন (রোমান্টিসিস্টদের ভঙ্গিতে বলতে গেলে) ভারতের সাহিত্যিক নিসর্গ চিত্রপটে যে সর্বোত্তম সুন্দরী রমণী বিচরণ করেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে এই প্রণতি। জিওরজ ফরষ্টার (১৭৫৪-১৭৯৪) এই নারীকে জার্মানীর বিদগ্ধ দৃশ্যপটে উপস্থাপিত করেছেন। মানচিত্রে এবং প্রকৃতিতে বলিষ্ঠ আবিষ্কারের অভিযাত্রিক আনন্দে অভিভূত এই লেখক রাইনহোলড ফরেষ্টারের পুত্র। ফরেষ্টার ছিলেন ১৭৭২-১৭৭৫-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত বিরাট বিশ্ব পরিক্রমার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষক। এইকালে বালক জিওরজকেও পিতার অনুগমনে অনুমতি দেওয়া হয়।

জিওরজ ফরষ্টার ছিলেন প্রকৃত পর্যটক। সমগ্র মানবিক ভূমি তিনি বিচরণ করেছেন। বিপ্লবীর নিষ্ঠা নিয়ে তিনি নিপীড়িতের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন। সব জাতির জন্য সমান অধিকারের জন্য তিনি লড়েছেন। তিনি হৃদয়গ্রাহী আবেদন এবং আবেগহীন প্রবন্ধাদি রচনা করে এবং পরিচ্ছন্ন রচনা এবং প্রবন্ধাদির দ্বারা তাঁর মতবাদ প্রচার করেছেন। এই মানুষটি সন্ধানীর বিরামবিহীন অন্বেষার দ্বারা জার্মান জাতিকে ও কন্টিনেন্টের অন্যদের ভারতীয় শকুন্তলার প্রভাবে পড়ে এই অবদান উপহার দেন।

শকনতলা—ফরষ্টার স্তার উইলিয়াম জোনসের কাছ থেকে এই বানান গ্রহণ করেছেন এবং ধ্রুপদী ও রোমান্সবিদ লেখকদের সেই বানান দান করেছেন। শকনতলা—কালিদাসের নাটকের নায়িকা, তিনি আমাদের চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতাব্দীতে এই নাটক রচনা করেন, উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যে শক্তিশালী গুপ্ত সম্রাটদের প্রভাবে রাজনৈতিক ও বিদগ্ধ অভ্যুত্থানের আশ্চর্য পটভূমি সেইকালে রচিত হয়েছিল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে বাসকালে যে অতুল ঐশ্বর্য সংগ্রহ করে এনেছিলেন ফরষ্টার, শকুন্তলা তার অন্যতম অংশ।

এই নাটকের কাহিনী অংশ অতি দ্রুত কথিত। মেনা (মেনকা) এবং ঋষি বিশ্বামিত্রের পরিত্যক্ত তনয়া শকুন্তলা। অরণ্যের পাখিরা তার জন্য খাদ্য নিয়ে আসত (তার নামের সঙ্গে এইসব প্রথম যুগের হিতকারীদের যোগ আছে)। যতক্ষণ না কণ্বমুনি এই সুন্দর প্রাণীটিকে দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করেছেন ততদিন এইভাবে চলেছে। কণ্বমুনি মেয়েটিকে পালন করতে লাগলেন। একদিন শীকারে বেরিয়ে রাজা দুষ্মন্ত তাকে আবিষ্কার করলেন এবং ভগবান সাক্ষী রেখে দুজনের ভাগ্য একসূত্রে গ্রথিত হল অর্থাৎ উভয়ে গন্ধর্ব বিবাহে আবদ্ধ হলেন। শকুন্তলাকে তাঁর অভিজ্ঞান যুক্ত অঙ্গুরী প্রদান করলেন, এই নাটকে সেই অঙ্গুরীয় এক বিশেষ ভূমিকা। প্রেমিক-প্রেমিকারা বিচ্ছিন্ন হলেন এবং পরে আবার যুক্ত হলেন—দুজনের দেখা হল—তাদের পুনর্মিলন ঘটল, শকুন্তলার অচঞ্চল সতীত্বের পুরস্কার। জার্মান সাহিত্যে কালিদাসের গীতি-নাট্যের এই নায়িকা ভারতীয় নারীত্বের প্রতীক। চরিত্রের দৃঢ়তা, ভাবাবেগের পবিত্রতা, কোমলতা এবং প্রেমের ব্যাপারে একনিষ্ঠতা এই নাটকের মুখ্য বক্তব্য হওয়ায় গোড়া থেকেই এর সাহিত্যিক চরিত্র মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

ইংলণ্ডে থাকা কালে ফরষ্টার সাধারণভাবে আপনাকে বিশেষ করে ভারতের ব্যাপারে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর কাছে, ভারতবর্ষ মর্যাদা মণ্ডিত উদারতা এবং সারল্যের এক প্রতীক। তাঁর অল্প বয়সে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর এক অভিজ্ঞতা হয়ত তাঁকে এই পথে চালিত করেছে, সাউথ সী আইল্যাণ্ডের রত্নমালার অন্যতম তাহিতির উপকূলে এসে পৌছলেন এবং সেখানকার মানুষের নির্ভার সুখবোধ এবং আশ্চর্য সারল্যে মুগ্ধ হলেন। সুতরাং এটা নিছক একটা সাধারণ ঘটনা নয় যে ইংলণ্ডে যাত্রার প্রাক্কালে তিনি (১৫ই মার্চ ১৭৯০) সফি লা রোসকে ভারতের ব্রিটিশ গভর্ণর জেনারেল

ওয়ারেন হেস্টিংসের ও তাঁর স্ত্রীর কাছে একটি পরিচয় পত্র দিতে অনুরোধ জানান:

> আমি আপনার বন্ধু সেই আকর্ষণীয় মানুষটি এবং মহিলাটির সঙ্গে পরিচিত হতে চাই; এবং যেহেতু এই দেশ ও তার অধিবাসীদের সমীক্ষার ব্যাপার জড়িত, আমি দুজনের সঙ্গেই কথা বলতে চাই ভারতবর্ষ এবং তার অধিবাসী বিষয়ে, আমি দেখতে চাই আমার দেখা তাহিতিদের ভারতবাসীদের মধ্যে কতটুকু খুঁজে পাই, কারণ আর যাই হোক ওদের থেকেই সম্ভবতঃ এরা উদ্ভূত হয়েছে।*

জিওরজ ফরষ্টার কোনোদিন স্বচক্ষে ভারতবর্ষ দেখার সুযোগ পাননি কিন্তু তাঁর ভারত প্রীতির ফলে তিনি একজন সন্ধানী প্রেমিকের মতো মূল্যবান সম্পদের সন্ধান পেয়েছেন। শকনতলা—শকুন্তলা যেন বৈদগ্ধ্যের বিস্ফোরণ এবং ধ্রুপদী মনোভাবাপন্ন জার্মান সাহিত্য সমাজকে তা অগ্নিদগ্ধ করেছে। এই কাজ বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের প্রকৃতির রূপান্তর ঘটিয়েছে, এবং রোমান্টিসিজমের মনোভঙ্গীর যথাযথ অনুমান করেছে। শকুন্তলার ইংরাজী অনুবাদের ফরষ্টারের জার্মান অনুবাদ, যা তাঁর বন্ধু স্পেনার কর্তৃক প্রকাশিত হয় তেমন সাফল্যলাভ করেনি। স্পেনার ছিলেন অতি সতর্ক এবং দ্বিধাগ্রস্ত মানুষ। তিনি আগুনভরা মানুষ ফরষ্টার কর্তৃক ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই তারিখে লিখিত পত্র পেয়ে থাকবেন। এই চিঠিখানি কিঞ্চিৎ সংশয় সহকারে সংরক্ষিত হয়—

> আমি ইংলণ্ড থেকে নিয়ে এসেছি ভারতীয় নাটক শকনতলা বা ফ্যাটাল রিঙ্। এটি অনুবাদ করেছেন স্যার ডব্লু. জোনস কালিদাসের লিখিত মূল সংস্কৃত থেকে—কালিদাস ১৯০০ বছর আগের বিখ্যাত ভারতীয় কবি! এই নাটকের অন্তর্নিহিত গুণের জন্য এর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিদান করা উচিত। শিশুসুলভ সারল্য এবং নাটকের শিল্পরীতির বাঁধন না থাকলেও এর মধ্যে আছে সূক্ষ্ম সুর, গভীর ভাবাবেগ এবং কাব্যিক আমেজ। আমি আমার

---

* কিছুকাল ধরেই পলিনেশীয়দের ভারতীয় বংশক্রম স্বীকৃত হয়েছে, বা সম্ভব বলে ধরা হয়েছে। দায়িত্বশীল বৈজ্ঞানিকদের মতে, যথা এস. পার্শী স্মিথ: হাওয়াই কি, দি হোমেনস্ অব দি মাওরী, ২য় সংস্করণ, ওয়েলিংটন, ১৯০৪; টে-রানগী হিরোআ, স্যার পিটার বাক: দি কমিং অব মাওরী, ওয়েলিংটন, ১৯৫০।

বন্ধু হুবারের সহযোগীতায় অনুবাদ করেছি (হুবার হলেন 'দাস হাইমলিখ গেরিখট্‌' নামক গ্রন্থের লেখক)।*

তুমি এটি সুন্দর করে ছাপাবে—প্রতি ফর্মা এক করোলাইন হিসাবে। এই নাটকটি বিশেষ আকর্ষণমূলক। তুমি নিশ্চয়ই এই সঙ্গে প্রেরিত নমুনা যা আমি শীল্যারের থালিয়ায় রেখেছি তা দেখেই বুঝবে।

স্পেনার শকনতলা মুদ্রণ করেন নি। এই উৎসাহপূর্ণ চিঠিখানির কোনো উত্তর না পেয়ে ফরষ্টার তাঁর পাণ্ডুলিপি পাঠালেন পুস্তক-ব্যবসায়ী মেইনৎসের যোহান পিটার ফিসারকে। তিনি নাটকটি তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করলেন প্রকাশার্থে।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল তারিখে ভূমিকাংশে ফরষ্টার তাঁর নাম স্বাক্ষর করেন। কয়েক সপ্তাহ পরে এই রচনাটি অনুবাদকের কাছে ফেরৎ এল—সুন্দরভাবে ৩৬৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ফরষ্টার ঠিক কোনদিন এটি হাতে পেয়েছিলেন সেই তারিখ আমাদের জানা, ১৭ই মে ১৭৯১। সেই দিনই তিনি এই নাটকের কপি গ্যয়তে, হেরদার ও তাঁর শ্বশুর ক্রিশ্চিয়ান গটলব হেইনেকে পাঠালেন। হেইনে ছিলেন গটিনগেনের দর্শনের অধ্যাপক। এছাড়া অন্যসব বন্ধুদের এবং পরিচিতদেরও বই পাঠান হল।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের এই দিনটি প্রকৃতপক্ষে জার্মান সাহিত্যের বসন্ত দিন। তৎক্ষণাৎ প্রাচীনের সঙ্গে সঙ্কীর্ণ আকর্ষণ প্রসারিত হয়ে নতুন দিগন্তের আভাস পাওয়া গেল। প্রাচীন ভারতীয় কবির কুঞ্জের এই সুন্দরী মেয়েটি সম্পর্কে স্নেহ ও আনন্দময় প্রশস্তির প্রবাহ চারিদিকে প্লাবিত করে দিল। ভূগোল এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে মহৎ-কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য স্থির সঙ্কল্প বৈপ্লবিক পর্যটক এক সুদূর অজ্ঞাত লোকের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিলেন। রোমান্টিক ভাবাবেগে চালিত জার্মান ভারততত্ত্বের সেই উষা লগ্নটি সহজেই বোঝা যায়,—কাব্যিক-বাসনা, বৈজ্ঞানিক নয়—এই বাসনা ছিল সিন্ধু ও গঙ্গার দেশকে জার্মান বুদ্ধিগত দর্শনের পরিধির মধ্যে টেনে আনা।

---

* এই সহযোগীতা কিন্তু অসম্ভব একথা লুডভিগ গীইগার, লুডভিগ ফার্দিনান্দ হুবার এবং কে এ বটিগার-এর মধ্যে লিখিত পত্রাবলীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন। থেরেসি হুবার কর্তৃক লিখিত হুবারের জীবনীতেও কোনো উল্লেখ নেই। অথচ অন্য সব গ্রন্থাবলীতে হুবার এবং ফরষ্টার সহযোগের কথা বিশেষ ভাবে উল্লিখিত আছে।

শকনতলার ভূমিকাংশে ফরষ্টার লিখেছিলেন যে কাজের আকর্ষণ 'পাঁচটি কি সাতটি অঙ্কের জন্য নয়। মানবিক অনুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবাবেগ গঙ্গানদীর কৃষ্ণবর্ণ মানুষরা রাইন বা টাইবার বা ইলুসিসের আমাদের শ্বেতাঙ্গদের মত সমান কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়েছেন।' পরিশেষে যে মানুষটি এই ভারতীয় সাহিত্য কর্মটিকে জার্মানদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর শকনতলা সম্পর্কে এই আশা পোষণ করেন:

"হয়ত তার জন্যই অনেকের মনে ভালবাসা জাগবে, তার নিজের স্বদেশের মহৎ আতিথেয়তাটুকু হারিয়ে যেতে দেবেনা।" 'স্থানীয় ও সাধারণ জ্ঞান' নামক একটি প্রবন্ধে ফরষ্টার আবেদন জানিয়েছেন—"আমাদের অন্তরে বা বাহিরে যে শক্তিমত্তা আছে তার প্রতিটি চিহ্ন একত্রিত করে চয়ন করে নিতে হবে—মানব অধ্যুষিত পৃথিবীর সকল অঞ্চলে যে কবিতা প্রতিভার যে পুষ্পসম্ভার ছড়ানো আছে তা সযত্নে আহরণ করতে হবে।"

সকল প্রকার বহুমুখী এবং উচ্চমানের সৃষ্টির স্বপক্ষেও তিনি অনুরূপ আবেদন জানিয়েছেন। এই ব্যাপারে তিনি গটিনজেনের দার্শনিক ক্রিসটফ মেইনার্সের উত্তম এবং অধম মানুষে বিভাজন ব্যবস্থা সোজাসুজি অগ্রাহ্য করেছেন।

শকুন্তলাকে যাঁরা সর্বপ্রথম প্রশস্তি জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ফরষ্টারের শ্বশুর হেইনে (১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই) অন্যতম,—'গটিনজেন নোটস অন লার্ণেড ম্যাটারস' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত এক সমালোচনায় তিনি প্রশস্তি জ্ঞাপন করেন। কালিদাসের নাটকের একক চরিত্রাবলীর সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে এই সব চরিত্রগুলি য়ুরোপের জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বাংলাদেশের ব্রিটিশ সুপ্রিম জজ বা প্রধান বিচারপতি, মাননীয় স্যার উইলিয়াম জোনস। হেইনে শকুন্তলা মেয়েটিকে উচ্চ প্রশংসায় চিহ্নিত করেন:

> 'দুষ্মন্ত বা শকুন্তলা কারো চরিত্র দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হয়নি আমাদের নাটকীয় মঞ্চের প্রয়োজন মাফিক, যদ্বারা প্রচণ্ড সংঘাত সম্ভব। কিন্তু মেয়েটি তার স্বাভাবিক, সরল, আত্মসমর্পিত ভঙ্গী এবং ভাবাবেগ জড়িত চরিত্রের জন্য আকৃষ্ট করে। এইসব বিবেচনা করতে হবে এই ভেবে যে এই কাহিনী এক সারল্য ও নিষ্পাপ আশ্চর্য জগতের প্রাচীন যুগ থেকে আহরিত এবং একজন ভারতীয়

কবির মানসিকতা আবহাওয়া ও ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সীল্যার এই আসন্ন প্রকাশ গ্রন্থটি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর দশ সংখ্যক জার্নাল 'থালিয়া'য় এই নাটকের একটি দৃশ্য প্রকাশিত করেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে লিখিত উইলহেলম হুমবোলডটকে একটি পত্রে তিনি উৎসাহ ভরে ঘোষণা করেন যে—'সমগ্র প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে নারী চরিত্রের এবং তার পবিত্র প্রেমের এমন সুন্দর কাব্যিক চিত্রণ আর দেখা যায় না।' এমন কি সাত বছর পরেও গ্যয়টেকে লিখিত একটি পত্রে তিনি স্বীকার করেন (২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮০২) :

> 'সেদিন গীতগোবিন্দ পড়তে বসে আবার শকনতলায় ফিরে গেলাম। কেন? আমি এই নাটকটিকে মঞ্চস্থ করা যায় কিনা এই চিন্তা করছিলাম। কিন্তু মনে হয় থিয়েটার সোজাসুজি এর বিরোধী, কারণ বত্রিশটি বায়ুর মাত্র একটি বায়ু এই তরণীকে এই দেশে ভাসতে দেবেনা। বোধহয় এর কারণ তার প্রধান বৈশিষ্ট্য অথাৎ নম্রতা আর সেই সঙ্গে গতিশীলতার অভাব, কারণ কবি ভাবাবেগ এমন ভাবে বয়ন করেছেন যা মৃদুতালের সঙ্গে সঙ্গতি সম্পন্ন। কারণ এখানকার আবহাওয়া শ্লথগতির প্রয়োজন হয়।'

প্রসঙ্গতঃ, কার্ল ভিকটর বনস্টেটেন একদা সীল্যরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন একজন আল্পস্ পর্বতস্থ বনচর মানুষের কাহিনীর (উইলিয়াম টেল) প্রতি, যার ফলে সীল্যরের কল্পনার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়। বিশেষ করে শকনতলা থেকে একটি অনুরূপ বিষয়বস্তুর সঙ্গে তিনি আগে থেকে পরিচিত ছিলেন বলে তিনি উৎসাহিত হন। এই কারণে আজ আমরা সীল্যরের সেই বিখ্যাত ব্যালাড পেয়েছি। কালিদাসের নাটক থেকে প্রেরণা উদ্ভাসিত হয়ে আসার এ এক প্রমাণ।

হেরদের মানবিকতা বষয়ে ধারণা যা 'আইডিয়াস অন দি ফিলসফি অব দি হিসট্রি অব দি ম্যানকাইনড' বা 'মানব সমাজের ইতিহাসের দর্শন-বিষয়ক ভাবনা' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তার সঙ্গে ফরষ্টারের চিন্তার সাদৃশ্য আছে। যাই হোক, ভারত সম্পর্কে তাঁর চিন্তা কিন্ত এখনও অতিশয় রোমান্স আশ্রিত। আনন্দের অভিব্যক্তি নয়, উচ্ছ্বসিত বাহুল্য নিয়েই হেরদের কালিদাসের কবিতাকে গ্রহণ করেন। একটি চিঠিতে (১৪ই নভেম্বর,

১৭৯১) ফরষ্টারকে এই সলজ্জ কোমলা নায়িকা সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'প্রাচ্যের একটি প্রকৃত পুষ্প এবং এ হল এ শ্রেণীর মধ্যে প্রথম ও সুন্দরতম।'

শকুন্তলা ধ্রুপদী প্রজন্মের কবিদের দ্বারা বারবার উল্লিখিত শব্দ। ভারতের কাব্য-কাননের এই মনোহর প্রাণীটি মন্ত্রমুগ্ধ করেছে এবং নবজন্ম দান করেছে। ফরষ্টারের কাছ থেকে শকুন্তলা এক খণ্ড পাওয়ার মাত্র একটি পক্ষকালের মধ্যেই অনুবাদক ফরষ্টার জার্মান কবি গ্যয়টের কাছ থেকে ধন্যবাদসূচক পত্র পেলেন। গ্যয়টের পত্রখানি সংরক্ষিত নেই, যা সংরক্ষিত হয়ে আছে তা সেই স্মরণীয় উক্তি—monumentum aere perennius—এতদ্বারা গঙ্গাতীরস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতরা কিভাবে জার্মানীর বিদগ্ধ সমাজকে সম্মোহিত করেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্বারা কালিদাসের মানসকন্যা জার্মানীতে এক চিরস্থায়ী আশ্রয় পেয়ে গেল। গ্যয়টের এই কবিতাগুলির দ্বারা এই সাহিত্যের এক বৈশিষ্ট্যের ও প্রাসঙ্গিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, ক্লাসিসিজম ও রোমান্টিসিজমের সেই ফলপ্রসূ দশকের পক্ষে এ এক বিশেষ আবিষ্কার :

"নববর্ষের কুসুম কি আমি না বর্ষশেষের ফল
আর সেইসব যা আত্মাকে মোহিত করে, আকুল করে, পূর্ণ করে ?
আমি কি একই সংযুক্ত নামে আকাশ আর মাটি—
আমি তোমার নাম উচ্চারণ করি শকুন্তলা, আর সব বলা হয় তৎক্ষণাৎ !"

এইসব পদ্যগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত আত্মীয়তার যোগ লক্ষ্য করতে ভোলেননি হেরদার। গ্যয়টে পরে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে গোথা থেকে প্রকাশিত Zerstreute Blätter বা ঝরাপাতা নামক তাঁর চতুর্থ কাব্য-সংগ্রহে পরবর্তী আকারে এই কবিতা নতুন করে রচনা করেন, এই কবিতা আজও সর্বত্র পরিচিত :

"তুমি কি নববর্ষের কুসুম এবং বর্ষশেষের ফল
আর সেইসব যা আত্মাকে মোহিত করে, আকুল করে, পূর্ণ করে ?
আমি তোমার নাম করি শকুন্তলা
আর তখনই সব কিছু বলা হয়ে যায়।"

এই ধরণের সম্বোধনে এই ক্ষুদ্র কবিতা ক্রমে সমগ্র জগৎ জয় করে।

কতগুলি উৎসাহী প্রজন্মে এই কবিতাবলী প্রশংসাসূচক মন্ত্রের মত এবং ভারতমাতার ব্যক্তিসত্তার কুমারী প্রয়াস। প্রখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যবিদদের একজন, সেজি (chezy) তাঁর নিজের গ্রন্থের নামপত্রে এই কবিতাটি উৎকীর্ণ করেছেন। কবি, এবং বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের কাছে, যাঁরা দর্শনের

ক্ষেত্রে বা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উন্নীত হওয়ার বাসনা রাখেন তাঁদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ বিশেষ।

হেরদেরের Zerstreutte Blätter-এর যে খণ্ডে 'শকুন্তলা' সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্ধিত আকারে আছে তার মধ্যে ভারতীয় নাটকের প্রতি প্রশস্তি জানিয়ে তিনখানি পত্রও সন্নিবেশিত হয়েছে। ভূমিকায় হেরদের তাঁর পাঠকদের গ্রন্থটি যথাযথভাবে পড়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন—'য়ুরোপীয় নয়, অর্থাৎ, ভাসমান কৌতূহলে কেমনটি দাঁড়ায় তা দেখলে হবে না, ভারতীয় ধারায় সূক্ষ্ম মনোযোগের সঙ্গে এবং মন্থর অথচ চিন্তাকুলভঙ্গীতে সযত্নে পাঠ করতে হবে।' সেই সংস্করণেই 'শকুন্তলা' প্রবন্ধের সঙ্গে কিছু ভারতীয় নীতিকথার অনুবাদ আছে (Gedanken einiger Bramanen : ব্রাহ্মণের কিছু চিন্তাধারা)।

হেরদের ফ্রিডশির মাজের-এর গ্রন্থ Zur Kulturgeschichte der Völker এবং Adarstea গ্রন্থের ভূমিকায় পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন কি সকৃতজ্ঞভঙ্গীতে ভারতীয় শকুন্তলার বাণী সমগ্র জার্মানভাষী অঞ্চলে গৃহীত হয়েছে। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে হেরদের শকনতলার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। এর ভূমিকায় তিনি ইতিমধ্যে মৃত জিওরজ ফরষ্টারকে প্রশংসা করেছেন—সাহিত্যিক পদাঙ্কানুসারী এই ফরষ্টার তাঁর অনুবাদে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য, ইংরাজী সংস্করণে এর অভাব ছিল। সেকালের ভাইমারে ভারতীয় শকুন্তলা কয়েক দশকের সাহিত্যিক আলোচ্য বিষয় ছিল। এই ভারতীয় নাটক গ্যয়টের 'ভেল্ট লিটারেতুর' বা বিশ্বসাহিত্যের স্বপ্নের এক জবাব। ভারতীয় সাহিত্যের ফসলের দ্বারা সুগভীরভাবে ব্যস্ত থাকায় গ্যয়টের শকুন্তলার সংক্ষিপ্তসার এবং তাঁর অন্য কথার মধ্যে অজস্র ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যথা : Indische Dichtungen নামক ভাবনা থেকে Zahme Xenien-এর নিম্নলিখিত লাইনগুলি :

"আর কি আনন্দ চাই, আর কি জানার আছে !
শকুন্তলা, নল—এদের চুম্বন করি !"

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে হাইনরিখ হাইনে যখন তার ফাউস্ট ব্যালের ভূমিকায় বললেন—গ্যয়টের ফাউস্টের 'মঞ্চ প্রস্তাবনা'য় শকুন্তলার আদর্শে গড়া, শকুন্তলা বিশেষজ্ঞদের কাছে সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত প্রসারিত হল।

কোন প্রকারে ভারতীয় চরিত্র শকুন্তলার নাম হেলেনীয় প্রতিভার কন্যা নসিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধু ভঙ্গিতে পার্থক্য কিন্তু প্রেরণাময়

প্রভাবে শকুন্তলার সঙ্গে একাত্ম। এই গ্রন্থের লেখক অনুমতি প্রার্থী, দুই সাহিত্যসৃষ্টির দুটি বৈশিষ্ট্য এখানে উধৃত করা যাক—জার্মান প্রতিভার যুগে 'হেলাস-বুক' নামক গ্রন্থে ক্লাসিসিষ্ট-রোমান্টিসিষ্ট সঙ্গীতে একটি নারী মুখ্য উপজীব্য হয়ে প্রকাশিত :

> তখনও প্রচলিত নসিক্কা ট্রাজেডির বহিরেখা নিয়ে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল গ্যয়টে সমুদ্রের প্রভাবে সিসিলির উপকূলে বসে ছক প্রস্তুত করেন…চার বছর পরে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বিশ্বপথিক জিওরজ ফরষ্টার তাঁকে শকনতলার প্রথম অনুবাদ উপহার পাঠালেন। হেরদের সোৎসাহে এই গ্রন্থটির প্রশংসা করেছেন। গ্যয়টে, তাঁর দিক থেকে বহু উধৃত চতুষ্পদী রচনা করেন, পরিশেষে কবির স্বীকারোক্তি : 'Nenn ich, Sakontala, dich, und so ist alles gesagt' (আমি তোমার নাম উচ্চারণ করি শকুন্তলা, আর তখনই সব বলা হয়ে যায়)—নসিক্কা অনুভব এবং শকুন্তলা অনুভবের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের দুই বিভিন্ন ভাবজগৎ বিরাজমান।

নসিক্কা এক হোমরীয় স্বপ্ন, সমুদ্র ভরে ছড়িয়ে আছে এক মধুর ভাবাবেগ। আমাদের সামনে দ্বিতীয় আফ্রোদিতের মত দাঁড়িয়ে—সমুদ্র ফেনা থেকে উদ্ভূত কল্পকথা, আর এই আনন্দময় কল্পদ্বীপের সুখী কন্যাটি বিপজ্জনক সমুদ্র থেকে সমুদ্রান্তরে দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় ব্যস্ত ইউলিসিস-ওডিসিয়ুসের দ্বারা প্রলোভিত। নসিক্কা-ওডিসিয়ুস যোগাযোগের পরিবেশটি একটা বিয়োগান্ত সামুদ্রিক উৎক্ষেপ।

সেইকালে জার্মান বুদ্ধির জগতে অপর নায়িকা শকুন্তলাকে আনা হয়েছে. সে এসেছে সুদূর ভারত সমুদ্রের পার থেকে, সে মৃত্তিকার মেয়ে একটি সতী নারীর প্রতীক। সে মেনার কন্যা, মেনকা একজন অপ্সরা—ভারতীয়রা তাদের স্বর্গীয় পরীদের তাই বলে থাকে, আর তার পিতা বিশ্বামিত্র মুনী। অরণ্যে পরিত্যক্ত অবস্থায় তাকে ফেলে রাখা হয়। তাকে আবিষ্কার করলেন রাজা দুষ্মন্ত, দর্শন মাত্রেই প্রেম এবং তৎক্ষণাৎ তাঁকে বধূ এবং রাণী হিসাবে দেবতাদের কাছে শপথ নিয়ে গ্রহণ করলেন। এ বিবাহের নাম গন্ধর্ব বিবাহ। একটি অভিজ্ঞান অঙ্গুরী সততার নিদর্শন হিসাবে দেওয়া হল এবং পরিশেষে

প্রেমিকদের পুনর্মিলন ঘটে। একটা অভিশাপের ফলে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল—এই সব হল কাহিনীর বিষয়বস্তু। ভারতীয় শকুন্তলা একটি গীতিকাব্যধর্মী নাটক।

এই দুটি চরিত্র শকুন্তলা আর নসিক্কা যেন উপকথার পৃষ্ঠা থেকে খড়িতে আঁকা ছবির মত প্রকাশিত হয়ে এসেছে। গ্যয়টের ব্যক্তি সত্তায় তারা এসে মিশেছে, হেলেনীয় ভারতীয় এবং জার্মান জগতের ভাব পরিমণ্ডলকে আহরণ করে তিনি এক সুসমঞ্জস সমন্বয় সাধন করেছেন। দুই শক্তিশালী ধারা এইখানে এসে মিশেছে। নসিক্কা-গ্রীস উদ্ভূত সৌন্দর্য্যের অন্বেষার ধ্রুপদী প্রতীক, আর শকুন্তলা প্রাচ্যদেশীয় রোমান্টিসিজমের আনন্দ সমারোহের প্রতীক। শকুন্তলার সহিষ্ণু নীরবতার চেয়ে পুরুষের সঙ্গে সংগ্রামরত নসিক্কার দ্বারাই গ্যয়টে বেশী অভিভূত হয়েছেন। যাঁর কাছে জাহাজের পাটাতন একেবারে অপরিচিত বস্তু সেই মানুষও এক কোমলা কুমারীতে পরিণত উপকথার প্রেমে পড়লেন। কিন্তু সহিষ্ণু ধরণীর সঙ্গীত, শকুন্তলায় জগৎ—জিওরজ ফরষ্টার দ্বারা বিশ্লেষিত হয়েছে। কালের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে সুদূরের মোহে এক অশান্ত আকুলতায় নতুনের প্রবক্তাদের প্রশস্তি গান করতে অতিব্যগ্র, বিনিময়ে পারিবারিক সুখ এবং বন্ধু পরিমণ্ডল পরিহার করতে হয়েছে।

দীর্ঘকাল ধরে ফরষ্টার-হেরদার-এর ভারত এবং ভারতীয় জগৎ অভিমুখী মনোভঙ্গীর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলে মনে হয়েছে গ্যয়টেকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে উইলহেলম ক্রিসটোফ লিওনহার্ড গারহার্ড (১৭৮০-১৮৫৮) লাইপজিগে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শকুন্তলা প্রকাশের পূর্বে, ভাইমার নগরীর এই সন্তান ভাইমারের মহৎ পালিত পুত্র গ্যয়টের কাছে তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেন এবং গ্যয়টে তাঁকে প্রাণভরে সমর্থন জানান। ভাইমারের কলালক্ষ্মীর পীঠস্থানের অন্যদের মধ্যে দুজন মহিলা সার্লোট ফন সীল্যর এবং ফ্রাউ ফন্ট্টাইন শকুন্তলাকে সপ্রশংস আনন্দে গ্রহণ করেন। প্রাক্তন ক্যাথিড্রাল প্রোভোষ্ট এবং হালবারষ্টাডট-এর বেতনভোগী যাজক যোহান উইলহেলম লুডভিগ গ্লীম (১৭১৯-১৮০৮) যিনি গ্রীসদেশীয় প্রাচীন কবিদের গীতিকবিতার ছন্দানুসরণে (anacreontics) কবিতা রচনা করেছিলেন। রোমান্স প্রবণ এক প্রজন্মের ব্যক্তিগতক্ষেত্রে নোভালিসের মত (ফ্রিডরিশ ফন হারদেনবার্গ, ১৭৭২-১৮০১) একজন উদীয়মান কবিকে ভারতীয় ফুল দর্শনে ব্যাপৃত

রেখেছিল। তাই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে কবির প্রণয়িনী সোফী ফন কুহনকে হারদেনবার্গের পৈতৃকভবনে শকুন্তলা এই নামে ডাকা হত।

আগষ্ট উইলহেলম শ্লেগেল (১৭৬৭-১৮৪৫) যিনি পরে জার্মানীর প্রথমতম ভারতবিদ হয়েছিলেন, ফরষ্টারের শকুন্তলা থেকে প্রেরণা লাভ করেন। এই গ্রন্থ পরে জার্মান বিজ্ঞানকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। শ্লেগেল বেনামে পূর্ব মুদ্রিত শকনতলা গ্রন্থ 'থালিয়া জার্ণাল' থেকে গ্রহণ করে তার সমালোচনা Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen-এর ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় প্রকাশ করেন এবং সেইখানে দেখলেন—

'অতি সূক্ষ্ম হৃদয়াবেগ আনন্দের কোমলতম কুঁড়ি কোমলতম হাতে তোলার মত।'

১৭৯১-এর সেই এপ্রিল দিন থেকে, যখন সেই সমালোচনা প্রকাশিত, তারপর আরো সাতাশটি বছর পার হয়ে গেল, তখন এই উৎসাহী সমালোচক জার্মানীর প্রথমতম ভারততত্ত্ববিদ্ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। এইভাবে শকুন্তলা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের এক সংযোগ সেতু রচনা করে।

ফরষ্টারের কর্মকাণ্ড কয়েকটি প্রজন্মের ভারততত্ত্ববিদকে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় প্রবুদ্ধ করেছে। প্রথম কয়েক বছরে, আরো কয়েকটি পুনঃমুদ্রণ প্রকাশিত হল। এই সংস্করণ গুলির মধ্যে অনুমোদিত ও অননুমোদিত দুই শ্রেণীর গ্রন্থই ছিল (যথা, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনায় এবং ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে হেরদের সংস্করণ); গেরহার্ড-কৃত ১৮২০ সংস্করণটিও আরেকবার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ফরষ্টারের শকনতলা পরবর্তীকালে বারবার পুনঃমুদ্রিত হয়েছে। (যথা: ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লাইপজিগে একটি বিস্তারিত খণ্ড, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে স্টুটগার্টে সঞ্চয়ন-গ্রন্থ হিসাবে এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লাইপজিগে প্রকাশিত হয়।) সংস্কৃত পণ্ডিতগণ উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান ভাষায় অনুবাদকালে তাঁরা সকৃতজ্ঞচিত্তে ফরষ্টারের দূরদৃষ্টির জন্য ঋণ স্বীকার করতে ভোলেন নি।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বার্নহার্ড হারৎসেল প্রথমতম সোজা সংস্কৃত থেকে জার্মান অনুবাদ পরিবেশন করেন। তিনি শুধু ফরষ্টারের টাকার কথা উল্লেখ করেন, এই গ্রন্থটির আবিষ্কার বা ইতিহাস বিষয়ে কোনো কথা বলার তিনি প্রয়োজন বোধ করেননি। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পিটার ফন বোলেন আরেকজন, তিনি Das alte Indien (প্রাচীন ভারত) নামক গ্রন্থ যা কোনিগস্‌বার্গে ১৮৩০-এ

প্রকাশিত হয় তাতে ফরষ্টারের সংস্করণ থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেননি। পরে, উপযুক্ত ভারততত্ত্ববিদের এক বৃহৎ তালিকা—'শকুন্তলা' অনুবাদকর্ম গ্রহণ করেন। নিয়তই নতুন নতুন সংস্করণ পরিবেশন করেছেন। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে শুধু বৈজ্ঞানিক বিশুদ্ধতা নয় কাব্যিক আঙ্গিকও পাঠকদের আকৃষ্ট করে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রুকারটের অনুবাদের কয়েকটি সংস্করণ হয় ১৮৬৭ এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। লুডলফ স্খেলাইআর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে আপনাকে পরবর্তী অনুবাদক হিসাবে উপস্থাপিত করেন। যেসব প্রাচ্যতত্ত্ববিদ এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ ও লেখকগণ এঁদের পদাঙ্কানুশরণ করেন তাঁদের নাম ওটো বোয়েথলিংগক (১৮৪২), আর্নষ্ট মেইনার (১৮৫২, ১৮৬৭) এডমণ্ড লোবেডনাৎস (১৮৫৪), এ. ডনসডর্ফ (১০৬৭), লুডভিগ ফ্রিৎসে (১৮৭৭), হেরমান ক্যামিলো কেলনার (১৮৯০). এম. মোলার (১৯০২), লিওপোলড ফন সখরোডার (১৯০৩), রোলফ লকনার (১৯২৪), পল কর্ণফিলড (১৯২৫) এবং পরিশেষে হানস লস্থ (১৯৬০)। 'শকুন্তলা' ক্রিশ্চিয়ান হিপ্পেলকে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অনুপ্রাণিত করেছেন একটি গীতিকাব্যধর্মী নাটক লিখতে (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃ প্রকাশিত)। আলফ্রেড ফন ভলৎসোগেন ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি শিথিল মঞ্চরূপ প্রদর্শন করেন। ফ্রিডরিশ ফন বডেনষ্টেডট ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি কবিতা রচনা করেন এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ম্যাকস মূল্যর একটি নাটক প্রণয়ন করেন।

শকুন্তলার সাফল্যের পর কালিদাসের সম্পূর্ণ রচনা অনূদিত হয় এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা টীকা করা হয়। রবার্ট লেনৎস উর্বশী নাটকের লাতিন রূপ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে প্রদর্শন করেন এবং এ. হিফার ১৮৩৭-এ আবার বার্লিনে প্রদর্শন করেন জার্মান ভাষায়। এফ. বলেনসেনের জার্মান ভাষায় অনুবাদ সেই বছরেই সেন্ট পিটসবুর্গে অভিনীত হয়। 'বিক্রমোর্বশী' নামক একটি নাটক একটি স্বর্গীয় অপ্সরার সহিত মানব নায়কের প্রেমের কথা বর্ণিত হয়েছে। কালিদাসের আর একটি মহৎ নাটক 'মালবিকাগ্নিমিত্র' অনুবাদ করেন এ. ওয়েবার ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং তা বার্লিনে প্রকাশিত হয়। সেই ভারততত্ত্ববিদ নাটকের বিশেষ তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা করে কালিদাসের গ্রন্থকারত্ব প্রমাণ করেছেন সেই সঙ্গে।

বার বার কালিদাস নতুন বিশ্লেষণ এবং সাধারণ ভাবে ভারতীয় নাটকের পরিচারতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। একজন নিয়মিত কালিদাস বিশেষজ্ঞ হলেন

এ: হিলেব্রানডট যিনি প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু পরেই একটি বিস্তারিত মনোগ্রাফে এই মহৎ ভারতীয় কবির কথা লিখেছেন। তিনি বিশেষ করে নাটক বিষয়ে য়ুরোপীয় প্রচেষ্টার সঙ্গে বৈপরীত্য দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে সবচেয়ে বেশী নাটকীয় অমিল হল এই যে ভারতীয় কবিদের রচনায় নাটকীয় গতি-বেগের অভাব। এ ছাড়া তিনি সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন এর ভিতর কোনো রকম আভ্যন্তরীণ সংঘাতের অভাব আছে। ভূমিকাংশে যে সারাংশ দেওয়া আছে তার মধ্যে এই বক্তব্যের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে:

"আমরা আরো গভীরতর বিষয় আশা করি। আর তথাপি এইসব কবিদের রচনায় তেমন প্রকৃতি এবং অমর কাব্য ভাবনা নেই যার জন্য একে বৃহত্তর পাঠক গোষ্ঠীর সামনে উপস্থাপিত করার উপযোগীতা আছে, কারণ আঙ্গিকের সামান্য ত্রুটী বিচ্যুতির জন্য এই নাটক প্রত্যাখ্যাত হবে না।"

একথা ভাবতে বিশ্রী লাগে যে একজন ভারততত্ত্ববিদ্ উপরোক্ত কথাগুলিতে আপত্তি প্রকাশ করেছেন এবং তিনি রাজনৈতিক, মার্কসীয় মৌলবস্তু বিজ্ঞানের মধ্যে আমদানি করেছেন যার দ্বারা ভারতীয় বিদগ্ধ সমাজকে এর উপলক্ষ্য করেছেন। ভারততাত্ত্বিক ওয়ালটার রুবেন পূর্ব-বার্লিনে বাস করেন এবং সংখ্যালঘু কম্যুনিষ্ট পার্টির মনোভঙ্গী নিজের রচনায় ছড়িয়ে দেন। তিনি হিলেব্রাণ্ডটকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে বলেছেন, 'উনি মুষ্টিমেয় এক শিক্ষিত বুর্জোয়ার জন্য লিখে থাকেন।' কবি কালিদাসকে প্রদত্ত প্রশস্তিতে রুবেন একটা প্রচার মূলক আত্মম্ভর মনোভঙ্গী প্রকাশ করে বলেছেন, 'এই দেশে (অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট শাসিত সেণ্ট্রাল জার্মানী) সব ব্যাপার অন্যরকম। কারণ সেখানে আছে মেহনতি মানুষ, তার মানবিতাকে ধন্যবাদ। তার আন্তর্জাতি-কতাতে ধন্যবাদ—সকল মহাদেশের সকল মানুষের প্রতি এদের ভালোবাসাকে ধন্যবাদ—মেহনতি মানুষ সকল ক্ষেত্রের মহৎ মানুষদের এবং তাদের কর্মকে আলিঙ্গন করতে উন্মুখ।' যাই হোক, একথা বলা যায় যে সেই একই পাণ্ডুলিপি যা এক রাজনৈতিক প্রস্তাবনা দিয়ে সুরু হয়েছে এইভাবে মর্ত্যলোকে সোস্যালিস্ট স্বর্গরাজ্য সম্পর্কে উচ্ছাস প্রকাশ করার দায়িত্ব পালন করেছেন (১২ অক্টোবর ১৯৫৫, ব্যুরো অব কম্যুনিষ্ট কাউন্সিল অব পীস ইন ভিয়েনার এক সুপারিশ হল এর ভিত্তি) এবং তারপর প্রকৃত 'ভারতীয়' ভঙ্গীতে একটি 'প্রস্তাবনা' রচনা করেছেন। 'মালবিকা এবং অগ্নিমিত্র' পরিচ্ছেদে কালিদাসের প্রতি প্রশস্তি জ্ঞাপন করেছেন:

বার বার তিনি প্রেমের প্রশংসা করেছেন, তার বিদায় বেদনা এবং আনন্দের কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি যেমন তাঁর প্রতিটি গ্রন্থে বিভিন্ন মানুষকে ভালোবাসতে, ক্লেশ ভোগ করতে এবং পরে সুখপ্রাপ্তির সুযোগ দিয়েছেন—তিনি প্রেমিকদের এমন সুন্দর-ভাবে রূপান্বিত করেছেন যে তাদের ত্রুটীটুকুও ভালোবাসতে হয়—আমাদের রীতিমত মানবিক ভঙ্গীতে ও সানন্দে তাদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে হয়। তিনি মহৎ, উষ্ণ হৃদয় বিশিষ্ট মহৎ কবি, যাঁরা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তাদের সকলকেই তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন যুগ যুগান্ত ধরে এবং এই ভাবেই প্রেরণা দান করবেন। শুধু তাঁর ভারতীয় সংসারে নয়, যেখানেই মানুষের হৃদয় প্রকৃত শিল্পকর্মদ্বারা অভিভূত হয় সেখানেই তিনি স্বীকৃতি পাবেন।

এই সূত্রে হানস লস কৃত 'শকুন্তলা' নাটকের অনুবাদের ভূমিকায় তিনি যা বলেছেন আমাদের তা এড়িয়ে গেলে চলবে না। এই ভূমিকায় তিনি ভারতীয় নাটকের উদ্ভব ও মঞ্চ-পূর্ব অবস্থার বিষয় একটি সংক্ষিপ্ত বহিরেখা এঁকেছেন :

প্রাচীন ভারতীয় পুতুল নাচের শিল্পরীতি তার ধ্রুপদী নাটকের উপর একটা অনপনেয় ছাপ রেখে দিয়েছে 'নাট্য নির্দেশক' এই ব্যক্তিটির রূপে, তার নাম সূত্রধার—প্রকৃত অর্থ, সূত্র যিনি ধারণ করে আছেন। ভারতীয় চিন্তায় শিল্প ও বিজ্ঞানের অন্য সব শাখার মত স্বর্গীয় উৎপত্তি দাবী করে। ভরত যিনি 'অভিনয় দর্পন' নামক গ্রন্থের পৌরাণিক গ্রন্থকার, তিনি বলেছেন যে প্রথম নাটকের দর্শক ছিলেন দেবগণ এবং সে নাটক হল সমুদ্র-মন্থনের কাহিনী ও সেই সঙ্গে দেবতা ও দানবের সুবিখ্যাত দ্বৈতযুদ্ধ কাহিনী। এর মধ্যে আমরা সহজেই লৌকিক উৎপত্তি বুঝতে পারি। গ্রীক নাটকের প্রতি ভারতের নির্ভরতা বিষয়ক যে তত্ত্ব আছে, যা আগের যুগে প্রায় বলা হত তা এখন উপেক্ষা করা যাবে।

"ডিসকভারি অব মিমিকস" নামক প্রবন্ধে সীগফ্রীড মেলসিংগার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চের মধ্যকার আভ্যন্তরীণ সংযোগ সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে এশিয়ার থিয়েটার বিষয়ক যোগাযোগের ব্যাপারে য়ুরোপীয় থিয়েটার কিম্ভূতকিমাকার রূপে পরিবর্তিত

হয়েছে, প্রাথমিক থিয়েটারের অস্তিত্ব বিলোপের পূর্বেকার যুগ। দূর থেকে যে উৎকর্ষমূলক বস্তু আমদানি হল তা ইচ্ছাকৃত ভাবে উদ্ভাবিত। মেলসিংগার সেই পদ্ধতি এই কটি কথায় বলেছেন :

ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন গ্যয়টে ফরষ্টারকৃত কালিদাসের শকুন্তলার অনুবাদ পাঠ করে। ফলে তিনি ফাউস্ট শেষ করতে মনোনিবেশ করলেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র আংশিকভাবে এই গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন। ভারতীয় কবির মধ্যে তিনি 'মঞ্চের ওপর প্রস্তাবনা'র আদর্শ বা মডেলের সন্ধান পান। সকল ভারতীয় নাটকই এক দ্বৈত পূর্বরঙ্গের দ্বারা আরম্ভ হয়। একটি স্তোত্র (স্বর্গের প্রতি প্রস্তাবনা জাতীয়) এবং একটি প্রস্তাবনা যেখানে নাট্য নির্দেশক কয়েকজন অভিনেতাকে মঞ্চের ওপর ডেকে নিয়ে নাটকটি এবং নাট্যকার বিষয়ে আলোচনা করেন। নিশ্চয়ই, আমরা দূরে সরে যাচ্ছিনা এই কথা ভেবে যে ট্রাজেডির এই দ্বৈত বয়নরীতিতে নাটকের আকার গড়ে ওঠে—মানব এবং দেবতার নাটক এবং দেবতাদের নাটক মানুষের সঙ্গে—এর ফলে কবির পক্ষে ফাউস্টের দ্বিতীয় অংশ রচনার সুযোগ আসে। ভারতীয় নাটকের নায়কও মাঝে মাঝে কাল এবং মহাকাশের (Time and Space) বিচরণ করেছেন :

"আমাদের সঙ্কীর্ণ মঞ্চে পা ফাঁক করে তুমি দাঁড়াবে
সমগ্র সৃষ্টির তুমি ফসল, দূরে দূরান্তে
মনের গতির মতো চতুর ও দ্রুত তব গতিভঙ্গী।
স্বর্গ থেকে সারা জগতে—আবার নেমে যাও গভীর নরকে।"

গ্যয়টে কোনদিন ভাবেননি যে তাঁর কাছে যা পরিচিত সেই রঙ্গমঞ্চে ফাউস্ট অভিনয় করা সম্ভব হবে। কিন্তু বারোক বা কিম্ভুতকিমাকার যেখান থেকে তিনি আঙ্গিকের দিক থেকে ভাব গ্রহণ করেছেন প্রথম খণ্ডে, সেখানে ভারতীয় ধারার মতো কোনো অলীক মায়া জাতীয় অলঙ্করণের প্রয়োজন নেই। কবি যেমনটি কল্পনা করেছিলেন সেইভাবে যে সম্পূর্ণ 'ফাউস্ট'-কে সম্প্রতি মাত্র মঞ্চে উপস্থাপিত করা হয়েছে তা নিছক সৌসাদৃশ্য মাত্র নয়—যথা গুস্তাফ গ্রনডজেনের হামবুর্গে প্রযোজিত নাট্যরূপ, যেখানে

প্রস্তাবনার অভিনেতারা নাটকের অভিনেতায় পরিবর্তিত হয়ে উন্মুক্ত মঞ্চে ভারতীয় ধ্রুপদী অভিনয়ের ভঙ্গিতে উপস্থিত হন।

অভিনয় জগতের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনে এই প্রযোজনা একেবারে চূড়ান্ত রেখা টেনে দিলেন। এর সূত্রপাত আমাদের মতে ১৯১০-এ। সেই বছর আলেকজান্দার তাইরোফ তাঁর মস্কো প্লে-হাউস 'শকুন্তলা' নাটক নিয়ে সুরু করলেন। পূর্বে তিনি প্যারিস এবং লণ্ডন ম্যুজিয়মে অনেক কাল ব্যয় করেছেন। সেখানে তিনি পোষাক পরিচ্ছদ, মুখোস এবং ভারতীয় নাটকের শিল্পগত রূপায়ন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনেক সময় ব্যয় করেছেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সিলভ্যা লেভীর 'লে থিয়েতর ইন্দিয়েন' প্যারিসে প্রকাশিত হয়। ১৯১০ থেকে ১৯২০-র মধ্যে ভারতীয় নাটকের অসংখ্য রূপান্তর পাশ্চাত্যের মঞ্চে প্রদর্শন করেন। এর মধ্যে বিশেষ সাফল্যলাভ করে যে সব নাটক তার মধ্যে ফয়েখট্ভানগারের 'বসন্তসেনা'। ব্রেসট তাঁর 'মান ইসট মান' নামক নাটকে শুধু যে ভারতীয় বিষয়বস্তু ব্যবহার করেছেন তা নয় একটি হাতি কিনে ঐতিহ্যগত ভারতীয় ব্যঙ্গ নাটক দেখিয়েছেন। আধুনিক ভারতীয় নাট্যকার বলবন্ত গার্গীর একটি গ্রন্থের নিবেদনী ভূমিকায় উদ্বোধনী অংশে নিম্নাংশ লক্ষ্য করে যা মনে হয়েছে তা আমার পক্ষে 'উত্তেজক' বলা যায়—" ব্রোলোট ব্রেসটের স্মরণে। যার থিয়েটর আমাকে অধিকতর ও গভীরতর ভাবে ভারতীয় থিয়েটরের জনপ্রিয় ও ধ্রুপদী দিকটির বিষয়ে সচেতন করেছে।"

কিন্তু 'জার্মান শকুন্তলা'র ক্রমবিকাশের কথা আরেকবার জের টানা যাক, কারণ কালিদাসের সাহিত্য কর্মের জার্মান অনুবাদ অন্য দেশের সাহিত্য জগতের মধ্যেও সেতু রচনা করেছে। এমনকি ফরষ্টারও তার ভারতীয় নায়িকার জার্মান পরিচ্ছদভূষিত আকৃতির বিজয় মিছিল দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। ১৭৯১-এর ১০ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি সানন্দে হেরদেরকে জানালেন স্যার উইলিয়াম জোনস খুব সম্ভবত আরো কয়েকটি ভারতীয় গ্রন্থ অনুবাদ করবেন যদি একবার তাঁর কানে যায় যে য়ুরোপে তাঁর শকুন্তলা কি সমাদার লাভ করেছে।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিবেশী নেদারল্যাণ্ডে শকুন্তলার অনুবাদ ফরষ্টারের সমগ্র

টীকাসহ প্রকাশিত হল। রাশিয়ান লেখক নিকোলাই মিখাইলোভিচ করমসিন ১৭৮৯ থেকে ১৭৯০ পর্যন্ত পশ্চিম য়ুরোপে থাকতেন, সেই সময় সীল্যরের পত্রিকা 'থালিয়া'তে ফরষ্টারের অনুবাদের কিছু অংশ বেনামীতে প্রকাশিত হয়। জার্মানীতে শকুন্তলা প্রকাশের সেই উত্তেজনাময় কালে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ফলে, করমসিনের 'মস্কোভস্কী জার্নাল' (৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৭৯২)-এর পাঠকরা ফরষ্টারের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের অংশ বিশেষ রুশ ভাষায় পড়তে পেলেন। সাহিত্য-প্রেমিক রাশিয়ানরা গ্যয়টের শকুন্তলা চতুষ্পদীর পরিচয়ও পেলেন। জার্মান (প্রথম রূপ) এবং রুশ উভয় ভাষাতেই তাঁরা এই কবিতার সঙ্গে পরিচিত হলেন। ড্যানিশ এবং সুইডিশ সংস্করণ দুটিও পরিষ্কারভাবে ফরষ্টারের প্রচণ্ড প্রভাবের পরিচায়ক। ফরাসী ভাষায় অনূদিত কালিদাস থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তার আসল জনক—ফরষ্টার। প্রকৃতপক্ষে, তার লেখক আঁতোয়ান ব্রুগিয়ের, যিনি ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই কাজটি সম্পন্ন করেন। তিনি অবশ্য তার জন্য ফরষ্টারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন।

আবার ব্রুগিয়েরের ফরাসী অনুবাদের ভিত্তিতে ডারমষ্টাডটের লুইজি দোরিয়ার ইতালীয় রূপান্তর করা হয়। তিনি তখন সেখানেই থাকতেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে পোলিস সাহিত্যের জগতে ভারতীয় নাটক আমদানি করা হল। তার ভূমিকায় ফরষ্টারের প্রতি এক বিস্তারিত প্রশস্তি জ্ঞাপন করা হল এবং তাঁর সমগ্র টীকাগুলি এর মধ্যে গৃহীত হল।

আবার শকুন্তলা সুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেও অনুপ্রাণিত করে। লুডভিগ্ ফন বীঠোফেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক চিন্তা করেছেন, এ ব্যাপারে তিনি যে ভিয়েনা প্রবাসী প্রাচ্যবিদ যোশেফ ফন হ্যামারপরগষ্টলের উপদেশ গ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বীঠোফেনের জার্নালের ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের লিখন থেকে আমরা জানতে পারি কি গভীরভাবে ফরষ্টারের শকনতলা এই সঙ্গীতকারকে তাঁর নিজের জীবনের চিন্তাধারা মেলাতে সহায়তা করেছে।

অনেকগুলি ভারতীয় কবিতার সঙ্গীত রূপ আছে। তার মধ্যে যে রোমান্টিসিস্ট ভারতরঙ্গ ভাবাবেগপ্রবণ জার্মান আত্মাকে গ্রাস করেছিল সুদূরের পিয়াসী হয়ে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

জে. ডব্লু. টমাসচেক (১৭৭৪-১৮৫০) যিনি জার্মান ও চেক সঙ্গীতের মধ্যস্থ বিশেষ তিনি শকুন্তলা ওপেরা নামক সঙ্গীত রচনা করেন। তথাপি তাঁর অন্যান্য সাহিত্য কর্মের সাফল্য সত্ত্বেও এবং তাঁর স্ত্রী উইলহেলমিন বিপরীত

ব্যাপারের জন্ত (প্রাক্তন উপাধি এবার্ট) প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও টমাসচেক এই ওপেরা মঞ্চস্থ করেননি। উপন্যাসকার লিওপোল্ড স্‌খেফার (১৭৮৪-১৮৬২) আরেকটি শকুন্তলা ওপেরা রচনা করেন। ইনি বহুদেশ পর্যটক প্রিন্স পকৃস্নারের বন্ধু। এই কাজটি দ্বারা তিনি একজন স্বরকার বা কমপোসার হিসাবে খ্যাতিলাভের আশা করেছিলেন। ফেলিক্স ভাইনগারটনার (১৮৬৩-১৯৪২) এই একই নামে একটি ওপেরা রচনা করেন। অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের পীয়ারেজ তালিকায় তাঁর নাম আছে এলডার ফন মূনৎসবার্গ এই রূপে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমবার যখন মঞ্চস্থ করা হল তখন লিসৎ শকুন্তলার প্রশংসা করেন। ফ্রানৎস স্যুবার্ট-এর (১৭৯৭-১৮২৮) শকুন্তলা ওপেরার স্বরলিপি দুঃখের বিষয় সংরক্ষিত করা নেই। অপরদিকে কার্ল ফন পেরফলের (১৮২৪-১৯০৭) ঐ একই নামের ওপেরা প্রাক-ভাগনারিয় রোমান্টিক স্কুলের ভঙ্গীতে রচিত ওপেরাকে কিছুতেই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বলা যায় না। আরেকজন সঙ্গীত রচয়িতা স্বরকার সিগিসমুণ্ড বাখরিশ (১৮৪১-১৯১৩)-যাঁর রচনার মধ্যে মুক্তপক্ষ প্রাচীন ভিয়েনায় সুর দোলা দেয়—একটি শকুন্তলা ব্যালে স্বরলিপি লিখেছেন। এই একই নামের এক প্রস্তাবনা ভিয়েনা ফিলহারমনিকে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে ডিসেম্বর প্রথম অনুষ্ঠিত হয় এবং অচিরাৎ এক মহৎ সাহিত্য চরিত্রের বিশ্লেষণ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। লুডভিগ্‌ ফিলিপ সথার-ভেনকা (১৮৪৭-১৯১৭) কৃত এক সমবেত স্বরের গীতালেখ্য শকুন্তলা অনুরূপ প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১৯৬৬-র ৬ই জুন তারিখে আমি 'শকুন্তলা অ্যাণ্ড দি রোমান্টিক মুভমেণ্ট ইন য়ুরোপ' শীর্ষক এক বক্তৃতা দিয়েছিলাম বোম্বের ইন্দো-জার্মান কালচারাল সোসাইটিতে, উপলক্ষ্য ছিল জার্মান শকুন্তলার অনুবাদ প্রকাশের ১৭৫তম সাম্বৎসরিক তিথি। সেই সময় আমি যে নিম্নলিখিত প্রস্তাব করি তা ভারত ও জার্মানী উভয় দেশেই বিশেষ সমর্থন লাভ করে, এবং আমি আশা করি ভবিষ্যতে কোনো সময় তা পূর্ণ হবে :

> জার্মানীতে পরিবেশনের ১৭৫তম বৎসর অতীত হল। এ আমাদের কাছে এক চমৎকার সুযোগ—ভারতীয় ও জার্মান উভয়ের কাছে—ঐতিহ্যগত ইন্দো-জার্মান মৈত্রীর একটা প্রতীক নির্বাচন করা। শকুন্তলার আনন্দময় কাহিনী, একটি অঙ্গুরী হারানো ও প্রাপ্তি ইত্যাদির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই অঙ্গুরী দুই তরুণ-

তরুণীর সুসামঞ্জস্য সম্পর্কের প্রতীক। শেষ পর্যন্ত এদের মিলন হল এবং তারপর স্থায়ী শান্তির মধ্যে দিন কাটাতে লাগল। আর শকুন্তলা নামটি কি ইন্দো-জার্মান মৈত্রীর দুয়ার খোলার প্রথমতম পদ্ধতি। সেই কারণে আমি প্রস্তাব করতে চাই যে একটা বাৎসরিক পুরস্কার প্রবর্তন করা হোক—এক বছর ভারতীয় ও পরের বছর জার্মানকে পুরস্কার দেওয়া হবে। এই পুরস্কার কোনো লেখক, গবেষক, বিজ্ঞানী অথবা ভারত-জার্মান মৈত্রী যার প্রথম রাষ্ট্রদূত ছিলেন শকুন্তলা, সেই মৈত্রীর আদর্শে নিবেদিত মহৎ ব্যক্তিকে। এই পুরস্কারের নামকরণ করা হোক—শকুন্তলা অঙ্গুরীয়। এই অঙ্গুরীর ধারক উভয় দেশের একজন বুদ্ধিজীবি ভদ্র মানুষ হবেন ভারত-জার্মান মৈত্রীর উদ্দেশ্যে যিনি নিবেদিতপ্রাণ।

শকুন্তলা মোহ এবং প্রেরণা ছড়িয়েছে, আনন্দ ও উৎসাহ দিয়েছে। সাহিত্যিক বিজয় যাত্রায় এ এক আনন্দময় ফল এবং পরে 'ডিথিরাম্বিক' (প্রাচীন গ্রীসের মদ্য দেবতার উৎসবে পরিবেশিত তরজা জাতীয় গীতিছন্দ) ছন্দের কবিতার উদ্ভব হয়েছে। ক্লাসিসিষ্ট এবং রোমান্টিসিষ্ট, কবি ও গবেষক সুন্দরী শকুন্তলাকে ভারত থেকে প্রশস্তি জানিয়েছেন।

তথাপি এর মধ্যে সুন্দরতম প্রশস্তি যা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে তা এক মহৎ জার্মান রচিত ভবিষ্যৎ বিশ্ব-সাহিত্যের সূচক—সুন্দরী রাজকুমারীকে নিবেদিত গ্যয়টের কবিতা, সুন্দরী রাজকুমারী, সুদূর গঙ্গাতীরের সুন্দরী রাজকুমারী।

Nenn ich. Sakontala, dich, und so ist alles gesagt !

বৌদ্ধধর্মের মুখোমুখি

আমি জানি আমি গৌতমের সঙ্গে একাত্ম।
কিভাবে কি জানি তিনি প্রেমের খবর জানবেন না?

হেরমান হেস (সিদ্ধার্থ)

জার্মান-ভাষী য়ুরোপের পাশ্চাত্য বৌদ্ধ গবেষণার কাজে এক বিশেষ অবদান আছে। এর প্রথম যুগে, এই গবেষণা শুধুমাত্র ভারততাত্ত্বিকদের দ্বারাই হয়েছে যারা মনে করতেন উত্তর বৌদ্ধধর্ম (মহাযান) দক্ষিণ বৌদ্ধধর্মের (হীনযানের) এক বিকৃতরূপ। এই ধারায়. মূল পালি ভাষায় লিখিত নিয়মের পাঠ অনেকরকম পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হয়েছে। একটি অংশ ক্যানন বা নিয়মের মৌল পবিত্রতা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করতে চান মূলগ্রন্থের অধিকাংশের সহিত যা মেলানো যায় না তা সোজাসুজি পরিহার করে। ফ্রানৎস কোনিংগ, কনষ্টানটাইন রেগামে দ্বারা সম্পাদিত গ্রন্থাবলীতে এই গোষ্ঠীকে এ্যাংলো-জার্মান স্কুল বলেছেন। এর প্রবক্তাদের তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে টি. ডব্লু. রেইস ডেভিডস, এডমণ্ড হারডি, হেরমান ওলডেনবার্গ, রিচার্ড পিসখেল এবং মরিসৎ ভিনটারনিৎস আর অন্যদিকে ও. রোজেনবার্গ, টি. সইখেরবাটসকী, এবং ই. ওবারমিলারকে বলেছেন রাশিয়ান স্কুল, তাঁরা চান মৌল বৌদ্ধধর্ম বৌদ্ধ তাত্ত্বিক দর্শনের রীতিমাফিক হোক। একটি তৃতীয় ধারা যা বৌদ্ধধর্মের তাত্ত্বিক দর্শন থেকে বহির্ভূত কিন্তু সকল উৎসকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে পরীক্ষা করতে আগ্রহী, তাঁদের বলা হয় ফ্রাঙ্কো-বেলজিয়ান স্কুল। যাই হোক এই সব জাতীয়তা মার্কা লেবেল বা ছাপ একটা স্থূল উল্লেখ মাত্র এবং ব্যক্তিগত গবেষক বা তাঁদের মাতৃভাষার সঙ্গে সম্পর্কহীন। এইভাবে শেষোক্ত গোষ্ঠীতে শুধু ল ভ লা ভ্যালে পুস্কিন, ইতিয়েন লামোৎ, জঁ প্রজিলুসকী, সিলভাঁ লেভী এবং পল ডেমিভিল আছেন তা নয় এঁদের মধ্যে ইতালীর জি. তুচি, ব্রিটেনের এ. বি কীথ, পোলাণ্ডের এস সখের এবং হেলমুথ ফন গ্লাসেনাপ, ম্যাকস ভ্যালেসের এবং ওটো স্ট্রাউস প্রভৃতি জার্মানরা।

বৌদ্ধজগতের সঙ্গে জার্মানীর প্রথম যোগাযোগ ঘটে মধ্যযুগে, যদিও তখন তা বোঝা যায়নি। বারলাম-যোসাফট তত্ত্বের মধ্যে ক্রিশ্চান সাহিত্যের শিকড়

থাকার জন্যই তার জনপ্রিয়তা এবং অন্য কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগাযোগের পরিচায়ক নয়।

চেতনার যুগ (এনলাইটনমেন্ট) না আসা পর্যন্ত য়ুরোপ এশিয়ার অধ্যাত্ম-জগতের মুখোমুখি পৌছায়নি। বিস্ময়ের কথা নয় যে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যোগাযোগ তার উদ্ভব ক্ষেত্র ভারত ভূমিতে হয়নি। সেই দেশ থেকে এই ধর্ম ব্যাপকভাবে উচ্ছেদ করা হয় কিন্তু ঘটেছে এশিয়ার প্রাচ্য এবং দক্ষিণ প্রাচ্য অঞ্চলে। প্রাচ্য এশিয়ার পর্যটকগণ তাদের সঙ্গে বৌদ্ধের অসংখ্য উপাধির অন্যতম কিছু সাহিত্যিক রত্নরাজি নিয়ে এলেন, বিশেষ করে শ্যামদেশ থেকে, এর বর্তমান নাম থাইল্যাণ্ড। জেডলারের ইউনিভার্সাল লেকসিকন-এ (অভিধান) আমরা দেখি একটি জমকালো পোষাকের মত একটি উজ্জ্বল এবং বর্নাঢ্য নাম দেখতে পাই, সমনোখোদম। যাই হোক আমরা যদি তার থাই পরিচ্ছদ থেকে তাকে মুক্ত করি, আমরা একটি প্রকৃত ভারতীয় নাম আবিস্কার কোরবো। সমনোখোদম প্রকৃতপক্ষে সমান গৌতম অর্থাৎ পর্যটক গৌতম, অতএব ঐতিহাসিক বুদ্ধদেব ছাড়া আর কেউ নয়। ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দেও জেডলারের ইউনিভার্সাল লেকসিকনে সমনোখোদমের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া আছে :

"শ্যামরাজ্যের অধিবাসীরা বর্তমানে যে মূর্তি পূজা করে তার নাম সমনোখোদম। তালপয়েনদের তাঁর সম্বন্ধে এক আশ্চর্য ধারণা বর্তমান। তারা বলে যে ওর আত্মা প্রথমে বহু এবং বিভিন্ন দেহে বিচরণ করেছিলেন এবং সেই কালে তিনি স্বর্গ ও মর্তের সার্থক জ্ঞান আহরণ করেন। স্বর্গ ও নরক সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন এবং প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ রহস্য বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হলেন।"

বুদ্ধের বাণী ইষ্ট-এশিয়াতে এসে পৌচেছে তীর্থযাত্রীদের পথ-পরিক্রমার সঙ্গে। সেণ্ট্রাল কিংডম বা কেন্দ্রীয় রাজ্যে আগত ভারতীয় বৌদ্ধদের গোড়ার যুগের নাম যথা কাশ্যপ মাতঙ্গের নাম প্রথম শতাব্দীতে এবং বোধিধর্ম পঞ্চম শতাব্দীতে শোনা যায়। এতদ্বারা ঐতিহাসিক বুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায়, চীনারা অতঃপর তাঁকে বলতেন—ফো। এই নামটিও অচিরাৎ আধুনিককালের য়ুরোপীয় পর্যটকের কাছে পরিচিত হল। এখানেও জেডলারের ইউনিভার্সাল লেকসিকন সেইকালের জ্ঞানের প্রস্রবণ বিশেষ, বিশেষত চীনা বৌদ্ধদের ব্যাপারে। যদিও এর গ্রন্থকারদের জানা ছিলনা যে ফো এবং সমোনোখোদম একই ব্যক্তি :

কে, কো বা কয়ে। চীনদেশের মুখ্য দেবতা, তাঁকে স্বর্গের প্রধানতম দেবতা হিসাবে পূজা করা হয়। তাঁর ভাবমূর্তিকে জেসুইটরা কানফুসিআসেরও ওপরে স্থান দেন। এর সবই জ্যোতির্ময় এবং আলোক উদ্ভাসিত, তিনি তাঁর দুটি হাতই কাপড়ের ভিতর গোপন রাখেন—তার দ্বারা এই অর্থ বোঝায় যে তিনি সব কিছু অদৃশ্যভাবে করে থাকেন। তাঁর দখিনে আছেন কানফুসিআস। এই পৌত্তলিক পূজকদের কাছে তিনি দেবতা হিসাবে স্বীকৃত আর তাঁর বাম দিকে আছেন কানৎসু বা লোনৎসু, তিনি এই ধর্মের অন্য শ্রেণীতে বিশেষ মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠ।

লেকসিকনের সম্পাদকদের এই তথ্যের সূত্র হল গোট্টলীব স্পীৎসেল। তিনি তাঁর নামের লাতিন রূপান্তর করেছিলেন থিওফিল স্পিৎসেলিওস (১৬৩৯-১৬৯১)। তাঁর পাণ্ডুলিপি 'দ্য রে লিটারেরিয়া সিনেনসিউম কমেনটারিয়স' ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে লেডেনে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিই য়ুরোপের বিদগ্ধ সমাজকে দূর-প্রাচ্য অঞ্চল সম্পর্কে সর্বপ্রথম একটা ধারণা সৃষ্টির ব্যাপারে সহায়ক হন। জেসুইট আথানসিউস কারচারের (১৬০২-১৬৮০) গ্রন্থাবলী কম প্রভাবশালী নয়, বিশেষ করে তাঁর 'চায়না ইলাসট্রেটা' যা ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আমষ্টারডামে প্রকাশিত হয়। প্রাচ্যের দর্শন বিষয়ে এইসব গ্রন্থাবলী লাইবনেৎসকে তাঁর বিশ্লেষণের ভিত্তি দান করেছিল, বিশেষতঃ চীনা দর্শন বিষয়ে। তিনিও বুদ্ধের চীনা নামের সহিত পরিচিত ছিলেন।

বিশ্ব-পর্যটক এনগেলবার্ট কেমপফার (১৬৫১-১৭১৬) যাঁর বাড়ি ছিল ওয়েষ্টফালিয়া-লিপ্পে শহরে এবং যিনি সাউথ-ইষ্ট এশিয়া এবং জাপান ভ্রমণ করেছেন, ইনি বিশ্বাস করতেন যে বুদ্ধ সম্ভবতঃ আসলে একজন মিশরীয় পুরোহিত ছিলেন ও তিনি ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন, যখন পারস্যের সম্রাট ক্যামবিসেস নীলের ওপরকার ভূখণ্ড অধিকার করেন। একদিক থেকে যোসাফটের উপকথার সম্পূর্ণ বিপরীত এই কেমপফারের মতবাদ।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ২৫০০ সাম্বৎসরিক স্মরণোৎসব উপলক্ষে, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ পণ্ডিত এবং বৌদ্ধতত্ত্বজ্ঞানীদের এক সভায় অন্যতম অগ্রগণ্য জার্মান পণ্ডিত হেলমুথ ফন গ্লাসেনাপ বৌদ্ধ ধর্ম যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্মমত যার সঙ্গে জার্মানরা সর্বপ্রথম মুখোমুখি হয়েছেন একথা উল্লেখ করেন। শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ অবদান বিষয়ক এক আলোচনা সভায়

পঞ্চম অধিবেশনের (২৬শে নভেম্বর থেকে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর পর্যন্ত) তিনি ছিলেন সভাপতি। শেষের আগের দিন দর্শনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করেন। অন্যসব বিষয়ের মধ্যে তার ভিতর সংক্ষেপে জ্ঞানী ভারতীয়বৃন্দ যাঁরা এই মহৎ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা তাঁদের মতবাদের প্রথম দিকের জার্মান যোগাযোগের বিবরণ বিধৃত করেন :

> ক্রিশ্চিয়ান চার্চ ফাদার সেন্ট জেরোম রচিত গ্রন্থাবলী পাঠ করে তত্ত্বজ্ঞানী প্রথম জার্মানরা বুদ্ধের নাম শোনেন। কারণ এই সেন্ট জেরোম বুদ্ধের অলৌকিক জন্ম অখ্যান উল্লেখ করেন। কিন্তু বুদ্ধের বাণী সম্পর্কে মধ্যযুগের মানুষদের কোনোরকম বিস্তারিত জ্ঞান ছিল বলে মনে হয় না।
>
> সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত একজন ছাড়া কোনো জার্মান দার্শনিক বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে কিছু জ্ঞান আছে একথা বলে গর্ব করতে পারতেন না। এই জার্মান দার্শনিকের নাম গটফ্রিড উইলহেলম লাইবনিৎস (১৬৪৬-১৭১৬)। সেই সময় চীনদেশের দর্শন সবে য়ুরোপে পরিবেশিত হয় ফরাসী যেসুইটদের রচনার মাধ্যমে। এঁদের গ্রন্থাবলী থেকে লাইবনিৎস চীনদেশে যেভাবে শিক্ষাদান করা হত সেই পদ্ধতিতে বৌদ্ধনীতি আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থিওডিসি-তে, লাইবনিৎস ফো-র কথা উল্লেখ করেছেন। চীনারা এই ভাবেই বুদ্ধদেবকে উল্লেখ করে। তিনি মাধ্যমিকা পদ্ধতি এবং শূন্যবাদের কথাও উল্লেখ করেছেন। ইমানুয়েল কান্টের (১৭২৪-১৮০৪) রচনায় আরও প্রশস্ততর তথ্যাদি পাওয়া যায়। এটা সাধারণতঃ জানা নেই যে কোনিংগসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে কান্ট শুধু দর্শন বিষয়ে নয় ভূগোল সম্পর্কেও বক্তৃতা দিতেন। তাঁর নিজের শহর কোনোদিন ত্যাগ না করেও, সারা ভূমণ্ডলের বিভিন্ন অঞ্চল বিষয়ে তিনি প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন, এবং এই জ্ঞান তিনি মুখ্যতঃ ভ্রমণ কথা পাঠ করেই আহরণ করেছিলেন। সুতরাং এই সব বক্তৃতায় তিনি সিংহল, বর্মা, শ্যামদেশ, চীন, জাপান এবং তিব্বতে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে আলোচনা করেন।

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কান্টের জ্ঞানের উৎস অনুসারে এটা প্রায় প্রতিকী মনে হতে পারে যে একজন চীন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, কাং ইউ-ওয়েই-এর শিষ্য 'মহৎ

বিশ্বজনীন ভাতৃত্বের' বিষয় প্রচার করেন দার্জিলিঙ শহরে এবং সেই 'হিমালয়ের বাণী' ভবিষ্যৎ মানব সমাজের হাতে তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টায় কনিংগসবার্গে একটি রেশমী রিবন পাঠান, এতে কান্টের বিখ্যাত নীতি তারা ভরা আকাশ এবং নীতির আইন তাঁর 'Critique of Pure Reason' গ্রন্থ থেকে উৎকীর্ণ করে দেন। এই কারণে, যুদ্ধের শীকার কনিংগসবার্গ আমাদের এক মহৎ দার্শনিকের অমরবাণীর চিরন্তন মূল্য বিষয়ে স্মারক হয়ে থাকতে পারে।

দার্শনিক জিওর্জ উইলহেলম ফ্রিডরিশ হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) প্রাচ্য জগতকে প্রচণ্ড সংশয় নিয়ে দেখেছিলেন। হেগেলের উপযুক্ত দৃষ্টি ভঙ্গীর অভাব ছিল। অধিকন্তু তাঁর অব্যর্থ আদর্শবাদ বা এবসোল্যুট আইডিয়ালিজম যেখানে চিন্তার নীতি এবং সত্তা দুই-ই এক বস্তু এবং যুক্তি ও বাস্তবতা মিশে গিয়ে এক হয়েছে, এর মধ্যে একটা বিচারক জাতীয় পদার্থ বর্তমান। পাশ্চাত্যের প্রতি সম্পূর্ণ আসক্ত হয়ে তিনি বিশ্বজনীন মূল্যবোধের কথা বলেন। তথাপি ভারত সম্পর্কে তিনি কি জানেন ?

'মাত্র সম্প্রতি আমরা ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছি।'

'হিসট্রি অব ফিলসফি' নামক তাঁর বক্তৃতার একটি লাইন উপরে উধৃত করলাম। বুদ্ধদেব সম্পর্কে সেই একই বক্তৃতায় হেগেল যিনি তাঁর ভারতবর্ষ বিষয়ক জ্ঞান আহরণ করেছেন হেনরী টমাস কোলব্রুকের রচনা থেকে, বলেছেন যে গৌতম ভারতীয় দর্শনের ন্যায় সূত্র প্রণেতা। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি বৌদ্ধধর্ম এবং হিন্দুধর্মের পার্থক্য বিষয়ে কিছুই তেমন জানেন না। হিন্দু ধর্মের ষড়দর্শনের অন্যতম হল ন্যায় দর্শন।

বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে হেগেলের এই বিচার বিবেচনা সচেতন দূরত্ব থেকে উদ্ভূত :

> ঐ সব জাতির ধর্ম হল বৌদ্ধধর্ম, পৃথিবীর মধ্যে এই ধর্ম সর্বাপেক্ষা সুদূর প্রসারিত। চীনদেশে বুদ্ধকে ফো-য়ে এই নামে পূজা করা হয়। সিংহলে তাঁর নাম গৌতম, তিব্বতে এবং মোগলদের দেশে এই ধর্ম লামাবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই ধর্ম যার সাধারণ পরিচয় হিসাবে বলা যায় এ ধর্ম আত্ম-সত্তার ধর্ম, আত্মহীণতার উন্নয়ন হবে অভ্যন্তরে দ্বৈত ভঙ্গীতে, তার একদিক হল নেতিবাচক আর অপরদিক অস্তিবাচক।

পরে হেগেল আরও ভোঁতা যুক্তিতে পৌছান। বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী তিনি

একবাক্যে প্রত্যাখ্যান করেন। বিশেষভাবে বৌদ্ধ 'ঈশ্বর ধারণা' বা বুদ্ধদেবের দেবত্ব তাঁকে বৈজ্ঞানিক সংযম থেকে বিচ্যুত করে তীব্র ভাষা ব্যবহারে প্রবৃত্ত করেছে :

> ঈশ্বরকে যদিও শূন্যভাবে উপলব্ধি করা হয়, তিনি এক 'সত্তা' অথচ তাকে তাৎক্ষণিক মানব হিসাবে কল্পনা করা হয়, যথা ফো-য়ে, বৌদ্ধ, দালয়লামা। আমাদের কাছে এই সরলীকরণ অতিশয় আপত্তিজনক, বিচিত্র, অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। একজন মানবসত্তা তার চেতনার সবকিছু প্রয়োজন নিয়েও ঈশ্বর বলে বিবেচিত হন, তিনিই চিরন্তন স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা বিশ্বজগতের উৎপাদক।

সকল রূপের ধর্মীয় গুণ ফ্রিডরিশ উইলহেলম ফন শ্খেলিং (১৭৭৫-১৮৫৪) অনুভব করেছিলেন, তিনি পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত হন। তার রোমান্টিক প্রকৃতি দর্শনে তিনি অনেক জগৎ উন্মুক্ত করেন কিন্তু একটি জগতেরই তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন যা তাঁকে খৃষ্টধর্মের দিকে আকৃষ্ট করে নিয়ে যায়। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁর সমীক্ষা অনেক সুদূরের বস্তু, কারণ এক বিদেশী ধর্ম বিশ্বাসের এত বিচিত্র অলৌকিকত্ব তাকে শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন চিহ্নে নিয়ে গেছে :

> বৌদ্ধধর্মের নাম উল্লেখ করে আমরা ভারতীয় জ্ঞানের ইতিহাসের বিষয়ে সর্বোচ্চ হেঁয়ালিতে পৌঁচেছি। এর কোনোরকম ব্যাখ্যা প্রচেষ্টা অদ্যাবধি বিফল হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম কি? তার অর্থ এই হতে পারে :

১। এর সারবস্তু কি? এর উত্তর তেমন কঠিন মনে হয় না। এ এক অদ্বৈতবাদী তত্ত্ব। কিন্তু অদ্বৈতবাদীতত্ত্বের অস্পষ্টতার জন্য যার ফলে উগ্র বিচ্ছিন্ন বস্তু মনে হতে পারে—যা আমাদের কিছুই বলে না। অর্থাৎ বোঝা যায় না। এই প্রশ্ন—

২। ঐতিহাসিক ধর্ম হতে পারে :

(ক) বৌদ্ধধর্ম কি হিন্দুধর্মেরও পূর্বের বস্তু এবং শেষোক্ত ধর্ম হয়ত মূল বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বিভেদ ঘটায়, ভারতীয় ধারায় যে তত্ত্ব স্বাভাবিক সেই ভাবে গড়ে উঠেছে? আমরা জানি এ কথাও বলা হয়েছে। অথবা—

(খ) বৌদ্ধধর্ম কি ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরের বস্তু। হয়ত

(কক) বেদের অতীন্দ্রিয় অংশ যা অদ্বৈতবাদী তত্ত্বের ইঙ্গিত দেয় তার থেকে কি উদ্ভূত? অথবা—

(খখ) বৈষ্ণবতত্ত্ব থেকে উদ্ভূত, যা অধ্যাত্মবাদের সীমায় পৌচেছে, বিশেষ করে বিখ্যাত ভাগবদ্গীতায়—অথবা

(গগ) ভারতের দার্শনিক মতবাদগুলির একটি থেকে এবং গোড়ায় এ হয়ত একটি দার্শনিক তত্ত্ব মাত্র ছিল যা ভারতবর্ষে সরকারিভাবে স্বীকৃত ধর্মকে গ্রাস করেছে ?

এই সব মতবাদের একটিরও সমর্থক এবং পরিপোষকের অভাব নেই। সম্ভবতঃ কোনোটিই হয়ত সত্য নয়।

যে সব জার্মানরা তাঁদের বৌদ্ধধর্মের ধ্বজাধারী হিসাবে স্বভূমিতে প্রবক্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেই সব পণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞানীদের অন্যতম হলেন আর্থার সপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০)। তাঁর কাছে বৌদ্ধধর্ম একটা আদর্শ, একটা সার্থক ধর্মমত। খৃষ্টধর্মের মধ্যে এই দার্শনিক অনেক ভারতীয় মূল সন্ধান করেছেন। এমন কি নিউ টেসটামেণ্টের দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর মতে ভারতীয় মতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সপেনহাওয়ার একদা তাঁর তরুণ বন্ধু বেক্‌-কে বলেছিলেন—

> তুমি আমার গৃহে একজন ক্রিশ্চান সাধু, কোনো ক্রশচিহ্ন পাবে না। তথাপি এসবের জন্য আমরাও গৃহদেবতা আছেন। দীর্ঘকাল ধরে আমি একটি প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি সংগ্রহের চেষ্টা করেছি। অবশেষে কাউনসিলার ক্রগার আমার জন্য একটি এনে দেন। এটি তিব্বত থেকে আনীত। আসলে এটি কালো বার্নিশে রঙ করা ছিল। আমি স্বর্ণকার ইয়ুং-দের ওখানে সেটাকে সোনালি করে নিয়েছি। তাকে বলা ছিল খাঁটি সোনা চাই অন্য কিছু চলবে না কিন্তু।

সপেনহাওয়ারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বৌদ্ধধর্ম সকল ধর্মের মধ্যে সুমহান। ফরাসী পণ্ডিত আঁকোয়েতিল দ্যুপেরোঁ উপনিষদের পারস্য রূপান্তর থেকে লাতিন অনুবাদ করার পর তা ষ্ট্রাসবুর্গ থেকে 'উপনেখট্' নামে প্রকাশিত, এইভাবে য়ুরোপে প্রবেশ করার পর সপেনহাওয়ার প্রাচীন ভারতের এই সাহিত্যিক উত্তরাধিকার পাশ্চাত্য জগতের সম্ভাবনাময় ভূমিতে রোপন করলেন। সপেনহাওয়ার প্রায়ই আপনাকে এবং তাঁর বন্ধুদের বৌদ্ধ বলে উল্লেখ করলেও বৌদ্ধধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যকার পার্থক্যটুকু যথাযথভাবে নির্ণয় করতে পারেন নি। তাঁরই অন্যতম এক সমকালীন পণ্ডিত জে. জে.

স্মিডট বিশ্বাস করতেন যে বৌদ্ধধর্ম প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যধর্মের আগের দিনের ব্যাপার। তিনি ইতিমধ্যে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যটুকু নিরূপণ করেন। যাই হোক সপেনহাওয়ারের দর্শন প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ মত সমন্বয় ভিন্ন আর কিছু নয়। যদিও সপেনহাওয়ারের নীতিশাস্ত্রগত প্রবণতা বৌদ্ধধর্মের প্রতিই ঘনিষ্ঠ, তাঁর অধ্যাত্মজ্ঞান পরিষ্কারভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সূত্র থেকে আহরিত। তাঁর দর্শনের এই উৎস ব্যাপারে তিনি তাঁর 'Die Welt als Wille und Vorstellung' গ্রন্থে (বিশ্বজগৎ তাঁর চিন্তা ও ভাবাদর্শ) আলোকপাত করেছেন:

> কাণ্টের দর্শনই একমাত্র বস্তু যার সঙ্গে পরিচয় আছে এই কথা মনে রেখে তারই সূত্র এখানে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এর উপর পাঠক যদি পুণ্য শ্লোক প্লেটোর তত্ত্ব অনুসরণ করে থাকেন তাহলে আমার কথা শোনার জন্য তাঁর প্রস্তুতি অধিকতর উন্নত এবং উন্মুক্ত। যাই হোক, যদি তিনি এর উপর বেদ অধ্যয়ন করে থাকেন—উপনিষদের মাধ্যমে যার সঙ্গে সংযোগ, আমার মতে, সর্বোত্তম সম্পদ এই এখনও তরুণ শতাব্দীকে যদি এর পূর্ববর্তী শতাব্দীর উপর স্থান দেওয়া যায় তাহলে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব পঞ্চদশ শতাব্দীর গ্রীক সাহিত্যের চেয়েও কিছু কম হবে না; যদি তার মধ্যে পাঠক প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানের আস্বাদ যথাযথ ভাবে পায় তাহলেই আমি যা বলতে চাই তার জন্য তাঁর প্রস্তুতি সার্থক বলা যাবে।

সপেনহাওয়ার অসংখ্য মর্মভেদী মন্তব্য করেছেন বৌদ্ধধর্মে মানবিক অভীপ্সা বিষয়ে। অন্য সব বিষয়ের মধ্যে নির্বান সংক্রান্ত ভাবধারা যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছেন—

> উন্নততর কর্ম এবং চরম ত্যাগের জন্য যে সর্বোচ্চ পুরস্কার যা যে স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় স্বামীর মৃত্যুর পর বার বার সাড়ে জন্ম ধরে সহমরণে যায়, যে মানুষ কখনও মিথ্যা কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে না, এই পুরস্কার নেতিবাচক ভঙ্গীতে শুধু সেই কল্পলোকের ভাষায় যার নিরন্তর প্রতিশ্রুতি হল আর পূর্ণজন্ম হবে না,—non adsumes iterum existentiam apparentem অর্থাৎ, যে বৌদ্ধরা যারা বেদ বা জাতিভেদ মানেনা তাদের কথায়—'তোমাকে নির্বান-

লাভ করতে হবে' অর্থাৎ এমন এক অবস্থা যেখানে চারটি বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না—জন্ম, জরা, বয়স এবং মৃত্যু।

সুসান সামারফেলড্ রোমান্টিকভঙ্গীতে সপেনহাওয়ারের ব্যাখ্যা করেছেন। ভারত সন্ধানী এই দার্শনিকের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন একজন মানুষ বুদ্ধদেবের বাণী প্রচার করছেন, একজন তাঁর নিজস্ব মতবাদ দ্বারা চালিত হচ্ছেন না :

> 'সপেনহাওয়ারের দর্শনে প্রতীক এবং সংক্ষিপ্ত বাক্যে ভারতীয় ধর্মবাণী বার বার উপস্থাপন করা হয়েছে।
>
> সপেনহাওয়ার এই পক্ষপাতহীণ দোহাই-এর মধ্যে একটা স্বস্তিকর স্বপ্নের দ্বারা আত্মতুষ্টি লাভ করেছেন...
>
> এই সম্পূর্ণ অভারতীয় তত্ত্ব বিভাজন ও জীবনের জন্য সপেন-হাওয়ার নিৎসে কর্তৃক 'মাথলাস ৎস্যুর মরগেনরোৎ' তিরস্কৃত হয়েছেন : "স্বীকৃতিলাভ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ততটা প্রবল নয় যে তার জন্য কোনও প্রকার ক্লেশ স্বীকার করবেন, তিনি অনধিকার প্রবেশ করছেন।" এইভাবে 'ভারত' সপেনহাওয়ারের কর্মকাণ্ডে শেষ পর্যন্ত একটি স্বর ভিন্ন আর কিছু অর্থ বহণ করে আনে না, যদিও প্রায়শঃ তা একটি প্রবল কণ্ঠস্বরেরও অধিক, যে শক্তিশালী বাদ্যবৃন্দের তিনি সঞ্চালক তার এক মোহকর যন্ত্র যদ্বারা তিনি তাঁর ভাবধারা প্রকাশ করেন।

বুদ্ধ বিষয়ক জ্ঞান অনেক সময় দার্শনিক প্রকৃতির গ্রন্থাদি ভিন্ন সাধারণ ধরণের গ্রন্থ মাধ্যমে প্রণীত হয়। ১৭৯১ থেকে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গটিনগেনে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে দুই খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের নাম Ideen uber die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Volker der alten Welt (রাজনীতি সম্পর্ক, এবং প্রাচীনকালের বিশেষ খ্যাত জনগণের ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক ভাবনা)—লেখকের নাম এ. এইচ. এল. হীরেন। ভারত বিষয়ক ইংরাজীর ভাষায় মুখ্য সন্ধান সূত্রাদি সম্পর্কে তাঁর অবাধ সংযোগ ছিল। এই পণ্ডিত তাঁর ঈষৎ দীর্ঘসূত্রী আঙ্গিকে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণে তাঁর পাঠকদের জানিয়েছেন যে বুদ্ধ একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা যার মতবাদ ব্রাহ্মণ জাতিদের মতবাদের বিরোধী। প্রকৃত পক্ষে, তিনি এই দুই

গোষ্ঠীর মধ্যে যে মারাত্মক ঘৃণা তার কথা উল্লেখ করেছেন এবং এই যুক্তিতেই উত্তরকালে বৌদ্ধধর্ম ভারতভূমি থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হয়েছিল। যদিচ বৌদ্ধধর্মের শিক্ষার্থীগণের পক্ষে এই গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে আহরিত জ্ঞান একটু মাঝারি ধরণের হতে পারে, এতদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ বিদগ্ধ য়ুরোপের একটি সীমিত গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে আমরা এক উদারভাবে পরিকল্পিত এবং দৃঢ় ভিত্তিক বিশ্বকোষের সন্ধান পাই। কয়েকটি খণ্ড সত্যই প্রকাশিত হয়। জে. এস. আয়সথ এবং জে.জি. গ্রুবের এই বিশ্বকোষ সম্পাদনা করেন এবং তা লাইপজিগ থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের নাম ছিল Allgemeine Encyclopadie der Wissenschaften und Kunste (বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক সাধারণ কোষগ্রন্থ), এই গ্রন্থের বারটি কলম শুধু বুদ্ধ বিষয়ে নিবেদিত। আমরা 'দুই বুদ্ধ' থেকে দৃষ্টান্ত হিসাবে কয়েকটি অংশ উধৃত করছি। ধর্মীয় ও অধ্যাত্ম ভারত বিষয়ক গবেষকদের জ্ঞান ও উত্তম ধারণা সৃষ্টির পক্ষে এগুলি সহায়ক হবে :

> জ্যেষ্ঠ এই উপাধি মেনু (মনু) সত্যব্রতের জামাতাকে দেওয়া হয়। তার অপর নাম বৈবস্বত। সূর্যের তনয়। একটি ভেলার দ্বারা বিষ্ণু কর্তৃক তাঁকে ত্রাণ করা হয় মহাপ্লাবনের কালে (প্রলয়)। তিনি পুরু নামক বিখ্যাত বংশের প্রথম পুরুষ…
>
> কনিষ্ঠ বা দ্বিতীয় বুদ্ধ বিষ্ণুর নবম অবতার হিসাবে স্বীকৃত। এই অবতারবাদ হয় কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়ত তার পরের ব্যাপার। এইখানে, তাঁর আবির্ভাবের কালে পৌরাণিক রীতিতে নির্নীত, প্রথমোক্তটির অবসানে অথবা বর্তমান শেষ যুগ অর্থাৎ কলিযুগের উৎপত্তিকালে—

আমরা দেখতে পাই যে বিশ্বকোষ এক নির্ভুল তথ্যের সন্ধান দেয় যা মাত্র কয়েক দশক পূর্বের অনেক সেণ্ট্রাল য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের ভারত বিষয়ক ভাবমূর্তির ধারণা বিরোধী। নির্বান বিষয়ক কঠিন সংস্কার বিষয়ক সংজ্ঞা এইভাবে বিশ্বকোষে দেওয়া হয়েছে :

> আত্মার অবসানকে নির্বান বলা হয় (সংস্কৃতে নির্ব্বানী)। এর অর্থ নেতিবাচক আনন্দ যা সকল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লাভ করার আশা রাখেন…

বৌদ্ধ মতবাদের এবং বুদ্ধ বা জ্ঞানবানের অনুশাসন বিষয়ে একটা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার উপযুক্ত সময় সমাগত। সর্বপ্রথম উল্লেখ্য বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক বৈজ্ঞানিক আলোচনা গ্রন্থের নাম Introduction a l'histoire du Buddhisme Indien, ১৮৪৪ এই গ্রন্থের লেখক ফরাসী ভারততত্ত্ববিদ এমিলি লুই বারনুফ। তের বছর পরে প্রকাশিত হয় একজন জার্মান পণ্ডিতকৃত প্রথমতম বৈজ্ঞানিক এবং বিশ্লেষক আলোচনা Die Gesamtdarstellung der buddhistischen Lehre (বৌদ্ধ মতবাদের সম্পূর্ণ বিবরণ)। এই গ্রন্থের লেখক কার্ল ফ্রিডরিশ কোপেন। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে হেরমান বেখ্ যা লিখেছিলেন তাঁর Göschen Volume নামক গ্রন্থে তা আজও কোপেনের গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রযোজ্য।

যদিচ আজ বিভিন্ন দিকে গবেষণা সুরু হয়েছে। এই গ্রন্থে এমন কয়েকটি বিষয় পাওয়া যাবে আর কোনো সাম্প্রতিক গ্রন্থে অনুরূপ দৃষ্টিক্ষেপ করা হয়নি। লেখকের হৃদয়গ্রাহী পরিবেশন পদ্ধতি যদিচ কিঞ্চিৎ ত্রুটীপূর্ণ, তথাপি অনেকদিক থেকে আজো এর আকর্ষণ অব্যাহত।

কোপেন বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন তা নয়, বৌদ্ধধর্মের তিব্বত-মঙ্গোলিয় শাখা বিষয়েও তিনি বিস্তৃত গবেষণা করেছেন এবং সেই সঙ্গে লামা মঠ ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা করেছেন।

হেরমান ওলডেনবার্গ (১৮৮১), এডমণ্ড হার্ডি (১৮৯০), যোসেফ ডালমান (১৮৯৮) ম্যাকস্ ভ্যালসার (১৯০৪), এইচ. হ্যাকমান (১৯০৫-১৯০৬), রিচার্ড পিসখেল (১৯০৬) এবং হেরমান বেখ্ (১৯১৬) বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র উচ্চমানের পরিচয় দিয়েছেন।

হেরমান ওলডেনবার্গ পালিসূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যাদির সাহায্যে বুদ্ধদেব চরিত একটি জীবনীর মাধ্যমে পরিবেশনের প্রচেষ্টা করেছেন এবং সেই সূত্রে বৌদ্ধ মতবাদেরও ব্যাখ্যা করেছেন। বৌদ্ধ দর্শন এবং মনোভঙ্গীর সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনের বৈপরীত্য বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। পরিশেষে, তিনি বুদ্ধের বাণী এবং পালি গ্রন্থাবলীর আঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ওলডেনবার্গের মতে বৌদ্ধধর্ম মুখ্যতঃ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত অথচ তিনি বিচার করেছেন যে বৌদ্ধধর্মের পরিধি থেকে অধ্যাত্মবিদ্যা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে। বৌদ্ধ নীতির মধ্যে তিনি দেখেছেন নেতিবাচক এবং শান্ত ভঙ্গী, এই মন্তব্য পরবর্তী পণ্ডিতগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়েছে। যাই হোক, ওলডেনবার্গ

বৌদ্ধধর্ম যে এক দুঃখবাদী ধর্ম এই মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি যে সব বিরুদ্ধ মন্তব্য করেছেন তা সত্ত্বেও ওলডেনবার্গের গ্রন্থ দ্বারা বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ওলডেনবার্গের মত অনুরূপ ধারায় হার্ডিও অগ্রসর হয়েছিলেন, তিনি ব্যক্তি ও বুদ্ধ বা অমিতাভের জীবন ও কর্মের পরিচয় দিয়েছেন দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্যের আলোকে।

রিচার্ড পিসথেল মানবিক মহত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের দিক থেকে বুদ্ধকে ঘনিষ্ঠতর করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীতে ড্যানিশ পণ্ডিত এডওয়ার্ড লেমান কর্তৃক লিখিত বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থটির প্রচুর প্রভাব ছিল।

আধুনিক 'কারিগরি বিদ্যাসংক্রান্ত গ্রন্থে'র আকারে হ্যাকমন রচিত গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম বেশ সরলভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তার মধ্যে ব্যাখার ছড়াছড়ি বা নির্ঘণ্ট দানের তেমন বাহুল্য ছিল না। ভ্যালেসার অন্যদিকে আবার পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক বিশ্লেষণের দিকেই লক্ষ্য রেখেছিলেন। এই সমস্ত লেখক থেকে জার্মানীর বৌদ্ধ বিষয়ক গবেষণার প্রভাব হেলমুথ ফন গ্লাসেনাপের মত ব্যক্তিত্বশালী মণীষীর কাছে বিস্তারিত হয়। এঁর লিখনভঙ্গী সরল এবং বিস্তৃত, পাঠক সমাজকে সম্বোধন করার দায়িত্ব তিনি এড়িয়ে যান নি, অন্যজন এরিখ্ ফ্রাউভালনার, তিনি গবেষককে বৌদ্ধ দর্শনের অধ্যাত্ম নিসর্গে উন্নতি করার প্রয়াস করেছেন।

হয়ত জার্মান ভারততত্ত্বের চরিত্রের দরুণই অনেক কাল এই বিষয়টি উপকথার স্বপ্নরাজ্যে বন্দী ছিল। তথাপি এটা কি প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম নয় যার বিশ্বাসের কুসুম বাস্তবের ভূমিতে অধিষ্ঠিত, যা ঘটনা ভিত্তিক, দৃঢ়, প্রামাণ্য এবং সহজেই বোধগম্য অধ্যাত্ম ও ভাবজগতের সিংহদ্বার কিভাবে উন্মুক্ত করতে হয় তা জানে ? কারণ, অশ্বত্থবৃক্ষ যা জ্ঞানবৃক্ষ নামে পরিচিত, তা কি সর্বকালেই উপকথা ও পুরকাহিনীর মাল্য বিজড়িত নয় ?

প্রতিবেশী দেশসমূহের ভারততত্ত্ববিদগণ তাঁদের জার্মান সহযোগীদের অনেক পূর্বেই এদিকে দৃষ্টিপাত করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ই. সেনার্ট তাঁর 'Essai sur la Le´gende du Buddha' প্রকাশ করেন এবং তারও পূর্বে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এডুইন আর্নলড্ ভারত ও বুদ্ধদেব বিষয়ে তাঁর মহাকাব্য Light of Asia বা মহানিষ্ক্রমণ প্রকাশ করেন। মহাভিনিষ্ক্রমণ (গ্রেট লিবারেশন) বিষয়ে আরনলডের ব্যাখ্যানুসারে বুদ্ধের বাণী দ্বারা গভীর

ভাবে অনুপ্রাণিত একজনের দৃষ্টি ভঙ্গীতে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে জ্ঞান বিতরণের প্রচেষ্টা হয়েছে। তথাপি আরনলড 'শাক্যজাতির সাধু' শাক্যমুনি এবং খ্রীষ্ট উভয়ের সঙ্গে একটা তুলনার প্রয়াস করেছেন, বুদ্ধদেবকে তাঁর শিষ্যবৃন্দ শাক্য-মুনি বলতেন। জার্মানী থেকে বিশেষ করে যে বিতণ্ডামূলক আলোচনা হয় এই তার উৎস সূত্র। আর্থার পিফনগস্ট আরনলডের গ্রন্থটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করার পর এই বিতর্ক সুরু হয়। যাই হোক অসংখ্য সৌসাদৃশ্য এবং বাহ্যিক সাদৃশ্য বর্তমান যা প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধধর্ম বা খ্রীষ্ট ধর্মের অভ্যন্তরীণ সারবস্তুকে স্পর্শ করে না।

তৎসত্ত্বেও জার্মানীতে বৌদ্ধ অনুশাসন এবং কাহিনী কিভাবে খ্রীষ্টীয় মতবাদকে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বা তার প্রতিবাদ করে অজস্র সমীক্ষা প্রকাশিত হয়। এ সব অবশ্য বেশীর ভাগই আনুমানিক। রুডলফ সেইডেল একজন লেখক যিনি নিউ টেসটামেণ্টের মধ্যে প্রবল বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। তিনিই ক্রিশ্চান বুদ্ধ তত্ত্ব প্রচার করেন যা গঙ্গানদী থেকে জর্ডন নদী এক প্রাকৃতিক অলৌকিকত্ব বলে গ্রহণ করে। যাই হোক, সেইডেল পূর্ণ পরীক্ষা করেছেন এবং তাঁর তত্ত্বের অনেকখানি অংশ প্রত্যাহার করেন তাঁর পরবর্তী রচনাবলী থেকে যা তাঁর পুত্র সম্পাদনা করেন কিন্তু এতদ্দ্বারা এ কথা মনে করা যায় না যে বৌদ্ধ-ক্রিশ্চান সংযোগ বিষয়ে তাঁর মৌল চিন্তা আর অনুসৃত হয় না। সেইডেলের অভিজ্ঞতা পরবর্তী পণ্ডিতগণ যথা—জি. এ. ভ্যান ডেন বারগ ভ্যান এইসিংগা এবং রিচার্ড গার্বে প্রভৃতিকে সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এঁদের গ্রন্থাদি থেকে আমাদের কালের ধর্মীয় দার্শনিক ও ব্রহ্মবিদ্‌গণের একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যথা আরনেস্ট বেনৎস যিনি প্রথম পর্বের খ্রীষ্টধর্মের উপর ভারতীয় প্রভাব পর্যন্ত লক্ষ্য করেছেন সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণের একমত হয়ে।

'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ক্রিশ্চানিটি' নামক তার গ্রন্থে রিচার্ড গারবে বর্ণনা করেছেন, শ্বেতদ্বীপ নামক লোককথা, যেখানে নারদ গিয়েছিলেন এবং যেখান থেকে পঞ্চতন্ত্র নামক নীতিকথা ভগবান নারায়ণের কাছ থেকে সংগ্রহ করে আনেন। শ্বেতদ্বীপ, এই রকম কথিত আছে, মেরু পর্বতের উত্তর এবং উত্তর পশ্চিমে ৩২,০০০ যোজন দূরে অবস্থিত। এই দেশ শ্বেতচর্ম বিশিষ্ট মানুষের বাসভূমি, তাদের চোখের রঙ্ হাল্কা ও পরিষ্কার। হিলকো ভিয়ারডো সথমেরুসও এই কাহিনী উল্লেখ করেছেন 'Indien und das Christentum' নামক গ্রন্থের

দ্বিতীয় খণ্ডে। ভারত ও খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কিত এই গ্রন্থটি যদিচ যথাযোগ্যভাবে এই পরিচ্ছেদের কাঠামোর মধ্যে খাপ খায়না এই বক্তব্য ক্রিশ্চান-ভারতীয় সংযোগ বিষয়ক বৃহত্তর ক্ষেত্রের পক্ষে প্রযোজ্য :

> একটিমাত্র বিবেচ্য বিষয় আছে সেটি হল আপাত প্রতীয়মাণ প্রমাণ এই যে য়ুরোপীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার পূর্বেই ভারতীয়গণ খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে অবহিত ছিল। এই হল শ্বেতদ্বীপ সংক্রান্ত কাহিনী, যা মহাভারত নামক মহাকাব্যের ৩৩৭ ও ৩৩৮ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে।

বেশ কিছু সংখ্যক পণ্ডিতরা এখন খৃষ্টধর্মের ওপর ভারতীয় প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছেন। রাধাকৃষ্ণণ এবং বেনৎস মনে করেন 'এসেনেস' ভারতবর্ষ এবং প্যালেষ্টাইনের অধ্যাত্ম জগতের মধ্যে একটা সংযোগ ছিল। উল্টো দিকে, যোসেফ ডালমান বিশ্বাস করতেন বৌদ্ধধর্মের ওপর খ্রীষ্টীয় প্রভাব লক্ষ্য করেছেন, বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের 'মহাযান' নামক নীতির মধ্যে। যাই হোক হিলকো ভিয়ারডো সৃখেমেরুদ তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে এই বক্তব্যের কাটন দিয়েছেন :

> সর্বপ্রথম এবং সর্বাগ্রে যোসেফ ডালমান মহাযান ধারার উদ্ভব খ্রীষ্টীয় প্রভাবে প্রভাবিত একথা বলেন। তিনি যে সব প্রমাণ উত্থাপন করেছেন তার মধ্যে একটি প্রধান অংশ হল বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বুদ্ধ মৈত্রেয় যে একদা প্রেমময় এবং করুণাময় মুক্তিদাতা হিসাবে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীকে দুর্দশার হাত থেকে ত্রাণ করবেন তার মধ্যে যীশুখৃষ্টের চরিত্রের সাদৃশ্য গৌতম বুদ্ধের চরিত্রের চেয়ে অনেক প্রবল। আমার মনে হয়, ডালমানের এই তত্ত্বের উত্তরে একথা বলা যায় যে খ্রীষ্টের চরিত্রের এই দিকগুলি ঐতিহাসিক গৌতম বুদ্ধের ওপর প্রতিফলিত না হলেও মৈত্রেয় (যিনি ভবিষ্যবুদ্ধ) তাঁর ওপর আরোপিত হয়। অধিকন্তু, একথা নিশ্চিত যে ভবিষ্যবুদ্ধ সম্পর্কিত ধারণা প্রাচীন ঐতিহ্যগত বর্ণনায় ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব চারশ শতাব্দীতেও তাঁকে মৈত্রেয় বলা হত। একথা স্বীকার্য যে ভবিষ্যৎ বুদ্ধের মূর্তি বা রূপ বিশেষ করে প্রেমময় ও করুণাময় রূপের মধ্যে গড়ে ওঠে, কিন্তু ভাবমূর্তি গোড়ার যুগে অজ্ঞাত ছিল এ অর্থ করা যায় না, কারণ নাম থেকেই বোঝা যায় মৈত্রেয়

(পালিভাষায় মেত্তেয়) মৈত্রী এই শব্দ থেকে উদ্ভূত (পালিভাষায় মেত্তা) অর্থাৎ প্রেম।

যদি কারো মনে এই ধারণা জাগে যে ভবিষ্যবুদ্ধ সংক্রান্ত চিন্তা বিদেশী প্রভাব ভিন্ন সংযুক্ত করা যাবে না, 'শাওসিয়ান্ত' কথাটির মধ্যে যে ইরাণীয় প্রভাব আছে তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ হেতুবশতঃ তা করা উচিত, অধিকতর সম্ভাবনা বিচার করে। কারণ বিতর্ক হচ্ছে ভবিষ্যৎ মুক্তিদাতা বা মোক্ষদাতা বিষয়ে এবং ইরাণ ভারতবর্ষের একেবারে পাশের বাড়ির প্রতিবেশী বলা যায়। যাই হোক শাওসিয়ান্ত চিন্তার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস এখনও অনেকখানি অন্ধকারাবৃত সেই কারণে মৈত্রেয় ধারণা যে ইরাণ থেকে ধার করে আনা একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। তথাপি, এই ধার করার কথাটা বিশ্বাস করার কি প্রয়োজন হবে? কোনো সময়ে এবং কোনো কোনো হেতু বশতঃ মোক্ষদাতা সংক্রান্ত চিন্তা কি বহু ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেই উদ্ভূত হয় না? এই চিন্তা যে বৌদ্ধধর্মেও আত্মপ্রকাশ করেছে তা বেশ সহজেই বোঝা যায়, মোক্ষ বা ত্রাণ ব্যাপারে এইখানে বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হয়েছে সেই কারণে।

ম্যাকস ম্যুলরই সর্বপ্রথম জার্মান পণ্ডিত যিনি বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ে যে নিরীক্ষা করেন তা সাধারণ পণ্ডিতি কৌতূহলের চেয়ে অধিক। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কীয়েলে অনুষ্ঠিত ভাষাতাত্ত্বিক কংগ্রেসে তিনি বৌদ্ধধর্মের বহুবিধ দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আপনাকে চিহ্নিত করেন। বৈজ্ঞানিক হিসাবে তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম এবং সাংখ্যদর্শনের মধ্যে বিভেদ রেখা সুস্পষ্ট করে দেখান।

দার্শনিক ফিলিপ মেইনলানডারকে (ছদ্মনাম: ফিলিপ বাৎস) আমরা বৌদ্ধধর্মের একজন উগ্র প্রবক্তা মনে করতে পারি, এ যেন একপ্রকার অলৌকিকত্বে পূর্ণ গুহ্যতত্ত্ব। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট তাঁর 'Die Philosophie der Erlosung' বা মুক্তির দর্শন নামক গ্রন্থ প্রকাশের পরদিন তিনি আত্মহত্যা করে নির্বান লাভ করার চেষ্টা করেন; তিনি আপনাকে গুলি করে আত্মহনন করেন। তাঁর ব্যাপারে কান্টের প্রতীতিবাদ দর্শনের নতুন করে ব্যাখ্যা করা হয়—প্রকৃত সপেনহাওয়ারী ভঙ্গীর মাপকাঠিতে এর নাম নির্ভেজাল অলৌকিকবাদ। মেইনলানডারের কাছে প্রতিভাস বা

এ্যাপিয়ারেন্সই সব কিছু। সব কিছুই অন্বয় বা ক্যাজুয়ালিটির কঠিন গণ্ডীতে আবদ্ধ। মেইনলানডারের এই ক্রিয়াকলাপে প্রমাণিত হয় সপেনহাওয়ারের প্রভাব কত সুদৃঢ়, কি ভাবে তিনি তখনকার কালের একটি আন্দোলনকে রূপ দিয়েছিলেন যাকে সম্বোধনালঙ্কারে ভারতীয় বলা যেতে পারত, কিন্তু তার মধ্যে সমকালের য়ুরোপীয় মনোভঙ্গীর মানুষের বিচ্ছিন্নতা প্রকট হয়ে উঠেছিল, তার প্রবক্তা, দুঃখবাদের ত্রয়ী, অযৌক্তিকতা এবং নিরীশ্বরতা তার মুখ্য উপাদানভূত বস্তু। এই আন্দোলন একটি ধারা যা ধীরে এবং নিস্তেজ ভঙ্গীতে এক ধর্মীয় দৃশ্যপটে মিশে গেছে। অনেকেই এই ধারা তরঙ্গ প্রবাহে অবগাহন করেছিলেন। নীৎসে কূলচিহ্নাকৃতি পতাকা প্রায় তুলে ধরেছিলেন। এবং যেকব বারকহাউট থেকে উইলহেলম র‍্যাব্বি বা যাঁরা তাঁর সন্নিকটস্থ, তাঁরা সেই চক্রের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন যাঁরা সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকে দুঃখবাদ থেকে সংগ্রাম করে বেরিয়ে এসে সকল বেদনার ওপর জীবনের এক অস্তিবাচক মনোভঙ্গী গ্রহণ করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর সেই সব দশকে যখন বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে সপেনহাওয়ারী দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ক উৎসাহ আংশিকভাবে বিলীয়মান হয়ে এল তখন এডুয়ার্ড ফন হারটমান (১৮৩২-১৯০৬) কৃত Philosophie des Unbewussten (অচেতনের দর্শন) বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি করল। সপেনহাওয়ার বুদ্ধের শান্ত এবং তপশ্চারী ভঙ্গীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আর এডুয়ার্ড ফন হারটমান একটা আধুনিক ধরণের বীরত্বব্যঞ্জক দুঃখবাদের গুণকীর্তন করেছেন। সপেনহাওয়ার মুক্তির পথের সন্ধান পেয়েছিলেন বাঁচার ইচ্ছাকে অস্বীকার করে, বিপরীত দিকে হারটমান সচেতন ভঙ্গীতে তা ঘোষণা করতে অভিলাষী ছিলেন। তাঁর মতে অচেতনকে আমাদের অভিলাষ প্রভাবিত সচেতনত্বের ওপর আরোপ করা হয়েছে, তার ফলে প্রগতির উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। তথাপি সচেতনত্ব পরিণামে এমন এক জায়গায় পৌছাবে যেখান থেকে একেবারে আমাদের সমগ্র ইচ্ছা বর্তমানে যেভাবে সক্রিয় তাকে শূন্যে বিলীয়মান করবে। বুদ্ধের প্রাচ্যদেশীয় অধ্যবসায় আর পাশ্চাত্য উদ্দীপনা এইখানে একত্রিত হয়ে মিলেছে।

পণ্ডিত এবং দার্শনিক বৃন্দ ছাড়াও অনেক সময় শিল্পীরা বুদ্ধের বাণী ও দর্শনে আকৃষ্ট হয়েছেন। রিচার্ড ভাগ্‌নার এমনই একজন, তিনি সপেন-হাওয়ারের দর্শনের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে দীর্ঘকাল ধরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে

আচ্ছন্ন ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাথিলডে ওয়েসনডককে লিখিত এক পত্রে তিনি স্বীকার করেন সহজাত প্রেরণায় তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন। এর তিন বছর পূর্বে তিনি বুদ্ধদেবের জীবনকে কেন্দ্র করে একটি অপেরা রচনা করবেন স্থির করেন, এই অপেরার নাম Der Seiger (বিজয়ী) ; এর ত্রিশ বছর পরে, বৌদ্ধ জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত কয়েকটি নকসা ভাগনারের মৃত্যুর পর আবিষ্কৃত হয়। তাঁর অপেরা গুলিতে বৌদ্ধ-ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়।

তবে শুধুমাত্র ভাগনারই বৌদ্ধ প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা নয়। নীৎসের চিঠিপত্র থেকে দেখা যায় যে তিনি তাঁর বন্ধু রোডের সঙ্গে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মশেষে পথভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। দুজনে যখন মনোহর মফঃস্বল শহর মাইনিনগেনে উপস্থিত হলেন ওরা ভাগনার গোষ্ঠী বা তাঁর অনুগামীদের দ্বারা আয়োজিত এক সঙ্গীত উৎসবের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে লিখিত একটি পত্রে তিনি তাঁর বন্ধু জারসডোরফকে লিখেছেন।

> এই প্রতিষ্ঠান এখন সপেনহাওয়ারকে মহসমারোহে আবিষ্কার করেছেন। হানস ফন ব্যুলো কর্তৃক রচিত একটি সুরঝঙ্কৃত কবিতা 'নির্বান'-এর মধ্যে সপেনহাওয়ারের বাক্যাবলী গ্রথিত হয়েছে, কিন্তু সঙ্গীত একেবারে ভয়ানক। লিসৎ, অন্যদিকে কিন্তু ভারতীয় নির্বানের চরিত্রটুকু সার্থকভাবে ধরতে পেরেছেন। এমনকি তাঁর কয়েকটি ধর্মীয় রচনায় এর পরিচয় পাওয়া যায় বিশেষ করে সেলিগকাইটেনে : 'Beati Sunt qui' ইত্যাদি।

রিচার্ড ভাগনারের শেষতম মহৎ রচনা 'Parsifal'-এর মধ্যে খ্রীষ্টধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বেয়েউথের কর্তা মানবিক অস্তিত্ব বিষয়ক জটিল প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি স্বীকার করেন যে জীবনের জ্বালাই অন্তিম পাপ। এই অনুভূতি বৌদ্ধধর্ম এইভাবে এতটা স্পষ্ট করে বলেন না। প্রজ্ঞানের (Cognition) পরিণতি হেতু বা জীবনের অসারত্ব বিষয়ে বা নেতিবাদ বিষয়ে জ্ঞানলাভ হলেই মোক্ষলাভ হয় না ; এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অপরাধ মার্জনা করা যায়। এর জন্য করুণা এবং ধ্যানকর্মের প্রতি বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। এই পবিত্র কর্মের ভার নিয়েছিলেন ঈশ্বর পুত্র নাজারাথের যীশু, মানবের পাপ স্খালনের ভার নিজের ওপর গ্রহণ করে। শুধু যখন যে বর্শা যা একদা ক্রুশবিদ্ধকে স্পর্শ করেছিল এমফোরটাসের

ক্ষতকে স্পর্শ করে পারসিফালের হাতের নির্দেশক্রমে তখন সেই ক্ষতস্থান বন্ধ হয়। পারসিফাল অপরাধ এবং কৃচ্ছ্রসাধনের অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রজ্ঞার অধিকারী হন।

এই ভাবে পৌণঃপৌনিক বিবেক দংশনেরও অবসান হয়...এবং কুনড্রি যে কামনার মধ্যে প্রবেশ করে বিস্মৃতি চেয়েছিল অনুশোচনার অশ্রুপাত ও মুক্তির আনন্দ প্রকাশে তাকে সুযোগ দেওয়া হয়।...খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের এই দায়িত্বে, বৌদ্ধধর্মের সচেতন পরিবর্জনের মধ্যে নীৎসে দেখতে পেয়েছিলেন ein Kriechen zu Kreuze (অর্থাৎ ক্রুশচিহ্নে হীনভাবে অগ্রসর হওয়া) নামক রচনায়। তথাপি ভাগনারের কাছে যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র হয়েছিলেন একটি মনোহর জীবনের মধুর মৃত্যুর মধ্যে সে জীবন সম্পূর্ণ, মানুষকে ক্ষমা করা এবং তাদের পাপের প্রতি আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের পথ নির্দেশের পবিত্র দায়িত্বে জীবন উৎসর্গীকৃত।

তথাপি, আজো কিন্তু বৌদ্ধধর্মের 'স্বর্গীয় দান' (যা তিনি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লিসৎকে লিখেছিলেন) যা তিনি সপেনহাওয়ারের মারফতে আবিষ্কার করেন। "Götterdämmerung" (ঈশ্বরের গোধূলি) তৃতীয় সংস্করণের শেষ দৃশ্যে (পরে অবশ্য শেষ সংস্করণে এই অংশ বর্জন করা হয়েছে) ব্রুণহিলডের কথাগুলির মধ্যে বৌদ্ধ মৌলচিন্তার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উধৃত করা হল :

কামনার জগৎ থেকে আমি চলে যাই,
মোহের জগৎ থেকে আমি বীর পলাতক,
অন্তহীন জন্মলাভের
উন্মুক্ত সিংহদ্বার আমার পিছনে বন্ধ করে এলাম,
এখন আমি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী,
পুনর্জন্মের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি,
এখন আমি যাত্রাশেষের পথে
চিরন্তনের পবিত্র সমাপ্তি :
কিভাবে পেলাম ?
কাতর প্রেমের গভীর জ্বালা
আমার চোখ খুলে দিয়েছে
পৃথিবীর সমাপ্তি
আমি এই চোখে দেখলাম।

ফ্রিডরীশ নীৎসের (১৮৪৪-১৯০০) দর্শনের লক্ষ্য ছিল এক নতুন যুগের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করা। তিনি যা বলিষ্ঠ তার সদ্‌গুণকে প্রশংসা করেছেন এবং সেই কারণে প্রশস্তি জ্ঞাপন করেছেন মহান্‌ বৌদ্ধধর্মকে—ক্রিশ্চান 'দাস-নীতি' নামক তাঁর ভ্রান্ত চিন্তা পরবর্তীকালে ঘৃণায় পরিণত হয়।

> বুদ্ধ বনাম 'ক্রুশবিদ্ধ'—শূন্যবাদী (নিহিলইজম) ধর্মের কাঠামোয় ক্রিশ্চান এবং বৌদ্ধদের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ বিভেদ রেখা রচনা করেছে। বৌদ্ধধর্ম যেন এক মনোরম সন্ধ্যার অভিব্যক্তি, এক পরম মাধুর্যভরা কোমলতা—সব কিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা যা পিছনে পড়ে আছে তার অভাব—তিক্ততা, হতাশা, ক্ষোভ, অবশেষে উচ্চ ধর্মীয় প্রেম, এর পিছনে যে দার্শনিক মতপার্থক্যের কৃত্রিমতা আছে, এ তার থেকে অবসর নেয়; তথাপি সেই অধ্যাত্মিক ঔজ্জ্বল্য বর্তমান থাকে।

এই পর্যন্ত বৌদ্ধ সমস্যাবলী প্রধানতঃ আলোচিত হয়েছে দার্শনিক ও শব্দতাত্ত্বিক সুবিধাজনক ভূমিতে অধিষ্ঠিত হয়ে। প্রেসিডেনসিয়াল কাউন্সিলার সুলজের 'ধম্মপদ' অনুবাদ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বৌদ্ধধর্মের সমর্থকরা বারবার প্রকাশ্যে খ্রীষ্টধর্মকে আক্রমণ করেছে। যাই হোক এই ব্যাপারে 'ধম্ম' ব্যাপারের জার্মান সমর্থকরা শুধুমাত্র ক্রিশ্চান গোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধে যেতেছেন তা নয় তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠ ভারতীয় অধ্যাত্ম সংস্কৃতি এবং ভারততত্ত্ববিদ্‌দের সঙ্গেও বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম বালটিক জার্মান লিওপোলড ফন সখ্‌রোদার জোর গলায় বললেন যে যা নিয়ে খ্রীষ্টধর্ম গঠিত বৌদ্ধধর্মে ঠিক সেই বস্তুটিরই অভাব। অর্থাৎ ক্ষমা এবং প্রেম। তাঁর Kultur-und Literaturgeschichte Indiens (অর্থাৎ ভারতের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস) নামক গ্রন্থে সখ্‌রোদার বৌদ্ধ মতবাদের এক বিস্তারিত সমীক্ষা করেছেন। সুলজে আবার অপরদিকে বলেছেন যে খ্রীষ্টধর্মের মতবাদ হল আত্মাভিমানী প্রেমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, বৌদ্ধ মৈত্রী নীতির বিপরীত, মৈত্রীর অর্থ বিশ্বজনীন ভালোবাসা, সকল প্রাণীর প্রতি শুভেচ্ছার অনুভূতি। তাঁর মতে বৌদ্ধধর্মে তার শক্তির পরিচয় দিয়েছে ঈশ্বর থেকে মুক্তি ঘোষণা করে, অপর দিকে খ্রীষ্টধর্ম শিশুদের ধর্ম যারা 'ভীরু ও নম্র' তাদের ধর্ম। বৌদ্ধধর্ম অপরদিকে পরিণত মানসের মানুষের ধর্ম। খ্রীষ্টান স্বর্গরাজ্য

নৈর্ব্যক্তিক আদর্শবাদের ভূমি, অপরদিকে বৌদ্ধধর্ম বিষয়নিষ্ঠ, নির্বান বিষয়ে বিষয়নিষ্ঠ আদর্শবাদে বিশ্বাসী।

এই চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমতমদের অন্যতম হলেন উপরিলিখিত জেসুইট জোশেফ ডালমান, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কবলেনৎস প্রদেশে তাঁর জন্ম। ডালমান ছিলেন একজন সুদক্ষ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ এবং ব্রহ্মবাদী। তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পূর্ব-এশিয়া এবং ভারতীয় জীবনধারার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা। তিনি টোকিও শহরের ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় ইওচী দাইগাকুর সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান সাহিত্য ও ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপনা ব্যতীত (একে সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ও বলা হত) ডালমান ইমপিরিয়াল জাপানীজ ইউনিভার্সিটিতে অনুরূপ কাজ করতেন। জার্মান এবং ভারতীয় চিন্তাধারা বিষয়ে সমভাবে পরিচিত থাকায় এই অধ্যাপক তাঁর Indische Fahrten (ভারতীয় ভ্রমণ, ১৯০৮ ও ১৯২৭), Die Sprachkunde und die Missionen (ভাষাতত্ত্ব এবং মিশন, ১৮৯১), Das altindische Volkstum (প্রাচীন ভারতীয় চরিত্রবিজ্ঞান-গত জীবন, ১৮৯৯), Japans älteste Beziehungen zum Western von 1542 bis 1614, (পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে জাপানের প্রথমতম সম্পর্ক ১৫৪২-১৬১৪, ১৯২৩)।

জার্মানীর বৌদ্ধ জগতে সর্বপ্রথম প্রেরণা জাগিয়েছে সপেনহাওয়ার প্রেমিক কার্ল ইউজেন ন্যুমান কর্তৃক অনূদিত একটি ক্ষুদ্র বৌদ্ধ সঞ্চয়ন গ্রন্থের প্রকাশ। কিছু ভ্রমাত্মক অনুবাদের জন্য তাঁর গ্রন্থটির ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন এবং বৌদ্ধধর্মের মৌল দক্ষিনীরূপ বিষয়ে জ্ঞান প্রসারে গ্রন্থটি বিশেষ সহায়ক হয়। ন্যুমান সর্বপ্রথম অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের পালি গ্রন্থ 'সার-সংগ্রহ' বিষয়ে মনোযোগী হন। এই তরুণ পণ্ডিত এরপর 'মাঝঝিম নিকায়া থেরা' ও 'থেরী গাথা', 'সুত্তনিপট' এবং 'দীঘা নিকয়' অনুবাদ করেন। এইসব গ্রন্থগুলি মূল পালি রচনা এবং সুদীর্ঘকাল ধরে গুপ্তভাবে রক্ষিত যে অধ্যাত্ম-জগতের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের সারবস্তু নিহিত আছে তার চাবি-কাঠি বিশেষ।

ন্যুমান ব্যতীত খ্যাতনাম পালি পণ্ডিত কার্ল সাইডেনস্টুকার যিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপে বৌদ্ধ সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকাটির নাম Der Buddhist সেই কালের সাময়িক পত্রিকা জগতে এক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। সাইডেনস্টুকার বহু পালি অনুবাদ এবং হীনযান

বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক গ্রন্থাদি সম্পাদনা করেন, যথা, ক্ষুদ্দক পাঠ, উদানা এবং পালি-বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি। উইলহেলম গাইগার, যিনি বৌদ্ধ বলে আত্মপরিচয় দিতেন, 'সাম্যউত্ত নিকয়' গ্রন্থের অনুবাদক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

বৌদ্ধধর্মের বিজ্ঞান সম্মত গ্রন্থপঞ্জী সর্বপ্রথম জার্মানীতে প্রকাশিত হয়। ম্যুনিক ও লাইপজিগে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এইচ. এল. হেলডট 'দয়েৎসে বিবলিওগ্রাফি দেস বুদ্ধিসমুস' (বৌদ্ধধর্মের জার্মান গ্রন্থপঞ্জী) প্রকাশ করেন। এরপর এম. লালু ও জে পারৎইলুসকী দ্বারা সম্পাদিত Bibliographie boudhique এবং ১৯৩৫-এ এ. সি. মার্চ কর্তৃক Buddhist Bibliography নামক ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অনুবাদ গ্রন্থমালায় Materialien zur Kunde des Buddhismus (বৌদ্ধগবেষণার মূলগ্রন্থ) ১৯২৩ থেকে হাইডেলবার্গে পাওয়া যেত, অবশ্য ১৯০১-এ প্রকাশিত লণ্ডনের Pali Text Society-র অনুসরণে এই গ্রন্থ রচিত। Buddhica এই নামে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে অনুরূপ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

এইখানে আমি সর্বাপেক্ষা খ্যাতনাম জার্মান বৌদ্ধকে পরিচিত করাতে চাই। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রেঙ্গুনে বৌদ্ধ সমানেরা হিসাবে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বারো মাস পরে, আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রতিষ্ঠান সংবাদ প্রকাশ করেন যে এনটন গুয়েথ সর্বপ্রথম য়ুরোপীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। তথাপি গুয়েথ যিনি 'নয়নতিলক' নাম গ্রহণ করেন তিনিই প্রথম য়ুরোপীয় ভিক্ষু নন, তিনি বৌদ্ধ গবেষণার ইতিবৃত্তে যোগদান করেন।

এই মানুষটি প্রায় সমগ্র পদব্রজে পরিভ্রমণ করে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তেসিয়ান পর্বতে বৌদ্ধ মঠ স্থাপনা করেন। সেইখানে ওয়ালটার মার্কগ্রাফের নেতৃত্বে ইতালীয় ও জার্মান বৌদ্ধরা সমবেত হতেন, ইনি রোমের সেণ্ট পীটার পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের পীত বসন পরিধান করে। কিছু সংখ্যক সহ বিশ্বাসী অনুগামী সহ তিনি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহলে পর্যটন উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। আর যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর কালে প্রচুর ক্লেশ ভোগ করে তাঁর দত্তক স্বদেশ ভূমতে ফিরে আসেন। তিনি জার্মান বৌদ্ধ সাহিত্যকে তাঁর অনুবাদ এবং প্রবন্ধাবলীর দ্বারা বিশেষভাবে অগ্রসর করেন। তাঁর পরিণত বয়সে নয়নতিলক জার্মান ও অন্যান্য য়ুরোপীয় এবং তৎসহ আমেরিকান, তিব্বতী, সিংহলী এবং দক্ষিণ ভারতীয় ভিক্ষু সম্প্রদায়ের পুরোধা বা নায়ক

থেরা হিসাবে অভিষিক্ত হন (নায়ক থেরার পালি অর্থ প্রবীণ নেতা) এবং দোদনডুয়ার নিকট রতগামা হ্রদের কাছে দ্বীপ আশ্রমে (Island Hermitage) প্রতিষ্ঠিত হন। অন্যান্য পালিগ্রন্থের সঙ্গে নয়নতিলক বিশুদ্ধ মাগ্গ-এর অনগুত্তারা নিকয়, মিলন্দ পনহ ও পুগ্গালা-পান্নাত্তি প্রভৃতির বিস্তারিত সংগ্রহ অনুবাদ করেন। উইলহেলম গাইগারের সঙ্গে নয়নতিলক সর্বশ্রেষ্ঠ য়ুরোপীয় পালি ও বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত হিসাবে খ্যাত।

জার্মান বিজ্ঞান তার জার্মানীস্থ বৌদ্ধ পণ্ডিতকে 'Deutsche Morgenländische Gesellschaft' (জার্মান প্রাচ্য সমিতি) দ্বারা সম্মানিত করেছেন 'হেরন এনটন ওয়ালটার ফ্লোরাস গুয়েথ যার ধর্মীয় নাম নয়নতিলক মহাথেরা'কে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে সম্মানিত সদস্য নির্বাচন করে। এই সোসাইটির তলপ বা সাইটেশ্যনে বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে :

> ...পালি-বৌদ্ধ সাহিত্যের সর্বাগ্রগণ্য মেধাবী ছাত্র, অগুত্তর নিকয়, মিলন্দ পনহ, বিশুদ্ধি মাগ্গ এবং অন্যান্য ধর্মীয় এবং যাজবীয় গ্রন্থাবলীর অনুবাদক। জার্মান ও ইংরাজী ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থের লেখক যার ফলে থেরাবাদিনদের ধমগ্রন্থ বিষয়ক জ্ঞান পাশ্চাত্য দেশে গভীরতর হওয়ার সহায়ক হয়েছে তাঁকে আমরা সম্মান জ্ঞাপন করি। অর্ধ-শতাব্দীকাল পূর্বে তিনি বৌদ্ধধর্মমত সিংহলে গ্রহণ করেন, যার ফলে নৈতিক অনুশাসন এবং হীনযান সাহিত্যের অপ্রতিহত ঐতিহ্যগত জ্ঞান সংগ্রহে তিনি সাফল্য লাভ করেন। গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক প্রয়াসের বিশেষ করে 'অভিধম্মপিটক' দ্বারা তাঁর সমীক্ষা উপকৃত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে সুদীর্ঘ অন্তরীণবাস, এবং তার পরিণামে তাঁকে জাপানে যেতে হয়, সেইখানে তিনি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি এবং জার্মান শিক্ষা দিয়েছেন। ১৯২৬-এ সিংহলে প্রত্যাবর্তন করে তিনি অক্লান্তভাবে নিজের কাজ করে গেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে দ্বিতীয়বার তিনি অন্তরীণাবদ্ধ হন যার ফলে তার সৃজনীশক্তি ব্যহত হয় এবং তাঁর আবহাওয়া এবং শারীরিক অসুস্থতা তার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করে। তাঁর অধিকতর জনপ্রিয় গ্রন্থাবলী প্রাচ্যদেশসমূহের বৌদ্ধমহলে তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি করে। তাঁকে একজন সম্মানিত সদস্য হিসাবে নির্বাচন

করে এই সোসাইটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যখণ্ডের বৌদ্ধ পণ্ডিত সমাজের মধ্যে যে অন্তরঙ্গ সংযোগ বর্তমান সেই কথাই বিশেষভাবে প্রকাশ করার বাসনা রাখে। চিত্ত এবং হৃদয়ের দিক থেকে দুর্লভ সম্পদের অধিকারী এই বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যিনি দীর্ঘকাল ধরে সিংহলের জনগণ এবং হীনযানভুক্ত দেশসমূহ এবং আমাদের দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় করেছেন তাঁকে আমরা বিশেষভাবে সম্মানিত করতে চাই।

নয়নতিলকের সিংহল যাত্রাকালে যাঁরা তাঁর সঙ্গে সহযাত্রী ছিলেন পালি নামানুসারে তাঁদের এইখানে উল্লেখ প্রয়োজন, তাঁদের নাম ভাপ্পা, মহানাম, সোনা, যশ এবং অন্য দুজন সাধু সবকৎসাক ও আনকেনব্রানড। অন্তবিধ কর্মাবলীর সঙ্গে নয়নতিলক জাপানের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কুমাজাওয়া দাইগোকু-র অধ্যাপক ছিলেন। অনেককাল ধরে তিনি জার্মান ও পাশ্চাত্য মননশীলতার প্রাচ্যদেশস্থ প্রতিনিধি ছিলেন। এই চক্রের আরেকজন জার্মান পণ্ডিত হলেন পালি নামধারী নয়নপোনিকা।

এই সূত্রে জার্মান বৌদ্ধ ভিক্ষুনী উপ্পলবন্নার (যার অর্থ উৎপলবর্না) নাম উল্লেখ করতে ভুল করা অনুচিত হবে। তিনি সঙ্গীতবিদের সাফল্যজনক জীবন পরিহার করে নয়নতিলক থেরার নির্দেশে বৌদ্ধধর্মের পথ গ্রহণ করেন। তার সম্পত্তির মধ্যে ছিল একটি টেবিল আর চেয়ার, একটি ক্ষুদ্র বৌদ্ধ মূর্তি, পালি ধর্মগ্রন্থ একটি সেলাইকরার যন্ত্র যার দ্বারা তাঁর সামান্য কয়েকটি বস্ত্রাদি সেলাই করা যেত—এ ছাড়া তিনি ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবন ধারণ করতেন। উপ্পলবন্না এই নামটি থেকে এমন কোনো সন্ধান সূত্র পাওয়া যায় না যদ্বারা বোঝা যায় যে এই নামের অধিকারিণী একদা স্প্রী নদীর তীরে এলসে বাখোলৎস নামে মানুষ হয়েছে এক প্রখ্যাত বার্লিন ব্যাঙ্কারের কন্যারূপে।

প্রসঙ্গতঃ একথা এইখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে জার্মান বৌদ্ধ শুধুমাত্র ভারতবর্ষ আর সিংহলে বাস করেন না। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্মা মুল্লুকের মগোক নামে এক দূর পল্লীতে একজন জার্মান ভিক্ষুর দেহান্তর ঘটে, তাঁর নাম ইউ. নয়নধারা। জার্মান থেরা নয়নতিলক দ্বারা তিনি সিংহলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং তাঁর গুরুর সঙ্গে বর্মায় গিছলেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এই মানুষটিরও কনরাদ নেল এই নামে বার্লিন শহরে জন্ম হয়। ইমপিরিয়াল জার্মানীর সার্জেন জেনারেল, জেনারেল নেলের তিনি পৌত্র।

চীনা অঞ্চলে যাঁরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ

খ্যাতিমান হলেন মারটিন স্টাইনকে, ভিক্ষু হিসাবে চীনাদের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল তাও চুন (পথের ঋজুতা)। নানকিং-এর উত্তর-পশ্চিমে সী-হিয়া-সানস্থ বৌদ্ধমঠে তাঁর দীক্ষা হওয়া বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ১৯৪০-এ Buddhistische Gemeinde (বৌদ্ধ সম্প্রদায়) কর্তৃক পটসডামে প্রকাশিত Buddha und China (বুদ্ধ এবং চীনদেশ) নামক পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যাবে। স্টাইনকে একদা বার্লিনের Gemeinde um den Buddha (বুদ্ধের চতুষ্পার্শ্বস্থ সম্প্রদায়) নামক প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন। একজন বৈজ্ঞানিক এবং Der Buddha-weg und wir Buddhisten (বুদ্ধের পথ এবং আমরা যারা বৌদ্ধ) নামক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে বৌদ্ধ গোষ্ঠির বাইরেও তাঁর নাম প্রসারিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গতঃ ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে উদ্বোধিত বৌদ্ধ কংগ্রেসের কথা উল্লেখ করা চলে, কারণ তার প্রতিষ্ঠাতারা অনুধাবন করেছিলেন যে পাশ্চাত্য জগতে বৌদ্ধমতকে ধর্ম হিসাবে স্বল্প সংখ্যক মানুষই গ্রহণ করতে পারবেন।

ডাঃ পল ডালকের কথারও উল্লেখ প্রয়োজন, ইনি বার্লিনের প্রখ্যাত Buddhistisches Haus (বৌদ্ধ-ভবন) নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ধীর ভাবাপন্ন সক্রিয় বৌদ্ধদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি। ১৯২৫-এ বার্লিন ফ্র নাউ-এ তিনি বৌদ্ধ-ভবন নির্মান করেন। তিনি যেসব গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন তার মধ্যে Buddhismus als Religion und Moral (বৌদ্ধধর্ম ও নীতি) ১৯১৪ এবং Der Buddhismus (বৌদ্ধধর্ম) ১৯২৬, এই গ্রন্থদুটি অন্যতম।

এ. পি. বুদ্ধদত্ত থেরা ২রা জুলাই ১৯৪৮ তারিখে অগ্‌গরামা, অমবলগোদা থেকে একটি পত্র লিখেছেন :

> আপনি জেনে খুশী হবেন সন্দেহ নেই যে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ পল ডালকের বার্লিন ফ্র নাউ এর বৌদ্ধ-ভবনে একমাস অতিথি হয়ে আপনার দেশে ছিলাম। আমি সুইজারল্যাণ্ড থেকে গিছলাম। সেখানে মিঃ লাংগের সঙ্গে আমি ছমাস ছিলাম, তিনি গৃহকর্তা হিসাবে লোকার্নোতে আমার দেখা শুনা করেন।

এর কিছুদিন পরে একটি ক্ষুদ্র কিন্তু বৈজ্ঞানিক পার্সেল আমার বাড়িতে এসে পৌছাল। বুদ্ধদত্ত আমাকে তাঁর পালি পাঠ্য গ্রন্থ পাঠিয়েছেন। এই পাঠ্য গ্রন্থটি লেখক কর্তৃক তাঁর জার্মান বন্ধুকে উৎসর্গ করা হয়েছে, উৎসর্গপত্রে লেখা

হয়েছে—"সুইজারল্যাণ্ড লোকার্নোর রুবেন লাংগের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত, তিনি আগ্রহভরে আমার দ্বারা এই গ্রন্থ রচনার বাসনা প্রকাশ করেন।"

আর একজন ফলিত বৌদ্ধ ধর্মানুসারী হলেন জিওরজ গ্রীম, তিনি Buddhistische Weisheit (বৌদ্ধ প্রজ্ঞা, ১৯১৮) Buddha und Christus (বুদ্ধ এবং খৃষ্ট) এবং Das Glück—die Botschaft des Buddha (সুখ—বৌদ্ধের বাণী, ১৯৩২) নামক বিখ্যাত গ্রন্থাবলী রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থে গ্রীম একটি বৌদ্ধ সারাংশ প্রদান করেন। আর. এন. কুদেনহোভ-কালেরগী তাঁর Los vom Materialismus (জড়বাদ থেকে সরে আসা যাক) নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মকে উৎকট ধরণের বিশ্বসুখবাদ বা হেডোনইজম এই কথা বলেছিলেন। গ্রীম এই মতবাদের জবাব দিয়েছেন উক্ত গ্রন্থে।

> প্রকৃত নীতিবাদ তার নিজের প্রয়োজনে যা সৎ তার প্রচার করে, এই তার পরিণতি। প্রকৃত নীতিবাদ, নীতিগত সততা এবং আনন্দের অবস্থা একাত্ম হয়ে মিশে যায়। তথাপি ঠিক সেই নিরিখে বৌদ্ধ ধর্মের ত্যাগকে নির্মান করা হয়েছে, চর্চা করা হয়েছে। ত্যাগের প্রতিটি কর্মের নিজস্ব পুরস্কার আছে। অর্থাৎ ত্যাগের আনন্দ। এই একটি কারনেই প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র বর্গগত অনুজ্ঞা আমাদের প্রকৃতির গভীরতম প্রদেশ থেকে উর্ধলোকে ওঠে; এবং প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির সকল প্রাণীর মধ্যে এই একটি বস্তু সর্ব প্রাণী-দ্বারা স্বীকৃত। এতে বলা হয়েছে, যা তোমাকে অখুশী করে তা কি জানার চেষ্টা করো এবং তাকে পরিহার করো। তবু, প্রকৃত উপলব্ধির আলোকে এর নাম—ত্যাগ করো! এই বর্গগত অনুজ্ঞা সকল কর্তব্য সকল আনন্দকে জড়িয়ে আছে।

এতদ্বারা বৌদ্ধনীতির নেতিবাচক চরিত্র একযোগে সমর্থনজ্ঞাপক।

প্রথম বৌদ্ধ পত্রিকা অচিরাৎ অনুরূপ সাময়িক পত্র দ্বারা অনুসৃত হল, যথা: Die Buddhistische Warte (বৌদ্ধ তোরণ) এবং Maha-Bodhi Blätter (মহাবোধি পত্র)। কিন্তু এই সব সাময়িকপত্র প্রকাশিত হওয়ার অনেক পূর্বে ১৯০৩-এ লাইপজিগে প্রথমতম বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করা হয়, তার নাম Buddhistischer Missionsverein (বৌদ্ধ মিশনারি সোসাইটি)। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এই নাম Buddhistische Gesellschaft (বৌদ্ধ সমাজ) এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে এর নাম হল Deutscher Zweig der Maha-Bodhi-

Gesellschaft (মহাবোধি সোসাইটির জার্মান শাখা) এবং সরকারি ভাবে বৌদ্ধ ওয়ার্লড মিশনের সঙ্গে সংযুক্ত। জার্মান মহাবোধি শাখা অতঃপর ছোটখাটো সংবাদ সমীক্ষা প্রকাশ করেন। আংশিকভাবে Buddhistische Gesellschaft বা মৈত্রী সমিতির সংযোগে, যেমন ব্রেসলুতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত Deutsche Pali-Gesellschaft (জার্মান পালি সমিতি, এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন মার্কগ্রাফ তাঁর বৌদ্ধ নাম সামানেরো ধম্মানুসারী) অথবা Bund für buddhistisches Leben (বৌদ্ধ জীবনের সমিতি), এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন ১৯১১-খ্রীষ্টাব্দে সালের ওপর হালের কাছে দোহালুতে ডাঃ বোন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে Neubuddhistische Zeitschrift (নব্য-বৌদ্ধ পত্রিকা) প্রকাশিত হয়। তারপর প্রকাশিত হয় পল ডালকের Brockensammlung (চূর্ণ সংগ্রহ, ১৯২৪-২৮) এবং জিওরজ গ্রীম ও কার্ল সাইডেনষ্টুকার সম্পাদিত Buddhistische Weltspiegel (বৌদ্ধ বিশ্ব-দর্পন, ১৯১৯-২১)। যুদ্ধ মধ্যকালীন কালে Gesellschaft für Buddhakunde (বৌদ্ধ জ্ঞান প্রদায়িনী সভা) ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে হাইডেলবার্গে স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান জার্মানীর বৌদ্ধ ধর্মগত ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য জার্মানীতে বিশেষ খ্যাত ছিল। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কফুর্ট-অন-মেইনে একটি নতুন জার্মান-বৌদ্ধ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ম্যুনিকে বৌদ্ধ বেনারস পাবলিসিং হাউসের অস্তিত্ব ছিল। ব্রেসলুতে মার্কগ্রাফের যুদ্ধ পূর্বকালীন পাবলিসিং হাউসের রীতিতে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কনসটানসের কুরট-ভেল্লার-ভেরলাগ অশোক সংস্করণের বৌদ্ধ-সাহিত্য পরিবেশন করেন।

অন্যান্য জার্মান ভাষী বৌদ্ধরা সম্প্রতি ভারতবর্ষে সক্রিয় আছেন, অষ্ট্রিয়ানদের মধ্যে আছেন হারবার্ট. ভি. গানথার (বুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থাদির রচয়িতা এবং সাইকি ও যুগনাধ্য প্রসঙ্গ প্রভৃতির রচয়িতা হিসাবে খ্যাত) শিল্পী দার্শনিক আরনষ্ট লোথার হফ্‌মান (যিনি লামা অনাগরিক গোবিন্দ এবং The Psychological Attitude of Early Buddhist Philosophy নামক গ্রন্থের লেখক হিসাবে খ্যাত। যখন জার্মানীতে ছিলেন লামা অনাগরিক গোবিন্দ যিনি একজন পারসী রমনীকে বিবাহ করেন তিনি তিব্বতী বৌদ্ধ সমাজের পাশ্চাত্য উদ্ভূত সম্প্রদায়গত বিভাগের প্রধান ছিলেন—এই প্রতিষ্ঠানের নাম আর্য মৈত্রেয় মণ্ডল। বর্তমানে তিনি ভারতেই বাস করেন। এই দেশ

তাঁর দত্তক ভূমি এবং তিনি প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও লামা-লেখক হিসাবে পরিচিত। রুডলফ পেটরীও দীর্ঘদিন ভারতে বাস করছেন। তিনি জার্মান ভিক্ষু অনিরুদ্ধ নামে পরিচিত। ইনি সুইডেনে সেই দেশের নাগরিকত্ব লাভ করে বৌদ্ধ মতবাদ প্রচার করেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ম্যুনিকে রিটার ফন মেং কর্তৃক প্রথম বৌদ্ধ সম্প্রদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যুনিকের সমিতি সিংহলের মহাবোধি সোসাইটির জার্মান শাখা হিসাবে পরিচিত। এদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হলেন যোশেফ. জি. বয়ের। এঁর দুটি ভাই আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ আন্দোলনে বৌদ্ধ বিমালো ও কোনদান্না এই নামে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের বসন্ত-কালে Buddhistische Monatshefte (বৌদ্ধ মাসিকপত্র) নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর নাম পরে পরিবর্তন করে রাখা হয় Indische Welt (ভারতীয় জগৎ)। পূর্ববর্তী বৎসরে জুরিখে Die Einsicht—Schweizerische Zeitschrift für Buddhismus (অন্তদৃষ্টি বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক সুইস পত্রিকা) প্রভৃতির অভ্যুদয় ঘটে। এই পত্রিকার সম্পাদক ম্যাকস ল্যাডনার নীৎসেও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক একটি সমীক্ষা গ্রন্থের লেখক, এছাড়া "Gotama Buddha—sein Werden, seine Lehre, seine Gemeinde (গৌতম বুদ্ধ—তার ক্রমবিকাশ, শিক্ষা এবং সম্প্রদায়) গোড়ার দিকের বৌদ্ধ পালি রচনাবলীর ভিত্তিতে রচিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

এম্যারসের উড্ডিং-এর গোড়ার দিকের বৌদ্ধ সম্প্রদায় যাঁরা জিওরজ গ্রীমের শিষ্য তাঁরা প্রকাশ করেন 'Yana' নামক পত্রিকা। 'Studia Pali Buddhistica' নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ যা ডাঃ পালমী কর্তৃক হামবুর্গ থেকে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয় তার পুনঃপ্রকাশ আসন্ন।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধ সমিতি এবং অনেক ব্যক্তি বিশেষ মহাবোধি সোসাইটির জার্মান শাখায় যোগদান করেন। যাই হোক, এই জাতীয় সমিতি বৌদ্ধ দর্শন থেকে সুরসঙ্গতিহীন বলে দেখা গেল এবং সেই কারণে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি Buddhist Union স্থাপিত হয়। পল দেবেশ কর্তৃক ব্যাড ওলডস্লোতে একটি বিশেষ ধরণের বৌদ্ধ ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য গঠিত হল Buddhistische Seminare für Seinskunde (মানব জ্ঞান বিষয়ে বৌদ্ধ আলোচনা সভা) ১৯৬১-তে ব্যাড ওলডস্লোর নিকটস্থ রোলফসহাগেনে এই আলোচনা সভা বা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সব সেমিনারের ফলে

অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে এক নতুন ভাবধারার উদ্ভব হল—Streitgespräche mit den Konfessionen (বিভিন্ন ধর্মের বিষয়ে তর্ক সভা) আর একটি অনুরূপ প্রতিষ্ঠান হল Verein Haus der Stille (স্তব্ধতার সমিতি ভবন)—জেলা লাউএনবার্গের রোসবার্গ নামক অঞ্চলের কাছে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়।

ঐতিহ্যানুসারে অধিকাংশ জার্মান বৌদ্ধ হীনযান শাখার অন্তর্ভুক্ত। জার্মান মহাযান বৌদ্ধদের প্রধান বা উপাচার্য একজন জার্মান বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তাঁর নাম উলরিখ রাইকার। তিনি উইসবাডেনের অধিবাসী। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে তাঁর দীক্ষা হয় জার্মান সন্ন্যাসী মহা মঠাধীশ লামা অনাগরিক গোবিন্দ দাপ কাশ্যপ এই নামে তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন।

> মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মধ্যে যাঁরা অতিকায় বুদ্ধ তাঁদের সমগোত্রীয়, শিল্প ও কাব্যে তিনি অতিশয় সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তারিত করেছেন।

উপরোক্ত কটি কথায় ফন গ্লাসেনাপ এই মহাযোগীর আবির্ভাবে ধর্ম-বহির্ভূত ক্ষেত্রে কি প্রভাব বিস্তার করেছে তার বর্ণনা করেছেন Reden des Buddha (বুদ্ধের ভাষণ সমষ্টি) নামক গ্রন্থের ভূমিকাংশে।

তবু একথা শুধু মাত্র বুদ্ধের ধ্রুপদী ধর্ম বিষয়ে যে সত্য তা নয়, নয়া-বৌদ্ধ দর্শন, কবিতা, বিশেষ করে গীতি কবিতাকে প্রভাবিত করেছে। ওটো কেম্নারের Pessimistisches Liederbuch (দুঃখবাদী গীতগ্রন্থ), ম্যাকস সেলিং-এর Quellen pessimistischer Weltanschauung (দুঃখবাদী ওয়েলটানশাউং-এর উৎস) এবং ফেরেউসের Stimmen des Weltwehs (পৃথিবী পরিত্যাগ বাসনা ভরা কণ্ঠস্বর) প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। একথা সত্য যে এই সব গ্রন্থ তেমন ব্যাপকভাবে সর্বত্র পরিচিত নয় কিন্তু এর দ্বারা আধুনিক লেখকদের উপর বৌদ্ধ প্রভাব যা বিখ্যাত কবিরাও অনুভব করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কারণে যখন ড্যানিস লেখক কার্ল জিলেরাপ Der Pilger Kamanita নামক উপন্যাস ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন তখন মনে হয় যে একজন বিশ্বাসী বৌদ্ধ মতাবলম্বীর কণ্ঠস্বর আধুনিকের মুখে প্রতিধ্বনিত। একজন সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর তীর্থযাত্রীর জীবনকথা আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন। জিলেরাপ জার্মান-বৌদ্ধ সাহিত্যের উদ্বোধক হবার আশা রেখেছিলেন। এই মনোভঙ্গী নিয়েই তিনি 'কামানিতা'য় একটি মন্তব্যে বলেন ঃ

> যদি ডাঃ ই. কে. নিউমান, যার গ্রন্থ ভিন্ন এই বইটি রচনা করা সম্ভব ছিল না, 'সত্যের পথ' নামক তাঁর গ্রন্থের প্রস্তাবনা অংশে তের বছর পূর্বে না লিখতেন···কেবলমাত্র গত কয়েকটি দশক, মাত্র গত কয়েক বছরে বুদ্ধ কে ছিলেন এবং আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছেন সেই কথা জানতে পেরেছি···যাই হোক বৌদ্ধ ধর্মের কাব্যাংশ, তাঁর অন্তর্নিহিত সারবস্তু, আজো আমাদের কাছে পাঁচ-ভাঁজ করা বন্ধ কেতাব মাত্র। একটির পর একটি শীল মোহর ভাঙতে হবে যদি আমরা তার হৃদয়ের বাণী জানতে চাই তাহলে শীলভেঙে খুলতে হবে, পণ্ডিতরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করার পর কবিরা এখন অগ্রসর হয়ে আসুন। তাঁদের কর্তব্য করুন পালি ভাষার তথ্যাবলী তাঁর প্রতীক্ষায় আছে। শুধু তখনই বুদ্ধের বাণী জীবনলাভ করবে। এই দেশেও তাই হবে। আর জার্মানীতে জার্মানদের মধ্যে বিকশিত হবে। আমি আশাকরি আমার সুপণ্ডিত এবং শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ এবং হয়ত আরো অনেকে এই গ্রন্থের মধ্যে সেই ইচ্ছাপূরণের সূত্রপাত লক্ষ্য করবেন।

তবু জার্মান রচনায় বৌদ্ধ প্রভাব তারও আগে পড়েছে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে যে বছর ম্যাকস ম্যুলর বৌদ্ধধর্মের প্রশস্তিতে রচিত একটি স্তোত্র গান করে শব্দতত্ত্বের সম্মেলনের পরিধি প্রসারিত করেছিলেন। জে. ভি. উইডমান তাঁর এপিক কবিতা 'বুদ্ধ' রচনা করেন। এইভাবে বৌদ্ধ চিন্তা সুকুমার সাহিত্যের বিষয় বস্তু হয়ে ওঠে। কিছু কিছু বৌদ্ধ-সাহিত্যের শিল্পগত মূল্য বা ক্রমে ফ্যাসনে পরিণত হয়—যে আলোচনাযোগ্য একথা স্বীকার্য। কিন্তু এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে এক প্রাচ্য দেশীয় সাধুর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। ফার্ডিনাণ্ড ফন হর্নষ্টাইন (নাটক: বুদ্ধ, ১৮৯৮), ফ্রিৎস মথ্নার (দৃশ্যাবলী: Der letzte Tod des Buddha—বুদ্ধের শেষ মৃত্যু, ১৯১২) এবং আলফনস ফন জিবুলকা (উপন্যাস: Der Tod vor dem Buddha—বুদ্ধের আগে মৃত্যু, ১৯৩৫) একটা ধারাবাহিকত্ব উচ্চ শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে থেকে গেছে, যথা স্তেফান ৎসোয়াইখ্, হেরমান হেস ও টমাস মান—এঁরা সকলেই তাঁদের জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে বুদ্ধের দার্শনিক পরিবেশের ঘনিষ্ঠ সংযোগে এসেছিলেন।

টমাস মান বা স্তেফান ৎসোয়াইখের কাছে ভারতবর্ষ আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম

ভঙ্গী না হয়ে বরং একটা পশ্চাদপট মাত্র। সেই কারণে, তাঁদের সাহিত্য বিষয়ে এই গ্রন্থে পরে আলোচনা করা হবে। তথাপি হেরমান হেস প্রাচ্য দেশের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছেন, ভারতীয় প্রজ্ঞা এবং চীনা মননশীলতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়েছেন।

এই পরিচ্ছেদের শিরোনামের কথাগুলি হেরমান হেস কর্তৃক তাঁর 'সিদ্ধার্থে'র আমার কপিতে লিখিত, আমি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন সেই দেশে যাত্রা করি তিনি লিখেছেন আমার ভারতের যাত্রাপথের সাফল্য কামনা করে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণের ১৬৭ পৃষ্ঠায় তার এই নিবেদনে একটি কথার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে দেখা যাবে। হেসের 'সিদ্ধার্থ' বুদ্ধের জগতের সারবস্তুকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। এই উপন্যাসের 'নায়ক'কে সেই জগতে পাঠানো হয়েছে যেখানকার অকৃত্রিমতার বিষয় হল সম্পূর্ণতা। কারণ শেষ পর্যন্ত, এ এক পরিণত মানবের কর্ম, এই সেই স্বয়ং বুদ্ধের সঙ্গে সংঘর্ষ যাকে সিদ্ধার্থ অনুসরণ করতে অসমর্থ, কারণ নিজের অভ্যন্তরস্থ কি এক বস্তু তাকে বাধা দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, ঠিক এই বস্তুই সিদ্ধার্থকে একজন প্রকৃত বৌদ্ধ বলে প্রকাশিত করেছে। রুডলফ পানউইৎস এই গ্রন্থটির নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করেছেন :

> এই কাহিনী সিদ্ধার্থ যা দৈর্ঘে একটি উপন্যাসিকা বা নভেল জাতীয়, অতি সুদূরের দিকে মন টানে। এর মধ্যে একজন মানুষের জীবন কথা বলা হয়েছে যিনি তাঁর সম্পূর্ণতা লাভে সচেষ্ট এবং তা লাভ করেছেন। সিদ্ধার্থ ভারতেরই একজন ভারতীয়। তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক। তিনি প্রাচীন পথে বিচরণ করেন। প্রতিটি পথে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং তার পরিপূরণ করেন আর এক বিপরীত পথ সুরু হয়। তিনি একজন য়ুরোপীয়তে পরিণত হয়ে হেরাক্লিডের ছন্দের সুরে দৃঢ়তা অবলম্বনে সচেষ্ট হন। সারবস্তুতে না হলেও ক্রিয়ায়; পরিস্থিতি অনুসারে তিনি কোনোরকম আইনগত নিয়ম মেনে চলবেন না অথবা পূর্ব নির্ণিত ভূমিকা যা শেষ পর্যন্ত তার অন্তর্লোকের সত্তাকে তুষ্ট করতে পারবে না। সুতরাং তার জন্য কোনো সমাধান নেই, মোক্ষ নেই যা তাকে স্বস্তি দিতে পারে, তাকে তার বিষয় নিষ্ঠ অহং-এর কবল থেকে মুক্ত করতে পারে। এই অবস্থা তাকে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি বিপরীত ধর্মী পর্বে নিয়ে গেছে এবং

এমন সময় আচরণে ব্রতী করেছে যা একতরফা নয় বরং নিছক ব্যক্তিগত—প্রতিটি এক পূর্ববর্তী পর্বের বর্গীভূত এবং পরবর্তী এক সমাজে তার সামাজিক বিস্তার এবং তাঁর সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এর সঙ্গে তাল রেখে যে কোনো মতবাদ স্বীকার করতে চায় না তাকে নিজস্ব করতে না পারলে, নিজের রক্ত মাংসের মধ্যে—অর্থাৎ সে কিছুই স্বীকার করে নিতে পারে না। শুধুমাত্র বুদ্ধের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার ফলে একটা পরিবর্তন ঘটে, তবুও কোনো আত্মসমর্পণ নেই, কোনো ধর্মান্তর নেই।

যে উদ্যানে বুদ্ধ বিচরণ করেছেন তার রেলিং-এ মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়েছেন তাঁর নাম রেইনার মারিয়া রিলকে। তথাপি তিনি যদিও বুদ্ধকে অনুসরণ করেন না, কিন্তু তিনি তাঁর চোখের গভীরতা, গরিমা এবং প্রসার দেখতে পেয়েছেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে ক্লারা রিলকের কাছে লিখিত এক পত্রের মধ্যে এই বাক্যগুলি আছে:

আর সেই ধ্বনি আমার সারা অঙ্গ ঘিরে আমার সমস্ত চিন্তা ডুবিয়ে দিল আর আমার সমস্ত রক্ত। এ যেন ধ্বনির দ্বারা গঠিত এক বুদ্ধ। এত বৃহৎ, এত বিরাট, এত প্রকাণ্ড যে তিনি তর্কাতীত —সুতরাং এই ধ্বনির সীমা যেখানে আর একবার নৈঃশব্দে পরিণত হল……

যাই হোক রিলকে তাঁর কবিতায় দুবার 'ধ্বনি দ্বারা গঠিত' রূপান্তর করেছেন। ১৯২৫-এর শেষের দিকে তিনি মিউডনে বুদ্ধের প্রথম তিনটি স্তবক রচনা করেন। যাই হোক, এটা দূরত্ব, সুদূরত্ব যা এখানে রিলকের দ্বারা অনুভূত হয়েছে, এ সেই হোরেসিয় 'odi profanum':

আহা তিনিই সব! আমরা কি সত্যই
তিনি আমাদের দেখবেন তাই প্রতিক্ষায় আছি?
তাঁর কি এর প্রয়োজন আছে?
আর আমরা যদি তাঁর সামনে সষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ি
তিনি একটি পশুর মত অনঢ়
সান্নিধ্যহীন হয়ে থাকবেন।

যাই হোক, ১৯০৮-এর বসন্তকালে রিলকে একটা ভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা

লাভ করেন। প্যারিসে তাঁর কলম থেকে দুটি লাইন প্রকাশিত হল। দূরত্ব আর তাঁকে ভীত করেনা। তাঁর কবি-কল্পনা স্বর্গের চিরন্তন নৈকট্যের মধ্যে মহৎ অভীপ্সা দেখতে পায়। এ কি নিছক কবি-কল্পনা না এর মধ্যে বিজড়িত আছে ভাবাবেগ? (আমরা তা জানিনা): Buddha in der Glorie (মহিমাময় বুদ্ধ) এই কবিতা অধ্যাত্ম গরিমা বিষয়ে নীৎসের ঘোষণা এবং বৌদ্ধধর্মের সোনালি সূর্যাস্ত স্মরণ করিয়ে দেয়:

সকল কেন্দ্রের কেন্দ্র, হৃদয়ের হৃদয়,
একটি বাদাম, তার খোলসের ভিতর সুমিষ্ট—
এই বিশ্বজগৎ যা প্রতিটি তারকা পর্যন্ত প্রসারিত
সে তোমায় সুপক্ক শাঁষ: প্রণাম তোমায়।
সকল বন্ধন থেকে তুমি মুক্ত মনে করছ,
অনন্ত আজ তোমার খোলস,
তেজোময় বীর্য প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত,
আলোক রশ্মি বাইরে থেকে সাহায্য করছে,
কারণ ওপরে, তোমার সূর্যরা ঘূর্ণ্যমাণ,
পরিপূর্ণ, উচ্চ, আর উত্তাপে ভরা—
কিন্তু তোমার ভিতর জীবন সুরু হয়েছে,
এই সব সূর্যগুলি অতিক্রম করবে।

য়ুরোপে বৌদ্ধধর্মের ফলাফল শুধুমাত্র সাহিত্য ও বিজ্ঞানে দেখা যাবে। য়ুরোপের অধ্যাত্ম জীবনে বৌদ্ধধর্ম একটি সুন্দর ধ্বনি মাত্র।—'ধ্বনি দ্বারা গঠিত একটি বুদ্ধ'। এর দ্বারা প্রেরণা জাগে, তথাপি কোনো বৃহৎ ধরণের ধর্মীয় গোষ্ঠীর অস্তিত্ব দেখা যায় নি। বৌদ্ধধর্ম অভ্যন্তরে আঘাত করে না কিন্তু বহিরঙ্গকে অসাধারণের আকর্ষণ এনে দেয়। ভাবের আন্দোলনে এটা প্রায় খ্রীষ্টধর্ম থেকে সরে আসা একটি ভঙ্গীমাত্র। এই ভঙ্গী অগ্রাহ্য করার মনোভঙ্গী বা ভালোবাসার অন্বেষা থেকে উদ্ভূত। এই কালের বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে পড়েছিলেন যে সব সাধারণ মানুষ ও বাহিরাগত, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন সাইলেসিয়ার অধিবাসী লেডুইগ ষ্টোহর। ১৯২৮-এর একদিন তিনি নিউমান সংস্করণ পাঁচখণ্ড মুখ্য পালি রচনাবলী সংগ্রহ করলেন এবং সোলডাউ জেলার টপিনগেনের কাছে সহসা একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করলেন। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অধ্যাত্ম সংযোগ স্থাপন করে অনেকেই নিজেদের মধ্যে অমূল্য

মূল্যবোধের সন্ধান পেয়েছেন। অধ্যাত্ম সংলাপ তাঁদের মধ্যে অপরের মনোভঙ্গী বোঝার সুযোগ এনে দিয়েছে। আবার মাঝে মাঝে নিজেদের অন্তরের অধ্যাত্ম-বস্তুর চাবিকাঠির সন্ধান দিয়েছে। এর থেকে তারা পেয়েছে বোঝবার শক্তি, উদারতা এবং সহিষ্ণুতা। সকল সৎগুণ একটা স্বাভাবিক অভ্যাসে Civitas Pacis—একটা শান্তির ও সহযোগীতার সাম্রাজ্য, সকল জাতির মানুষ নিয়ে সকল ধর্ম, সকল মননশীল জগৎকে নিয়ে ভবিষ্যৎ কালের সাম্রাজ্য গড়ে তোলা যাবে।

জার্মান ভাষী জগতে
ভারততত্ত্ব বিষয়ক চর্চার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্পদ যে বিরাট দেশ যোজন কোটি দূরে অবস্থিত, তমসাবৃত হয়ে দীর্ঘকাল পূর্বে লুপ্ত হয়েছিল, আর একবার জার্মান পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়ে উঠেছে।

রাজা শ্যামাকুমার ঠাকুর (জার্মানী-কাব্য)

*　　　　*　　　　*

নয়া বিজ্ঞানের পথিকৃৎ ও প্রবক্তা এফ. ফন স্‌খলগেল এবং সৃজনশীল প্রতিভা ফ্রানৎস বোপ, জার্মান তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতির উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠাতা, যেকব গ্রীম, আর একজন ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতির উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠাতা, সুগভীর চিন্তাবিদ্ উইলহেলম ফন হমবোলট, যিনি ভাষাতাত্ত্বিক জগতের দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে নতুন পদ্ধতির সংযোগ সাধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, আগষ্ট ফ্রিডরীশ পট—সর্বপেক্ষা বিশ্বজনীন ভাষাতাত্ত্বিক যাঁর দার্শনিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাপ্রাপ্ত মন যে কোনোরকম ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা অস্পষ্ট বা অভেদ্য রাখেন নি—এঁরা সকলেই জার্মান মননশীলতার আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র।

—থিওডোর বেনফি (জার্মানীর ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচ্য-শব্দতত্ত্ব বিষয়ক ইতিহাস)

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে লাইপজিগ শহরে প্রকাশিত 'জার্মান-কাব্য' নামক গ্রন্থে ভারতীয় পণ্ডিত রাজা শ্যামাকুমার ঠাকুর, যে লেখক শব্দতত্ত্বের ক্ষেত্রে কাব্যিক ভাবধারা আমদানি করেন তিনি জার্মান বিজ্ঞান ও জার্মান ইতিহাস বিষয়ে বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক প্রশস্তি জ্ঞাপন করেন।

ভারততত্ত্ববিদ থিওডোর বেনফির (১৮০৯-১৮৮১) তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও শব্দ বিষয়ে ও সংস্কৃত সংক্রান্ত ক্ষেত্রে গবেষক জার্মান পথিকৃৎদের উচ্চ কাব্যিক প্রশংসা করেছেন তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক ও শব্দতাত্ত্বিক ইতিহাস বিষয়ক এক ব্যাপক আলোচনার ভূমিকাংশে উৎসাহপূর্ণ প্রশস্তিদান করেছেন। বেনফির এই গ্রন্থ নব্য শব্দতাত্ত্বিক শৃঙ্খলা, ভারততত্ত্বের একটা বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রগত ক্রমবিকাশের বিস্তারিত ইতিহাস; ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মান পাণ্ডিত্যের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে ফরষ্টারের 'শকনতলা' প্রকাশের বার বছর পরে ফ্রিডরীশ স্‌খলেগেল প্যারিস থেকে তাঁর ভাই আগস্ট উইলহেলমকে লিখেছেন তাঁর প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ক পড়াশোনা বিষয়ে। সেই চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি ফ্রিডরীশ স্‌খলেগেল একজন ইংরাজ যুদ্ধ বন্দী, নৌ-বিভাগের অফিসার আলেকজান্দার হ্যামিলটনকে তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার শিক্ষক নির্বাচিত করেছেন এবং পড়াশোনা ভালোভাবে অগ্রসর হচ্ছে :

> অন্যদিকে আমি ভালোই করছি। কারণ, আমি অনেকটা শিখেছি। শুধু যে পারসিক ভাষায় আমার পড়াশোনা অগ্রসর হয়েছে তা নয়, অবশেষে আমার সংস্কৃত শিক্ষার লক্ষ্য পথে পৌছানো বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি। চার মাসের মধ্যে মূল ভাষায় পড়তে পারব এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। অবশ্য তখনও হয়ত আমাকে অনুবাদের সঙ্গে মেলাতে হবে।

মনে হয়, নব্য-বিজ্ঞানের গভীর ও অক্লান্ত পথিকৃত ও ভায়ের অন্তরে যিনি ভারতবিদ্যা বিষয়ে উৎসাহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন তিনি তাঁকে অধিকতর বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশন করছেন।

ফ্রিডরীশ ফন স্‌খলেগেল (১৭৭২-১৮২৯) ফ্রান্স ছাড়লেন, ক্লাসিকাল গ্রিসো-রোমান যুগের কাব্যধর্মী রোমান্টিক অনুরাগ বোধ হয় শেষ হয়ে এল, কারণ, বৃহত্তর ভারতীয় জগত তখন তাঁর কাছে প্রগাঢ় আকর্ষণ রচনা করেছে। নব-নির্বাচিত কর্মক্ষেত্রে আগ্রহের প্রমাণ হিসাবে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Uber die Sprache und Weisheit der Inder (ভারতীয়দের ভাষা এবং প্রজ্ঞা প্রসঙ্গে) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ফরষ্টারের 'শকনতলা' স্‌খলেগেলের গ্রন্থটি জার্মান ভারততত্ত্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রেরণা স্থাপনে সহায়ক হয়েছে।

দার্শনিকভাবাপন্ন চিন্তায় ইতিমধ্যেই তুলনামূলক ইঙ্গিত থাকায় বিশেষ করে বিশ্ববিকাশ বা ইমানেশন বিষয়ে ভারতীয় জ্ঞান, এবং প্রকৃত শব্দতত্ত্বের ক্ষেত্রে অনুরূপ ক্রমবিকাশ ইত্যাদির জন্য গ্রন্থটি বিশেষ ভাবে স্‌খলেগেলের ভাই আগস্ট উইলহেলমের প্রতি (১৭৬৭-১৮৪৫) স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। বইটি পড়া শেষ হতেই তিনি নিজেই সংস্কৃত পড়তে সুরু করলেন। ভাবতে বিস্ময় লাগে মননশীল ভারত বিষয়ে কোন বস্তু দুই ভাইকে এভাবে আকৃষ্ট করেছিল। একথা কি সত্য হতে পারে যে তৃতীয় এক ভাই কার্ল আগস্ট স্‌খলেগেল (১৭৬১-১৭৮৯) হানোভারিয়-ব্রিটিশ গার্ডস রেজিমেণ্টের একজন অফিসার হিসাবে ভারতে গিয়েছিলেন এবং মাদ্রাজের নিকট তাঁর মৃত্যু হয়, সেটাই অন্যতম কারণ?

তবু এর ওপর আরো গুরুভার হেতুও থাকতে পারে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হাইনরিখ হাইনের একটি চিঠি ঠিক সেই কালে জার্মান ভাষী অঞ্চলে অনেকে যা চিন্তা করছিলেন তার সঙ্গে সুর মিলিয়েছে অর্থাৎ এটা কত ভাগ্যের কথা যে জার্মানরা কলোনীর আকারে ভারতীয় অঞ্চলে কোনো ভূখণ্ড উপহার পাননি। আর সেই কারণেই তাদের সব লক্ষ্য পক্ষপাতমুক্ত হয়ে ভালোবাসার সঙ্গে তাদের সমগ্র দৃষ্টি ভারতের অধ্যাত্মিক সম্পদের ওপর রাখতে পেরেছিলেন। হাইনে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন, আগস্ট উইলহেলম স্‌খলেগেলকে, তাঁকে Sonettenkranz (সনেট মালিকা) নামক গ্রন্থটি উপহার পাঠান উপলক্ষ্যে এই চিঠি :

> সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপারে একমাত্র সময়ই বলবে এটা কতখানি সহায়ক হবে। বছরের পর বছর পোর্তুগীজ, ডাচ ও ইংরেজরা বড় বড় জাহাজ বোঝাই করে ভারতবর্ষের রত্নরাজি নিয়ে আসছে, আমরা জার্মানরা শুধু তাকিয়ে আছি। তথাপি ভারতের অধ্যাত্মিক রত্নরাজি থেকে আমরা বঞ্চিত থাকব না। স্‌খলেগেল, বোপ, হমবোলডট, ফ্রাঙ্ক ইত্যাদি আমাদের বর্তমান পূর্ব-ভারতীয় পর্যটক, বন এবং ম্যুনিক উত্তম বাণিজ্য কেন্দ্র হতে পারবে।

ফ্রানৎস বোপ (১৭৯১-১৮৬৭) সর্বপ্রথম আগস্ট উইলহেলম স্‌খলেগেলকে ভারতবিদ্যার সঙ্গে পরিচিত করেন। শব্দতত্ত্বের পণ্ডিতেদের পক্ষে এটা অদৃষ্টের পরিহাস বলতে হবে যে 'শিক্ষকে'র পূর্বেই 'ছাত্র' অধ্যাপক হয়ে গেছেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে আগস্ট উইলহেলম স্‌খলেগেল

জেনিভার গুইলাম ফারকে একটি চিঠি লেখেন, ইনি মাদাম স্তেল এবং লেখক উভয়েরই বন্ধু ছিলেন। এই চিঠির মধ্যে আনন্দ-সংবাদ ছিল, আমি বাল্মীকির মধ্যে হোমারের সন্ধান পেয়েছি।

প্যারিসে ওঁদের যুক্ত পড়াশুনা ব্যতীত স্‌খলেগেল ও বোপ এই দুই ভারত বিষয়ে উৎসাহী বন্ধুর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিশেষ পার্থক্য ছিল। স্‌খলেগেল শব্দকোষ বাদ দিয়ে সাহিত্যের দিকটাই অধিক পছন্দ করতেন, অপরদিকে বোপ গোড়া থেকেই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহী।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের 'বনে' জার্মানীতে ভারতীয় পঠন-পাঠন ব্যাপারে তিনি যে কি পরিমাণ আগ্রহ সঞ্চার করতে পেরেছিলেন তা তাঁর সংস্কৃত গ্রন্থাদি প্রকাশ এবং দেবনাগরী অক্ষর সংগ্রহ বিষয়ক প্রচেষ্টা সংক্রান্ত যে সব ভদ্র তথ্যাদি পাওয়া যায় তার মধ্যে দেখা যাবে।

> এ. ডব্লু. স্‌খলেগেল কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ ইতিমধ্যেই সুপরিচিত। প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'বন' সংস্করণ লাতিন অনুবাদ-সহ ভাগবদগীতা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে, (২য় সংস্করণ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লাসেন কর্তৃক সূত্রপাত করা হয়) এরপর প্রকাশিত হয় তার সংস্করণের রামায়ণ, এটি আটটি বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশের কথা, তার মধ্যে বন শহরে মাত্র একটি এবং আধখানা প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ হয়—১৮২৯ এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থের মধ্যে প্রথম দুটি কাণ্ড লাতিন অনুবাদসহ দ্বিতীয় খণ্ড, ২০ পর্যন্ত আছে। এর অবসরে লাসেনের সহযোগে হিতোপদেশ (Institutio salutaris) অর্থাৎ মূল গ্রন্থ ১৮২৯ এবং Commentarius criticus সমালোচনা ও মন্তব্য ১৮৩১-এ প্রকাশিত হয়। যাই হোক Interpretatio latina যা গ্রন্থের মলাটের পাশে বিজ্ঞাপিত হয় সেই লাতিন মন্তব্য প্রকাশ হয়নি। সংস্কৃত গবেষণা বিষয়ে ধ্রুপদী শব্দতত্ত্বের সমালোচনা পদ্ধতির পরিচয় দ্বারা স্‌খলেগেলের ভূমিকা চিহ্নিত। এই সংস্করণের চমৎকার লাতিন অনুবাদ ভার্জিল এবং হোরাসের রচনার সমতুল। এর এক সংযোজিত গুণ হল এই যে এতদ্বারা য়ুরোপীয় ভূমিতে উল্লেখ্য সংস্কৃত গ্রন্থাদির চারা বসানো হল, পশ্চিমের পাঠকদের কাছে এই গ্রন্থগুলি এভাবে সহজলভ্য হল। বোহৎলিংক এই সংস্করণগুলি থেকে প্রকৃতপক্ষে অনেকখানি অংশ তাঁর অভিধানে

উধৃত করেছেন; তিনি তাঁর ক্রেষ্টোমাথীতে স্‌খলেগেলের রামায়ণ থেকে একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বনে মুদ্রিত এই সব সংস্কৃত পাঠ তখনও যথেষ্ট ব্যয়বহুল। রামায়ণ সংস্করণের মূল্য ফরাসী এবং জার্মান গ্রন্থ তালিকায় ৫০ ফ্রাঁ বা ১৪ থালের বলে উল্লেখ করা হয়েছে…

বোপের চিঠিপত্রে দেবনাগরী টাইপ কেনার ব্যাপারটি বারবার উল্লিখিত হয়েছে। য়ুরোপের যে প্রথম ব্যক্তি সংস্কৃত অক্ষরের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি লণ্ডনের উইলকিনস্ ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ব্যাকরণে তিনি সর্বপ্রথম এই অক্ষর ব্যবহার করেন। এই অক্ষরগুলি পুনরায় ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন সংস্করণ 'হিতোপদেশ' এবং বোপের 'নালুস' মুদ্রণে ব্যবহৃত হয়। এ. ডব্লু. স্‌খলেগেল-এর পাঠ নতুন সংস্কৃত অক্ষর যা তিনি বনে কিনেছিলেন রয়্যাল প্রাসিয়ান গভর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে তাই দিয়ে মুদ্রিত হয়। তাদের উৎপাদনে তাঁর অংশ লঘু এক পাণ্ডুলিপির শিরোনামে প্রকাশিত—Litterarum figuras ad elegantissimorum codicum Bibliothecae Regiae Parisiensis exemplaria delineavit, caelandas, feriundas, flandas curavit Aug. Guil. Schlegel…Lutetiae Parisiorum, ex officina Georgii Crapelet MDCCCXXI.

এ. ডব্লু. স্‌খলেগেল একজন অক্লান্ত পণ্ডিত তিনি উইলহেলম ফন হুমবোলডট, সীল্যর ও গ্যয়টে, স্‌খেলিং, হোলডারলিন প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন ও মাদাম দ্য স্তেলের তিনি বন্ধু ছিলেন। বার্ণাদোতের প্রাইভেট সেক্রেটারী বা একান্ত সচিব হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিক ব্যাপারে কিছু জ্ঞান লাভ করেন, তথাপি তিনি প্রথম এবং সর্বাগ্রে ছিলেন একজন শান্ত বৈজ্ঞানিক, বহু ঐতিহাসিক বিশ্বজনীনত্বের প্রমুখ বৈজ্ঞানিক।

Indische Bibliothek (ভারতীয় পাঠাগার) নামক তাঁর সংগ্রহে তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের বৈশিষ্ট বিষয়ক সমীক্ষা করেন এবং এতদ্বারা এই গ্রন্থাবলীকে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টির ধারায় আকার ও নির্দেশ দান করেন, তার নাম Über den gegenwärtigen Zustand der indischen Philologie (ভারতীয় শব্দতত্ত্বের আধুনিক রূপ)।

এ. ডব্লু. স্‌খেলেগেল ভারততত্ত্বের নব আবিষ্কৃত ক্ষেত্রে একজন মহামণীষীস্বরূপ। উইনডিসথ্‌ প্রাগৈতিহাসিক ভারত সম্পর্কে তিনি কি ভাবে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন এবং ভবিষ্যৎ ভৌগলিকদের জন্য তিনি নির্দেশ রেখা নির্দিষ্ট করে গেছেন এবং পরবর্তীকালের প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার অর্থে স্মারক বিষয়ে কল্পনা করে গেছেন। উইনডিসথ্‌ বলেছেন:

> একজন শিক্ষাবিদ শিক্ষক এমন বিশ্বজনীন ভঙ্গীতে বলেছেন, এমন পদ্ধতিগত ভঙ্গীতে ভারতীয় প্রত্ন বিষয়ে বলেছেন যে তাঁর শ্রোতাদের চিত্তে তিনি একটা সুদৃঢ় ছাপ রেখে দিয়েছেন। অতএব, ভারতীয় প্রত্ন বিষয়ক ক্রিশ্চিয়ান লাসেনের সমীক্ষাকে তাঁর শিক্ষক এ. ডব্লু. স্‌খলেগেলের আদর্শের সর্বোত্তম পরিপূর্তি বলা যায়।

অগ্নিব্রতী স্‌খলেগেলের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন পণ্ডিত ফ্রানৎস বোপ। তিনি ও পণ্ডিত ফ্রিডরীশ স্‌খলেগেলের সুবিখ্যাত গ্রন্থ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। তিনি প্যারিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিছলেন। প্রথম প্রজন্মের জার্মান ভারত-তত্ত্ববিদগণের অন্যতম (জার্মান মননশীল দৃশ্যপটে শকুন্তলার আবির্ভাবের পর), বোপ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সংস্কৃত গবেষণা দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ভারততত্ত্বের একটি নতুন শাখা অচিরাৎ গড়ে উঠল, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব। বোপের গ্রন্থটির নামটি সুবৃহৎ:

> গ্রীক, লাতিন, পারসিয়ান, জারমানিক প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে সংস্কৃতের সংযোজক সমস্যা। রামায়ণ ও মহাভারত থেকে অতিরিক্ত পর্বসহ, মূল গ্রন্থ থেকে প্রকৃত ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ এবং বেদ থেকে কয়েকটি অংশ সংযুক্ত। পরিচায়ক মন্তব্য সহ কে. জে. উইনডিস্‌থমান সম্পাদিত। ফ্রাঙ্কফুর্ট-অন-দি-মেইন, ১৮১৬।

এই গ্রন্থ অচিরাৎ প্রকাশিত হল। কারণ পণ্ডিতমহল অতি দ্রুত নতুন সুযোগ সম্পর্কে অবহিত হলেন। বোপ মহান শব্দতাত্ত্বিকদের দলে প্রবেশ করলেন যদিও পথিকৃৎ জগতের অসম্পূর্ণতা রয়ে গিছল। মূল গ্রন্থের মধ্যে ত্রুটি প্রবেশ করার গ্রন্থটির সামান্য অঙ্গহানি হয়।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট উইলহেলম স্‌খলেগেলের বন-এ আহ্বান আসায়, বোপ জার্মানীতে দ্বিতীয় সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বন যখন সংস্কৃত পঠন-পাঠনের কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে তখন তিনি লণ্ডনে গেলেন। তখনও তিনি লণ্ডনে, পরের বছর

সেখান থেকে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভারততাত্ত্বিক গ্রন্থ প্রকাশ করলেন, এ গ্রন্থটি 'নলোপখ্যানে'র লাতিন অনুবাদ। মহান মহাকাব্য মহাভারত থেকে এই কাহিনী গৃহীত, এই গ্রন্থের নাম Nalus, Carmen sanscritum e Mahabharato। বোপ অনুবাদ প্রকাশ করতে লাগলেন এবং বিশ্লেষণী ভাষ্যাদি লিখলেন ও ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করলেন। তাঁর তুলনামূলক ব্যাকরণ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পর প্রকাশিত হয়, সেই বছরেই তিনি সংখ্যাগণিতের তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রকাশ করেন। ফ্রানৎস বোপের প্রথম জীবনী রচনা করেন সলোমন লেফমান। নব্য শব্দতাত্ত্বিক পদ্ধতির গ্রন্থকার হিসাবে বোপ ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে প্রবেশ করলেন। তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এবং ইন্দো-জার্মানিক পঠন-পাঠনের স্থপতি হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করলেন।

অপরের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে তাঁর পদ্ধতি গোঁড়া শব্দতাত্ত্বিক ক্ষেত্রের বাইরে থেকে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ল, সে সব জায়গায় অবশ্য সবক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সঠিকত্ব প্রয়োগ করা হয়নি। জেমস টড লিখিত রাজস্থানের অতীত কাহিনী এমনই এক দৃষ্টান্ত, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে। ঐতিহাসিক পরিচ্ছেদগুলির মহান তাৎপর্য আছে বটে, বোপের তুলনামূলক পদ্ধতি এখানে সাম্রাজ্যগত, শব্দতাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় ব্যাপারে মাঝে মাঝে বিস্তৃত হয়েছে সন্দেহজনক ভঙ্গীতে কারণ লেখক স্যাকসন ভাষা এবং কিপচাকের সঙ্গে সংযোগ সূত্র পেয়েছেন সুইডেন ও কাশগরের মধ্যে আবার বলেছেন বুদ্ধ এবং ওডন অভিন্ন ব্যক্তি। আজো যে এই জাতীয় অবৈজ্ঞানিক রীতি তুলনামূলক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তা জি. জয়সেনার রচনায় প্রমাণিত, তিনি আবার 'ভারত থেকে উদ্ভূত স্যাকসনগণ' বলতে ভালবাসেন। সাকা-সেনায়ে বা সাকিয়া-সেনায়ে, মহাভারতের কুরু সম্প্রদায়ের সঙ্গে জার্মান ও এ্যাংলো-স্যাকসনদের সঙ্গে এক বলে ধরেছেন, তিনি আবার জার্মানী কুরু-মান্নিয়া পর্যন্ত বলতে ছাড়েননি। এই জাতীয় কল্পনায় পক্ষীরাজ ঘোড়া উড়িয়ে দেওয়ার ফলে তুলনামূলক বিজ্ঞানের চেয়ে সমৃদ্ধ ধরণের অলৌকিকত্বকে মিশিয়ে দেওয়ার প্রবণতাই দেখা যায়।

আরেকজন গোড়ার দিকের ভারততত্ত্ববিদ হলেন ওথমার ফ্রাঙ্ক (১৭৭০-১৮৪০) ক্রুততালে ভারত আবিষ্কার করলেও শেষ পর্যন্ত একটা বৈজ্ঞানিক

বিচারে পৌঁছাতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৮০৮-এর ফ্রাঙ্কের ইরাণী-পারসিক নির্দিষ্ট গ্রন্থটি নুরনবার্গ ও লাইপজিগে Das Licht vom Osten (প্রাচ্য-দেশের আলোক) নামে প্রকাশিত হয়, গ্রন্থটি নেপোলিয়ান বোনাপার্টিকে উৎসর্গীকৃত করা হয়, তিনি রাইনবনডের রক্ষাকর্তা এবং একালের সর্বশক্তিমান অবতার।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ওথমার ফ্রাঙ্ক উরৎসবার্গে জার্মানীতে মুদ্রিত প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। এর নাম ব্যাকরণম/শাস্ত্রচক্ষুষ/গ্রামাটিকা/সংস্কৃতা. এই গ্রন্থটি ব্যাভেরিয়ার রাজাকে উৎসর্গ করা হয়। ব্যাভেরিয়ার উইটেলসবাখ রাজন্যবর্গ পরে শিল্পী এবং পণ্ডিতদের সমর্থন করতে ইচ্ছুক হন। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ্য বেনফি-র Geschichte der Sprachwissenschaft und der orientalischen Philologie in Deutschland (জার্মানীতে ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচ্যদেশীয় শব্দতত্ত্বের ইতিহাস)।

ভারততত্ত্ববিদদের শ্রেণীতে আছেন অনেক খ্যাতনাম বৈজ্ঞানিক, যাঁদের রচনাবলীর উল্লেখে এক সুবৃহৎ গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত হয়ে যাবে। তাঁদের রচনাবলী গ্রন্থাকারে বা সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং আজো প্রতিটি ছাত্র এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে আগ্রহশীল বন্ধুদের কাছে তা সুপরিচিত গ্যয়টের কল্পনার দিক থেকে সত্য, এই সব সাময়িক পত্রাবলী এক একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ। এইগুলি ভারতীয় পরিধির অন্তর্গত অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংলাপের মঞ্চের মত কাজ করেছে। সুদীর্ঘ তালিকায় প্রথমতম হল এ. ডব্লু. সখলেগেলের Indische Bibliothek (ভারতীয় পাঠাগার) ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এর উত্তরাধিকারী হিসাবে উল্লেখ্য Zietschrift für die Kunde des Morgenlandes (প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ক পত্রিকা) ১৮৩৭ (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং জি. এইচ. ইওয়ালডের উৎসাহে প্রকাশিত হয়)। Zeitschrift für Wissenschaft und Sparche (বিজ্ঞান এবং ভাষার পত্রিকা) ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Geesllschaft (জার্মান ওরিয়েন্টাল সোসাইটির পত্রিকা) ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আজ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী শ্রদ্ধা অর্জন করে আসছে এবং Indische Studien (ভারতীয় সমীক্ষা) ১৮৫০-এ। এই তালিকায় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় Zeitschrift für vergleichende Sprach-

forschung auf dem Gebiet des Deutschen, Griechischen und Lateinischen (তুলনামূলক ভাষা গবেষণা—জার্মান, গ্রীক ও লাতিন ভাষা বিষয়ে) ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে সুরু হয় এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung auf dem Gebiet der Arischen, Celtischen und Slawischen Sprachen (তুলনামূলক ভাষা গবেষণা—এরিয়ান, কেলটিক ও স্লাভানিক ভাষা গোষ্ঠী প্রসঙ্গে)। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শেষোক্তটির নামকরণ পরিবর্তিত হয় Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiet der indogermanischen Sprachen (ইন্দো-জার্মানিক ভাষা গোষ্ঠীতে তুলনামূলক ভাষা গবেষণা) এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen (হিন্দো-জার্মানী ভাষা গবেষণায় সাহায্য) সঙ্গে যুক্ত হয়। এই তালিকা শেষ হয়েছে Orient und Okzident (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য) নামক সাময়িক পত্রে এসে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে থিওডোর বেনফি এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সব সুপ্রতিষ্ঠিত বিনা উনবিংশ শতাব্দীর কি অবস্থা হত? এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুপরিজ্ঞাত ও সুপরিচিত ছিল Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, প্রীতিভরে সবাই বলত ZDMG ব্যতীত ছিল Orientalische Literaturzeitung (প্রাচ্য-সাহিত্য পত্রিকা) ১৮৯৮ থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয় এবং Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes (প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারততত্ত্বের একটা পীঠস্থান হওয়ার পর বন শহরটি যথার্থই রাইনের উপরিস্থিত জার্মান বারাণসী নামাঙ্কিত হয়। অনুরূপ ভঙ্গীতে এই গ্রীক পঠন-পাঠনের কেন্দ্র ম্যুনিককে ইসারস্থিত এথেন্স এই নামে পরিচিত হয়। এই জাতীয় ডাকনাম, ছাত্রমহল কর্তৃক উদ্ভাবিত হয় মনে হয়। এর মধ্যে সর্বদাই প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশিত। মানব জাতির পক্ষে ডাক-নামের ভিতর প্রখ্যাতকে অন্তরঙ্গ করে সহ-মানবিক সমাজে গ্রহণ করার রীতি আছে। স্থানের ক্ষেত্রে, অবশ্য তাঁর মধ্যে স্থান বিশেষের মনোভঙ্গী ও গরিমা ধরে রাখাটাই লক্ষ্য থাকে। এই দিক থেকে, জার্মান বারাণসী নামটি সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে। স্লেগেলের উত্তরাধিকারী এবং ধারারক্ষীরা যথা ক্রিশ্চিয়ান লাসেন

ও থিওডোর অরক্রেখট্, হেরমান জ্যাকবী, উইলবাল্ড কাইরফেল এবং পল হাকার প্রভৃতি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য বন শহরের হাতে সমর্পণ করেছেন।

এইখানে আরও কয়েকটি ভারত-বিদ্যা পঠনের জার্মান কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। জার্মানীর বিভক্ত রাজধানী বার্লিন—যার ভাগ্যের মধ্যে বর্তমানের বিভক্ত পৃথিবীর রূপ প্রতিফলিত গোড়ার দিকে ভারতবিদ্যা শিক্ষাদানের একটা বিভাগ ছিল। অধ্যাপক হিসাবে ফ্রানৎস বোপের পর, আলব্রেখ্‌ট ওয়েবার, রিচার্ড পিসখাল, হাইনরিখ লুডারস এবং বার্নহার্ড ব্রেলোর গোড়ার দিকে জার্মান ভারতবিদ্যার ঐতিহ্যকে সজীব রেখেছিলেন। যুদ্ধোত্তরকালে বার্লিনের দুই অংশের মধ্যে যখন বিভেদ বিস্তারলাভ করে, যে অংশ মুক্ত পৃথিবীতে অবাধ গবেষণায় বিশ্বাসী সেই অংশে বিদ্যাশিক্ষার একটা নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, দি ফ্রি ইউনিভার্সিটি আর বার্লিনের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর কম্যুনিস্ট মতবাদ প্রবেশ করেছে।

ইস্ট-বার্লিনের হামবোলডট বিশ্ববিদ্যালয়ের মত, লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় পঠন-পাঠনের একটা বিভাগ আছে, সেখানে ই. এফ. কে রোজম্যুলার সেই ১৮২৯ থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত ভারতবিদ্যা বিষয়ে লেকচার দিয়েছেন। তাঁর স্থান অধিকার করেন. ই. এফ. এফ. বীয়ার যিনি ১৮৩৮ থেকে ১৮৪১ পর্যন্ত এই পদ অধিকার করে ছিলেন। ১৮৪৮-এ ভারতবিদ্যার এক স্থায়ী পদ স্থাপনা করা হয়, এবং যাঁরা সেই পদ অধিকার করেছিলেন তাঁদের নাম আজ পর্যন্ত যাঁরা ভারতবিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁদের কাছে সুপরিচিত। তারা হলেন: হেরমান ব্রোক-হউস, ইনি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদির প্রসিদ্ধ প্রকাশক বংশের অন্যতম, আরনষ্ট উইনডিস্‌থ, যোহানেস হারটেল, ও ফ্রিডরীশ ওয়েলার।

সংস্কৃত ও ভারতীয় বিজ্ঞানের অধিকাংশ পদ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্থাপনা করা হয়। তুবিনগেন আরো অনেকগুলি দৃষ্টান্তের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে এখানে উল্লিখিত ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবিদ্যার ইতিহাসে স্থান লাভ করে। প্রসিদ্ধ ভারততত্ত্ববিদ্‌গণের নাম সুরু হয়েছে রুডলফ ফন রোথ-এর নাম দিয়ে এবং তারপর অনুবর্তিত হয়েছে রিচার্ড গারবে ও যেকব হয়েরের নাম দিয়ে এবং শেষ হয়েছে হেলমুথ ফন গ্লাসেনাপ ও পল থীইমের নামে এসে।

গোটিনগেন ভারতীয় বিদ্যার এক প্রখ্যাত কেন্দ্র হয়ে আছে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। যদিও জিওরজ হাইনরিখ এওয়ালড সেইখানে ১৮২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে

ভারতবিদ্যা বিষয়ে লেকচার দিয়েছেন, একটি নিয়মিত অধ্যাপক পদ স্থাপিত হয়েছে বিগত একশ বছর পূর্বে। থিওডোর বেনফি, ফ্রানৎস কীয়েলহোর্ন, হেরমান ওলডেনবার্গ, এমিল সীয়েগ, আর্নষ্ট ওয়ালড্‌স্মিডট এবং হাইনৎস বেখার্ট প্রভৃতিরা হলেন যাঁরা গোটিনগেনে তিব্বতী দলিল দস্তাবেজ ও ভারতীয় মূল গ্রন্থ পরিবেশন করেন এবং তুরফান কর্তৃক সৃষ্ট সেন্ট্রাল-এশিয়াটিক ইনডিয়ান নামক হেঁয়ালির সমাধানে সহায়তা করেন।

ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয় অনেক গোড়ার দিকে ওথমার ফ্রাঙ্কের বক্তৃতা এবং ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য প্রখ্যাত ছিল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্টিন হুয়াগের অধ্যাপনার কালে এখানে নিয়মিত ভাবে ভারতবিদ্যা পঠনের একটা পদ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আরনষ্ট কুন, উইলহেলম গাইগার, হানাস ওয়েরটেল, ওয়ালটার উস্ট এবং হেলমুট হফমান প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ তাঁদের গবেষণায় ভারততত্ত্বের প্রান্তিক বিষয়বস্তুর আমদানি করেন, যেমন সিংহলী পঠন-পাঠন অথবা তিব্বতী-বন ধর্মের ভাষ্যরচনা।

মারবুর্গ ইউনিভার্সিটি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তার ভারততত্ত্বের প্রথম অধ্যাপকের পদ স্থাপনা করেন, ম্যুনিকের ঠিক এক বছর পরে। ফার্দিনান্দ উইলহেলম জেকব জাষ্টি, কার্ল ফ্রিডরীশ গেল্ডনার, হান্‌স ওরটেল এবং জেকব উইলহেলম হয়ের, যোহানেস নোবেল এবং উইলহেলম রাউ প্রভৃতি সকলেই ভারত-তত্ত্ববিদ্‌ এবং এঁরা সকলে মারবুর্গকে প্রখ্যাত করেছেন। বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক পড়াশোনা এবং গেল্ডনার কৃত বেদচর্চার ব্যাপার এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

পরিশেষে, হামবুর্গের অতি সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠিত ভারততত্ত্বের কেন্দ্রের কথা এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে হয়, এইখানে স্টেন কোনোউ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে লেকচার দিয়েছেন। ভারতীয় গবেষণার আন্তর্জাতিক চরিত্রের পরিচয় তাঁর এই অধ্যাপনা ব্যাপারে পরিস্ফুট। ক্রিশ্চিয়ান লাসেনের পর, কোনোউ জার্মান ভিত্তিক ভারততত্ত্বের ক্ষেত্রে যাঁরা প্রশংসালাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয়। ওয়ালথার সুখউব্রিং এবং লুডভিগ এলসড্রফ এই দুজন গবেষকের ভারতীয় গবেষণা ব্যাপারে হামবুর্গের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান আছে। অন্যতম খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ জার্মান পণ্ডিত প্রফেসর আলড্রোফ ভারততত্ত্ব ও সাহিত্য-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা দ্বারা ভারত-জার্মান সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠ করেছেন।

যুদ্ধের পর অনেক জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্ব বিভাগ ছিল না। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে কীয়েল প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে অধ্যাপক পল ডিউসেন অধ্যাপনা করতেন সেইসব জায়গা তাদের পূর্বতন গৌরবের অধিকারী হতে পারবে না। ইতিমধ্যে কীয়েলে ভারততত্ত্বের একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হয় এবং দেখা গেল যে পশ্চিম-জার্মানীর ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত সমস্ত বিভাগগুলি বৃদ্ধি পেয়ে ৬ থেকে ১৩-তে উন্নীত হল। এই সূত্রে হাইডেলবার্গের সুদাসিয়েন ইন্‌ষ্টিটিউটকে (দক্ষিণ-এশিয়া ইনষ্টিটিউট) বিস্মৃত হলে চলবে না।

এই গ্রন্থের পরিসরে ভারততাত্ত্বিক গবেষণার একক ক্ষেত্রে শুধু মাত্র অনুসন্ধান করা ছাড়া আর কিছু করা অসম্ভব। এমন কি উনডিস্‌খের ভারতীয় ভাবধারার সুপণ্ডিত ভাষ্যকারদের জীবন ও কর্মের অনন্যসাধারণ গ্রন্থের ৪৫২টি তথ্যপূর্ণ পৃষ্ঠায় ভারততত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁদের এবং তাঁদের গ্রন্থাদি সম্পর্কে পরিচয় দান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। ম্যুনষ্টার, হাল এবং জার্মান অঞ্চলের আরো অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং অবশ্য জুরিখ, ভিয়েনা ও বেসলে, গ্রাৎস, বের্ন, সালসৎবুর্গ, ইন্নসব্রুক, প্রাগ, স্ট্রাসবুর্গ, দোরপাট এবং আর যে সব অঞ্চলে বিস্তারিতভাবে জার্মান ভাষী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ গবেষণা করেছেন তাঁদের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমন এক সময় ছিল যখন জার্মান ভাষা-তাত্ত্বিকরাই সাধারণভাবে এবং ভারততত্ত্ববিদ্যা বিশেষভাবে বাকী সারা বিশ্বের কাছে আদর্শস্থানীয়। এই তথ্য আজো আদর্শ হওয়া উচিত। তরুণ বয়সে গাব্রিয়েল মোনড একদা হিপোলাইট টেইনেকে প্রশ্ন করেন যে জার্মানীতে তাঁর পড়াশোনা সম্পূর্ণ করা ঠিক হবে কিনা। ৩০শে আগস্ট, ১৮৬৪ তারিখে একটি পত্রে তিনি যে জবাব দেন পরবর্তীকালে তা বিশেষ খ্যাতিলাভ করে, অন্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে জার্মান ভারততত্ত্ব বিদ্যা বিষয়টিকে প্রশস্তি জ্ঞাপন করা হয়েছে :

'La plupart des grandes e´tudes historiques ont aujourd' hui leur centre et leur coeur en Allemagne. Cela est incontestable pour les e´tudes sanscrites et persanes pour toute l'histoire et la philologie grecque et latine···

'উত্তম ঐতিহাসিক পঠন-পাঠনের কেন্দ্রস্থল হল জার্মানীর অভ্যন্তরে।

সংস্কৃত এবং পারসিক পঠন-পাঠন ব্যাপারে, সমগ্র ইতিহাস, সমগ্র গ্রীক এবং লাতিন শব্দতত্ত্ববিষয়েও এই কথা প্রযোজ্য।...

১৯৫৩ এবং ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ ভি. রাঘবন, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিষয়ক অধ্যাপক অদ্যাবধি অ-শ্রেণীভুক্ত সংস্কৃত গ্রন্থাদি আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে য়ুরোপে আগমন করেন। দুবছর পরে তিনি ভারততত্ত্ববিদ্যা বিষয়ে একটি খতিয়ান প্রস্তুত করেন। তাঁর ভ্রমণের তালিকাভুক্ত দেশ জার্মান বিষয়ক পরিচ্ছদের ভূমিকাংশে তিনি যে একজন শান্ত এবং চিন্তাশীল পণ্ডিত যাঁর কথা আমি প্রীতিভরে স্মরণ করি আমার ভারত ভ্রমণের পরিচয় সূত্রে, প্রায় তরঙ্গা-গানের উচ্ছ্বাসের ভঙ্গীতে তাঁর প্রসঙ্গে বলা যায়:

> যদিচ পাশ্চাত্ত্য জগতে সংস্কৃতকে আবিষ্কার করার কৃতিত্ব ইংলণ্ডের এবং যদিও ফরাসী পথিকৃৎদের পদতলে বসে বোপ এবং স্থলেগেলের মত প্রথমতম জার্মান সংস্কৃতবিদ শিক্ষা পেয়েছেন, জার্মানী সংস্কৃত শিক্ষা এমনই নিস্পৃহপ্রীতি ও উৎসাহভরে গ্রহণ করেছেন, যে কোনোরকম অত্যুক্তি না করে বলা যায় ভারতবর্ষের বাইরে সংস্কৃতের দ্বিতীয় আশ্রয়ভূমি জার্মানী। যুদ্ধের পূর্বে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চোদ্দটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপক পদ ছিল, এই অবস্থা এমনই যে ভারতবর্ষ সম্পর্কেও এমন কথা বলা যায় না; যুদ্ধের পরবর্তীকালেও, দশটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপক পদ রয়েছে এবং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্গের আরো কয়েকটি সংস্কৃত বিভাগ আছে। ম্যাক্স্ ম্যুলার ও ডিউসেন ভারতের প্রত্যাশা পূরণ করেছেন এবং সমগ্র য়ুরোপের কাছে 'বন' যেন এক বারাণসী। সংস্কৃত বিভাগে জার্মান অবদান সম্পর্কে বিবরণ দিতে হলে আধুনিককালে সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ক ইতিহাস রচনা করার প্রয়োজন হবে। ভারততত্ত্ববিদ্যা বিষয়ে আগ্রহী সমগ্র বিশ্বের জন্য এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে জার্মান সহযোগীরা এখনও যুদ্ধজনিত অজস্র মনস্তাত্ত্বিক ও বস্তুগত অসুবিধা সত্ত্বেও এবং বিশেষ করে ধ্বংসপ্রাপ্ত পাঠাগারজনিত অসুবিধা থাকলেও সংস্কৃত গবেষণা বিষয়ে জার্মান ঐতিহ্য এবং মানানুসারে গবেষণা কর্ম করে চলেছেন।

প্রফেসার রাঘবন তাঁর এই রিপোর্টে কীয়েল সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলেছেন সেখানে ডিউসেন ও সথ্‌রাদের, ওলডেনবার্গ ও স্ট্রাউসের ঐতিহ্য

আজো অক্ষুণ্ন আছে। রাঘবন ভ্রমণরত প্রফেসারবৃন্দ এবং স্নাতক বৃত্তিধারীদের কথাও উল্লেখ করেছেন। ও. সখ্‌রাদের যেমন একদা আদেয়ারে কিউরেটার ছিলেন, হামবুর্গের ভারততত্ত্ববিদ লুডভিগ আলসড্রোফ এলাহাবাদে এক পণ্ডিতের কাছে শিক্ষালাভ করেন। মুনস্টারের পল হাকারের অদ্বৈতবিষয়ক পাঠের প্রতি ভারতীয় পাঠকদের কাছে পরিচিত করা হয়েছে। বনের হানস লখ্‌ তখন রামঅভ্যুদয় সংস্করণ প্রস্তুত করছিলেন। পল থীইমের পানিনি ও বেদ বিষয়ক গ্রন্থ. উরৎসবার্গের কোহলের এবং মেয়ারহোফারের এবং সেই সঙ্গে পূর্ব-বার্লিনের ওয়ালটার রুবেনকেও পরিচিত করা হয়েছে। এই শেষোক্ত ভারততত্ত্ববিদ—ভারতীয় সংস্কৃত পণ্ডিত তাই লিখেছেন—'মার্কসীয় মানসিক রূপান্তরের মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছেন' অপরদিকে ৮৩ বৎসর বয়স্ক জেনার জে. হারটেল পশ্চিম জার্মানীর নয়া পরিবেশে বিশেষ ক্লেশের মধ্যে আছেন।'

অষ্ট্রিয়াতে এই ভারতীয় পণ্ডিত হুলৎসখ্‌, ফুরার, কপার্স, ফ্রাউভালনার ও হাইনে-গেলডার্নের গ্রন্থাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন; প্রাগে তিনি মহান জার্মান ভারততাত্ত্বিক ভিনতারনিৎস-এর নাম শোনেন, সেই সঙ্গে শোনেন দেবরুন্নের, ব্লোক এবং রেডার্ড প্রভৃতির নাম। স্ট্রাসবুর্গের ভারততত্ত্ববিদ আরনষ্ট লিউমান, তাঁর পুত্রের নামকরণ করেন মনু, তাঁর কন্যা হলে তার নামকরণ করা হত সীতা। এখন মনু লিউমানের নিজের মেয়ে এই নামের অধিকারিণী। স্ট্রাসবুর্গ সংস্কৃত পণ্ডিতের পুত্র দীর্ঘকালধরে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত-তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ে শিক্ষাদান করেছেন। ভারতের এই বিশেষজ্ঞ এই মত সমর্থন করেছেন যে নৈবর্ত্তিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে ম্যাক্স ম্যুলারের উত্তরাধিকার জার্মানভাষী মননশীল পরিবেশে আজো মর্যাদা মণ্ডিত হয়ে আছে। বেদ এবং বৈদিক জগৎ আজো জার্মানদের কাছে সুগভীর অর্থসূচক।

বেদ—এই কথার অর্থ জ্ঞান। পবিত্র জ্ঞান। বেদ হল ভারতের পবিত্র গ্রন্থ। ভারতীয় জনগণের অধ্যাত্ম অতীত বেদ দ্বারা প্রতিফলিত। বিগত শতাব্দীতে পাশ্চাত্যখণ্ডের পণ্ডিতগণও তার অন্তর্নিহিত মূল্য স্বীকার করেছেন।

বেদ প্রসঙ্গে বলতে গেলে য়ুরোপীয় ও ভারতীয়গণের মনে প্রখ্যাত ভারত-তত্ত্ববিদ ম্যাক্স ম্যুলারের নাম মনে আসে। ইনি ভারত সম্পর্কে ইংরাজী ও জার্মান পঠন-পাঠনের ব্যাপারে শক্তিশালী আগ্রহ সঞ্চারের জন্য দায়ী। কারণ, ভারতের পবিত্র গ্রন্থগুলির অনুবাদের পরিশ্রমেই তিনি তাঁর কর্মজীবন উৎসর্গীকৃত করেছেন।

মূল গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত অংশ সম্বলিত অন্যান্য সংস্করণ ডাঃ ফ্রিডরাশ রোজেন ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদন করেছেন। তথাপি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য খণ্ডে ম্যাকস ম্যুলারের অনুবাদ আজো স্বীকৃত গ্রন্থ।

জার্মান ভারতবিদ্যা বেদগবেষণার একটি বিশেষ শাখার উন্নয়ন করে যার দ্বারা কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ করা গিয়েছে, বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। এই সূত্রে সর্বোপরি উল্লেখ করতে হবে হাইনরিখ জিমারের Altindisches Leben—die Kultur der vedischen Arier (প্রাচ্য ভারতীয় জীবন—বৈদিক আর্যদের সংস্কৃতি) এই গ্রন্থটি ভারততত্ত্ব বিষয়ে একটি ধ্রুপদী গ্রন্থ হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের প্রতিটি দিকের এক বিস্তারিত সমীক্ষা। হেরমান ওলডেনবার্গ তাঁর গ্রন্থ Die Religion des Veda (বেদের ধর্ম) যা ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্টুটগার্টে প্রকাশিত হয় তার মধ্যে বেদের যুগের ধর্মীয় অধ্যাত্ম জীবন বিষয়ে একটা নতুন আলোকপাত করেছেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আলফ্রেড হিলেব্রানডট তাঁর Vedische Mythologie (বৈদিক পুরাণকথা) ব্রেসলু-র সাইলেসিয়ান রাজধানীতে প্রকাশ সুরু করেন—এই গ্রন্থটি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিন খণ্ডে সম্প্রসারিত করা হয়। ভারতীয় দেবদেবীগণের এ এক ধ্রুপদী কোষগ্রন্থ। হিলেব্রানডটের 'Mythologie'-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৭-১৯২৯ এর মধ্যে, ওলডেনবার্গ-এর গ্রন্থটির তার মধ্যে চারটি সংস্করণ হয়ে গেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতীয় ও বিশেষ করে বৈদিক পঠন-পাঠনের একটা নতুন আগ্রহ সঞ্চারিত হয়। প্রসঙ্গতঃ—হিলেব্রানডটের Mythologie গ্রন্থটির একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ব্রেসলুতে প্রকাশিত হয়। জার্মান পাঠকদের এক বৃহত্তর গোষ্ঠিগুলির মধ্যে এই বিষয়ের আকর্ষণবৃদ্ধি এই আরেক প্রমান। বেদ গ্রন্থের একটা ব্রহ্মবিদ্যাগত বিশ্লেষণ হল কে. এফ. গেল্ডনারের গ্রন্থ 'Vedismus and Brahmanismus' ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'তুবিনগেনে' প্রকাশিত হয়, এই বই ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক ইতিহাসের একটি পাঠ্য পুস্তক। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থটির পুনঃমুদ্রণ হয়। বিংশ শতাব্দীতে পি. টি. হফমানের গ্রন্থ Die Weisheit der Veda (বেদের জ্ঞানশিক্ষা) ১৯২৫-এ ম্যুনিকে প্রকাশিত এই গ্রন্থে 'হিন্দু বাইবেলে'র অধ্যাত্ম সম্পদকে ব্যবহার করা হয়। জার্মানীতে মননশীল ভারতকে জনপ্রিয় করার মূলে এই

গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। এই কালটি জার্মানীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমনের পরবর্তীকাল—কবিকে সেইকালে ভারতীয় মননশীল জগতের মুখ্য প্রতিনিধি বলে গণ্য করা হত।

১৯৩৫-এ প্রকাশিত হেরমান লোমেলের গ্রন্থ Die alten Arier—von Art und Adel ihrer Götter (প্রাচীন আর্যগণ—তাঁদের দেবগণের সারবস্তু ও ভব্যতা) যা ফ্রাঙ্কফুর্ট-অন-দি-মেন থেকে প্রকাশিত হয় তার মধ্যে বৈদিক গবেষণার এই ঐতিহ্য অব্যাহত রইল। এর অল্পকাল পরে একটি সমীক্ষা প্রকাশিত হল তার নাম—Der vedische Mensch—Studien zur Selbstauffassung des Inders im Rig und Atharva Veda (বৈদিক মানুষ—ঋক ও অথর্ব বেদে ভারতীয়দের আত্মোপলব্ধি বিষয়ে সমীক্ষা, হাইডেলবার্গ ১৯৩৮)। এই গ্রন্থের লেখক মহারাষ্ট্রের দাণ্ডেকার। তিনি দীর্ঘকাল জার্মানীতে থাকার ফলে স্থানীয়দের মতো অবাধে জার্মান বলতে এবং লিখতে পারতেন, তথাপি তিনি তাঁর বিষয়বস্তু ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে উপস্থাপিত করেন। সমাজতত্ত্ব বিষয়ে একটা নতুন পথ প্রদর্শিত হয় উইলহেলম রাউ-এর গ্রন্থ Staat und Gesellschaft im alten Indien—nach den Brahmana Texten—(প্রাচীন ভারতে সমাজ ও রাষ্ট্র—ব্রাহ্মণ্য সূত্রানুসারে) উইসবাডেনে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থে বৈদিক যুগের সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বেদের চারটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রাচীনতম ও গুরুত্বপূর্ণ হল ঋগ্বেদ বা প্রশস্তির মন্ত্র বিষয়ক জ্ঞান। প্রতিটি জাতির মধ্যে স্তোত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত ভাষাতাত্ত্বিক দলিলের মধ্যে শুধু মাত্র যা চমৎকার ও অতিশয় মহান তার প্রতিফলন ঘটেছে তা নয়, যা প্রাচীনতম তা ব্যাখ্যাত হয়েছে নিয়মমাফিক ভঙ্গীতে। সুতরাং ঋগ্বেদ দেবগণের উদ্দেশ্যে রচিত ও যা সুমহান তার প্রতি প্রশস্তি, আর্য-ইন্দো-জার্মানিক প্রাচীনতত্ত্বের প্রতি মর্যাদামণ্ডিত ভাষায় রচিত দলিল। ভারতীয় সাহিত্যের এই প্রামাণ্য গ্রন্থের অন্যতম প্রকাশ হল এডলফ কেম্‌গী কৃত ঋগ্বেদের অনুবাদ ১৮৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে লাইপজিগে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পুনঃবার সম্পাদিত হয়। লাইপজিগেও ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ওয়ালটার উস্ট প্রথম বেদ প্রকাশের কাল এবং ভাষা বিষয়ে এক উৎসাহব্যঞ্জক সমীক্ষা রচনা করেন। এই গ্রন্থের নাম—Stilgeschichte und Chronologie des Rig Veda (ঋগ্বেদের রচনা শৈলী এবং ধারাবাহিকত্বের ইতিহাস)।

জার্মানীতে ঋগ্বেদের বহু সম্পূর্ণ অনুবাদ পাওয়া যায় বিশেষতঃ হেরমান গ্রাসমান (লাইপজিগ ১৮৭৬-৭৭) রচিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের দুটি খণ্ডে প্রাচীন ভারতীয় স্তোত্র রচনার সমগ্র সম্পদের সন্ধান দান করা হয়েছে। ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এ. লুডভিগ প্রাগে ঋগ্বেদের ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ এক অনুবাদ প্রকাশ করেন—এই শহর হল প্রখ্যাত জার্মান চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খ্যাত। এই অনুবাদ আঙ্গিক প্রেমিকদের পক্ষে পড়া চলবে না। জার্মানভাষী পাঠককে মূল গ্রন্থের একটি নিটোল এবং নিখুঁত অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। ঋগ্বেদের এক প্রশংসনীয় নির্বাচিত অংশ পরে আলফ্রেড হিলেব্রানডট (গোটিনগেন, ১৯১৩) কর্তৃক পরিবেশিত হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ এবং আক্ষরিক গদ্যানুবাদ উত্তম টীকা সহ কে. এফ. গেলডনার কর্তৃক রচিত হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে গোটিনগেনে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় অথচ দ্বিতীয় খণ্ড আটাশ বছর পরে কেমব্রিজে, মাসাচুসেটস ও উইসবাডেনে একযোগে প্রকাশিত হয়।

বেদ গ্রন্থের অপর এক অংশ হল অথর্ব বেদ—ঐন্দ্রজালিক প্রভাবের জ্ঞান ভাণ্ডার। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রিফিথ নামক একজন ইংরাজ বারাণসীতে সম্পূর্ণ বেদ প্রকাশ করেন। আমেরিকান হুইট্‌নে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কেমব্রিজ, মাসাচুসেটস সংস্করণ প্রকাশ করে তাঁকে অনুসরণ করেন। জার্মানভাষী অঞ্চলে সুনির্বাচিত গ্রন্থাবলীর কিছু সংস্করণ পাওয়া যায়, তার মধ্যে উল্লেখ্য এ. লুডভিগ ও ফ্রিডরীশ রুকার্ট। শেষোক্তজনের অপূর্ব অনুবাদ প্রকাশিত হয় এইচ. ক্রেয়েনবার্গ কর্তৃক ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে হানোভারে, ব্রাউবাথে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে।

জুলিয়াস গ্রীল অপর ব্যক্তি যিনি অথর্ববেদকে কাব্য ছন্দে একশটি স্তোত্রে সম্পূর্ণ করে প্রকাশ করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর গ্রন্থটি তুবিনগেনে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৮-তে স্টুটগার্ট-এ পুনঃমুদ্রিত হয়। পরিশেষে, অথর্ব বেদের সুবিস্তৃত পটভূমিকে হেরমান বেথ তাঁর Der Hymnus an die Erde (মাটি-প্রশস্তি) ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন।

গোপন গ্রন্থ উপনিষদাবলীর মধ্যে সর্বেশ্চবাদী বিশ্বাসের পুরুষোত্তম তত্ত্বের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করা হয়েছে—এক অতীন্দ্রিয় জগতে আত্মসমর্পণ। এখানে জগৎকে গদ্যে এবং মাঝে মাঝে পদ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। তবু জার্মান বিজ্ঞানী এবং সংশয়াচ্ছাদিত সন্ধানের মন নিয়ে দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান। এবং উপনিষদ জিজ্ঞাসুর কাঁধের ওপর মাথা রেখে বৌদ্ধধর্মের সুষমায় আচ্ছন্ন মণ্ডিত

উক্তি দেন। পল ডুসেন একটি দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন, তার নাম—Die Philosophie der Upanischaden und die Anfänge des Buddhismus (উপনিষদের দর্শন এবং বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি) ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে গোটিনগেনে প্রকাশিত হয় এবং আট বছর পরে পুনঃসম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মহান ভারততত্ত্ববিদ Sechzig Upanischaden (ষাটটি উপনিষদাবলী) লাইপজিগে প্রকাশ করেন। তাঁর Die Geheimlehre des Veda (বেদের গোপনতত্ত্ব) লাইপজিগে ১৯০৭-এ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে আরেক উপনিষদ সঞ্চয়ন পরিবেশিত হয়। ১৯২১-এ এই গ্রন্থের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়, উৎসাহী জার্মান পাঠকবৃন্দ ষাটটি উপনিষদের তৃতীয় সংস্করণ যা সেই বছরে প্রকাশিত হয় তা বিশেষ সমাদরে গ্রহণ করেন। ১৯২১-এ যোহানেস হারটেল রচিত Die Weisheit der Upanischaden (উপনিষদের তত্ত্ব) ম্যুনিকে প্রকাশিত হয়। সেই যুদ্ধোত্তরকালের গোড়ার দিকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্পদের প্রতি জার্মান পাঠকদের সুগভীর আগ্রহের এর চেয়ে অধিকতর উত্তম পরিচয় আর কি হতে পারে। এ কথা উল্লেখযোগ্য যে জেনাতে এ. হিলেব্রানডট তাঁর গ্রন্থ Aus Brahmanas und Upanischaden, সেই বছরেই প্রকাশ করেন। এইচ. ফন. গ্লাসেনাপের অতি সাম্প্রতিক এক সংস্করণের ভূমিকাংশ থেকে উধৃতি দেওয়া যাক যার মধ্যে লেখক যে একজন অ-রোমান্টিক সাদা-সিধা কালের সন্তান তা প্রমাণ করেছেন:

> বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে বা মধ্যভাগে যে-সব অতিকায় মণীষী ভারতীয় ঋষি ও কবিদের গ্রন্থাবলী আবিষ্কার করেছিলেন আমাদের এই কালে ভারতীয় পুরাতন সম্পদকে অন্য ভঙ্গীতে বিচার করতে আগ্রহী। অতি কমসংখ্যক রাষ্ট্রনেতাই ডব্লু. ফন. হমেবোলডটের মনোভঙ্গীর অংশভাগী হবেন যিনি গেনৎসকে লিখিত এক পত্রে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন যে ভাগবদগীতা পাঠ করার সুযোগলাভের উপযুক্ত বয়স তিনি পেয়েছিলেন।
>
> শকুন্তলা বিষয়ে গ্যয়টের দোঁহা অপেক্ষাকৃত অল্প রোমানটিক যুগের সন্তানের কাছে কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বাসপ্রবণ মনে হবে। সপেনহাওয়ার উপনিষদের মধ্যে যে শান্তি ও সান্ত্বনা পেয়েছিলেন, জার্মানীর অভ্যন্তরের কম সংখ্যক মানুষকেই আজ তা রোমাঞ্চিত করবে, বাইরের তো কাউকেই নয়।

আমরা এখন আর রোমাঞ্চের আবেগ অভিভূত হইনা, মৌলিক আবিষ্কারের উৎসাহে একটা অপ্রত্যাশিত সংস্কৃতির সন্ধান দূর প্রাচ্যে মানবিক প্রজ্ঞার একটা পরিচয় পূর্বসূরীরা পেয়েছিলেন। এখন অপেক্ষাকৃত শান্ত এবং দৃঢ় চিন্তার উদ্ভব ঘটেছে, তার ফলে আমাদের মনোভঙ্গীর ক্ষেত্রে একটা পরিবর্ত্তন ঘটেছে যা প্রাচ্যের প্রজ্ঞার উচ্চ মূল্য না দিয়ে বরং অল্প মূল্য নির্ধারণ করছে, এটা বিশেষজ্ঞের বিষয়বস্তু বলে সে দিকেই পাঠানো হচ্ছে। আমরা যদি বলি নাটক গ্রীক মনীষার সৃষ্টি এবং প্রাচীন কালের আর কোনো মানুষ এই জাতীয় কিছু সৃষ্টি করেন নি, তাহলে তার মধ্যে অজ্ঞতা বা অস্পষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যাবে; ভারতীয় মননশীলতা যে সমস্ত উচ্চাঙ্গের গ্রন্থাদি স্বাধীনভাবে রচনা করেছেন সেই দেশের লৌকিক নাটক থেকে তাঁদের স্বদেশের মাটির উপযুক্ত বস্তু, পাশ্চাত্যের অনুরূপ সৃষ্টির সঙ্গে তার বিভিন্নতা থাকবে, মানবিক সমস্যার আভ্যন্তরীণ স্বীকৃতি বিষয়ে যে পার্থক্য থাকা সম্ভব সেই বিষয়ে অজ্ঞতা থাকবে ভারতীয় মহাকাব্য 'রামায়ণ', ভরতের বংশধরদের মধ্যে যুদ্ধ বিষয়ক গানের চেয়ে কিছু অতিরিক্ত, কিন্তু তার মধ্যে নিবেলউনগেনলিয়েড এবং গুডরুন বা ইলিয়াড ও অডিসির সমতুল কাব্যিক অনুভূতির ও সৃজনশীলতার অভাব আছে বোঝা যায়। মহাকাব্যের প্রকৃতি ও উৎপত্তি বিষয়ে যিনি কিছু অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে চান তাকে উৎসাহিত করতে এই গ্রন্থ বিফল হবে না। প্রাচীন দৃষ্টান্ত হিসাবে উপনিষদাবলীর এক অতুলনীয় মূল্য আছে—অংশতঃ বুদ্ধের মোক্ষলাভের পূর্বকালের রচনা—এর মধ্যে মানবিক আত্মার উচ্চতম লক্ষ্যে পৌছানোর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সেই সব গ্রন্থের মূল্য অক্ষুন্ন থাকবে—উৎসাহব্যঞ্জক বাহুল্য ও অতিশয়োক্তি বাদ দিয়েও তার মূল্য থাকবে।

পুনরায় হিলেব্রানডটের গ্রন্থ Die schönsten Upanischaden—der Hauch des Ewigen—eine Auswahl aus den mystischen Texten (উপনিষদের সর্বোত্তম—অনন্তের স্পর্শ—গুঢ়তত্ত্ববাদী গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত) ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রাচীন ভারতের সুগভীর ধর্মানুরাগ এবং ধর্মীয় দর্শন যা এখনও পর্যন্ত তার ধর্মবিশ্বাসে অবিচল।

প্রাচীন ভারত বেদান্ত দর্শনে বিজড়িত এই শব্দটির অর্থ বেদ। পুনরায় উপনিষদের মহান জার্মান অনুবাদক পল দেউসেন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লাইপজিগে প্রকাশিত Das System des Vedanta (বেদান্তের পদ্ধতি) জার্মান পাঠক সমাজের হাতে তুলে দেন। দেউসেন ভারতীয় দার্শনিক পদ্ধতির প্রতি জার্মান বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখেন। একথা বিশেষ উল্লেখ্য যে দেউসেন জার্মান সপেনহওয়ার সোসাইটি স্থাপনা করেন এবং একটি বিশেষণমূলক সপেনহাওয়ার সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই-ভাবে তিনি সপেনহাওয়ারের হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত আত্মহারা মনোভঙ্গী এবং জগৎ সম্পর্কে প্রকৃত ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এ শুধু মননশীল দেওয়া-নেওয়া জনগণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে এক পরমোৎকৃষ্ট বস্তু। দার্শনিকরা মনের সৌধ রচনা করেছেন বিদেশী জগতের মধ্যে নিজেদের মনকে ডুবিয়ে দিয়ে, তবু অনুবাদক আর টীকাকারগণই তাঁদের হাতিয়ার জুগিয়েছেন। তাঁরা ভিত্তি রচনা করেছেন যা ভারত থেকে মননশীল স্রোত প্রবাহিত করা সম্ভব করেছে—

> নয়া-প্লেটনিক দার্শনিকবৃন্দ ও আলেকজান্দ্রিণ ক্রিশ্চানগণের মরমী ব্রহ্মবাদী (মিষ্টিক থিওসফিষ্ট) লগোস নীতি, একহার্ট ও টউলের নামক ক্রিশ্চান মরমী সাধুদের বাণী এবং পরিশেষে, উনবিংশ শতাব্দীর মহান জার্মান মরমী মনীষী সপেনহাওয়ার প্রসঙ্গে একথা প্রযোজ্য।

জার্মান পাণ্ডিত্যপূর্ণ আগ্রহ বিষয়ে আরেক আলোকপাত হয়েছে পুরাণ বিষয়ে, বিশ্বজগতকে ভারতের পরমোত্তম উপহারের মধ্যে তা উল্লেখনীয়।

পুরাণ কথাটির অর্থ পুরাতন। ভারতীয় প্রাচীন আখ্যান যা পৃথিবীর শৈশব থেকে এসে পৌঁছেছে তার সংজ্ঞা হল পুরাণ। পুরাণ কথাটির সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে প্রাচীন সংস্কৃত কোষ রচয়িতা অমর সিং 'পঞ্চলক্ষণ' সমর্থিত হতে দেখেছেন। বৈশিষ্ট্যের এই পাঁচটি চিহ্ন (যা তাদের পরিচয়) হল একটি প্রকৃত প্রাচীন কাহিনী উপজীব্য হবে পৃথিবী সৃষ্টি বিষয়ক কথা থাকবে, দেব-দেবীদের বংশ তালিকা থাকবে তার সঙ্গে থাকবে আদিম মানুষের ইতিহাস, মনুর বিধান এবং মানবজাতির চতুর্দশ পুরুষের পরিচয় এবং সর্বশেষে সূর্য এবং চন্দ্র বংশীয় রাজাদের কথা। এই সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে বোঝায় যে পুরাণের লক্ষ্য হল মানব সৃষ্টির উষালগ্ন। যখন পর্যন্ত দেবগণ যে মানুষকে

পৃথিবী বাসের যোগ্য করেছিলেন সেই মানুষের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল।

পুরাণের প্রথম অনুবাদ জার্মান ভাষায় ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে জুরিখে প্রকাশিত হয়। প্রায়ই জার্মান শহরগুলিতে এই গ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণ ঘটেছে, অনেকের মতে এই গ্রন্থটি ভাগবদগীতার সমতুল্য।

পুরাণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুবাদের জন্য আমরা হাইনরিখ জীমারের কাছে ঋণী, তাঁর গ্রন্থ Der indische Mythos (ভারতীয় পুরাণকথা) ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্টুটগার্টে প্রকাশিত হয়। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে জুরিখে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যা সুইজারল্যাণ্ডের সীমানা পার হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারে সহায়ক হয়েছে।

জার্মানভাষী কবিগণ কয়েকটি পৌরাণিক উপাখ্যানের সার্থক অনুবাদ করেছেন। এইখানে এ. এফ. ফন সখ্‌আকের গ্রন্থের উল্লেখ প্রয়োজন, তাঁর গ্রন্থ Stimmen vom Ganges (গঙ্গানদীর কণ্ঠস্বর) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিতে সেই পুরাণের রত্নখনি থেকে গভীরভাবে রত্ন আহরণ করা হয়েছে। কুড়ি বছর পরে হামবুর্গে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং এর ফলে ভারত সংস্কৃতির ভাষ্যকার হিসাবে কবির খ্যাতি প্রচারিত হয়। সেই থেকে আজো গ্রন্থটি জার্মান ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে এক আদর্শ গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। ১৭৯১-এর অনুবাদ অবলম্বন করে ফ্রিডরীশ রুকার্ট দুই খণ্ডে একটি কবিতার পুনর্গঠন করেন, লেখকের মৃত্যুর পর ৪৫ বছর পার হওয়ার আগে গ্রন্থটি কিন্তু প্রকাশিত হয়নি। এই গ্রন্থটিও অচিরাৎ জনপ্রিয়তা অর্জন করে, গ্রন্থটিতে যেভাবে দেব-দেবী ও ভারতের প্রথম যুগের বীর পুরুষদের বর্ণনা করা হয়েছে তজ্জন্য ধন্যবাদ দিতে হয়।

পুরাণের একটি খণ্ড হল বিষ্ণুপুরাণ, এই গ্রন্থটি ভগবান বিষ্ণুকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত। এই খণ্ডটি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ম্যুনিকে এ. পল কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে তিনি নামকরণ করেন Krischnas Weltengang—ein indischer Mythos in zwanzig Andachten (অর্থাৎ কৃষ্ণের পৃথিবী পর্ব—কুড়িটি ধ্যানের ভারতীয় পুরাণ কথা)। দ্বিতীয় খণ্ডের শিরোনাম থেকেই এই পণ্ডিত যে কি গভীর জ্ঞানের অধিকারবশে সুদূরবর্তী দেশের রচনার চর্চা করেছেন এবং কি সুগভীর লক্ষ্যপথ তিনি অনুসরণ করেছেন।

পুরাণ ধর্মপরায়ণ মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রমাণ, এরই পাশাপাশি

সেই সাহিত্য বর্তমান যা প্রামাণ্য এবং সকলশ্রেণীর ভারতীয়গণ কর্তৃক স্বীকৃত। এই সাহিত্যও জার্মান ভাষী পণ্ডিতগণ কর্তৃক গৃহীত হয় যাঁরা সেগুলি পাঠক সমাজে পরিবেশন করেছেন। এর নাম শাস্ত্র এবং জীবনের সকল স্তরকে বেষ্টন করে গঠিত। পবিত্র রচনাদির পরিপূরক এবং ভাষ্য হিসাবে এইসব গ্রন্থ রচিত। সাহিত্যের এই বিভাগের বৈশিষ্ট্য বুঝতে এবং রসস্বাদন করতে পাঠকের মোরিৎস ভিনতারনিৎসের Geschichte der indischen Literatur (ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস) পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থটিতে ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে এমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে যার জন্য এটি শুধু ইংরাজী নয় কয়েকটি ভারতীয় ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র জার্মান পাঠকদের কাছে মূলতঃ পরিচিত করা হয় যোহান যেকব মেয়ারের লাইপজিগে ১৯২৬-এ প্রকাশিত অনুবাদের মাধ্যমে। এই গ্রন্থের লেখক হিসাবে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্যের নাম করা হয়। রাষ্ট্র চালনা এবং শাসন ব্যবস্থা বিষয়ক এই নির্দেশিকার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের চমকপ্রদ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণে গ্রন্থটি জার্মান ভারততত্ত্ববিদ্‌ এবং ঐতিহাসিকবৃন্দ কর্তৃক আকর গ্রন্থ হিসাবে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা শূন্য উপজীব্য বিশিষ্ট গ্রন্থ নিয়েও যে য়ুরোপীয়গণ মাততে পারেন তার প্রমাণ নীলকণ্ঠ কৃত 'মাতঙ্গলীলা' নামক গ্রন্থের অনুবাদ। এই গ্রন্থটিতে ভারতীয় হস্তী বিষয়ক লোকগাথা সুপরিচ্ছন্ন কাব্যের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়েছে। Spiel um den Elefanten (হস্তী বিষয়ক নাটক) ১৯২৯-এ ম্যুনিকে প্রকাশিত এই গ্রন্থের মাধ্যমে হাইনরিখ জীমার এই ধারার অন্তর্গত গ্রন্থাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সেই সঙ্গে 'হস্তীর দীর্ঘজীবন বিষয়ে বেদ' নামে এক সমীক্ষা প্রকাশ করেন। জীমারের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে এফ. এডগারটন পরে ইংরাজী ভাষীদের জন্য লিখেছেন 'হিন্দুদের হস্তী বিষয়ক লোক গাথা' (The Elephant Lore of the Hindus.)।

এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হল মল্লনাগ বাৎস্যায়নের কামসূত্র। নৃজাতিতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং চিকিৎসক সকলের কাছেই এই গ্রন্থের সমান আকর্ষণ। এই গ্রন্থটি রিচার্ড শ্মিডেট ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্গীকৃত করা হয়। পরবর্তী বৎসরে যোহান যেকব মেয়ার একটি প্রাসঙ্গিক বর্ণনা প্রকাশ করেন।

বহু সংখ্যক জার্মানভাষী পণ্ডিত কর্তৃক ভাগবদ্‌গীতাও গৃহীত হয়। এই

কবিতাই পেশাদারদের দৃষ্টি মহাকাব্য মহাভারতের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। সেই গ্রন্থেরই এটি একটি অংশ বিশেষ।

মানুষ যখন তার বাল্যজীবনকে পরিহার করে আসে—হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ে বয়ঃসন্ধিকালে, চলে যায় শতাব্দীর মহৎ কীর্তিমালায়, দেবতা এবং বীর-পুরুষের কথায়, তখন তারা মহাকাব্যের সাহিত্যিক যুগে প্রবেশ করে। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মহাভারত, 'ভরতের বংশধরগণের সংগ্রাম সংগ্রাম বিষয়ক মহাকাব্য।' পৌরাণিক যুগের কবি ব্যাসদেব এই কাব্য-গ্রন্থের লেখক হিসাবে পরিচিত এবং আজো ভারতে ধর্মগ্রন্থ যে শ্রদ্ধা সহকারে পঠিত হয় সেই শ্রদ্ধাভরে পাঠ করা হয়।

জার্মান ভারততত্ত্ববিদগণকে ধন্যবাদ, মহাভারত ও জার্মান পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অনেক পূর্বে। কয়েকজন সর্বোত্তম বৈজ্ঞানিক এই মহাকাব্যকে আশ্চর্য প্রাসঙ্গিক ভাবমূর্তিতে পুনঃগঠনে সাফল্যলাভ করেছেন। এই জাতীয় গ্রন্থাবলীর অধিকতর পরিচিত হেরমান ওলডেনবার্গের Das Mahābhārata—seine Entstehung, sein Inhalt, seine Form (মহাভারত উৎপত্তি, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক) গ্রন্থটি ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গোটিনগেনে প্রকাশিত হয়। এই গবেষণার ক্ষেত্রে ওলডেনবার্গের পূর্বসূরী হলেন হেরমান জ্যাকোবী। তাঁর Mahābhārata—Inhaltsangabe, Index, Concordanz (মহাভারত—সূচী, নির্ঘণ্ট, নির্দশিকা: বন, ১৯০৩) গ্রন্থে এই মহাকাব্যের অনুরূপ বিস্তারিত ভাষ্য ও তৎসহ প্রাচীন ভারতের জন-জীবনের নিখুঁত চিত্র প্রকাশ করেন।

জার্মান পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁরা সর্বপ্রথম মহাভারতের নির্বাচিত অংশাবলী অনুবাদ করেন তাঁদের মধ্যে এডলফ হোলৎসমানের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি কয়েকখণ্ড Indische Sagen (ভারতীয় পুরাকাহিনী) কারলস্রুতে প্রকাশ করেন ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, এইভাবে জার্মান পাঠক সমাজকে ভারতীয় উদ্ভাবনী শক্তি ও কল্পনার প্রসারত্ব বিষয়ে পরিচয় দান করেন। এই গ্রন্থের অন্তর্নিহিত গুণ এমনই প্রবল যে আজো তার পুনর্মুদ্রণের দাবী রাখে। ১৯২৩-২৪-এ ওয়ালটার পারৎসিগের একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয় তার নাম Die wichtigsten Erzählungen des Mahābhārata (মহাভারতের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গল্পাবলী) 'ভরতের বংশধরগণের সংগ্রাম বিষয়ক মহাকাব্য' নামক রত্নখনির অন্তহীন ভাণ্ডার

থেকে সংগৃহীত এই গল্পগুলি য়ুরোপের জনগণকে ভারতের মহাকাব্য সাহিত্যের বিষয়ে একটা আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিপাতের সুযোগদান করেছে। পল দেউসেন মহাভারত থেকে শুধুমাত্র একটি গল্প সংগ্রহ করেছেন তা নয়, তাদের দার্শনিক ভঙ্গী অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় এবং তদনুসারে অন্বয়ীকৃত করা হয়। ১৯০৬-এ লাইপজিগে আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং তার নাম Vier philosophische Texte des Mahābhārata (মহাভারতের চারটি দার্শনিক পাঠ।

যাই হোক মহাভারতের রত্নাবলীর সর্বাধিক উজ্জ্বল মুক্তা হল ভাগবদ-গীতা—'আশীর্বাদধন্যের গান'। অধ্যাত্ম বিদ্যা সম্পর্কে য়ুরোপে যা কিছু শিক্ষণীয়, ভারতীয় দার্শনিকদের মনোভঙ্গী এবং ভাবধারা এইখানে এমন ভাষায় প্রতিবিম্বিত যা সুন্দর সহজ এবং বিশ্বাসযোগ্য। মহাভারতের এই অংশে মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনস্তাত্ত্বিক গভীরতার সঙ্গে সমকালের সংঘাতের কাছে মানুষের প্রতিক্রিয়া যেভাবে লিখিত হয়েছে হাজার হাজার বছর আগের মানুষের রচনায় এই জাতীয় সার্থকতা কদাচিৎ প্রত্যাশা করা যায়।

ভাগবদগীতা ভিন্ন ভারতবর্ষ কি হত। দার্শনিক কবিতায় বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে একজন সারথির ছদ্মবেশে পাণ্ডুরাজপুত্র অর্জুনকে তার আত্মীয়বর্গ কুরুবংশীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেছিলেন তার বর্ণনা আছে। আত্মীয় ও বন্ধুগণের রক্তপাতের কাজে ব্রতী হতে রাজী না হয়ে বিদ্রোহী হওয়ায় কৃষ্ণ তাকে পালনে উদ্বুদ্ধ করেন। কানট-এর দার্শনিক নীতি যেভাবে আমাদের কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত হতে নির্দেশ দেয় এই পবিত্র গ্রন্থও সেইভাবে আমাদের উপদেশ দান করেছে। গাঙ্গেয় উপত্যকার শব্দপ্রয়োগের মধ্যে আমরা 'ক্যাটেগরিক ইমপারেটিভ' (কান্টিয় দর্শনের সূত্র) প্রতিধ্বনিত দেখি। উইলহেলম ফন হামবোলডট ভাগবদগীতাকে বলেছেন—'শুধুমাত্র পরমোত্তম যে তা নয়, আমাদের পরিচিত যে কোনো সাহিত্যে এই একমাত্র প্রকৃত দার্শনিক কবিতা রচিত হয়েছে।'

গীতার অনুবাদ জার্মানীতে এত বেশী হয়েছে যে গ্রন্থটিকে 'একমাত্র' ভারতীয় গ্রন্থ বলে উল্লেখ করা হয়। গ্রন্থটির বহুমূল্য সংস্করণ আছে আবার পেপারব্যাক পকেট বুক সংস্করণও পাওয়া যায়। অনেকের মধ্যে রিচার্ড গারবে (লাইপজিগ, ১৯০৫) পল দেউসেন (লাইপজিগ, ১৯১১) এবং লিওপোলড ফন স্‌থরোডার (জেনা, ১৯১২) এই গ্রন্থটি অনুবাদ করেন।

একটিমাত্র দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে এই শেষোক্ত গ্রন্থটির ডাসেলড্রফে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্রয়োদশতম পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রুডলফ ওটোর অনুবাদ স্টুটগার্টে প্রকাশিত হয়। আরেকটি রবার্ট বকসবেরগার কর্তৃক অনুদিত ও হেলমুথ ফন গ্লাসেনাপ কর্তৃক পরিমার্জিত হয়ে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সেই শহর থেকেই রেক্লাম পাবলিশিং হাউসের বিখ্যাত পকেট বুক সিরিজে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রুডলফ ওটো কর্তৃক Die Urgestalt der Bhagavad Gita (ভাগবদ্গীতার মৌলিকরূপ) আরেকটি গ্রন্থ ১৯৩৪-এ তুবিনগেনে প্রকাশিত হয়। জার্মান ব্রহ্মবিদ্যার ইতিহাসে এইটি বিখ্যাত লেখকের প্রকৃত প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রন্থ।

এইখানে ওয়েস্টফালিয়ার থিওডোর স্প্রিংমান (১৮৮০-১৯১৭) কর্তৃক অনূদিত ভাগবদ্গীতার উল্লেখ প্রয়োজন। সারাজীবন ধরে তত্ত্ব জিজ্ঞাসু এই স্প্রিংমান অবশেষে ওলড এবং নিউ টেসটামেন্টের ঈশ্বর ভজনা থেকে সরে এসে ভারতীয় দর্শনের দেব-দেবীদের ভজনায় ব্রতী হন। তিনি বিশ্বাস করতেন— 'লক্ষ্য অনন্ত ঈশ্বর, বিশ্বজগৎ ও আত্মা সব কিছুই এক, বিশ্বজনীন বস্তু বিশেষ আর সব পথ সেই দিকেই ধাবিত—' স্প্রিংমানের এক বন্ধু বলেছেন যে— 'কোনো দিক থেকে স্বাভাবিক প্রবণতা ক্ষুণ্ণ না করে এবং কিঞ্চিৎমাত্র ভারতীয় না বনে গিয়ে, বহিরঙ্গ ভাবাবেগে চালিত সাহিত্যিক, সূক্ষ্ম প্রকৃতির মানুষের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটে থাকে, সেই রূপান্তর সাধন না করে, তিনি ভাগবদ্গীতার অন্তর্নিহিত বাণীর মর্মগ্রহণ করেছিলেন।'

প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার সময় স্প্রিংমান গ্যয়টের 'ফাউস্ট' পকেটে নিয়ে রণক্ষেত্রে যান নি, তাঁর সঙ্গে ছিল 'ভাগবদ্গীতা'। যাই হোক, তাঁর জীবনাদর্শ যা ভারতীয় গ্রন্থাদির দ্বারা আবিষ্কৃত কর্মের দর্শন থেকে তা নিসৃত। এর মধ্যে শেষ আশ্রয় যিনি গ্রহণ করেছেন তিনি ফাউস্টিয় প্রভাবের সন্তান নন তার উৎপত্তি ভারতীয় মননশীলতায়।

> কোন প্রকার কর্মকে হীন জ্ঞান করে সরে আসার নাম 'কর্ম' নয়। জীবনকে যথাযোগ্য ভাবে ধারণ করে বিস্তীর্ণ পরিসরে যিনি নীতি নির্দেশক নির্দিষ্ট পথ রচনা করতে পারেন শুধু তিনিই জানেন কিভাবে কর্ম করণীয়। বিমূর্ত দর্শনে নিবেদিত উৎসাহ যা সংসার থেকে সরে আসা ধর্মে ব্যয়িত হয় তা যতকাল এইভাবে আহরিত অধ্যাত্মশক্তি প্রয়োগে উপযুক্ত ভাবে ব্যয়িত হয় তখন তা ব্যর্থ হয়

না। তথাপি এখানে ধর্মপরায়ণ মানুষকে যা পরম তাকে অতিক্রম করতে হবে। জীবনের মহান পরীক্ষা হল জীবনের অন্ধকার দিকের প্রলোভনের মুখে অবিচল থাকা। বিমূর্তন এবং অধ্যাত্মতাত্ত্বিক প্রজ্ঞান ভিন্ন, ধ্যান এবং ধর্মভাব ভিন্ন কেউই তার বহির্জীবনের যথোচিত অর্থ উপলব্ধি করতে পারবে না। এভাবে এ থেকে বিরহিত হওয়ার অর্থ বিশ্বজগতের কেন্দ্রাতুরস্ত পারিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্যুত হওয়া। বিশ্বাসের প্রতি ভক্তিভাব এবং অনুভূতির যে গভীরতা মানুষকে তার কর্মে প্রেরণা জোগায় এবং কর্মকে তার পরিপূর্ণ মূল্য-দান করে তার থেকে দূরে সরে আসা। বিরহিত হওয়া এক প্রকার আত্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এই অবস্থালাভ করতে হলে সুদীর্ঘ-কালের শিক্ষা প্রয়োজন। এ সেই শক্তি যার দ্বারা উপযুক্ত সময়ে নিজের সমগ্র শক্তির প্রতি আলোকসম্পাত করা যায়। এইভাবে অতিশয় ভিন্নধর্মী পদ্ধতি এবং মুক্তির পথ ভাগবদগীতার মধ্যে নিহিত আছে। সত্যের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা এবং এই যুদ্ধের যাঁরা যোদ্ধা তাঁদের দৈহিক সমর্থন দান করা ভাগবদগীতার উদ্দেশ্যে। এমনি আত্মোৎসর্গ করার ব্রাহ্মণ্য রীতি জীবনের সবটাই যে আত্ম বলিদানের জন্য আমাদের সেই শিক্ষা দান করে। চরম আত্মোৎসর্গ অবশ্য রণক্ষেত্রে বীরের মত আত্ম-বলিদান করা। স্বর্গের প্রবেশ পথ তাহলে সহজেই উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্প্রিংমান কর্তৃক এই ভূমিকা লিখিত হয়। সেই সময় তিনি সেনাদল থেকে ছুটি নিয়ে এসেছিলেন। সেই বছরের ১৬ই এপ্রিল "সেমিন দ্য দামে' স্প্রিংমানের রণক্ষেত্রের সহকর্মী মাইন-থ্রোয়ার কোম্পানীর এই কম্যাণ্ডের জন্য বীরোচিত কবর খনন করলেন। একজন সেনানীর শেষ শান্তিময় আশ্রয়ের উপর এই জাতীয় সমাধিলিপি দুটি হননকারী হতভাগ্য বিশ্বযুদ্ধের পর যারা যুদ্ধযন্ত্রের দ্বারা পিষ্ট হয়েছে সেই বর্তমান-কালের মানুষদের কাছে যথোচিত মনে না হতে পারে। কিন্তু ওয়েস্টফালিয়ার এই স্বপ্নবিলাসী মানুষ যিনি কৃষ্ণ নির্দিষ্ট কর্মযোগের দ্বারা অভিভূত হয়েছিলেন—যা কাণ্টের দর্শনের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, এই জাতীয় বাক্যাবলী আজো বাস্তবের প্রতিনিধিত্ব করে।

ভাগবদগীতা অসংখ্য প্রশ্ন তুলেছে—তার মধ্যে যা ঐকান্তিক তা হল এর প্রবণতা। সেই বিষয়ে একজন প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদের বক্তব্য উধৃত করা যাক :

> সাংখ্য ও বেদান্ত এই দুই বিভিন্ন মৌল তত্ত্বের সমন্বয় একই কাব্যিক বিষয়বস্তুর মধ্যে সমন্বয় সাধন কি করে সম্ভব হল, কি ভাবে তাকে মিলিয়ে মিশিয়ে পাশাপাশি রেখে ব্যাখ্যান করা গেল ? একটি কবিতা যার অন্তর্নিহিত ভাবধারা মুখ্যত ঈশ্বরবাদী, যা মহান দেবতা কৃষ্ণ-বিষ্ণুর মহিমা কীর্তনে নিবেদিত তার বক্তব্য আহরণ করল স্পষ্টতঃ নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য দর্শন থেকে কি করে তা সম্ভব হল ? কে তার ব্যাখ্যা করবে ? এর ভিতর বিশাল সমস্যাবলী জড়িত কিন্তু তা সমাধানহীন থাকবে না।

এই সমস্যা সমাধানের ভিত্তি রচনা হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের উদ্দেশ্যমূলক আবিস্কারে। য়ুরোপীয় ভারততত্ত্ববিদগণ চমৎকার ফল লাভ করেছেন নিজেদের মধ্যে তা প্রয়োগ করে, বিশেষ করে বিগত তিনটি দশকে তা সম্ভব হয়েছে। এই কর্মে বিশেষভাবে জার্মান পণ্ডিতগণের অংশ বেশী। সবার উপরে পল ডেউসেন ও রিচার্ড গারবে, উভয়ে এই বিভাগে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবদানের জন্য স্থায়ী কৃতিত্বের অধিকারী। যাই হোক, ভাগবদগীতার দার্শনিক বিষয় বস্তু বিষয়ে অধিকতর ভাবে যা প্রকাশ হল তা এল ভিন্ন অঞ্চল থেকে। বিচক্ষণ ও সুপণ্ডিত যেসুইট গবেষক যোশেফ ডালমান যিনি দুই সুবৃহৎ ভারতীয় মহাকাব্য এবং তার উৎপত্তি ও রচনা বিষয়ক অতিশয় কঠিন প্রশ্নের জবাব ক্লান্তিহীন উৎসাহ ও অসাধারণ শক্তিমত্তার সঙ্গে সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। সূত্রপাত হিসাবে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ডালমান মহাকাব্য এবং আইনবিধি মহাভারতের ব্যাখ্যা করে এক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটির পর অচিরাৎ প্রকাশিত হল পরের বছরই পরবর্তী গ্রন্থ, নির্বানতত্ত্ব বিষয়ে এক সুন্দর ভাবে লিখিত গ্রন্থ। বৌদ্ধ ধর্মের প্রাগ্‌ইতিহাস বিষয়ক সমীক্ষা হিসাবে বর্ণিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর শিরোনামের দ্বারা যা বোঝায় তার চেয়ে অনেক বেশী তথ্য পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থে, লেখক গভীর অনুভূতির সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের প্রথমতম ক্রমবিকাশ বিষয়ে গবেষণা করেছেন। প্রায়শই তিনি নতুন

সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং তার ভিত্তিতে তিনি ভারতীয় চিন্তার ক্রমবিকাশ এবং উৎপত্তি বিষয়ক পুনর্গঠনে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে নম্রভাবে যুক্তিবাদী নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য দর্শন যা ভারতীয় মধ্যযুগীয় সংরক্ষিত পাঠ্য গ্রন্থের সঙ্গে যা সুপরিচিত হয়ত সেই দর্শনেরই সম্পূর্ণ ঈশ্বরবাদী কোনো পূর্ব-মতকে অনুসরণ করেছে। তিনি দেখেছেন গোড়ার দিকের রূপটি মহাকাব্য মহাভারতে সংরক্ষিত হয়েছে এবং আরো বেশী পরিমাণে রক্ষিত হয়েছে তার বিখ্যাত দার্শনিক পর্ব আমাদের ভাগবদগীতায়…। বিশেষ করে ভাগবদগীতার তত্ত্ব এবং প্রাসঙ্গিক দার্শনিক অংশের মধ্যে গোড়ার দিকের এবং প্রকৃতপক্ষে সাংখ্য তত্ত্বের গোড়ার দিকের আকৃতিতে সুস্পষ্ট। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের অন্যতম একজন প্রখ্যাত ছাত্র হেরমান জ্যাকোবী কর্তৃক এই মত ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। দেখা যায় অন্যত্র এই তত্ত্ব অনুমোদিত না হয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিত্যক্ত হয়েছে। দালমানের গ্রন্থটি যদিও আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে রচিত হয়েছে এবং তাঁর মতবাদ বিশেষভাবে উদ্দীপক। অধিকাংশ গবেষক, যথা গারবে, জ্যাকোবী, পিসখেল এবং অন্যান্যগণ এই মতবাদ ধরে রইলেন যে ভাগবদ্গীতায় আমরা কিছুই নতুন ও মৌলিকতত্ত্বের সম্মুখীন হই না। অর্থাৎ মহাভারতের দার্শনিক পাঠ্য অংশের সংরক্ষিত রূপে বরং পরবর্তীকালে, বিভিন্ন মতবাদের সংস্পর্শে বা সংমিশ্রণ ঘটেছে, অর্থাৎ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের অপেক্ষা কত কম গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যবস্তু। এই দৃষ্টি-ভঙ্গীকে প্রকাশ ও সমর্থন করেছেন প্রাঞ্জলতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে। এর মধ্যে প্রচুর বৈদগ্ধ্য ও সুগভীর পেশাগত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে অনেক নতুন দিক প্রকাশিত এবং এই মতবাদকে তিনি যুক্তি গ্রাহ্য পরিণতিতে নিয়ে গিয়েছেন। রিচার্ড গারবের ভাগবদ্গীতার অনুবাদ এবং তৎকর্তৃক লিখিত বিস্তারিত ও হৃদয়গ্রাহী ভূমিকার অনস্বীকার্য উৎকর্ষতা অনেকাংশে দায়ী। দালমানের সম্পূর্ণ অন্যদিকে প্রযুক্ত বলিষ্ঠ চাপকে এড়িয়ে এবং সেই প্রক্রিয়ায় অগ্রাহ্য করলেও তদ্বারা গারবের সুস্পষ্ট অবদানের বৈশিষ্ট্যের মূল সুর কোনো মতে ক্ষুন্ন হয় না।…

এডলফ হোলৎসমান জুনিয়র, ভাগবদ্‌গীতার মধ্যে যে পরস্পর বিরোধীতা তার ব্যাখ্যা করার প্রয়াসে বলেছেন যে এই কবিতা তার মৌলিক আকৃতিতে ছিল সম্পূর্ণভাবে অদ্বৈতবাদী তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বরবাদের ধারায় পুনর্গঠিত হয়েছে। মহাকাব্যের দেবত্বপ্রাপ্ত নায়ক কৃষ্ণ-বিষ্ণুর প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য তা করা হয়ে থাকবে। রিচার্ড গারবে কিন্তু অত্যন্ত বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে জোর দিয়ে বলেছেন যে কবিতাটির সাধারণ চরিত্র এর পরিকল্পনা এবং রূপায়ন প্রবলভাবে ঈশ্বরবাদী…

মহাভারতের আর এক অংশে আছে নল-দময়ন্তীর কাহিনী, এক রাজা ও রানীর বৃত্তান্ত, হোমারের পেনিলোপীয় ভঙ্গীতে দময়ন্তী তার স্বামীর প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষায় ছিলেন। এই কাহিনীর সর্বপ্রথম জার্মান অনুবাদ এল জে. জি. এল. কোসিগারটেন-এর রচনায়, তাঁর 'নল' ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে জেনায় প্রকাশিত হয়। গ্যয়টে তাঁর Noten und Abhandlungen zum besseren Verständnis des West-Östlichen Diwans (পাশ্চাত্য-প্রাচ্য দিওয়ানের উত্তমতর বোঝাপড়ার জন্য মন্তব্য এবং প্রবন্ধাবলী) নামক গ্রন্থে কোসিগারটেন একজন সংবেদনশীল ও সহৃদয় বন্ধু। ফ্রিডরীশ রুকারট ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কফুর্ট-অন-মেইনে প্রকাশিত আরেকটি গ্রন্থে এই কাহিনী পুনঃব্যাখ্যাত হয়েছে। আরনেষ্ট মেইনার কৃত এক নতুন অনুবাদ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ. এফ. ফন. সখাক তাঁর নিজস্ব অনুবাদ তাঁর Stimmen vom Ganges নামক গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত করেন। স্টুটগার্টের রেকলাম পাবলিসিং হাউস কর্তৃক ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, আলব্রেখট ভেৎসলার এই গ্রন্থের অনুবাদক। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে তিনি ছন্দের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন তা গ্রীক ও লাতিন কবিতার ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ কৌতুহলের বস্তু:

কয়েকটি গদ্য অংশ ব্যতীত মহাভারত ছন্দোবদ্ধ রচনা; এর যে ছন্দ (রাজা) নল পর্বে (মহাকাব্যে) ব্যবহৃত হয়েছে তার নাম শ্লোক। এর ভঙ্গী অনুসারে অ। মাত্রায় চতুষ্পদ লাইনে এই কবিতা রচিত: × × × × ⏑ - — ⏓ (প্রথম ও তৃতীয় লাইন) এবং × × × × ⏑ — ⏑ ⏓ (দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইন),

আমাদের পরিচিত ভঙ্গীতে এই আবৃত্তি করা হয় না, এ কবিতা স্বরেলামন্ত্রের ভঙ্গীতে উচ্চারিত হয়।

মহাভারতের আর এক অংশ সাবিত্রী উপাখ্যান. যার মধ্যে ভারতীয় নারীত্বের মহিমা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, যে কাহিনীতে সাবিত্রী মৃত্যু দেবতার কাছ থেকে তার স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এই কাহিনী জার্মান লেখক ফ্রানৎস বোপ কর্তৃক প্রথম অনূদিত হয়। রেকলাম সংস্করণে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের এইচ. সি. কেলনার কর্তৃক গদ্যে অনূদিত হয়।

এডলফ হোলৎসমানও এই কাহিনী তাঁর Indischen Sagen (ভারতীয় গাথা) নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ১৮৪৫-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং এই গ্রন্থটি ভিনতারনিৎস কর্তৃক ১৯২১-এ পুনরায় সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই অংশের সবচেয়ে সার্থক অনুবাদ লোবেডানৎস (১৮৬৩) ও ফ্রীৎসে (১৯১০) কৃত।

শুধু মহাভারত নয় বাল্মিকী কৃত রামায়ণ মহাকাব্যটি চব্বিশ হাজার দ্বিপদীতে রচিত। এই কাহিনী রাম কর্তৃক তাঁর স্ত্রী সীতাকে উদ্ধার করার জন্য যুদ্ধ করেন। রাক্ষসরাজ তাঁকে হরণ করেছিলেন, এই মহাকাব্য বিশেষজ্ঞ ও জার্মানীর সাধারণ পাঠক উভয়ের কাছে এক চিরন্তন আবেদন রেখেছে।

উপরিলিখিত ভারততত্ত্ববিদ এডলফ হোলৎসমান কর্তৃক একটি সঞ্চয়ন গ্রন্থ ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে কারলস্রুতে প্রকাশিত হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রামায়ণ ও মহাভারতের নির্বাচিত অংশকে ভারতীয় পুরাণকথার একত্রে গ্রথিত খণ্ডে প্রকাশ করা হয়। Das Ramayana—Geschichte und Inhalt (রামায়ণ—ইতিহাস ও সূচী, বন, ১৮৯৩) নামক গ্রন্থে হেরমান জ্যাকোবী ভারতীয় গ্রন্থের এক বিশদ সমীক্ষা প্রকাশ করেন। পরের বছর আলেকজান্দার বউমগারটনার ভারতের রাম-সাহিত্য বর্ণনা করেন। এই দুই গ্রন্থ পেশাদার মহলের বাইরে জার্মান পাঠকবর্গকে ভারতের অপর মহাকাব্যটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। জে. মিনরাড কৃত রামায়ণ সংকলন যা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ম্যুনিকে প্রকাশিত হয় তার মধ্যে একটি বিশেষ অংশের উৎকৃষ্ট অনুবাদ পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থ বিশেষভাবে অল্পবয়সী পাঠকের উদ্দেশে রচিত। আগস্ট উইলহেলম স্থলেগলের কলম থেকে রামায়ণের লাতিন অনুবাদ এসেছে।

জার্মান ভারততত্ত্ববিদগণ ভারতীয় মহাকাব্য দুটিকে শুধুমাত্র ভারতীয় সাহিত্য ইতিহাসের মূল্যবান দলিল বলে মনে করেন না। এই কাব্য দুটি

বিশ্বের ইতিহাসের বস্তু। এই কারণেই প্রাচীন ভারতের সাহিত্যিক ঐতিহ্য ব্যাপারে ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও ভারততাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ ছাড়া ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় দার্শনিকবৃন্দ, তুলনামূলক ব্রহ্মবিদ্যার ইতিহাসকার পণ্ডিতগণ এবং নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ আবিষ্কার কর্মে ব্রতী আছেন।

জার্মান ভারততাত্ত্বিকগণের ভারতের মহত্তম রত্ন সম্ভার হল লিখিত শব্দের মাধ্যমে মণ্ডিত রত্নরাজি। শব্দতাত্ত্বিকগণের আগ্রহের গভীরতা অনুমান করতে সচেষ্ট হওয়া উচিত, তাঁরা ব্যস্তভাবে শব্দার্থ সন্ধান করেছেন, উপমান করেছেন, সূচী সংকলন করেছেন এবং ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত নয়া শৃঙ্খলাসৃষ্টি করেছেন। থিওডোর বেনফী ভারতবর্ষে শব্দের প্রতি কি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় তার উল্লেখ করেছেন :

> "ভারতীয় ধর্ম যেমন প্রাকৃতিক প্রতিভাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সংস্কৃতে বচ (Nominativ Singularis, Vak, Latin vox : কর্তৃকারক একবচন সংস্কৃত : বাক্, লতিন ভক্স) প্রভৃতির শক্তিমান ধ্বনি থেকে উত্থিত, বজ্র…
>
> বাচ ভিন্ন অনেক বেশীবার বেদে বাক্যের দেবীর কথার উল্লেখ আছে, তাঁর নাম সরস্বতী—'নদীর মধ্যে প্রতিভাময়ী'—দ্বিধাহীন বাগ্মীতার সৌন্দর্য মৃদুগতিতে প্রবাহিত জিহ্বার অভঙ্গ সমতা থেকে উদ্ভুত।……"

জার্মানী যদি ভারততত্ত্বের আবাস গৃহ হয়ে থাকে তাহলে তার এই বৈশিষ্ট্যের কৃতিত্ব হল অক্লান্ত কর্মী বিজ্ঞানীদের এবং তাদের শ্রমে রচিত ব্যাকরণ ও অভিধানগুলির। এইসব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলীর রচয়িতাগণকে প্রায়ই সাধারণ সংকলক মনে করা হয়, যেন তাঁরা মস্তিক প্রয়োগ না করে একটা কথার ওপর কথা চাপিয়ে গেছেন। যাঁরা এইসব কর্মীদের এই ভঙ্গীতে বিচার করেন তাঁরা নিশ্চয়ই যে শ্রম, অধ্যবসায় ও ইতিহাস, ধর্ম, শব্দতত্ত্ব এবং রাজনৈতিক তথ্যাবলী বিষয়ে সুগভীর জ্ঞানের প্রয়োজন এই ধরণের দৃঢ় ভিত্তিক ও সুললিত অভিধান রচনায় প্রয়োজন সেই বিষয়ে অজ্ঞ। এই জাতীয় গ্রন্থাদি শুধু তালিকার নথী নয়, এইগুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যুগের জীবন্ত দলিল হিসাবে প্রযুক্ত হতে পারে। অভিধানাদি যখন এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করা যায়, যে এই সব গ্রন্থের লেখকবৃন্দ, ব্যাকরণের লেখকদের মত বিশেষ

ক্ষেত্রের গবেষকদের গবেষণাকর্মের অপরিহার্য হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হবে।

ক্যাসক পরিহিত এ্যাংলিক্যান যাজকবৃন্দ যথা, রথ, ৎসাইগেনবালগ প্রভৃতি গবেষকদের পিছে পিছে এসেছেন বপ-এর প্রজন্মের গবেষকবৃন্দ। বোপ-ই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ভঙ্গীতে যে সব অঞ্চলে জার্মানিক জনগণ বসবাস করেছেন সেখান থেকে সিন্ধু এবং গঙ্গা অধ্যুষিত ভূমি যেখানে উত্তর ভারতীয় জাতিগণ বসবাস করেন তার নৃতাত্ত্বিক জ্ঞাতিত্ব সন্ধান করেছেন। তাঁর রচিত über das Conjugationssystem ছাড়াও একটি সংস্কৃত অভিধানের জন্য বোপের কাছে ঋণী, এর নাম Glossarium Sanscritum. এবং এই গ্রন্থ ১৮২৮-১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে লাতিন ভাষায় বার্লিনে প্রকাশিত হয়। অতি সরল ভাবে সমস্ত ধাতু ও শব্দরূপ দিয়ে সেই সব শব্দকে গ্রীক, লাতিন, জার্মানিক, লিথুয়ানিয়ান, স্লাভনিক ও কেলটিক ভাষা গোষ্ঠীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। বোপের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের তুলনামূলক ব্যাকরণ, সেই গ্রন্থটির নিম্নলিখিত নামে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় "Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslawischen, Gotischen und Deutschen (সংস্কৃত, জেনদ্, আর্মেনিয়ান. গ্রীক, লাতিন, লিথুয়ানিয়ান, প্রাচীন স্লাভনিক, গোথিক ও জারমান ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ)। এইখানে এক নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভব হয় যা গবেষক পণ্ডিতদের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত করেছে নতুন বিশ্বকোষ জাতীয় অভিধান রচনায়, আমাদের এই কালেও সেই ধারা প্রবাহিত। শুধু মুষ্টিমেয় দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যাক। ১৮৫৫ থেকে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বন-শহরে আগস্ট জন ভূলার্স রচিত দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ লাতিন ভাষায় রচিত একটি পারসিক, লাতিন ধাতু প্রকরণ বিষয়ক অভিধান প্রকাশিত হয়, সংস্কৃত, জেন্দ. ও পাহলভী ভাষায় উৎকৃষ্ট শব্দাদি তুলনা হিসাবে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইরানীয়-ইন্দো-এরিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও এই গ্রন্থটি কখনও তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। আগস্ট ফ্রিডরীশ পট পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ Wurzelwörterbuch der indogermanischen Sprachen (ইন্দো-জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠীর ধাতু-প্রকরণগত অভিধান) গ্রন্থটি

লেমগো এবং ডেটমোলডে ১৮৫৯ থেকে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। তাঁকে অনুসরণ করেন আগস্ট ফিক তাঁর Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen (ইন্দো-জার্মান ভাষাগোষ্ঠীর তুলনামূলক অভিধান) গোটিনগেনে ১৮৯১ থেকে ১৯০৯ এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। এলয়স ওয়ালডে আরেকজন লেখক যিনি ইন্দো-জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠীর তুলনামূলক অভিধান রচনা করেন। জুলিয়াস পোকর্নি কর্তৃক পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে এই গ্রন্থ প্রয়োজনীয় সূচী সহ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়ে বার্লিন ও লাইপজিগে ১৯২৭ থেকে ১৯৩২-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। পোকর্নি নিজেও লিখেছিলেন Indogermanisches etymologisches Worterbuch (ইন্দো-জার্মানিক ধাতু-প্রকরণগত অভিধান)। এই গ্রন্থ ১৯৪৮-এ প্রকাশিত হয়। হাইনরিখ কোপেলমান রচিত Die eurasische Sprachenfamilie: Indogermanisch, Koreanisch und Verwandtes (ভাষা গোষ্ঠীর ইউরেশিয়ান পরিবার: ইন্দো-জার্মানিক, কোরিয়ান এবং সম্পর্কিত ক্ষেত্রাদি) হাইডেলবার্গে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভারতের ইন্দো-এরিয়ান বুলির অতিখ্যাত অভিধান হল ওটো ফন বোহটলিংক রচিত Sanskrit-Wörterbuch সেণ্ট পিটার্সবার্গের ইম্পিরিয়াল রাশিয়ান একাডেমি অব সায়ান্স কর্তৃক সাতটি খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশিত হয়। বোহটলিংক-এর সহযোগী ছিলেন রুডলফ রোথ। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় এই দুই লেখক তাঁদের কর্মপদ্ধতি বিষয়ে উল্লেখ করেছেন—

> এইভাবে আমরা শব্দতাত্ত্বিকদের দ্বারা প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছি: সোজা মূল গ্রন্থ থেকে শব্দে বা বিষয়বস্তুর মধ্যে যার যোগ আছে সেই অর্থে আহরণ করেছি; এই পদ্ধতির পথ অতি শ্লথ এবং কষ্ট সাধ্য। ব্যাখ্যাকারী বা অনুবাদক কেউই সেদিকে নেতৃত্ব গ্রহণ করেননি। সুতরাং ব্যাখ্যাকার ও কোষগ্রন্থ রচনাকার এই উভয় ভূমিকাই আমাদের গ্রহণ করতে হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইম্পিরিয়াল রাশিয়ার রাজধানী সেণ্ট পিটর্সবার্গ ভারতীয় পঠন-পাঠনের এক সুবিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। তার কারণ অসংখ্য জার্মান প্রাচ্যবিদগণকে সেইখানে গবেষণা কার্যের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এঁদের অন্যতম ওটো ফন বোহটলিংক তাঁর সংস্কৃত অভিধানের চার খণ্ডে সম্পূর্ণ একটি সংক্ষেপিত সংস্করণ প্রকাশ

করেন। গ্রন্থটি এমনই চমৎকার হয় যে ১৯২৩ থেকে ১৯২৫-এর মধ্যে লাইপ-জিগে তার পুনর্মুদ্রণ হয়। সংস্কৃত অভিধানের ক্ষুদ্র সংস্করণে শুধুমাত্র বৃহৎ সংস্করণে প্রদত্ত শব্দাবলীর অর্থ দেওয়া আছে।

ভারতবর্ষেও কয়েকটি বিখ্যাত এবং গুরুত্বপূর্ণ অভিধান রচিত হয়। পাণিনি কোষগ্রন্থ লেখকদের কাছে এক আদর্শ বিশেষ। হলায়ুধ ভট্ট প্রণীত অভিধান-রত্নমালার বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন, তিনি আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে ছিলেন, এবং জৈন সাধু হেমচন্দ্র কর্তৃক রচিত 'অভিধান চিন্তামণি' আর একটি গ্রন্থ। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি অনুবাদ করেন থিওডোর অফরেখট্ এবং শেষোক্তটি অনুবাদ করেন বোহটলিংক এবং চার্লস রিউ। অফরেখট্ কৃত অনুবাদ যুগপৎ ইংরাজী ভাষায় লণ্ডনে এবং জার্মান ভাষায় সেণ্ট পিটার্সবার্গে অজস্র পাদটীকা-সহ প্রকাশিত হয়। সেইকালে, লণ্ডনে কয়েকটি জার্মান সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়, যথা 'সংস্কৃত গ্রন্থকর্তা ও ধাতু প্রকরণের উৎকৃষ্ট সংস্করণগুলির উল্লেখসহ' থিওডোর বেনফীর 'সংস্কৃত অভিধান' (১৮৬৬) এবং কার্ল ক্যাপেলার কৃত ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের 'সংস্কৃত অভিধান', এই গ্রন্থটি স্ট্রাসবুর্গে ১৮৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Sanskrit Wörterbuch' গ্রন্থের অনূদিত বৃহত্তর সংস্করণ। পিটার্সবার্গ অভিধানগুলির আদর্শে এই গ্রন্থটি রচিত।

হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী দুই জার্মান গবেষক রিচার্ড পিসথেল ও জিওরজ বুহলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এঁরা ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে ভারতবর্ষের সুবিখ্যাত প্রাকৃত অভিধানটির ইংরাজী রূপান্তর প্রকাশ করেন—তাঁর নাম 'The Decinamamala···' (বিশ্লেষণী মন্তব্য। শব্দ নির্ঘণ্ট এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা সহ সম্পাদিত)।

Jaska's Nirukta samt den Nighan-tavas (যক্ষের নিরুক্ত নিঘন তত্বসহ) ১৮৪৮ থেকে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত বেদ গ্রন্থের যে নির্ঘণ্ট অংশ রুডলফ রথ কর্তৃক প্রকাশিত হয় তার শিরোনাম। নিরুক্ত কথাটির অর্থ ধাতুপ্রকরণ। যক্ষ ছিলেন প্রখ্যাত পাণিনির পূর্বসূরী। রথের গ্রন্থটি একটি মূল্যবান পদক্ষেপ কেননা প্রাচীন ভারতীয় পাণ্ডুলিপিতে বেদের যুগের বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি তার ধাতুপ্রকরণসহ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, যদিও সংক্ষিপ্ত লিখনভঙ্গীর জন্য অনেকক্ষেত্রে অর্থ গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে তথাপি এই গ্রন্থ মূল্যবান।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে আরনষ্ট ও জে. লিউমান ইন্দো-জার্মানিক জনগণের

প্রাচীনতম লিখিত ভাষায় শব্দতাত্ত্বিক গবেষণার ফসল তাঁদের Etymologischen Wörterbuch der Sanskritsprache (সংস্কৃতের ধাতুপ্রকরণগত অভিধান) ক্রিশ্চিয়ান কর্ণেলিয়াস উইলেনবেক ১৮৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এঁদের পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত ধাতুপ্রকরণগত সংস্কৃত অভিধান রচনা করেন।

আমাদের পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষার যে গ্রন্থটি উদ্ধার করে দেওয়া হল তার নাম ঋগ্বেদ, হেরমান গ্রাসমানের Wörterbuch zum Rig-veda (ঋগ্বেদ বিষয়ক অভিধান) ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লাইপজিগে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি অভিনন্দিত হয় এবং যথাসময়ে ওয়েসবাডেনে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দুই যুদ্ধের মাঝখানে, রিচার্ড স্‌খমিডট বোহটলিংকের সংস্কৃত অভিধানের অতিরিক্ত অংশ প্রকাশ করেন, ১৯২৪-২৮-এর মধ্যে লাইপজিগে তা প্রকাশিত হয়। আরেকটি গ্রন্থের কথা এখানে উল্লেখ না করা ঠিক হবে না—তাঁর নাম Vergleichendes etymologisches Wörterbuch des Alt-Indoarischen (Altindischen) (প্রাচীন ইন্দো-এরিয়ান/প্রাচীন ভারতীয় ভাষাসমূহের ধাতুপ্রকরণগত তুলনামূলক অভিধান, ১৯৩৫)।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, জার্মানীতে সংস্কৃতচর্চা আরো একটু বেশী অগ্রসর হয়। আলবার্ট থামব লিখিত Handbuch des Sanskrit-এর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হাইডেলবার্গে প্রকাশিত হয় রিচার্ড হয়সচাইলড কর্তৃক সংশোধিত অবস্থায়। সেই বছরই মানফ্রেড মেয়ারহফার একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen (প্রাচীন ভারতীয় ভাষা গোষ্ঠী সমূহের সংক্ষিপ্ত ধাতুপ্রকরণগত অভিধান) জার্মান, সংস্কৃত এবং ইংরাজী ভাষার মৌখিক সংজ্ঞা এই গ্রন্থে পরিবেশিত হয়। এডলফ ফ্রিডরীশ স্টেনৎসলার-কৃত Elementarbuch der Sanskritsprache—Grammatik, Texte, Wörterbuch (সংস্কৃত প্রাথমিক ব্যাকরণ, মূল পাঠ্য এবং শব্দার্থসহ) জার্মানীতে প্রকাশিত গ্রন্থাদির মধ্যে সবিশেষ পরিচিত। বারোটির অধিক সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রন্থটি ধ্রুপদী সংস্কৃতের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কীয়েলহোর্ন-কৃত আগেকার ব্যাকরণের প্রভাব এই গ্রন্থে দেখা যায়। পিসখেল এবং গেল্ডনার প্রভৃতি প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্‌গণের এই গ্রন্থটির ব্যাপারে সহযোগ ছিল, এঁরা যথাক্রমে গ্রন্থটিকে আরো উন্নত এবং পরিমার্জিত করেন।

মুখ্য উত্তর ভারতীয় বুলি এবং শব্দরূপ প্রাকৃত ভাষায় যা পাওয়া যায় তা বিশেষ সমীক্ষার ক্ষেত্র। জার্মানদের ভারততাত্ত্বিক শৈশবকালেই পণ্ডিতগণ এর গুরুত্ব বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় নরওয়ের ক্রিশ্চিয়ান লাসেন তাঁর ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রাকৃত ব্যাকরণ লাতিন ভাষায় রচনা করেন। নিকোলাস দেলিউস প্রাকৃতের শব্দরূপ প্রসঙ্গে লাসেনের গ্রন্থের পরিপূরক হিসাবে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

উত্তর ভারতের লঘু ভাষা গোষ্ঠীর ব্যাকরণ ও অভিধান প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে বিহারী ভাষার—প্রাচ্য হিন্দি বিষয়ে বিহারীভাষার তুলনামূলক অভিধান (তুলসীরামায়ণের সূচীপত্র) রচনা করেন এ. এফ. রুডলফ হোয়ারনেল ও স্যার জর্জ গ্রীয়রসন। ১৮৮৫ এবং ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কলিকাতায় এই গ্রন্থটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ডাঃ রাইনহার্ড ভাগ্‌নার শ্রীকান্ত-এর অনুবাদ কর্মে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় মিত্রপক্ষের যুদ্ধবন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়, তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলকে বাংলা ভাষায় লাতিন অক্ষর অনুসরণ করার প্রচেষ্টায় ব্রতী ছিলেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে টি. জে. এল. মেয়ার একটি ইংরাজী-বালোচী অভিধান প্রকাশ করেন, এদিকে উইলহেলম গাইগার কর্তৃক Etymologie des Baluchi প্রকাশিত হয়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বার্নহার্ড ডোর্ন তখনকার অবিভক্ত ভারতবর্ষের আফগান বুলি নিয়ে চর্চা করেন এবং পোস্ত ভাষায় একটি chrestomathy বা উৎকৃষ্ট রচনাবলীর সংগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর পদাঙ্কানুসরণ করে লুডভিগ উইলহেলম গাইগার ইন্দো-এরিয়ান ও ইরাণীয় ভাষাগোষ্ঠীর সম্পর্কে এক বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করেন। তার নাম Etymologie und Lautlehre des Afganischen (আফগান ভাষা বিষয়ক ধাতুপ্রকরণ ও ধ্বনিপ্রকরণ, ম্যুনিক, ১৮৯৩)। অবশ্য গাইগার সিংহলী ভাষার ধাতুপ্রকরণগত অভিধানের গ্রন্থকার হিসাবে পরিচিত। প্রখ্যাত জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ্ যেকব এবং উইলহেলম গ্রীম জার্মানদের জন্য যা করার চেষ্টা করছিলেন তাঁদের অপূর্ব তুলনামূলক Deutschen Wörterbuch (জার্মান অভিধান) রচনা করে, গাইগার গুরুত্বপূর্ণ সিংহলীদের ইন্দো-এরিয়ান ভাষার জন্য তাই করার আশা করেছিলেন, অর্থাৎ তিনি একটি বিস্তারিতভাবে সম্পূর্ণ ভাষা ইতিহাসের এক আদর্শ গ্রন্থ রচনায় প্রয়াসী হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে প্রকাশিত এই গ্রন্থ ব্যতীত গাইগার মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জে সিংহলীর প্রভাব বিষয়ে গবেষণা করেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Etymological Vocabulary of the Maldevian Language নামক রচনা রয়্যাল এশিয়াটিক জার্নালে প্রকাশ করেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলে অন্যান্য ভাষাগুলির মধ্যে এ. ডব্লু কর্ণেলিয়াস 'গোরখালি'র প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এই ভাষাটি সাহিত্যিক শব্দরূপ বিষয়ে কদাচিৎ আলোচিত হয়েছে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর গোরখালি-ইংরাজী অভিধান দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন।

প্রাচীন রাজ্য মগধের ভাষা পালি, ঐতিহ্যগতভাবে যে ভাষায় বুদ্ধদেব কথা বলতেন, জার্মানগণ কর্তৃক অতি গোড়ার দিকে আবিষ্কৃত হয় যেমন প্রীতিসহকারে একদা সংস্কৃত আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ সাইডেনস্টুকার ও নয়নতিলকের ভাষাতাত্ত্বিক কর্মের উল্লেখ করা যায়—বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিষয়ে এরা দুজন সর্বোচ্চ খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত। সেই সঙ্গে কুরট স্থমিডটের নামও উল্লেখ্য।

এখন কিছু অপেক্ষাকৃত লঘু ভাষাসমূহের উল্লেখ্য প্রয়োজন। এদের মধ্যে কিছু ইন্দো-এরিয়ান গোষ্ঠী বহির্ভূত। যে সব ব্যাকরণ প্রচলিত আছে তার মধ্যে ই. ডব্লু উইটার প্রণীত নাগা বুলি বিষয়ক গ্রন্থ An Outline Grammar: Grammar of the Lhota-Naga Language (কলিকাতা-১৮৮৮), যোহান হফমান ও আরথার ফন এমেলেন (পাটনা, ১৯৩০-১৯৪১) রচিত তিন খণ্ডে সমাপ্ত মুনডারি ভাষা বিষয়ক গ্রন্থ Encyclopaedia Mundarica উল্লেখ্য।

পারসীদের ভাষা বিষয়ে অনুসন্ধান করেন ডাঃ স্পাইগেল তিনি এই ভাষায় শব্দরূপের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে তার ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ব্যাকরণের শেষাংশে আলোচনা করেছেন।

> 'পারসীভাষায় প্রধান মূল্য অবশ্য তার মধ্যেই নিহিত. পারসিয়ানদের স্মৃতি হিসাবে—প্রাক্-ইসলামি যুগ আমাদের দৃষ্টিদান যোগ্য।'

জিপসী বা বেদিয়ারা সেন্ট্রাল য়ুরোপের একমাত্র যাযাবরী গোষ্ঠী, তাদের উৎপত্তিস্থান কাশ্মীর ও গুজরাটের মধ্যবর্তী অঞ্চল বলে মনে করা হয়। তারা এখনও তাদের প্রাচীন ভাষায় কথা বলে, এই বুলি ইন্দো-এরিয়ান দার্দিক বুলির সংমিশ্রণ, ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রীতিভরে রোমান্সবাদ আমদানি করেছেন ভাষাতাত্ত্বিকগণ (পট, বিসকফ, বুখমায়ার, লাইবিস), জিপসীদের ভাষানুসন্ধান নিয়ে শতাব্দীব্যাপী সাধনায় ব্রতী ছিলেন। মোঙ্গল হানাদারদের বিরাট

আক্রমণের মুখে জিপসীরা য়ুরোপে চলে এসেছিল। জার্মানীর কোনো কোনো অঞ্চলে বনিক শকট বা ক্যারাভানবাসী নৃতত্ত্বের এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে 'ট্যাটারনস্' বলা হয়। এদের উপজাতীয় রাজা তাদের প্রাচীন যাযাবরী আচার-আচরণ আজো বজায় রেখেছে, 'ট্যাটারনস' কথাটি প্রাচীন আক্রমণকারী জাতির (তাতার) নামানুসরণে। সাত শতাব্দীকাল ধরে জিপসীরা পাশ্চাত্য জগতে একটা যাযাবরী রোমান্সের আমেজ নিয়ে এসেছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে তাদের হিমালয়স্থ আবাসের লোক কথা, অতি সাম্প্রতিক কালে সেই বস্তুর প্রতি আমাদের সচেতন দৃষ্টি পড়েছে।

একথা সত্য যে ভাষাতাত্ত্বিকদেরও একটা রোমানটিক দিক আছে। ভারতীয় অঞ্চলের এই সব ভাষা আবিষ্কার, যার মধ্যে শুধু ইন্দো-ইরানীয় এবং কিছু লঘু অ-ইন্দো-জার্মানিক ভাষার কথা এখানে আলোচিত হল। এই কর্ম ভারতবর্ষের সঙ্গে জার্মানীর বৈজ্ঞানিক যোগাযোগের প্রকৃতপক্ষে এক আনন্দময় মধ্য রঙ্গ।

ভাষাতত্ত্বের মহত্তম মনীষীরা তাঁদের এক বা একাধিক মুখ্য গ্রন্থাবলীর জন্য উল্লিখিত হয়ে থাকেন, কিন্তু এ সমস্তই অনেক সময় তাঁদের জীবনের কর্মাবলীর সামান্য একটি অংশবিশেষ। ভাষাতাত্ত্বিক আশীর্বাদ পুষ্ট উনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র পরিশ্রম ও তার সমগ্র পণ্ডিতবর্গের মূল্যায়ন কে করতে পারবে? ক্রিশ্চিয়ান লাসেনের নাম (১৮০০-১৮৭৬) সর্বদাই Indischen Alterthumskunde (ভারতীয় প্রাচীনত্ব) নামক গ্রন্থের সঙ্গে সংযুক্ত। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, থিওডোর অফরেখট্ (১৮২২-১৯০৭) তার 'সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির তালিকা'র জন্য স্মরণীয়। আলব্রেখ্‌ট ওয়েবারের (১৮২৫-১৯০১) কথা উল্লেখ করতে গিয়ে 'হোয়াইট যর্জুবেদ' মনে আসে, এদিকে জর্জ বুহলার তাঁর অসামান্য গ্রন্থ Grundriss der indoarischen Philologie und Altertumskunde (ইন্দো-ইরানীয় গবেষণার বিশ্বকোষ) জন্য স্মরণীয়। শেষোক্তটি হল জার্মান ও ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী এর জার্মান-ইংরাজী-ভারতীয় সহযোগীতার মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য এই গ্রন্থাবলী সর্বত্র উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে গৃহীত হল। গ্রন্থাবলীর জ্যাকেটে বর্ণিত পরিচয় বাক্যে এই প্রতিজ্ঞা বাক্য লিখিত আছে।

ইন্দো-ইরানীয় রিসার্চের এনসাইক্লোপিডিয়া গ্রন্থে সর্বপ্রথম পূর্নাঙ্গভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে পদ্ধতিগত ধারায় ভারতীয় ভাষা,

ধর্ম, ইতিহাস, প্রাচীনত্ব ও শিল্পবিষয়ক সুবিশাল বিষয়বস্তু, এই সব বিষয়াবলীর অধিকাংশ ইতিপূর্বে সংলগ্নভাবে আলোচিত হয়নি··· অষ্ট্রিয়া, ইংলণ্ড, জার্মানী, ভারত, নেদারল্যাণ্ডস ও যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি সমূহের প্রায় ত্রিশজন পণ্ডিত এই কর্ম সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এই সব রচনা ইংরাজী বা জার্মান ভাষায় রচিত হবে।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জুলিয়াস জালি ব্যুলারের শোচনীয় মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেন। তিনি ব্যুলারের বুদ্ধিমত্তার এক নৈর্ব্যক্তিক চিত্র অঙ্কন করেন, সেইসব এইখানে ভারতীয় সমীক্ষা বিষয়ক প্রচেষ্টার এক দৃষ্টান্ত হিসাবে তালিকাবদ্ধ করা হল :

ভারততত্ত্ব বিষয়ক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে সামগ্রিক ভাবে ব্যুলারের দক্ষতা ছিল, ধীরগতিতে ক্রমবর্ধমান এই অধিকার শেষ জীবনে যে কর্ম তাঁর জীবনে সর্ব প্রধান হয়ে উঠেছিল এবং যে সংকল্প পরিপূর্তির জন্য সরকার তাঁকে ছুটি দিয়েছেন সেই এনসাইকোপিডিয়া অব ইন্দো-এরিয়ান রিসার্চ প্রকল্পের তিনি ছিলেন সর্বাধ্যক্ষ। সত্তর দশকের (অষ্টাদশ শতাব্দ) গোড়ায় 'ভারতীয় প্রাচীনত্ব' নামক একটি বিস্তারিত গ্রন্থ রচনার তিনি পরিকল্পনা করেন। 'ওরিয়েণ্টালিয়া'র জন্য যিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, যাঁর উদ্দেশ্য ছিল লাসেনের অপ্রচলিত 'ভারতীয় প্রাচীনত্ব' গ্রন্থের স্থানে একটি নতুন গ্রন্থ প্রকাশ, সেই লণ্ডন প্রকাশক নিক. ট্রবনারের সহযোগে এই পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করার বাসনা ছিল। যাই হোক এই সব শিলালিপি সংক্রান্ত গবেষণা ও অন্যান্য জরুরী কাজ তাঁর এই পরিকল্পনা রূপায়নে বাধা সৃষ্টি করে। তার ভাষাতাত্ত্বিক গ্রন্থাবলীর প্রকাশক নিক ট্রবনারের ভাইপো স্ট্রাসবুর্গের কে. জে. ট্রবনার ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের লণ্ডন কংগ্রেসের অধিবেশনের কালে তাঁর প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত ও সর্বজন প্রশংসিত জার্মানিক ও রোমানিক গবেষণা বিষয়ক কোষগ্রন্থের অনুরূপ ধারায় বিশদভাবে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা। ব্যুলার সম্মতিদান করলেন, তাঁর নামের গুরুত্বের জন্য এবং তাঁর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দরুণ তিনি শুধু জার্মান ও অষ্ট্রিয়ান

সহযোগী নয়, ব্রিটিশ, ডাচ, নর্থ আমেরিক্যান ও ভারতীয় সহযোগীদের সহায়তায় প্রতিশ্রুতিলাভ করলেন। এই ভাবে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ করা সম্ভব হল, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় গবেষণা বিষয়ে প্রতিটি শাখা প্রসঙ্গে এক একটি পুস্তিকা প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল। স্থানীয় রঙ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমীক্ষার ক্ষেত্রে 'মার্গ' এই কথাটি ব্যবহার করা হল।

উনবিংশ শতাব্দীর মহৎ মনীষীগণ যাঁরা জার্মান ধ্রুপদী যুগের ভারত-জার্মান গবেষণার সূত্রপাত করেন তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বলেছেন, এদিনের গবেষকবৃন্দ অনেকদিকে তাঁরা সীমিতক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হয়েছেন যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যথা এলসড্রফ ভূগোলের ক্ষেত্রে এবং ফন গ্লাসেনাপ ব্রহ্মবিদ্যাগত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমারেখার শৃঙ্খলা অতিক্রম করেছেন। সহজ এবং অজটিল ভঙ্গীতে শেষোক্ত লেখক দার্শনিক বিষয়বস্তু থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করেছেন এবং জনপ্রিয় উপন্যাসকারের ভঙ্গীতে তাঁর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হেলমুথ ফন গ্লাসেনাপ (১৮৯১-১৯৬৩) সর্বদাই ভারততত্ত্বের সীমারেখা অতিক্রম করায় উদগ্র বাসনায় আকুল ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের ভ্রমণকথার শেষাংশে ভারততত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার সমস্যা বিষয়ে বাস্তবানুগ ভঙ্গীতে সরসতার স্পর্শ দিয়ে উল্লেখ করেছেন—

> ভারততত্ত্ববিদদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—যাঁরা শুধুমাত্র সীমিতক্ষেত্রে কাজ করেন এবং যাঁরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশে সক্রিয় হওয়ার প্রয়াসী। এ বিষয়ে একটি বহু পরিচিত বাণী উপযুক্তভাবে প্রযোজ্য :
>
> "Dummer, sammle still und unerschlafft
> im kleinsten Punkt die höchste Kraft."
>
> ("ওরে নিরেট বুদ্ধি! অধ্যবসায় সহ
> সংকীর্ণ ক্ষেত্রে মহত্তম শক্তি আহরণ কর।")
>
> এবং গ্যয়েটে যুক্তিসহ বলেছেন 'In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister' (সীমাবদ্ধতাই প্রমাণ করে কে অধিকর্তা)—একজনের সমস্ত পরিশ্রম যদি কোনো একটি মাত্র ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তিনি সেই বিভাগে এমন জ্ঞান

অর্জন করবেন না যা বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা একই সঙ্গে ব্যাপৃত থাকেন তাঁদের পক্ষে সহজলভ্য নয়। যাই হোক, অর্থনৈতিক জীবনে বহুমুখী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই একটি কথা প্রযোজ্য। এরা সহজেই সংকটপ্রবণ। সাফল্য যদি একটিমাত্র কর্ষিতক্ষেত্রে, তখন সেই পণ্ডিতের শক্তি বিষয়ে বিচারের প্রশ্ন ওঠে। তথাপি কেউ যদি বহু বিভাগে তাঁর শক্তি পরীক্ষা করেন তাহলে ত্রুটি হওয়া সম্ভব।

তবে সর্বোপরি, বহুমুখী কর্ম বিজ্ঞানীদের কাছে একটা সমৃদ্ধিকর ব্যাপার, তাঁদের মানসিক প্রসারত্ব বৃদ্ধি পায়, এবং একটি ক্ষেত্রে যে জ্ঞান তিনি আহরণ করেন অন্য ক্ষেত্রে তা সহায়ক হতে পারে। যে সব ভারততাত্ত্বিক আমরা অতীতে পেয়েছি, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যতই পার্থক্য থাক; ম্যাকস মুলার, আলব্রেখট ওয়েবার এবং রিচার্ড পীসখেল, হেরমান জ্যাকোবী, হাইনরিখ ল্যুডার্স প্রভৃতি সকলেই বিভিন্ন বিভাগে সমীক্ষা করেছেন এবং সেই ভাবে তাঁরা প্রচুর প্রেরণা সম্পদে লাভবান হয়েছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির কোন একটি বিশেষ বিভাগে কোনো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করতে হলে লেখককে শুধুমাত্র তাঁর বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রটুকু বিষয়ে জানলেই চলে না। তার বাইরে, সম্পর্কিত অন্য বিভাগের বৈশিষ্ট্য বিষয়েও তাঁর বিশদ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তবেই তিনি বিষয়বস্তুর ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারবেন। শুধুমাত্র নিজের ক্ষেত্রে 'বিশদ জ্ঞান বিহীন শব্দতাত্ত্বিক' হয়ে থাকলে চলবে না, তাঁকে সংলগ্ন এবং সম্পর্কিত তথ্য বিষয়ে জ্ঞানানুসন্ধান করতে হবে। সংকীর্ণ ও শুধুমাত্র বিশেষ ধরণের গবেষণায় নিজেকে আবদ্ধ রাখলে তিনি সংশ্লিষ্ট তথ্য এবং পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে তাঁর নিজের গবেষণাকে উপযুক্ত সাহায্য করতে পারবেন না। ভারতের প্রাচীনযুগের ধর্মীয় ইতিহাস বিষয়ে আমাদের জ্ঞান প্রভূতভাবে অগ্রসর হয় ওলডেনবার্গের নৃতত্ত্বগত আবিষ্করণে, যার ফলে ব্রাহ্মণ-পাঠকে আমরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষা পেয়েছি। অন্য সব বিষয় সম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। যদিও আমরা উপেক্ষা করি যে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আহরিত জ্ঞান মানুষের বুদ্ধির প্রসারতা ঘটায়

তথাপি মানসিক দিগন্তের সম্প্রসারণ সর্বদাই লাভজনক। অজ্ঞাবধ সংস্কৃতির গোচর-জ্ঞান ভারততত্ত্বের ব্যাখ্যার পক্ষে সহায়ক পন্থা হতে পারে, কিংবা বিস্তারিত তথ্যের উপর চাকচিক্যমান অলঙ্কার মাত্র হতে পারে—তুলনামূলক ব্রহ্মবিদ্যায় বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে গোচর জ্ঞান বিষয়ক তুলনা সর্বাধিক প্রয়োজনীয় কর্তব্য।

মোক্ষমূলা

ভারততত্ত্বের নভোমণ্ডলে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

> পাশ্চাত্যের সঙ্গে সকল সংযোগ, ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাধিক ফলপ্রসূ হয়েছে বিগত শতাব্দীর জার্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণের সঙ্গে সংযোগ। এতদ্বারা ভারতবর্ষের প্রচুর উপকার হয়েছে। প্রাচীন মতবাদের জায়গায় জীবন বিষয়ে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠল, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই দৃষ্টিভঙ্গী শিলীভূত হয়েছিল। এ যেন এক বদ্ধ ঘরে এক ঝলক তাজা প্রাণরসপূর্ণ বাতাসের প্রবেশ। যে সব মহামনীষী এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী রচনায় সহায়ক হয়েছেন তাঁদের জার্মান পণ্ডিত ম্যাকস্ মূলারের মত এতখানি ধন্যবাদ আর কারও প্রাপ্য নয়।
>
> এ. এস. ভি. পন্থ (অহিংসার ধ্বনি অক্টোবর—১৯৫৬)

ভারতবর্ষের সর্বত্র ম্যাকস্ মূলারের নাম এক ম্যাজিক প্রক্রিয়া, এর গুণে জার্মান অতিথির জন্য যে কোন দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর যেমন প্রতিটি জার্মান অতিথিকে গুপ্ত সংস্কৃত গবেষক মনে করা হয়, সকলেই একটি মাত্র মানুষের গৌরবের রশ্মিতে শরীর উত্তপ্ত করতে পারেন। ব্রিটিশরা, বেশ আইনসঙ্গতভাবেই ম্যাকস্ মূলারকে তাঁদের আপনজন বলে মনে করেন। স্বতন্ত্রভঙ্গীর এই পণ্ডিতজনকে জাতীয় মর্যাদায় মণ্ডিত করেছেন, এই প্রসন্নভঙ্গী ও সরস চিত্তের মহান্ পণ্ডিতকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দান করেছেন।

ম্যাকস্ মূলার, কিংবা যে নামে তাঁকে জন্মকালে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ফ্রিডরীশ ম্যাকসিমিলয়ন মূলার—জার্মান ও এ্যাংলো জার্মান ভারততত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে এক প্রতীক বিশেষ। ১৮২৩ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দেশাউ অঞ্চলে জীবন সুরু করেন, শব্দতত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহী এক উদারনীতিক পরিবারে তিনি মানুষ হয়েছেন। পিতৃদেব ভিলহেলম মূলার যখন পরলোক গমন করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র চার, তিনি ছিলেন Philhellene বা গ্রীকানুরাগী, গ্রীসের স্বাধীনতার স্বপক্ষে তিনি রাজনৈতিক লেখকের কলম চালনা করেছেন।

তরুণ ম্যাক্সের বাসনা ছিল সঙ্গীত শিক্ষা করার কিন্তু বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্ ব্রোকহাউস তার পরিবর্তে তাঁকে সংস্কৃত অধ্যয়নে রাজী করালেন। আরেকজন প্রখ্যাত ভাষাবিদ্ বোপ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের নয়া শৃঙ্খলা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি করলেন। দার্শনিক স্খেলিং মূলারকে উপদেশ দিলেন অধ্যাত্ম তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণায় বসতে। কিন্তু খোলামন সম্পন্ন এই তরুণ তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হলেন। পরিশেষে, ফরাসী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ বারনউফ তাঁকে ধর্মমতগুলির তুলনামূলক বিজ্ঞানও অধ্যয়নে রাজী করলেন, তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ঋগেদের অফুরন্ত প্রস্রবনে। বারনউফের কাছ থেকে মূলার জেনদের বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করলেন, প্রাচীন পারসিক ভাষার এই গ্রন্থটির প্রায় বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নাম ছিল আবেস্তা।

বারনউফ প্রেরণামূলক বাণী ম্যাক্স মূলারের মনে গাঁথা হয়ে গেল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে গেলেন। প্রাসিয়ান রাষ্ট্রদূত কার্ল বোসিয়াসের মধ্যে তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক পেলেন যিনি তাঁর ঋগেদ সংক্রান্ত পরিকল্পনা সমর্থন করলেন। যাই হোক, দূর প্রসারী ভাষাতাত্ত্বিক পরিকল্পনার প্রয়োজনে এই তরুণের প্রাসিয়ান এবং রাশিয়ান পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার সম্ভবনা হয়ত তথাকথিত বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের আর্থিক হিসেব নিকেশের জন্ম বরবাদ হয়ে গেছে। ইংলণ্ডে এই জাতীয় কোনো রকম ওজর আপত্তির বালাই ছিল না। বুনসেন ও উইলসন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিয়ে প্রথম তিনটি খণ্ড (যথাক্রমে ১৮৪৯, ১৮৫৪, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) প্রকাশের খরচ খরচার ব্যবস্থা করেন। আর শেষ তিনটি খণ্ড (১৮৬২, ১৮৭২ ও ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) সেক্রেটারি অব ষ্টেট ফর ইনডিয়ার আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। এই শেষ তিনটি খণ্ড কুইন ভিকটোরিয়ার নামে উৎসর্গীকৃত হয়। এতদ্বারা সম্রাজ্ঞীর প্রতি গবেষকদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এই সম্রাজ্ঞী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় বিদ্রোহের সেই দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করেন। এর দু'বছর পর তিনি ভারতের মহারাণী পদে অধিষ্ঠিত হন, এই ঘটনা মূলারের গ্রন্থটির ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর ঘটে।

এই গ্রন্থ প্রকাশ একটা সাহিত্য বিজ্ঞানগত ঘটনা। ভারতের অনেক ব্রাহ্মণ একজন ম্লেছ বা বিধর্মী কর্তৃক তাঁদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থাদিকে সর্বপ্রথম এইভাবে মুদ্রণ ও ব্যাখ্যা করার ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তথাপি

ষষ্ঠ খণ্ডটি প্রকাশের পর ম্যাকস মূলার অবদান এবং সম্পাদক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব উচ্চ প্রশংসা লাভ করে (এই কাজ তাঁর সহযোগী ছিলেন অফরেশট ক্রনহোফার, এগলিং, থিব ও ভিনতারনিৎস প্রভৃতি)। ভারতবর্ষেই, তিনি এক অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে সমর্থন লাভ করেন। কাথিয়াবাড়ের মূল শঙ্করের আশপাশের একদল ব্রাহ্মণগণ তাঁকে প্রচণ্ডভাবে সমর্থন করলেন। মূল শঙ্কর, তাঁর সন্ন্যাস নাম দয়ানন্দ সরস্বতী নামেই অধিক পরিচিত, তিনি এবং তাঁর ধর্মমতানুসারীবৃন্দ একটি সংস্কার মুক্ত সম্প্রদায় সংগঠন করলেন তার নাম আর্য সমাজ—উন্নতমনাদের প্রতিষ্ঠান। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যাকস মূলারের 'ষষ্ঠ খণ্ড' প্রকাশের ঠিক এক বছর পর। দীর্ঘকাল ধরে সমালোচিত হওয়ার পর অকস্‌ফোর্ডের এই এ্যাংলো-জার্মান পণ্ডিতকে এখন সম্মানসূচক উপাধি দান করা হল। 'মোক্ষ মূল' বা মুক্তির মূল। এই উপাধি আজো ভারতীয়গণ কর্তৃক স্বীকৃত। আর ম্যাকস মূলার প্রকৃতপক্ষে এই নবগঠিত সম্প্রদায় যা ধর্মের সংস্কার সাধন করে পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মূল বিশেষ। দয়ানন্দ ম্যাকস মূলারের রচনা নিখুঁতভাবে পড়েছিলেন, তিনি এক সাদাসিধে ও সরল জগতে পুনরাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। তাঁর কাছে বেদ এক বাইবেল স্বরূপ যার অন্তর্নিহিত বাণী পালনীয়। এই কারণে কাথিয়াবাড়ের এই সাধুকে হিন্দু লুথার বলা হত—বেদে উল্লেখ না থাকলেও তিনি অবশ্য পুনর্জন্মের তত্ত্ব তাঁর এই পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

পরে, যে সব বক্তৃতাদি সাধারণভাবে সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পণ্ডিত ও সাধারণ শ্রোতাদের সমাবেশে বলা হয়েছিল তা ইংরাজী ভাষায় মুদ্রণ করা হল। এর নামকরণ করা হল Chips from German Workshop, ততদিনে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা হিসাবে তিনি খ্যাতিলাভ করেছেন। তথাপি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে যখন অকসফোর্ডে সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ খালি হল, তখন ম্যাকস মূলারকে নির্বাচন করা হল না। ১৯৬০ সংস্করণ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা মতে তার কারণ 'তিনি বিদেশী এবং তার সংযোগ ছিল উদারনীতিক'। কিন্তু যখন ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অকস্‌ফোর্ডে তুলনামূলক শব্দতত্ত্বের একটি পদ সৃষ্টি করা হল তখন তাঁকে অধ্যাপক নিযুক্ত করা হল। কারণ এই জার্মান পণ্ডিত ফ্রানৎস বোপ, আগস্ট এফ. পট এবং এডলফ পিকটেটের শব্দতাত্ত্বিক গবেষণার সিদ্ধান্ত

বিষয়ে ইংলণ্ডে পরিচয় দান করেন এবং ব্রিটিশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তুলনামূলক শব্দতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর সমগ্র সৃজনশীল কর্মজীবনে মূলার শব্দতত্ত্ব এবং দর্শনের (এই দিক থেকে তিনি কান্টের অনুগামী এবং কান্টের Critique of Pure Reason এর তিনি ইংরাজী অনুবাদ করেন) তুলনামূলক ব্রহ্মবিদ্যা এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রান্ত সীমায় সমাসীন ছিলেন।

ষষ্ঠ খণ্ডের প্রকাশের পর ম্যাকস্ মূলারের সম্পাদনা কর্মের বিরতি ঘটে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর অধ্যাপক পদ ত্যাগ করেন সমগ্র সময় তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থ 'The Sacred Books of the East' সম্পাদনার জন্য অবকাশ লাভের জন্য। এই সিরিজের গ্রন্থগুলির সংখ্যা ৫১ খণ্ডের কম নয় এবং এইগুলি প্রাচ্য দেশের পবিত্র রচনাবলী সম্পর্কে যথেষ্ট সুযোগ দান। মাত্র তিনটি খণ্ড ম্যাকস মূলারের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষ যিনি বিজ্ঞানের কর্মে নিবেদিত প্রাণ তাঁর শক্তিমত্তার কথা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়। এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে উধৃতবাণী রাজস্থানের পিলানীর প্রাক্তন বিড়লা এডুকেশন ট্রাষ্ট বর্তমানে যার নাম বিড়লা ইনষ্টিট্যুট অব টেকনোলজী অ্যাণ্ড সায়েন্স, তার সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এ. এস. ভি. পন্থের ম্যাকস মূলার বিষয়ক সমীক্ষা গ্রন্থ থেকে গৃহীত। এই রচনাটি সর্বপ্রথম একটি জৈন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমি ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক পন্থের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাঁকে আমি সপ্রশংস-ভঙ্গীতে স্মরণ করি। তিনি তাঁর উপরোক্ত সমীক্ষায় এই কথাগুলি বলেছেন :

> তিনি ছিলেন মার্গ দর্শীন। অপরে শুধু তাঁর পদাঙ্কানুসরণ করেছেন। তাঁর অবদানের সম্পর্কে বলা যায় যে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ঋষি বাল্মিকীর সঙ্গে তুলনীয়। পরবর্তী কালের সকল কবি বাল্মিকীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। এই একইভাবে, আধুনিক প্রাচ্যবিদগণ ম্যাক্স্ মূলারের কাছে প্রেরণার জন্য ঋণী। ...তিনি ভাগবদগীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের সংজ্ঞামাফিক একজন কর্ম যোগী।

এই কথাগুলি আমার মনে আমি ভারতে যে শতশত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করেছি তা স্মরণ করিয়ে দেয়। জয়পুরের প্রাসাদে, অম্বরে বা চিতোরে, তাঞ্জোরের মন্দিরের শীর্ষে বা মাদুরাই-এর মন্দিরে কিংবা ত্রিচিনোপল্লীতে। বিভিন্ন রাজ্যগুলির রাজধানীতে বা প্রাদেশিক শহরে সাধুদের আশ্রমে বা অন্তবিধ জ্ঞান ভিক্ষু মানুষের সান্নিধ্যে—ম্যাকস মূলারের নাম এক ম্যাজিক সূত্র

—মোক্ষ মূলা নামটি একটা আকস্মিক প্রীতি ও তাৎক্ষণিক বোঝাপড়ার এক তরঙ্গ এনে দেয়। আরেক দিক থেকে এই আশ্চর্য কাণ্ড ভারতে তাঁর কর্মের সমাদর ঘটিত ব্যাপারের সমান্তরাল, প্রথম দিকে ছিল দ্বিধাগ্রস্ত পরে প্রচণ্ড উৎসাহ। ম্যাকস একটি কাহিনী যা তিনি প্রাচ্যবিদ্ ডাঃ হাউগের কাছে শুনেছিলেন প্রায়ই বলতেন, সে ঘটনাটি পুণায় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের ঘটনা, সেখানে একজন অব্রাহ্মণকে ম্যাকস্ মূলারের সংস্করণ থেকে উচ্চকণ্ঠে পাঠ করতে হয়। তখন উপস্থিত উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণগণ তাঁদের গ্রন্থাদি ম্যাকস মূলারের পাঠানুসারে সংশোধন করে নেন। যার প্রতি প্রথমে সংরক্ষিত মনোভাব ছিল তা পরে আনন্দময় স্বীকৃতিতে পরিণত হল।

ম্যাকস মূলার অনেকগুলি বিধান রেখে গিছলেন। বার বার তিনি তাঁর পাঠক এবং শ্রোতাদের প্রশ্ন করেছেন—এটা কিংবা ওটা আমাদের কি শিক্ষা দেয়? আর প্রতিবারই তার উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন। বিশেষতঃ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—India—What Can it Teach Us? তাঁর 'Last Essay' নামক গ্রন্থে তিনি যে সার বাক্য দিয়েছেন তা সেদিনের মত আজো সমান প্রযোজ্য:

> ইতিহাস যদি আমাদের কিছু শিক্ষা দেয় তাহলে ইতিহাসকে আমাদের এই শিক্ষা দিতে হবে সে ধারাবাহিকত্ব যা আমাদের অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে আবদ্ধ করে রাখে—তা'হল প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য।

এবং বিদগ্ধ প্রাচ্য ও বিদগ্ধ পাশ্চাত্যকে মৈত্রী বন্ধনে বাঁধার এ এক আবেদন নয় কি? একি গ্যয়টের বাণীর সমর্থক নয়? 'Westostlichen Divan (প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আম দরবার) নামক বিখ্যাত কাব্যের গণ্ডরূপ নয়:

যিনি নিজেকে জানেন
আর জানেন অপরকে,
এখানে তিনি নির্দেশ পাবেন
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে সোদর স্বরূপ দেখতে,
বিভাজিত নয়।

এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে যে সব জার্মান ইনষ্টিট্যুট স্থাপিত হয়েছে যেখানে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে জার্মান বুদ্ধিজীবিদের যোগাযোগ ঘটছে তার নামকরণ ম্যাকস মূলারের নামাঙ্কিত।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই নূতন দিল্লীতে ভারতের তদানীন্তন পরিবহণ মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবির (কবির ছিলেন ভারত-ইসলামী বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যের ধারাবাহী এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ) এবং ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর চার্জ-দ্য-এ্যাফেয়ার কাউন্সেলর ডাঃ হারবার্ট রিকটার কর্তৃক সংযুক্তভাবে উদ্বোধন করা হয়। এই কাউন্সেলর সেই সব ছিমছাম কূটনৈতিক দায়িত্বভার সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অন্যতম যাঁরা তাদের উপযুক্ত বুদ্ধি বৃত্তি এবং উদ্ভাবনীশক্তির সহায়তায় তাঁদের পদকে গৌরবান্বিত উপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালে, বাগদাদ, এলজিয়ার্স এবং টিউনিসের এ্যাম্বাসাডার ডাঃ রিখটার উল্লেখ্য অঞ্চলে তাঁর কর্মজীবন সম্পূর্ণ করেছেন।

নূতন দিল্লীর সেই উদ্বোধনী উপলক্ষ্যে যা পরবর্তীকালে অন্য শহরগুলিতে আরো অনেকগুলি ম্যাকস মূলার ভবনের উদ্বোধনে দুজন জননেতা ম্যাকস মূলার প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্মরণ করিয়ে দেন—এই মহান্ পণ্ডিত সম্পর্কে ভারতের প্রীতির পরিচয় সামান্য কয়েকটি কথায় যেভাবে দেওয়া হয়েছে অনেক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেও তা সম্ভব হত না। ভারতের নিজস্ব অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের নেতৃত্ব করার আহ্বান আছে :

> ভারতের প্রতি তাঁর কি সুগভীর প্রেম। নিজের মাতৃভূমির প্রতি তার এক শতাংশও আমার থাকুক এই আমার বাসনা।

ভারতীয় শিল্পকলার যাদু

শিল্পী এবং ঋষিরা আমাদের দেখিয়ে দেয় কোন শক্তি তাঁদের আবেষ্টন করে আছে সুতরাং আমাদেরও আবেষ্টিত করবে। আমরা প্রকৃত পক্ষে যা সেই স্তরে আমাদের উন্নীত হতে হলে আমাদের চারপাশে যে সব বাধা আছে তা অতিক্রম করতে হবে, সেই সব বাধা হল স্বার্থপূর্ণ বাসনাকামনা আর অপবিত্র সংস্কার। শিল্প আমাদের সেই ত্রাণকারী স্বপ্ন দান করে যা অশান্ত মন এবং বিহ্বল আত্মাকে দেয় স্বস্তি। শিল্পের উদ্দেশ্য হ'ল আত্ম-সংস্কৃতি—আত্মার সংস্কারসাধন।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

(এসেনে অনুষ্ঠিত ভারতীয় শিল্পকলা প্রদর্শনীর ভূমিকা)

যে জগত পরিমাপ উপেক্ষা করে শিল্প সেখানে এক হিতকর সংলাপের সুযোগ দান করে; শিল্প সেইসব শক্তির অন্যতম যা গঠন করে শিক্ষাদান করে, যার অগ্রগতি আছে এবং সমাজকে সংরক্ষণ করে। শিল্প যেখানে গভীরত্ব লাভ করে সেখানে শিল্প মানবিক ও অতিমানবিক ক্ষেত্রে এক সংলাপের সেতু রচনা করে—স্রষ্টা এবং সৃষ্টির সঙ্গে ভাববিনিময় ঘটে।

শিল্পের মূল যে ধর্মীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোনো কালেই ভারতীয় শিল্পের দৃষ্টি তা অতিক্রম করেনি। সুতরাং এর মধ্যে ধর্মীয় ও প্রতীক গুণ প্রাধান্য লাভ করেছে।

জার্মানীতে শিল্প জগৎ ভারতীয় তত্ত্ব বিষয়ে পাশ্চাত্য-জগতের বাকী অংশের কিঞ্চিৎ বিলম্বেই সজাগ হয়েছে। আমরা জানি শকুন্তলা যখন স্নো হোয়াইটের মত সাহিত্য ও ইতিহাসের মত কাচের কফিন ঠেলে সলজ্জ ভঙ্গীতে ধ্রুপদী যুগের রোমান্টিক মোহ বিস্তার করে প্রাচ্য-প্রেমিক মহলে আপন প্রাধান্য বিস্তার করে একটা গ্রহণশীল পর্বে এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন গ্যয়টে এই সাহিত্যিক আবিষ্কারে আনন্দিত হলেও ভারতীয় শিল্পের দিকে অগ্রসর হয়েছেন যথেষ্ট সংযত ভঙ্গীতে এবং সংযম সহকারে। ভারতীয় সংস্পর্শে আসার পর গ্যয়টে যে ভাবে তাঁর চিন্তার পরিচয় দান করেছিলেন তার ফলে বোঝা যায় ভারতীয়

ভাস্কর্য তাঁর কাছে কত বিদেশী মনে হয়েছে। তথাপি, যাঁর কাব্যিক স্বদেশ হল দিব্য-প্রেরণা সঞ্জাত গ্রীসের বাতাবরণে সংগঠিত, যিনি দেবতা এবং বীর-পুরুষদের সদ্গুণ এবং সঙ্গতির অন্তর্নিহিত চিরন্তন ছন্দের মাধুরীতে আপনাকে বেঁধেছিলেন, যিনি নিখুঁত আকৃতির মধ্যে সদ্গুণ এবং ভব্যতার পরিচয় পেয়েছেন, তিনি যে কি ভাবে ভারতীয় দেবতার এক ভাস্কর্যকে প্রতীকি গুরুত্ব দান করলেন! শকুন্তলা তার কুমারীত্বের বিশ্বজনীন মানবিক আবেদনে তাঁকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল, যে জগত জাতীয় সীমানা যেখানে নউসিকা ও গুডরুণ, ক্রিমহাইল্ড ও আইসোলডি এবং বিয়েট্রিস ও ওফেলিয়া বিচরণ করে তা অতিক্রম করেছে শকুন্তলা। প্রকৃতপক্ষে, গ্যয়টে দেব-দেবীগণের বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট দুজ্ঞেয় রহস্য বুঝতে সম্পূর্ণ অসমর্থ—এর মধ্যে কল্পনার অতি প্রাচুর্য বর্তমান। সেই কালের পৌরাণিক মনোভঙ্গীতে হেলেনীয় আঙ্গিকের প্রাধান্য ভদ্র পীড়নের চাপে উৎপীড়িত। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে যখন হারডার Über Denkmale der Vorwelt (প্রাচীনত্বের স্মৃতিসৌধে) নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তখন তিনি আক্ষেপ করেছিলেন যে ভারতীয় প্রাচীন মন্দির এবং স্মৃতিসৌধগুলি জার্মানদের কাছে শীলমোহর করা গ্রন্থের মত।

আর তথাপি, গ্যয়টে, যিনি তখনও যোহান জোয়াকিম ভিনকেলমানের হেলেনীয় বাণীর প্রভাবে আচ্ছন্ন তিনি ভারতীয় শিল্প বিষয়ে অভিমত দিয়ে বসলেন। Zahmen Xenien (জেনিয়াকে বশ করো) নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি তাঁর নিন্দাবাদ প্রকাশ করেছেন:

আর এইভাবে আমি বরাবরের মত
  চাইনা দেবতার আঙ্গিনায় পশুর উপস্থিতি।
হস্তির এই অরুচিকর শুণ্ড,
  গলদেশে সাপের ফোঁসফাঁস,
পৃথিবীর জলাভূমির গভীরে দিব্য প্রাণী কচ্ছপ,
একই কাঁধে এতগুলি সম্রাটের মাথা,
ওরা আমাদের হতাশায় ডুবিয়ে দেবে,
অবশ্য-খাঁটি প্রাচ্য দেশ যদি অবশ্য তাদের গ্রাস না করে।

অনেককাল আগে প্রাচ্যদেশ ওদের গ্রাস করেছে,
কালিদাস আর সেই সঙ্গে আরও সবাই পরিণতি পেয়েছে,

কবির পরিচ্ছন্নতা ওদের আছে,
আর কুৎসিত পুরোহিত আর বীভৎস মূর্তির
হাত থেকে সেইটুকু আমাদের নিষ্কৃতি দিয়েছে।
আমি স্বয়ং ভারতে বাস করতাম,
যদি সেখানে কোনো ভাস্কর থাকত॥
শকুন্তলা আর নলের চেয়ে
মধুরতর আর কি কল্পনা করা যায়,
এদের চুম্বন করি।
আর মেঘদূত
প্রিয়তমের কাছে বাণী পাঠাতে কে না চায়
এই দূতের মাধ্যমে!

যা কিছু নতুন এবং আশ্চর্য তার ওপর প্রচণ্ড উৎসাহ সত্ত্বেও কেন যে ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রতি গ্যয়টের এই বিরোধী মনোভাব হয়ত আরো দীর্ঘকাল চলত যদি না তার অনুগামীদের মনোভঙ্গী অপেক্ষাকৃত উদার না হত।

গ্যয়টের দৃষ্টিভঙ্গী ও উনবিংশ শতাব্দীর অপেক্ষাকৃত উন্নততর দৃষ্টিভঙ্গী যা যে কোনও অভূতপূর্ব বস্তুর প্রতি অনুকূল তার মধ্যবর্তীকাল প্রাচ্যবিদ্ থিওডোর বেনফির (১৮০৯-১৮৮১) মধ্যে রূপায়িত। Grossen Allgemeinen Encyclopädie (বৃহৎ সাধারণ বিশ্বকোষ) নামক আরসথ্ এবং গ্রোবার সম্পাদিত গ্রন্থে (১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি ভারতবর্ষ বিষয়ে ৩৫৬ পৃষ্ঠা লিখেছেন। বেনফি ভারতীয় ভাস্কর্য বিষয়েও লিখেছেন। ভারতীয় ভাস্কর্য বিষয়ে লিখতে বসে 'গ্রীক ধারা'র কথা উল্লেখ করা তার পক্ষে সহজ হয়েছে। ভিনকেলমান এবং গ্যয়টে সাহিত্যিক উত্তরাধিকারীদের সমর্থন করে এমন একটি মন্তব্য বেনফির কাছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে হয়েছে, তাই মনে হয় কত দ্রুতগতিতে মত পরিবর্তিত হয় এবং তা সংশোধন করা যায়:

> ভারতীয় ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশ স্থাপত্যের সঙ্গে সম্পর্ক বিশিষ্ট। প্রাচীনতর কাজগুলি অপেক্ষাকৃত কম আলঙ্কারিক, কিন্তু শিল্পগত কৌশল বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে আলঙ্কারিক, কলাকৌশলের প্রাচুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। গুহাগুলির দেওয়ালগাত্র বিরাট গাত্র চিত্রে সজ্জিত, তার মধ্যে পৌরাণিক গুরু এবং লঘু ঘটনাগুলি অঙ্কিত হয়েছে। এ ছাড়া মাঝামাঝি, বৃহৎ এবং বিরাট আকারের অনেক মূর্তি আছে; স্তম্ভ

গাত্র ইত্যাদিতে ভাস্কর্যমণ্ডিত মূর্তির সম্পদ উৎকীর্ণ আছে। পূর্বে যা উল্লিখিত হয়েছে দেবমূর্তিগুলি যা মানবিক রূপে প্রকাশিত তার মধ্যে বীভৎস বিকৃতি আছে। তাদের অবশ্য ধর্মীয় মতবাদানুসারে পশুর মাথা সংযোজন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানবিক ভাস্কর্যের চেয়ে পশুর ভাস্কর্য অপেক্ষাকৃত সার্থকতর হয়েছে। আকৃতিগুলি অতিশয় মহৎ ভঙ্গীর, এর মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর শিল্পগত নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় যা গ্রীকধারার অনুগামী। মানবিক মূর্তিগুলি অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত, তথাপি এমন অনেক ভাস্কর্য দেখা যায় যা এই শিল্পের পক্ষে চরম সার্থকতা লাভ করেছে বলা যায়।

বেনফি ইতিমধ্যেই মহামালয়পুর অর্থাৎ মহাবলিপুরম সম্পর্কে বলতে পেরেছেন। এইখানে বিষ্ণু বামন অবতার বা বামন দেহধারী দৈবমূর্তিতে মহাবলি নামক দৈত্যকে বধ করেছিলেন। তিনি এলোরা বিষয়েও আলোচনা করেছেন, তিনি এল্লোরা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে বৌদ্ধধর্ম 'দিব্য ভাবনায় পরিচালিত হয়ে তার প্রধানের পরিকল্পনা করেছেন—অন্যথায় মানব রূপে একে কল্পনা করা হয়।'—এই ব্যাপারটি বিশেষভাবে ভারতীয় চিত্রকলার পক্ষে প্রাণশক্তি সঞ্চারক হয়েছে, অপরদিকে মানবিক শিল্পগত ভাবধারার ক্ষেত্রে 'ব্রাহ্মণ্য রীতি'র অভাব ছিল।

যে বছরে বেনফির ভারতবর্ষ সংক্রান্ত রচনা Allgemeine Encyclopädie-তে প্রকাশিত হয় সেই বছর ওথমার ফ্রাংকের মৃত্যু হয় (১৭৭০-১৮৪০)। ওথমার ফ্রাংক একজন ইন্দো-পারসিক পণ্ডিত, গোড়ার দিকে তিনি শিল্প-ব্যাখ্যায় ব্রতী ছিলেন। ইংলণ্ডে প্রাপ্ত সচিত্র তথ্য সহযোগে তিনি ভারতীয় স্মৃতি সৌধগুলির সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এই পদ্ধতিতে তিনি এল্লোরায় একটি মস্তক মূর্তি আবিষ্কার করেন, এই মূর্তিটির সঠিক পরিচয় তিনি অবগত হন। এই গুহা গাত্রস্থিত মূর্তিগুলিকে তিনি ইল্লোরা বা শিবের মস্তক এই অনুমান করেছেন। তখনও পর্যন্ত এই মস্তকটি বুদ্ধমূর্তি হিসাবে পরিচিত ছিল, সেই ধারণাই ছিল প্রবল। ১৮৩৫ খ্রীঃ ৩ই এপ্রিল তারিখে ম্যুনিখের রয়্যাল একাদেমি অব সায়ান্সের ফাইলোলজী ফিলসফি বা শব্দতাত্ত্বিক দর্শন বিভাগে প্রদত্ত এক ভাষণে (পরে এই ভাষণটি একাদেমির প্রবন্ধ-সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে সংকলিত) ফ্রাংক এই মূর্তিটি

প্রসঙ্গে আলোচনা করেন, সেই সূত্রে তিনি দেবতার দার্শনিক ব্যাখ্যা করেন। সেইকালে য়ুরোপে এই ধারণার উদ্ভব সবে মাত্র সুরু হয়েছে :

এ কি সম্ভব নয় যে এই সব মূর্তিগুলি তাদের শান্ত সমাহিত ভঙ্গীর জন্য এবং পূর্বোক্ত অবস্থিতির জন্য সেই এক এবং অদ্বিতীয় দেবতা শিবের দিকেই মৌল ইঙ্গিত প্রকাশ করে না? ভারতের সর্বত্র এইসব মূর্তি ছড়ানো আছে—বিশেষতঃ প্রাচীন মন্দিরগুলিতে, আমরা জানি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইগুলি শিবমূর্তি, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য শৈববাদ থেকে সরে আসার পর এই সব মূর্তিকে জৈনধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধগণ অধিকার করেছেন। বস্তুবাদী বিবরণে এর উল্লেখ সর্বত্র পাওয়া যায়। হজসনের মতে নেপালে এবং যেমন র‍্যাফেল ও আরো অনেকের মতে যবদ্বীপে এইসব মূর্তি দেখা যায়। কিন্তু শিব কি অস্থিরতার দেবতা ন'ন? রূপান্তর, এক থেকে অন্যে সরে যাওয়া, বৈপরীত্য ও ধ্বংসের দেবতা কি তিনি ন'ন? এই সব পর্বতগাত্রে অনেকক্ষেত্রে তাঁকে ভয়ংকর ভীষণ ভৈরব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বীর ভদ্র—তুষ্ট বীর ইত্যাদি। তাঁর রূপান্তরগত প্রভৃতি জীবন্ত একমাত্র এই যুক্তি ব্যতীত এবং সেই সঙ্গে যেহেতু তিনি আপন অভ্যন্তরে বৈপরীত্যকে লয় করেছেন চিন্তায়, কর্মে এবং বাসনায়—তেমনই তিনি নিজের দেহ থেকেই এই রূপ সৃষ্টি করেন।

শিবের এই রূপান্তর এক বিশ্বজাগতিক ও ঐতিহাসিক বস্তু। এইভাবেই তাঁর উৎপত্তি। তিনি শক্তি ও রূপের অধিকারী। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দিক থেকে তিনি এই শক্তির ধারক, তাঁর মধ্যেই একযোগে আগম-নিগমের পথ। সুতরাং তাঁর অনেকগুলি নাম যা সাধারণভাবে সুপরিচিত, তার মধ্যে তাঁর শান্তরূপ এবং সংহত চিন্তা প্রকাশিত; চিত্রে সেই ভাব রূপায়িত। তাঁকে (অমর সিংহের সহিত) শম্ভু বলা হয়; অর্থাৎ শান্তিস্বরূপ, সমাহিত এবং প্রসন্ন; শঙ্কর অর্থাৎ যিনি সদয়তা ও শান্তির সঞ্চারক; পুরাণ সমর্থিত একটি সাধারণ ব্যাখ্যানুসারে তিনি শিব, অর্থাৎ সমগ্র জগৎসংসার তাঁর আশ্রয় পুষ্ট; ধূর্জটি, অর্থাৎ যিনি বিশ্ব সংসারের ভার বহন করেন; সর্বদক্ষ, অর্থাৎ স্বয়ম্ভুব; যোগেশ বা যজ্ঞেশ্বর অর্থাৎ মৈত্রীর ঈশ্বর;

মহাব্রতী, মহান ভক্ত ও মহাতাপস ; রামরাজ প্রথম খণ্ডে এইভাবে বর্ণনা আছে। শিবযোগের পৌরাণিক আখ্যান, শিবের ঐক্যবদ্ধ ধ্যান অতি প্রাচীন ; সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিশেষ ও বিস্তারিত অধ্যায় হল তন্ত্র ; এই অধ্যায়ে শিব ও তাঁর অর্ধাঙ্গিনী শিবানীর সঙ্গে সংলাপ লিপিবদ্ধ আছে, এই সংলাপে অতীন্দ্রিয় মিলন সম্পর্কিত ধ্যান-প্রকরণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনেক হিন্দুর মতে এই তন্ত্র বৈদিক সাহিত্যের পূর্বকালে রচিত—একে পঞ্চম বেদ বলা হয়। যাই হোক আমাদের বিশ্বকর্মার সঙ্গে বা শিবের সঙ্গে কি সম্পর্ক শান্তি ও ধ্যান-ধারণার ; কিংবা শিবের অপর রূপের সঙ্গে ইলোরা বা এলিফাণ্টা ইত্যাদির পর্বতগাত্রে খচিত চিত্ররূপের কি সম্পর্ক ! মহাদেবের ধারাবাহিক রূপকল্পনার মধ্যে এর স্থান কোথায় ? অপরে সাধারণতঃ এমন এক রূপ থেকে অগ্রসর হন যা মূলে একটু বিদেশী এবং পারস্পরিক বিরোধমূলক এবং তাঁরা মনে করেন এক অযৌক্তিক ভঙ্গীতে জোড়াতালি দেওয়া হয়েছে, আমাদের যুক্তি এই যে এই সব পর্বত গাত্রস্থিত মন্দিরগুলির উদ্যোক্তাদের সুস্পষ্ট স্থিতি এবং এই সব পরিবেশ অনুযায়ী ভাস্কর্য এবং অতিশয় ঘনিষ্ঠভাবে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় আমরা উপস্থিত বিচারে মনে করি যে এইসব একই মনোভঙ্গী থেকে পরিকল্পিত এবং গঠিত, একই ব্যক্তির হাতে এই খোদাই কাজ হয়ত সম্পূর্ণ হয়নি, তথাপি এর মধ্যে ভাবগত ঐক্য বর্তমান। এর থেকে সেই একই ফললাভ করা যায় যা আমরা ইতিমধ্যেই ভারতীয় পুরাণ কথা এবং দর্শনের মধ্যে বর্ণিত হতে দেখেছি।

এই বক্তৃতায় ফ্রাংক হিন্দু দেব-দেবী সমাজে শিবের স্থান নির্ণয় করেছেন ; বিশ্বকর্মা বা বিশ্বস্থপতি হিসাবে। সেইকালের পক্ষে যথেষ্ট এক বলিষ্ঠ বিবৃতিতে তিনি শিবকে বিশ্বের বৈপরীত্যের লয় সাধনের অভিব্যক্তি বলে অভিমত প্রকাশ করেন এবং তিনি উচ্চতর এক সম্প্রীতি সাধনের সংস্থা। ত্রয়ী দেহ—ত্রিমূর্তি—তাঁর কাছে এই দিব্য বিশ্বজাগতিক কর্মভারের এক প্রতীক। দক্ষিণে ত্রিমূর্তির মস্তক (লেখক মনে করেন যে পাঠকগণ ত্রিমূর্তির চিত্রের সঙ্গে পরিচিত) সঠিক শিবকে রূপায়িত করেছে, তাঁর কপালে তৃতীয় নয়ন, বাম দিকের মস্তকটি তাঁর স্ত্রী পার্বতীর, তাঁর হাতে একটি হাত আয়না এবং ভ্রু

রঞ্জিত করার উপযোগী একটি সূচিকা, নারী সুলভ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, আর তৃতীয় মুখটিতে নর-নারীর সংযুক্ত মূর্তি রূপায়িত, উভয়ের একাত্ম অস্তিত্বের পরিচায়ক।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাংক ভারতীয় দর্শন বিষয়ে একটি গ্রন্থে সর্ব জার্মান ভাষায় হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সর্বপ্রথম প্রয়াস করেন। শুধুমাত্র হিন্দুধর্ম বিষয়ক সমীক্ষা ব্যতীত ফ্রাংক পারসিক আলোক ধর্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। ইরাণের আধ্যাত্মিক রত্নভাণ্ডার তাঁকে সারাজীবন মোহিত করে রেখেছে। কিন্তু তিনি বৌদ্ধদের সমস্যা বিষয়েও গবেষণা করেছেন, তাদের তিনি 'বৌদ্ধেন' বলতেন। সেণ্ট পিটার্সবার্গের ইমপিরিয়াল একাদেমি অব সায়েন্সেস-এর জে. জে. সথ্‌মিডটের সঙ্গে তিনি বিতর্কে মেতেছিলেন, এই বিষয়ে সথ্‌মিডটের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল মঙ্গোলীয় লামাবাদ বিষয়ে। ফ্রাংক কলিকাতা, লণ্ডন ও প্যারিসে এই সব বিষয়ে মূল্যায়ন করেন। এইভাবে ইণ্ডোলজী বা ভারততত্ত্ব—মানসিকতার ক্ষেত্রে মহাণ আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র—ইশার থেকে নেভা এবং গঙ্গা, রাইন থেকে টেমস এবং সীন নদীর মধ্যে সেতু রচনা করেছেন। এর ফলে উৎসাহ এবং প্রেরণা-সঞ্চারী আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে।

ভারতীয় স্থাপত্য বিষয়ে য়ুরোপীয় বিচারে ক্রমশঃই সবিশেষ তথ্যজ্ঞান ও নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতদিনে তুলনা করাও সম্ভব হল, কারণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় দেব-দেউলগুলি বিশেষ করে পর্বতগাত্রস্থিত মন্দিরগুলি সংরক্ষণ এবং চর্চার জন্য প্রচুর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ক্রিশ্চিয়ান লাসেন (১৮০০-১৮৭৬) তাঁর Indischen Alterthumskunde (ভারতীয় প্রত্নবস্তু) নামক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের অনেক অংশ ভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। লাসেনের মধ্যে ভারতীয় শিল্পবস্তু এক সুদক্ষ এবং অনন্যসাধারণ ব্যাখ্যাকার লাভ করেছে। এই নরওয়েবাসী মানুষটি জার্মানীতে নতুন করে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তিনি বন এবং হাইডেলবার্গ একাদেমির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অন্য সব বিষয়ের মধ্যে, তিনি পারসিক শিলালিপির প্রকৃত অর্থ ভেদ করতে সমর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে বহুমুখী ঐতিহাসিক জ্ঞানসম্পন্ন এই ব্যক্তিকে প্রাচ্যদেশ এবং তার শিল্প ইতিহাস বিষয়ে একজন অধিকারী ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃত।

ভারততত্ত্ববিদদের শ্রেণীতে আরেকজন উল্লেখযোগ্য সদস্য হলেন রিচার্ড

গারবে (১৮৫৭-১৯২৭)। তিনি লিখিত পাঠ্যবস্তু থেকে সুরু করে প্রস্তর এবং বর্ণে নৃত্যের অপরূপ ভঙ্গিমায় ও সঙ্গীতের ধ্বনির মধ্যে ভারতীয় চিন্তাধারার প্রকৃতি সন্ধান করেছেন। তিনি একজন সুপণ্ডিত এবং অতি দ্রুতগতি তাঁর বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর বাইরেও খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন ভারতের সঙ্গে ক্রিশ্চান সম্পর্কের গোড়ার দিকের ইতিহাস অনুসন্ধান করে। গারবে ভারতীয় তাঁর শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়ে আলোচনা Indien Baedeker নামকে গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। সেই গ্রন্থে যে সব ঘটনাবলীর কথা মুদ্রিত হয়েছে তদ্বারা এই ধারণা মনে জাগে যে গারবে তাঁর Indian Travel Notes নামক গ্রন্থের জন্য এইসব তথ্য সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে গারবের একটি আবিষ্কার বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। জৈন মন্দির বিষয়ক সমীক্ষায় তিনি মালাবার উপকূলের স্থাপত্যের সঙ্গে নেপালের মন্দির স্থাপত্যের একটা সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছিলেন :

> দক্ষিণ ভারতীয় বা দ্রাবিড় আঙ্গিক যার মধ্যে কাষ্ঠ-নির্মিত স্থাপত্য থেকে একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে তার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। মনে হয়, আনুমানিক ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে এর উদ্ভব এবং কালক্রমে তার কিছু কিছু রূপান্তর ঘটেছে, অবশ্য সেই রূপান্তর সর্বদাই যে ভালোর দিকে তা বলা যায় না। এই আঙ্গিক অন্তর্গত গোষ্ঠীভুক্ত নির্মাণ পদ্ধতি দেবতামূর্তির দ্বারা অতিভারাক্রান্ত। সেই সঙ্গে আছে মানব ও পশুমূর্তির বিভিন্ন ধরণের বিহ্বলকর ভঙ্গীতে নির্মিত চিত্র সম্ভার। নাটমন্দির সহ দ্রাবিড় মন্দিরের গর্ভগৃহ সমান্তরাল কোন বিশিষ্ট; তার উপর একটি পিরামিড আকৃতির কয়েকটি তলা বিশিষ্ট মিনার, তার চতুর্দিকে সমর্থক বহুকোন বিশিষ্ট মন্দির চূড়া। বৃহত্তর মন্দিরগুলি এক বা একাধিক চত্বর দ্বারা বেষ্টিত, তার সামনে বিচিত্র ধরণের স্তর বিশিষ্ট সিংহদ্বার (গোপুরম্), দ্রাবিড় মন্দিরগুলির প্রাঙ্গনের এই হল বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির বৃহদায়তন এক সাধারণ ব্যাপার, শ্রীরঙ্গম মন্দির সারা ভারতের সর্ববৃহৎ মন্দির। দ্রাবিড় স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হল তাঞ্জোরের মন্দির, আনুমানিক খ্রীঃ পূর্ব ১০০০ অব্দে এই মন্দির নির্মিত হয়। এ ছাড়া মাদুরা, জিল্লামবরম, কম্বুকোনম এবং রামেশ্বর মন্দিরের

উল্লেখ প্রয়োজন। ভারতের মূলভূমি ও সিংহলের মধ্যবর্তী এক দ্বীপে এই শেষোক্ত মন্দিরটি স্থাপিত।

স্থানীয় প্রচলিত আঙ্গিকের মধ্যে যা নেপালী এবং কাশ্মীরী রীতির অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়, এই দুই ধারাই বিদেশী রীতি প্রভাবিত। নেপালী মন্দিরগুলি চীনা স্থাপত্য পদ্ধতির একটি রকমফের মাত্র। ছাদের উপরকার তরঙ্গায়িত ভঙ্গী কিঞ্চিৎ স্বল্প এই যা পার্থক্য, চীন দেশে এই ছাদের প্রান্তদেশ অবশ্য পিছন দিকে বাঁকানো। নাতিদীর্ঘ কাষ্ঠময় স্তম্ভের ওপর স্থাপিত সুবৃহৎ ছাদ নেপালের মন্দিরের পক্ষেও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ এই জাতীয় দুটি বা তিনটি ছাদ একের উপর আর একটি করে সাজানো হয়। নেপালের সংকীর্ণ উপত্যকায় শোনা যায় প্রায় ২০০০ হাজার মন্দির আছে, তাদের অধিকাংশই আবার রাজধানী কাঠমুণ্ডুতে অবস্থিত। নেপালের প্রাচীনতম স্থাপত্য হল বৌদ্ধ স্তূপ, যার উৎপত্তি হয়ত খৃষ্টজন্মের তিনশত বছর আগে ঘটেছে। উপরে বর্ণিত ইন্দো-চাইনিজ মন্দিরগুলি ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ বা তার পরে নির্মিত। আশ্চর্যের বিষয় এই ধরণের নেপালী রীতির জৈন মন্দির মালাবার উপকূলের দক্ষিণ কানারায় পাওয়া যায়। এতদ্বারা সেই একই হেঁয়ালি মনে জাগে সুদূর উত্তরাঞ্চল ইল্লোরায় দক্ষিণ ভারতীয় কৈলাস-রীতির প্রভাব কিভাবে এসেছে!

কাশ্মীরী পদ্ধতি যা শুধু কাশ্মীর উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ এবং পাঞ্জাবের 'সলট্-রেনজে' দেখা যায় তার মধ্যে গ্রীক প্রভাবের চিহ্ন দেখা যায়, বাঁশীর আকারের স্তম্ভ বা উত্তর ডোরিক আঙ্গিক স্তম্ভের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য। এই আঙ্গিকের অন্য বৈশিষ্ট্য হল দ্বিতল পিরামিড সদৃশ ছাদ এবং প্রতিটি প্রবেশদ্বারের মাথায় ত্রিস্তর খিলান। মন্দিরগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র এবং চারদিকে সুবৃহৎ বার-দুয়ার। সংরক্ষিত স্থাপত্য নিদর্শনগুলি ৭০০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের, সবচেয়ে পরিচিত হল 'মার্তণ্ড' নামক সূর্যমন্দির, ইসলামাবাদ থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে অবস্থিত। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির নির্মিত হয়।

প্রফেসর গুস্তাফ কোসিন্না কর্তৃক সম্পাদিত মাননুস লাইব্রেরী সিরিজে

জি. টি. হোয়েথ্ স্থাপত্যের ইতিহাসে ভারতের স্থান বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তার মধ্যে যে মতবাদ প্রকাশ করা হয়েছে বর্তমানকালে হয়ত তা প্রশংসা করা যাবেনা কিন্তু ভারতের প্রতি সুস্পষ্ট দৃষ্টিদানের নিদর্শন হিসাবে এইখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যা প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়:

> র‍্যাভেনার থিওডোরিক দি গ্রেট রেড-সী ব লোহিত সাগর পার হয়ে রোমান সম্রাটদের সামুদ্রিক যাত্রাপথ অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের সময় থেকে ভারতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উত্তম ছিল কারণ ভারতীয় খ্রীষ্টানগণ এবং অষ্ট্রোগোথসরা উভয়েই আর্য ছিলেন। এইসব সম্পর্ক বিষয়ে নথীপত্রের অভাব আছে যেমন আছে ডিয়েট্রিখ ফন বের্ন-এর বহুবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে। এর হেতু হল তাঁর কন্যার রোমান-চার্চে দীক্ষিত হওয়া। অর্থডকস্ ক্রিশ্চানগণ (রক্ষণশীল) কাফের সম্রাটের দেহ বিখ্যাত সমাধি মন্দির থেকে তুলে নিয়ে ফেলে দেয় এবং তাঁর সম্পর্কিত সর্বপ্রকার ঐতিহাসিক তথ্যাদি নষ্ট করে। ইতিহাসের এই ফাঁক-টুকুর প্রতিক্রিয়া শিল্প-বিষয়ক ইতিহাসেও লক্ষিত হয়। মালে বিভিন্ন শিল্প শাখার ক্রমবিকাশের ধারার সূত্র সন্ধান করিতে গিয়ে মিশরী ও সিরিয় মঠ-মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু ঐ সব দেশের মঠ-মন্দিরের আঙ্গিক ভারতবর্ষের বৌদ্ধ যুগেরও পূর্বকালের—সেখানে এ. ওয়েবারের সংস্কৃত রিপোর্ট অনুসারে ক্রিশ্চানরা প্রথম ক্রিশ্চান শতকেও বাস করতেন। ভারতীয় ক্রিশ্চানরা পারস্য ও সিরিয়ার নেষ্টোরিয়ানদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। কৃষ্ণ এবং বুদ্ধদেবের অনুগামীদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রেখে তাঁরা র‍্যাভেনায় সমধর্মীদের কাছে ভারতের সাংস্কৃতিক সংবাদ পরিবেশন করেছেন।
>
> যে সব আলংকারিক ভঙ্গী সেই কালে ভারত থেকে সোজা-সুজি গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য সিংহলের অবিচ্ছিন্ন সর্পিল হারমালা—যেন 'সান ভাইতেলে'র চূড়াদেশের জটিল বুনন কর্মের চারপাশের বেষ্টনী। অন্য সব চূড়াগুলি সরল কারু-কর্মে সজ্জিত। এদের পরিকল্পনার ঐশ্বর্য এবং সজীব রূপায়ণ বিশেষ-

ভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার যাদুঘরে এইসব দেখা যাবে। স্তম্ভশীর্ষ ও তার বেষ্টনী সহ কারুকার্যে একটি কমললতা আর তার তিনটি সর্পিল পাতা—দুটি সুদৃঢ় জল-পত্র আর দুটি কুঁড়ি। র‍্যাভেনায় ভারতীয় উদ্ভবের ভঙ্গীতে রচিত দুটি স্থাপত্য নিদর্শন আছে। তা হল থিওডোরিক মসোলিয়াম বা স্মৃতিসৌধ, সেণ্ট এ্যাপোলো-নেয়ারের পাশে গোলাকার চূড়া এবং সান ভাইতেল…

বাতায়নের আচ্ছাদন ভারতীয় ত্রিপত্রের সজ্জায় সঞ্জীবিত, লোহার গ্রীলে লতানে পামগাছের অলংকরণ। ধাতব তার ও লৌহদণ্ডের স্থাপত্য লতানে পাম জাতীয় জালির কাজের কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে। এই কারণে পেটা লোহার দণ্ডগুলির শিল্পগত বৈশিষ্ট্যকে একটা বিশেষ পদ্ধতি বলে বিবেচনা করা যায়। অপরদিকে প্রস্তর নির্মিত কাজগুলির মধ্যে বৈদেশিক শিল্পবস্তুর অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। যদিও মূল উপাদানের মধ্যেই আঙ্গিক নির্ণয় করতে হয়। এই স্থাপত্য প্রস্তরের স্বপক্ষে বলা যায় যে তার ওপর কোনোরকম অলংকরণ করা হয়নি। তবে বেতস বেত এবং লৌহদণ্ডের বুনন যেখানে কৃত্রিম পাথরের দণ্ড পুরু হয়েছে সেইখানে নতুন করে রচনা করা হয়েছে। তাদের পাশা-পাশি ঢালাই দ্বারা মূল পরিকল্পনায় এক অতিরিক্ত রেখা রচিত হয়েছে।

হোয়েখ্‌টের মতে এ এক স্বাভাবিক ব্যাপার যে ভারতীয় বাঁশের আঙ্গিক পাশ্চাত্য খণ্ডেও অনুসৃত হয়েছে।

প্রস্তর নির্মিত মন্দিরগুলির দিক থেকে একটা সোজা রাস্তা য়ুরোপে ক্যাথিড্রালগুলির দিকে চলে গেছে—তিনি এই ভাবেই কথাটি প্রয়োগ করেছেন। আবার সেই সঙ্গে তিনি আলংকারিক পুষ্প সম্ভারের পথও অনুসরণ করেছেন এবং তিনি একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে পাশ্চাত্য জগতের স্থাপত্য ভারত কর্তৃক অনুপ্রাণিত। হোয়েখট অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন যাঁরা তাঁর এই ভারত-সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন। বেশ কিছু কালের জন্য এঁরা গবেষণা-ইতিহাসে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য:

সম্প্রতি দুটি সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে, যদ্বারা উপরোক্ত বিবৃতির অসংখ্য পরিপূরক এবং সমর্থন পাওয়া যায়। ভিয়েনার

প্রফেসার যোশেফ সটরৎসিগোৌসকী লিখিত ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হল অলতাই-ইরাণ অ্যাণ্ড মাইগ্রেসন অফ পিপলস্ বা Altai-Iran und Völkerwanderung এবং বুদাপেস্তের গেৎসা স্পুকা ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জুন সংখ্যায় মন্থলি জার্নালস ফর দি সায়ান্স অব আর্ট নামক সাময়িকপত্রে লিখলেন—Buddhistische Spuren in der Völkerwanderungskunst (অর্থাৎ জন প্রব্রজন গত শিল্পে বৌদ্ধ-প্রভাব)।

র‍্যাভেনার থিওডোরিক দি গ্রেটের মসৌলিয়মের মধ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতের আদর্শের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন স্পুকা, এর মূল স্তম্ভগুলি কোন-বিশিষ্ট, তার উপরকার অংশ গোলাকার আর শীর্ষে আছে মুকুট সদৃশ আমলক, তিনি প্রাচীর গাত্রর মধ্যবর্তী বিরতিগুলির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তুলনা করুণ: আমার বাঁশ নির্মিত ভবন বিষয়ক প্রবন্ধ "Zeitschrift für Bauwesen" (গৃহ-নির্মাণ ও স্থাপত্য-বিষয়ক পত্রিকা) নামক পত্রিকায় দ্রষ্টব্য। এছাড়া লাইসিক্রেটস মনুমেণ্ট বিষয়ক উপরোক্ত বিশ্লেষণটিও তুলনা করা উচিত। সটরৎসিগোৌসকীর ধারণা যে আমেরিকায় বহু রজ্জু বিশিষ্ট বুনন কর্মের উদ্ভব ভারতবর্ষে, বেত এবং বাঁশের দেশ ভারতবর্ষ।

১৯১ পৃষ্ঠায় তিনি সর্বদেব মন্দিরকে (Pantheon) এক পথচিহ্ন বলে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি অনুমান করেন ভূমধ্য-সাগরস্থ দেশগুলির গম্বুজ এসেছে সাকাই দেশগুলি থেকে অর্থাৎ আর্মেনিয়া হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে।

দায়ারবেকিরের সিটাডেল চার্চ ও রুথেনিয়ার কাষ্ঠ নির্মিত চার্চ যা ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মন্থলি জার্নালস অব সায়ান্স অফ্ আর্ট পত্রিকায় দশম এবং একাদশ খণ্ডে পাওয়া যাবে তার সঙ্গে তুলনা করুণ গুজরাট উপদ্বীপের সোমনাথের মন্দিরের যা ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে ধ্বংস করা হয়। ২২৭ পৃষ্ঠায় সটরৎসিগোৌসকী অনুমান করেন যে চতুষ্কোণ গম্বুজের উৎপত্তি আর্য দারুময় স্থাপত্য থেকে কারণ ভারত এবং ইউক্রেনে এর চিহ্ন পাওয়া যায়; তিনি কোন বিরাট থেকে আরো দূরে অগ্রসর হয়ে অষ্ট কোন ও গোলাকার গম্বুজে গিয়ে পৌচেছেন।

বংশ নির্মিত উপভবনের যে আঙ্গিক প্রস্তর গাত্রে পুনরঙ্কিত হয়েছে প্রাচীর বিরতির মাঝে তা সর্বদেব মন্দিরের কোন-বিশিষ্ট রূপে একেবারে চরমে উঠেছে—এবং এর অর্ধ বৃত্তাকার রূপ মিনার্ভা-মেডিকার দশ অঙ্গ বিশিষ্ট মন্দিরের অনুরূপ।

আলংকারিক চিত্রণের উদ্ভব বিষয়ে আরেকজন যিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁর নাম ওটো ফিসার। তিনি আবৃত্তি বিশিষ্ট এবং প্রতীক্ বিশিষ্ট অলংকরণের দেশান্তর বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে এসব এশিয়ার আভ্যন্তরীণ অংশের নিজস্ব ধারা:

> গোলাপ পুষ্পাকৃতি, তালি বৃক্ষ এবং কমললতা ইত্যাদি চিত্ররূপ প্রধান অলংকরণের মধ্যে সংরক্ষিত। সর্পিল আকৃতি এবং স্বস্তিকা সব কিছুই তেমন ভারতীয় মনে হয় না, প্রাচীন এশিয়ার অভ্যন্তরস্থ সর্বসাধারণের সম্পত্তি বলেই মনে হয়। এইভাবে কয়েকটি পশুর একটি মস্তক ভাগাভাগি করে অধিকার করার চিত্ররূপ, ডানাওয়ালা সিংহ, অর্ধ মানব অর্ধ দানব আকারের প্রাণী বা বৃষ সমগ্র আভ্যন্তরীণ এশিয়ার সাধারণ উত্তরাধিকার। বিশেষ ভারতীয় রূপ-স্থাপত্যে যা সুস্পষ্ট তা অলঙ্কারের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত অল্প উন্নত মন হয়। তবে এই সবই বিশেষ ভাবে সুস্পষ্ট হ তখন যদি আমরা প্রস্তর নির্মিত সৌধের ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি সীমায়িত করি।

ভারত ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধনের প্রশ্নটি প্রাচ্যবিদ ভিলিবালড কারফেলকেও উৎসাহিত করেছে। তিনি Die dreiköpfige Gottheit (তন মস্তক বিশিষ্ট দেবতা) নামক গ্রন্থে এই বিষয় বিস্তারিত লিখেছেন। কারফেল এই ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সমান্তরালের সন্ধান পেয়েছেন এবং শ্রমসাধ্য ভালোবাসা এবং যত্নের সঙ্গে তিনি তার সন্ধান করেছেন। তিনি চিহ্ন, প্রতীক ও লক্ষণ সন্ধান করেছেন শুধু এই ত্রিমূর্তির প্রকৃত অর্থ উদ্ধারের জন্য। লিও ফরবেনিউস-এর পূর্বে প্রাচীন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ত্রিমূর্তি এবং চতুরীশ্বরতা কি ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা পরীক্ষা করেছেন। চার সংখ্যাটি তিনি সৌর সাংস্কৃতিক রীতির প্রতীক হিসাবে ধরেছেন, তিন সংখ্যা তাঁর কাছে চান্দ্র দৃষ্টিকোণের পরিচায়ক, গতিময়তা ও সৃষ্টির প্রতীক। এই সমীক্ষাকে আরো অগ্রসর করে দিয়েছেন কারফেল, তাঁর গ্রন্থাবলী ভূমধ্য

সাগরীয় ও ইন্দো-এশিয় সাংস্কৃতিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এক উত্তেজনাময় পরিক্রমা। কারফেল ভূমধ্যসাগর ও ভারতের মধ্যে এক সম্পর্ক গত অলৌকিকত্ব আবিষ্কার করেছে। মাত্র দুবার সেই ব্যাকরণগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা বিষয়ে শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা গিয়েছিল। মাত্র দুবার সেই এক মৌন পদ্ধতিতে নাট্য শিল্প গড়ে উঠেছে ; দুবার স্থায় পদ্ধতির উন্নয়ন করা হয়েছে। কারফেলের পরিশিষ্টাংশ ইতিহাসের এক নতুন আলেখ্য :

> নতুন জ্ঞানের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হবে—এই মানসিক অলৌকিকত্বের অনুলিপি কি শেষ পর্যন্ত একই মূল থেকে উদ্ভূত নয় ; অর্থাৎ তারা কি তাদের প্রাগ্-ঐতিহাসিক সূচনায় প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় সাংস্কৃতিক জগৎকে তাদের একই আঁতুড়ঘর হিসাবে গ্রহণ করবে না। অন্যকথায়, এই সব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ক্রমবিকাশ এবং মানসিক সৃজনকর্ম একই কাণ্ডেরই বিভিন্ন শাখা, সকলেরই উদ্ভব সেই ভূমধ্যসাগরীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী থেকে। সেই সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিরই এক প্রতিফলন, যেমন বিশ্বজনীনতা, ভূতলস্থ রেখাপাত দ্বারা ভবিষ্যৎ কথন, অথবা সেই রাজ্যের দর্শনশাস্ত্রের মত সব কিছু চীনা-ইষ্ট-এসিয়ান অভিব্যক্তির সুস্পষ্ট ফল—"মহাকাশ দিগন্ত বা সমতল দ্বারা বেষ্টিত" এই জ্ঞান থেকে উদ্ভূত। এতদ্বারা "ছন্দ, সৌম্যভাব এবং প্রচলিত সৃজনশীলতার" অভিব্যক্তি পরিস্ফুট। এইসব বিচারের ফলে সিদ্ধান্ত তেমন বেশী বলিষ্ঠ হবে না যে শুধু উপরোক্ত বিজ্ঞানগুলির বিবর্তন নয়, অধিকন্তু অন্যবিধ আধ্যাত্মিক অথবা ধর্মীয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে বিবর্তন ঘটেছে, অথবা য়ুরোপে এবং ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে বিবর্তন এসেছে তার মধ্যে সেই পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, মানব সমাজের উদ্ভবের অস্পষ্ট প্রদোষান্ধকারে ভূমধ্যসাগরীয় সাংস্কৃতিক জগতের গভীরে যার ভিত্তি। প্রকারান্তরে এর প্রকৃত অর্থ হবে এই যে এই দুই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের মানসিক সাফল্য তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও একটা সুগভীর এবং বিশ্বজনীন ব্যাখ্যা লাভ করবে বোঝাপড়া এবং তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে।

একজন বিজ্ঞানী যিনি প্রতীকের ব্যাখ্যার অধিকতর ব্যাখ্যায় অগ্রসর

হয়েছেন এবং শুধু মাত্র ভারতীয় চিহ্ন ও প্রতীকের বর্ণনামূলক স্থিরিকরণে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি তাঁর নাম হাইনরিখ ৎসাইমার। তিনি এই শিল্প অনুভবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

এরপর খাঁটি প্রাচ্য শিল্প পাঠের পথ থেকে সরে না এসে শিল্প ইতিহাস থেকে সরে এসে অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ ব্যাখ্যা বা অন্ততঃ বর্ণনা করেছেন ভারতের শিল্প-সম্পদের যা সকলের পক্ষে দ্রষ্টব্য।

ভারতীয় গবেষণার প্রকৃত স্বর্ণ যুগ প্রথম মহাযুদ্ধের কালের পর সুরু হয়েছে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বিলহেলম কোহন ভারতীয় খোদাই কর্মের বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। চার বছর পরে বৌদ্ধ শিল্প নিদর্শন প্রসঙ্গে তিনি একটি পুস্তিকা রচনা করেন। প্রায় সেই সময় জার্মান বিজ্ঞানী স্টেলা ক্রামরিশ এই অঞ্চলের শিল্প বিষয়ে প্রথম সমীক্ষা রচনা করেন। কাশ্মীর ও কন্যাকুমারী মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শিল্প সম্পদের কথা; অচিরাৎ তিনি আরও একটি বিশদ গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন, এর নাম Grundzüge der indischen Kunst (ভারতীয় শিল্পের মূল কথা)। পরিণামে তাঁর রচনাবলী ভারতীয় শিল্পের সর্ব বিভাগ আলোচিত হয়েছে। এরকথা সত্য যে অঙ্কন শিল্পের মধ্যে তিনি একটা বক্র গতি লক্ষ্য করেছেন এবং দেখেছেন গোড়ার যুগের সাংস্কৃতিক ধারাকে সরলীকরণের চেষ্টা—"একটা অদ্ভুত বিস্তার-প্রবণ ঐকতান দেখা যায় যার জন্য এ দেশের জাতিগত সংমিশ্রণ অনেকটা দায়ী।" এইখানে, রাজস্থানী পদ্ধতির শিল্পরীতির উল্লেখ করা যায়। লেখিকা সেই বিষয়ে একটা বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর অ-য়ুরোপীয় শিল্প-কলা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে :

> ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে আমরা রাজপুত শিল্প-কলা বিষয়ে আলোচনা করি; এই আখ্যা দ্বারা এই কথা দ্বারা প্রায় অক্টাভো-সাইজ কাগজে আঁকা গ্রন্থ অলংকরণ এবং আবাঁধা ছবির পৃষ্ঠা বোঝায়। এই সব ছবি অনেক বেশী সংখ্যায় রাজপুতানা ও বুন্দেলখণ্ডে উৎপন্ন হয়েছিল আর আংশিকভাবে হয়েছিল পাঞ্জাবের হিমালয়ের উচ্চ ভূমিতে। এর ওপর অম্বর, উদয়পুর, দাতিয়া, ওরচা এবং ছত্তরপুরের প্রাসাদগুলিতে ও পরে জয়পুর, যোধপুর এবং বিকানীরে, এ ছাড়া আছে কাংড়ার অষ্টাদশ শতাব্দীর চিত্রাবলী।

ষোড়শ শতাব্দীর সমতলভূমির চিত্রাবলী এবং এই শতকের শেষ

দিকের বিভিন্ন রাগ ও রাগিনীদের অসংখ্য চিত্রাবলীর মধ্যে শিল্প-নিদর্শন প্রকাশিত। এই সব ছবি হ'ল বহিঃরেখা-ও উজ্জ্বল বর্ণ বহুল, স্থান সংক্রান্ত নিশ্চিত পরিমিত বোধ এবং সাধারণ দৃঢ়তা মুখ্য ঐতিহ্যের জনপ্রিয় শিল্পরূপ। গুজরাটের একটি পত্রের গায়ে অঙ্কিত কৃষ্ণলীলার একটি পর্ব আঁকা হয়েছে, এই ছবি হয়ত পরবর্তীকালে অন্ততঃ এর উর্ধায়ত দিগন্ত এবং বৃক্ষগুলির বলিষ্ঠ ছায়ারূপ থেকে এই রকম অনুমান করা যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধ শতকে মানবিক মূর্তির অধিকতর বর্তুলাকার রেখা এবং দৃশ্য পটের বিষয় বস্তু দেখা যায় আর ছায়া এবং প্রশস্ত পরিসর এই সব চিত্রের বৈশিষ্ট্য। রঙগুলি মিশ্রিত এবং তার ঔজ্জ্বল্য কিছু হ্রাস পেয়েছে; সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে উন্নততর ঢালাই, ছায়াপাত, রেখাগত ও বৈমানিক পরিপ্রেক্ষিত ধীরে ধীরে এসেছে। সাধারণতঃ এর জন্য মোগল প্রভাবই দায়ী মনে করা হয়। কিন্তু মোগলরীতি ইতিমধ্যেই (স্থাপত্য বিষয়ে) নির্দিষ্ট হয়ে আছে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বোক্ত কাজগুলির মধ্যে। মিনিয়েচার বা ক্ষুদ্রাকৃতি ছবির মধ্যে একটা সস্তা "বাস্তবতা"র আঙ্গিক গ্রহণ করা হয়েছে, এটা য়ুরোপের আমদানী। এই ধারা রাজপুত ও মোগল উভয় রীতির চিত্রকলার মধ্যে প্রবেশ করে সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং অনেক ক্ষেত্রে শুধু মাত্র বিষয় বস্তু অনুসারে তার পার্থক্য বোঝা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আলংকারিক সারল্য আমদানি হল এবং অবয়বের একটা সুস্পষ্ট সৌন্দর্য লক্ষ্য করা গেল যার মধ্যে পারসিক রীতিও অনুসৃত হয়েছে...অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীতে (জয়পুর) বিশেষভাবে আলংকারিক দেহ-ভঙ্গিমার জন্য এবং সেই সঙ্গে সুবর্ণ-নীল-ধূসর রঙের সঙ্গে লাল এবং নীলের সংমিশ্রণ লক্ষ্যণীয়। এইভাবে রাজস্থানের চিত্রকলা সুদৃঢ় অলংকরণ এবং বলিষ্ঠ ও সুরুচিসম্পন্ন কারুকলায় সমৃদ্ধ।

পরবর্তীকালে হেরমান গোয়েৎস অসংখ্য রচনার মধ্যে ভারতীয় শিল্পের আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় পূর্ব-প্রতিবদ্ধতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় শিল্পকলা ও সংস্কৃতি বিষয়ে অধিকারী লেখকবৃন্দের মধ্যে গোয়েৎস পুরোভাগে স্থান পেয়েছেন। ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্য সম্পর্কে তিনি একটি

সাধারণ বোঝাপড়ার ভাব সৃষ্টি করেছেন। সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলির অচঞ্চল ক্রমবিকাশ ও উন্নয়নের ব্যাপারটি তিনি যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন। গোড়ার দিকে, তাঁর একটি গ্রন্থে বিশ্বজগতের সঙ্গে ভারতের সংযোগ বিষয়ে এবং একযোগে একটা নির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের দিকে তার অগ্রগতি বিষয়েও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন:

> এমন কোন অসংশয়িত সাংস্কৃতিক উন্নয়ন মিশর এবং ব্যাবিলন থেকে গ্রীস হয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য মানুষের কাছে এসে পৌছায় নি। পরপর, পাশাপাশি, বসবাসকারি জগতের সংস্কৃতিগুলি উদ্গত হয়েছে, গড়ে উঠেছে, পরিণতি লাভ করেছে আবার তার বয়স হয়েছে এবং মৃত্যু ঘটেছে। এরা সবাই নিরন্তর পারস্পরিক ক্রিয়ার বিষয়বস্তু তথাপি প্রত্যেকে তার নিজের এবং বিদেশী বস্তু থেকে অনুপান সংগ্রহ করেন এবং তাকে একটা একান্তভাবে নিজস্ব রীতিতে গড়ে তোলেন।

গোয়েৎস তার ভারতশিল্প বিষয়ক শেষতম গ্রন্থে এই বিশ্বজনীন সুযোগের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সহ-গ্রন্থকার ঐ. বুনেলের সঙ্গে তিনি এক বহু আলোচিত বিবরণ লিখেছেন দরবারী মিনিয়েচার চিত্রকলার শৈলী বিষয়ে ভারতীয় গ্রন্থ অলংকরণ প্রেমিকদের জন্য। সে ত্রিশ বছর পূর্বেকার কথা, তার পর থেকে এফ. গগেনহিম; কে দোয়েরিং এবং ই. ভায়েৎস প্রভৃতির গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে। আলফ্রেড সালমণি এবং ই. বাখোফার বিশেষভাবে ভারতীয় ভাস্কর্যের বিচারে ব্রতী ছিলেন।

সাধারণ ভাবে ইন্দো-এশিয়া শিল্পরীতিতে গ্রীক প্রভাবের প্রসঙ্গ নিয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এ. ইপ্পেল, এল. এডাম ও বি. কেমপারস্। বৌদ্ধ শিল্প কখনও কখনও হেলেনীয় শিল্পরীতির কাছাকাছি বিকশিত হয়ে উঠেছে, যাঁরা এই বিষয়বস্তু আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম এল. সখেরমান, ই. বেনডা এবং ডি. সেকেল।

বর্তমান কালে ক্লাউস ফিসার এবং হাইমো রাউ প্রভৃতিরা ভারতীয় শিল্প বিষয়ে যারা প্রখ্যাত প্রবক্তা তাঁদের অন্যতম। গোয়েৎস, ফিসার, রাউ এবং অন্যান্য লেখকদের এই কৃতিত্ব যে তাঁরা এই শিল্পের বৈদেশিক দিকটির সঙ্গে সমন্বয় সাধক দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভারতীয় শিল্পের তরুণতর

বিশ্লেষকদের মধ্যে ফিসার এই শিল্পরীতির ইতিহাস সন্ধান করেছেন আর অন্য দিকে রাউ বিশেষ বিশেষ কাজগুলির বৈশিষ্ট তুলে ধরেছেন। এই পদ্ধতিতে তিনি অন্তর্নিহিত এইসব বহুমূল্য ভাস্কর্যের যা মুখ্য আঙ্গিক তা আবিষ্কার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন এই ভাস্কর্যের মধ্যে একটা আকর্ষণীয় বাস্তবতার মধ্যে প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনা সঞ্জীবিত পুনর্জন্মের আভাষ লক্ষ্য করেছেন। হিন্দুধর্মের ইন্দ্রিয়জ প্রাচুর্য্যের ওপর তিনি বৌদ্ধদের প্রতিমা-বিরোধী জগতের কথা বর্ণনা করেছেন—যা তার ধ্যানব্রতী সাধকের পালনীয় অনুশাসনকে স্থাপত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে। এইসব আধুনিক শিল্প-ঐতিহাসিকদের ভারতীয় শিল্পকলা-বিষয়ক চেতনা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা আছে। হিন্দু দেবতার এক প্রতিমূর্তি চিত্রের পাশে বৌদ্ধস্তূপের রুক্ষ জ্যামিতিক আঙ্গিক বা প্রস্তর খোদিত স্মৃতিসৌধ প্রকৃতির পিছনে এঁরা তাদের লক্ষ্য বা সাধনার অঙ্গ মোক্ষ বা নির্বান লাভ করেন।

পরিশেষে কালুস ফিসার যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন জৈন শিল্পতার সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের জন্য, তাঁর সূক্ষ্ম নীতিবোধ এবং বলিষ্ঠ নান্দনিক অনুভূতির জন্য জীবনের এক বিশেষ ধারা রচনা করতে সমর্থ হয়েছে অথচ ভারতায় ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের গণ্ডীর ভিতরই থেকে গেছে।

আরও অনেকে ভারতের ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়েছেন এবং ভারতীয় রহস্য সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন উইলি হাস, তিনি ভারতায় শিল্প বিষয়ে তার মনোভংগী Merkur নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন :

> ভারতীয় শিল্প তার শির্ষবিন্দুতে পৌছেচে ধাবমান কালের মাধ্যমে অনন্তকে প্রকাশ প্রচেষ্টায় নয়, স্থায়িত্বকে প্রকাশ পরিবর্তনের মাধ্যমে, ঈশ্বরকে প্রকৃতির মাধ্যমে নয়; পরিবর্তনকে সহনশীলতার দ্বারা, আর পরিবর্তনীয়কে অনন্ততার মাধ্যমে। এলিফান্টার ত্রিমূর্তি ভারতীয় শিল্পের অতি সুমহান নিদর্শন—এই মূর্তি প্রকৃতি আকৃতির তিনগুণ বড় এবং তিনবার এই মূর্তিতে একই সঙ্গে দেবতার তিনটি অভিব্যক্তি প্রকাশিত। এই মূর্তির একটিতে শিবকে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং অপর দুটিতে শিব-বিষ্ণু বা পালক এবং শিব-রুদ্র বা লয় কর্তা হিসাবে রূপায়িত। এই অতিকায় ভাস্কর্যের সম্পূর্ণ প্রতীকি প্রতিক্রিয়া এর তিনবার পুনরাবৃত্তি থেকেই উদ্ভূত। যদি

কোথাও হয়ে থাকে তাহলে এখানেই প্রকৃতির পরিবর্তন সহনীয়তার মাধ্যমে প্রকাশিত, রূপান্তরকে দেখান হয়েছে অপরিবর্তনীয় রূপে—পাশ্চাত্য শিল্পের সম্পূর্ণ বিপরীত রীতি। আরেকটি শিব, নৃত্যশীল শিবকে ভারতীয় ভাস্কর্যে প্রায়ই রূপায়িত করা হয়েছে সর্বদাই অতি ভদ্র, শান্ত এবং ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক, মাঝে মাঝে অতিশয় সার্থক হয়েছে এই মূর্তি, এর মধ্যে রূপান্তর, মৃত্যু এবং প্রকৃতির পুনর্জাগরণ, এই সহনশীল দেবতার মাধ্যমে প্রকাশিত। এই সব হল অতি চমৎকার শিল্পকর্ম—তবে এর মধ্যে কোনো প্রকার প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রকৃতি যা ঈশ্বরকে অসীম অনন্ত, বৈচিত্রে অনন্ত; এই কারণে পাশ্চাত্য শিল্প ও কবিতায় উন্নয়নের সুযোগ আছে। ঈশ্বর অদ্বিতীয়,—এই শিল্পের বৈপরিত্য ধর্মীতায় ঈশ্বর যখন প্রকৃতির পরিবর্তন মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন—মতবাদশীল ভারতীয় শিল্পের রীতি এমনই কঠোর যে এইসব শিল্প বস্তুর কোনোটিতে কোনও শিল্পীর নামাংকিত করা হয়নি। শিল্পীরা সবাই অজ্ঞাত।

জার্মানভাষী লেখকবৃন্দ ভারতীয় কারুশিল্প বিষয়ে কয়েকটি হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ রচনা করেছেন। অনেকে আবার চরম মতভঙ্গী প্রকাশ করেছেন—এদের মধ্যে দুটি নাম উল্লেখ করা গেল—এক কমিউনিস্ট কল্পলোক বিহারী রুবেন আর অপরজন জেসুইট পণ্ডিত ফ্রানৎস-জেভার সথউবহামার। জার্মানভাষী ক্রিশ্চানগণ ভারতে পরিকল্পিত ক্রিশ্চানশিল্প বিষয়ে একটা আন্দোলন সুরু করেন। এঁদের মধ্যে একজন যিনি চিত্রকলার ক্ষেত্রে কিছু আলোকপাত করেছেন তিনি হলেন সেণ্ট গ্যালনের তরুণ এবং উৎসাহী রাইমণ্ড কীল, এর সংক্ষিপ্ত এবং ঘটনাবহুল জীবন ১৯১৭-থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত সীমিত। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে আসেন, তিনি পুল্লাখে দর্শনবিষয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং সেখান থেকেই এসেছিলেন। তাঁর আগমনের অল্পকালের মধ্যেই তিনি পুণার দ্য নোবিলি কলেজে প্রথমত খাঁটি ক্রিশ্চান চিত্রকলার প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ভারতীয় ক্রিশ্চানদের মধ্যে তিনি শিল্প বিশ্বাস সৃষ্টি করেন। ভারতীয় শিল্পীদের তাঁরা যতকাল ক্রিশ্চান ঐতিহ্য এবং ভারতীয় উত্তরাধিকারের মধ্যে একটা ভারসাম্য রচনা করতে পেরেছেন—তিনি ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করেছেন তাঁদের নিজেদের সারবস্তু এবং নিজস্ব অতীত থেকে।

ভারততত্ত্ব বিষয়ক মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে (৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬) ভারতীয় শিল্পের জার্মান ছাত্রগণ—যথা পি. জে. নিউনার ও লোর টেরমেহর প্রভৃতি শিল্প ঐতিহাসিকরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সম্পর্কের যে ব্যাখ্যা করেন তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীমতী লোর টেরমেহর বলেছেন যে রেইমস ক্যাথিড্রালের অতিথিগোষ্ঠীর ভার্জিন মেরীর মূর্তি বিশ্বজাগতিক নর্তক শিবমূর্তির পরস্পর বিরোধী রূপ অগ্নিশিখার তোরণের মধ্যে নৃত্যরত এই দক্ষিণ-ভারতীয় ব্রোঞ্জ মূর্তিতে নটরাজের মূর্তি রূপায়িত। ভার্জিন মেরীর প্রতিমূর্তি খোদিত প্রস্তর প্রাণবন্ত। ভারতীয় ব্রোঞ্জেও বহিরঙ্গ প্রকাশ পরিস্ফুট, তার মধ্যে আছে প্রতীকি ধারা কঠোর নৃত্যবিভঙ্গে রূপায়িত, এর মধ্যে চিরন্তন পরিবর্তন এবং চিরন্তন পৌন-পোনিকত্বের ইঙ্গিত আছে—বহু প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট পরিকল্পনার আভ্যন্তরীন চক্র থেকে উদ্ভূত শক্তির ইঙ্গিত বর্তমান।

জার্মানীতে এবং জার্মানভাষী জগতের অসংখ্য স্থান আছে যেখানে ভারতীয় শিল্প আশ্রয় লাভ করেছে। বার্লিনের চৌদ্দটি ম্যুজিয়মের মধ্যে যেটি নবীনতম, যার নামের সঙ্গে এখনও প্রাশিয়া সংযুক্ত সেই "Stiftung Preussischer Kulturbesitz"—যাদুঘরটি ভারতীয় শিল্প বিভাগ। এই যাদুঘরটি ১৯৬৩-র নববর্ষের দিন বার্লিনে উদ্বোধিত হয়। এই যাদুঘরটি জার্মান-ভাষী সাংস্কৃতিক জগতে ইন্দো-এশিয়ান শিল্পকর্মের বৃহত্তম সংগ্রহ-শালায় পরিণত হয়েছে।

এই বিভাগে যে সব শিল্পনিদর্শন প্রদর্শিত হয় তার মধ্যে এশিয়া পর্যটকগণ কর্তৃক উপহার দত্ত (বিশেষতঃ ষোড়শ শতকের) দ্রব্যসম্ভার অন্তর্গত। এইগুলি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে "Königlich-Preussischen Kunstkammer" (রয়্যাল প্রাশিয়ান চেম্বার অব আর্ট)-কর্তৃক "নৃতত্ত্ব বিষয়ক সংগ্রহাবলীতে" স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে প্রদর্শিত সব কটি শিল্প নিদর্শনেই যে প্রকৃত শিল্পের ছাপ আছে তা নয়, এইসব শিল্পবস্তুর মধ্যে অপরিচিত প্রাচ্যদেশীয় বাতাবরণের আমেজ প্রতিফলিত করার পক্ষে এইগুলি সহায়ক।

কিন্তু এই শতকের অভ্যুদয় থেকে জার্মান গবেষণার ক্ষেত্রে ইন্দো-এশিয় অতীতের প্রত্যক্ষ সমীক্ষার কালে সুরু হয়েছে—বিশেষতঃ অতীত বৌদ্ধযুগের শিল্প বিষয়ে। ১৯০২ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝে প্রাক্তন নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহে যা ইতিমধ্যে বার্লিন ম্যুজিয়ম অব এথনোলজী নামে পুনর্গঠিত হয়, তাঁরা পূর্ব-

তুর্কেস্থানে চারটি গবেষক অভিযাত্রী বাহিনী পাঠান। এই অঞ্চল হল আবিষ্কারক ও শিল্পপ্রেমিকদের মিলনক্ষেত্র। বৌদ্ধ মূর্তি এবং গ্রন্থ, মানি-খেয়ান সাহিত্যের অংশবিশেষ অথবা নেসটোরিয়ান রচনাবলী দর্শকদের শিল্পজগৎ শব্দতত্ত্ব ও ধর্মের ক্ষেত্রে আবিষ্কারের অভিযাত্রায় আমন্ত্রণ জানায়। এর মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের, জরথুষ্ট্রীয় ক্রাইস্ট ও বৌদ্ধ এই তিন বিভিন্ন ধারার সংযোগ ঘটেছে। আলবার্ট গ্রুণভেডেল, আলবার্ট ফন লে কোক এবং আরনষ্ট ভাল্‌ড্‌ সমিউট এই মাগনা-ইণ্ডিয়া এরিয়ার আধ্যাত্মিক পথনির্দেশক, তাঁদের অবধায়কত্বেই আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে আত্মসমর্পণ করতে পারি।

তুরফান একদা প্রাচীন ভারতমাতার এক শাখা ছিল। বর্তমানের বার্লিন-তুরফান সংগ্রহের তালপত্রের বা চামড়ার ওপরকার পাণ্ডুলিপি, চিত্রকলা, খোদাই কর্ম, ভাস্কর্য, মাটির কাজ, কাঠ-খোদাই, মন্দির-চিত্র, সিল্ক-চিত্রকলা, এবং সূচের কাজ প্রভৃতির সমঝদার বৃন্দকে একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে বিগতযুদ্ধ তুরফান ও নর্দান সিল্ক রোডের অন্যান্য শিল্প-সম্পদ বিপর্যস্ত করেছে, প্রাচীন গান্ধার অঞ্চল থেকে কুচা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের সংগ্রহ এই শিল্প সম্ভার। তথাপি আজো, উজ্জ্বল এবং সুন্দররূপে আলোকিত কক্ষগুলিতে গান্ধারের বোধিসত্ত্বের সুবৃহৎ মূর্তি সাজানো আছে, এশিয়ার এই অংশ গান্ধারে ভারতীয় ভাবধারাকে হেলেনীয় আঙ্গিকে ঢালা হয়েছিল। এইখানে গৌতমের বাণী এ্যাপোলের মূর্তিতে রূপায়িত হওয়ার মধ্যে য়ুরোপে ভারতের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

আরেকটি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক যেখানে ভারতীয় শিল্পের এক সুযোগ্য আশ্রয় মিলেছে। জুরিখে যখন ভারত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদির স্রোত পৃথিবীর সর্বত্র প্রবাহিত হল—ভারতীয় উত্তরাধিকার রীটবার্গ ম্যুজিয়মে এক মহাণ নির্গমণ পথ পাওয়া যায়। এইখানে অতিথিরা অসংখ্য ভাস্কর্য, এবং অন্যান্য ভারতীয় শিল্পনিদর্শন দেখতে পান, এইগুলি ভারতীয় শিল্পের বিভিন্ন পর্বের স্মরণীয় নিদর্শন। বার্লিন ও জুরিখের এই দুই সৌধ যাদুঘর পরিচালনায় উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত—অন্য যে সব প্রতিষ্ঠানে অনুরূপ ভারতীয় প্রস্তর বা ব্রোঞ্জ, কাগজ বা তালপত্রের শিল্পবস্তু সংরক্ষিত তার কাছেও এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

এই পরিচ্ছদের শীর্ষে যে নীতিবাক্য উধৃত আছে ভারতের বাইরে অনুষ্ঠিত এখন পর্যন্ত ভারতীয় শিল্প সম্ভারের বৃহত্তম প্রদর্শনী। (১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯)-এর নাম এসেন প্রদর্শনী Fünftausend Jahre Kunst aus

Indien (পাঁচহাজার বছরের ভারতীয় শিল্প সম্পদ)। এই অপরূপ প্রদর্শনী মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ভিলা হুগেলের ক্রুপ হাউসে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও ওয়েস্ট জার্মানির প্রেসিডেণ্ট থিওডোর হেউস এই ঘটনার সংযুক্ত পৃষ্ঠপোষক। জার্মান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পৃষ্ঠপোষকত্বে শিল্পকলার এই অন্যান্য সাধারণ প্রয়াস সফল হয়। সুবৃহৎ ক্যাটালগে আরো অনেকের সঙ্গে লিখেছেন এরিখ বোয়েরিংগার। তিনি ছিলেন বার্লিনের তদানীন্তন জার্মান আর্কিওলজিক্যাল ইনস্টিট্যুটের প্রেসিডেণ্ট, তিনি এবং হেরমান গোয়েৎস ভারতবর্ষে আলেকজাণ্ডারের পথ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন। সমগ্র ব্যাপারটি একটি ছোটখাটো শিল্পকর্ম। সূচী এবং সমাপ্তি, তথ্য সন্নিবেশ এবং অলংকরণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলে সম্পাদিত এবং তার শিল্পগত রস বোধ এক সুগভীর বিষয় বস্তুর উপযুক্ত।

এখন বাকী যে সব পাশ্চাত্য দেশীয় শিল্পী ভারতীয় প্রভাবে পড়েছিলেন তাঁদের কথা বলা। বালথাসার স্প্রেঙ্গারের ভ্রমণ কথায় সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষদর্শীর আঁকা ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের ছবিগুলি সম্ভবতঃ অগসবার্গের হানস বার্গকমেয়ারের কারখানা থেকে পাওয়া যায়। এর পরবর্তী অধিকাংশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত, যার অধিকাংশ আর্মষ্টারডাম এবং ন্যুরণবার্গে প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে এই ধরনের চিত্র অলংকরণ ছিল। এতদ্বারা বোঝা যায় যে কি ভাবে হঠাৎ ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

অলঙ্কারবহুল চিত্ররূপ এবং তাদের দেশান্তর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ভারত প্রাচ্য দেশীয় শিল্পীরা পাশ্চাত্য দেশীয় শিল্পীবৃন্দকে অন্যভাবে প্রভাবিত করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে ও. বেনেশ্‌খ দাবী করেন যে রেমব্রাণ্টের 'আব্রাহাম ও পরীরা' নামক ছবিতে ভারতীয় মিনিয়েচার ছবির আঙ্গিকের আশ্চর্য সাদৃশ্য মেলে।

দক্ষিণ-জার্মানীর অধিবাসী যোহান জোফ্রানী (১৭৩৩-১৮১০) যে সব জার্মান শিল্পী গোড়ার দিকে ভারত ভ্রমণে গিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম। প্রায় সাত বছর কাল ভারতই ছিল তাঁর দেশ। এই ভারতবর্ষে তিনি অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ছবি এঁকেছিলেন। Indischen Biographien (ভারতীয় জীবনীমালা) গ্রন্থের শেষতম নাম জোফ্রানীর—অনেক খ্যাতনাম গভর্ণর জেনারেল, মহারাজা, নবাব, প্রাচ্যবেত্তা এবং রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তাঁর নামটি কিঞ্চিৎ বিসদৃশ :

১৭৮৩-৯০ ভারতবর্ষে গমন: কলিকাতা ও লক্ষ্ণৌ শহরে অবস্থিতি: ঘটনা এবং জীবন চিত্র শিল্পাঙ্কনের বিষয়বস্তু, "নাটকীয় দৃশ্য এবং আলাপাচার দৃশ্য" যথা, "কর্ণেল মোরদন্তের মুরগীর লড়াই", "ইস্ট-ইণ্ডিজে ব্যাঘ্র শীকার", হায়দর বেকের কলিকাতার দূতাবাস: এর কিছু অংশ রিচার্ড ইয়ারলোম কর্তৃক খোদিত। খোদাইকার রিচার্ড ছিলেন খ্যাতনাম মেজ্জোটিনটো এনগ্রেভার—(১৭৪৩-১৮২২) তিনি স্যার এলাইজা ইমপের ছবিও এঁকেছেন এবং কলিকাতার সেণ্ট জনস চার্চের বেদীর সজ্জা হিসাবে "দি লাস্ট সাপার" নামক চিত্রটি এঁকেছেন। (সেণ্ট জনস চার্চ ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে উপসনাদির জন্য উদ্বোধিত হয়।)

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সেণ্ট জনস চার্চ এ্যাংলিকান ক্যাথিড্রলে রূপান্তরিত হয়। এখানে জোফ্রানীর 'লাস্ট সাপার' ছবিটি দক্ষিণ নেভ বা মন্দিরের মধ্য-ভাগে দেখা যায়। এই ছবিটি গোড়ার দিকে আঁকা ছবিগুলির অন্যতম। এবং সেইসঙ্গে জার্মান শিল্পীর অসামান্য শিল্প নিদর্শনের চমৎকার দৃষ্টান্ত, প্রাচীন শিল্পগুরুদের ঐতিহ্যানুসারে কলিকাতা শহরের কয়েকজন বিখ্যাত নাগরিককে যীশুর তেরজন শিষ্যের রূপে এই ছবিটিতে আঁকা হয়েছে।

জোফ্রানী ও বর্তমান কালের শিল্পীদের মধ্যবর্তী সময়ে, কিছু পর্যটক মাঝে মাঝে ভারতের চিত্ররূপ শিল্পী এবং লেখক রূপে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। আমরা কয়েকটি ছবির কথা জানি ক্রিশ্চান মিশনের কাল থেকে সেইসব ছবি আঁকা হয়েছে। ডাঃ এইচ মোগলিংগ রচিত Das Kurgland (কুর্গ দেশ) ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তিকায় এফ. কুফমান-লার-অঙ্কিত অনেকগুলি সুন্দর লিথোগ্রাফ সন্নিবেশিত আছে। এই সব ছবির মধ্যে শতাব্দী কাল পূর্বের ভারতের অপরূপ রূপের এবং পশ্চিমঘাটের দৃশ্যপটের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। আরনস্ট হেকেলের ভ্রাম্যমানের চিঠিতে পাঠক এই পণ্ডিত ব্যক্তির ছবির ঝাঁপি থেকে কয়েকটি ছবির প্রতিলিপি দেখতে পাবেন—এই ছবির মধ্যে দৃশ্যাবলী সুক্ষ্ম রঙ ও রেখায় ধরা হয়েছে।

ভারতে আগত বিস্মৃত শিল্পীদের অন্যতম হলেন অসওয়ালড্ মালউরা, তিনি স্বয়ং শিল্পী এবং লেখক ছিলেন। তাঁর আঁকা "শ্রীনগরের সেতু" ভারত থেকে যে সব শিল্পী দৃশ্যপট এঁকে এনেছেন তার মধ্যে বর্ণ-বৈচিত্র্যে এই ছবি অন্যতম সুন্দর ছবি হিসেবে স্বীকৃত। মালউরা গান্ধীকে খুব শ্রদ্ধা করতেন।

তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে গান্ধী, খ্রীষ্টধর্ম এবং হিন্দু দেব-দেবী বিষয়ে বিবরণ দিয়েছেন; তিনি এই উপমহাদেশের বহু অংশের ছবি এঁকেছেন। গোয়া প্রসঙ্গে তাঁর কাহিনী প্রাণরসে উচ্ছল।

আরও একজন জার্মান শিল্পী পল কোহেন-পোরথাইম সাধারণ ভাবে এশিয়া এবং বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষে নব্য-জগতের একজন শিক্ষাদাতা হিসাবে বিবেচিত হন। তিনি প্রতিবেশীগণের প্রতি স্বার্থহীন সহায়তায় উপদেশ দিয়েছেন এবং ধর্ম এবং শিল্পের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করেছেন। বাস্তবতা ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিষয়ে ক্রমবর্ধমান সংঘাত ও ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের বিলীয়মান প্রভাবের এই যুগে তিনি সংক্ষেপে আধুনিক শিল্পীর ভূমিকা নির্দেশ করেছেন। এই দুটি পরম মূল্যবোধের মধ্যে তিনি একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ সূত্রের সন্ধান পেয়েছেন:

> আধুনিক য়ুরোপীয়দের কাছে শিল্প এবং ধর্ম একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার—তবে এর কারণ এই যে এই দুটি বস্তুকে একটি এক তরফা নিজস্ব দৃষ্টিকোণে বিচার করা হয়। সেণ্ট ফ্রান্সিস অব এ্যাসিসাই এবং ফ্রা এঞ্জেলিকোর এই উভয়ের মাঝে সংযোগ সূত্র কত ঘনিষ্ঠ। মধ্যযুগে শিল্প ও ধর্মের মধ্যে সংযোগ কত গভীর ছিল, বৌদ্ধ শিল্পে সাধু এবং শিল্পী কতদূর অভেদাত্মা?

আরো অসংখ্য শিল্পী ভারতবর্ষে কাজ করেছেন, এই দেশের বহুরূপ তাদের সাহিত্য ও শিল্প কর্মে প্রতিফলিত। এই রকম একজনের নাম গেরহার্ড গোলভিৎসার, তাঁর Indisches Bilderbuch বা ভারতীয় ছবির বই নামক গ্রন্থে তাঁর অভিজ্ঞতার ছাপ ধরা পড়েছে। স্টুটগার্টের একাদেমি অব আর্টসের অধ্যাপক গেলেভিৎসার এই গ্রন্থটি তাঁর স্ত্রী ললিতাকে এবং তাঁর পিতা-মাতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ এফ. ও. স্থারদার এবং তাঁর স্ত্রী লুসি ললিতার জনক-জননী। অনুরূপ আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন আর. ভব্লু. বয়ের। সুইস শিল্পী মিকাএলা বুরখার্ড-সিমাইকা সুইজারল্যাণ্ড, ব্রেজিল, মিশর ও ভারতে ছবি এঁকেছেন। প্রাচ্য দেশ থেকে আঁকা এই মহিলার ছবির মধ্যে মানবিকতার সন্ধানে, ও সরল সহৃদয়তার সন্ধানে তার আপ্রাণ চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতে এই দুটি বস্তুরই সন্ধান পাবেন এই তাঁর আশা ছিল।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বাংলাদেশের শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী

বিশ্ববিদ্যালয় ওয়ালটার লাইবেনথালের সত্তরপূর্তি উপলক্ষে একটি অভিনন্দন গ্রন্থ প্রকাশ করেন, এই পণ্ডিত ব্যক্তি বাইশ বছর কাল ভারতবর্ষে কাজ করছেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লাইবেনথালের কোনিগসবার্গে জন্ম হয়। এই অভিনন্দন গ্রন্থে তাঁর পরিচয় লেখা আছে 'ভাস্কর-সৈনিক-পণ্ডিত'। ভাস্কর হিসাবে তিনি চীনা-ভারত-এসিয়-উপজীব্যে আকৃষ্ট হন। তরুণ বয়সে লাইবেনথাল প্রথম মহাযুদ্ধে তাঁর স্বদেশের স্বপক্ষে লড়াই করার জন্য স্বেচ্ছা সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন। যুদ্ধান্তে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি পালি, সংস্কৃত, তিব্বতি এবং চীনা ভাষা শিক্ষা করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ডক্টরেট থীসিসের জন্য 'সৎকার্য যা তাঁর বৌদ্ধ বিরোধীদের দ্বারা বর্ণিত' এই বিষয়বস্তুর ওপর লিখলেন। সেই বছরেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে পার্টিচালিত রাষ্ট্রের বর্বর হস্তক্ষেপ তিনি একটি মাত্র লাইনে অতি সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন।

সেই বছরেই তাঁকে তাঁর পিতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হতে
হয় হিটলারী শাসনের খামখেয়ালী বিভেদমূলক আইনের চাপে।

লাইবেনথাল ১৯৭২ পর্যন্ত চীনদেশে বক্তৃতা দিয়েছেন। তারপর থেকে দিয়েছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চীন-ভারত প্রসঙ্গে। তিনি প্রথমতঃ একজন পণ্ডিত এবং দ্বিতীয়তঃ একজন শিল্পী। যে অল্প সংখ্যক জার্মান ভাষী পণ্ডিতগণ চীন ভারত সংস্কৃতির মধ্যে সেতু রচনা কার্যে ব্রতী আছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। অনেকদিক থেকে তাঁর জীবন বহু জার্মান ইহুদী বংশোদ্ভুতের সম্পদ ও দুর্দশার প্রতীক স্বরূপ।

আরেকজন জার্মান প্রবাসী যিনি ১৯৩৮ থেকে ভারতে আছেন (তাঁর অতি সাম্প্রতিক কর্মভার হল বোম্বাই শহরের বিখ্যাত দৈনিক Times of India পত্রিকার শিল্প-নির্দেশক বা Art Director) এই শিল্পীর নাম ওয়ালটার লাংঘামার। তাঁর আঁকা ছবিগুলির মধ্যে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর ও রাজস্থানের অপরূপ মনোহারিত্ব ধরা পড়েছে। Times of India পত্রিকায় তাঁর সহকর্মী এগন জাদিগ ভারতের রহস্য ও মাধুর্য্যের গভীরে মজেছেন। এই দুই শিল্পীর মধুর রোমান্টিক শিল্প কর্মের তীক্ষ্ণ বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায় বৌদ্ধ লামা অনাগরিক গোবিন্দের শিল্পকর্মে লক্ষিত হয়। তাঁর ছবিতে হিমালয়ের ভাবগম্ভীর তীক্ষ্ণ বৈপরীত্যের ছবি বহু কোণ সম্পন্ন বঙ্কিমায়

পরিস্ফুট তথাপি এর সব রকম কর্কশতা সত্ত্বেও। তাঁর কাজের মধ্যে একটা বিশেষ ধরণের রোমান্টিকতার স্পর্শের সঙ্গে মিশিয়ে আছে একটা আধ্যাত্মিক আকুলতা। দর্শক হিমালয়ের দৃশ্যের ওপর জার্মান আদর্শবাদের প্রতিফলন লক্ষ্য না করে পারবেন না।

রুশ শিল্পীও তীর্থপথিক শ্বেতোৎস্লাভ রোরিগ অঙ্কিত হিমালয় দৃশ্যপটে অনেকটা অনুরূপ আঙ্গিক লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সুস্পষ্ট বিশেষত্ব ব্যঞ্জক চিত্ররূপের সঙ্গে বৌদ্ধ প্রশান্তির সঙ্গে উনবিংশ শতকের দার্শনিক আদর্শবাদ সংমিশ্রিত হয়ে গেছে। হেরমান গোয়েৎস গাইকোয়াড অব বরোদা ম্যুজিয়মের কিউরেটর হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় শিল্প শিক্ষা করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম রোরিগের শিল্প সম্পদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আরেকজন শিল্পী যিনি লামা অনাগরিক গোবিন্দের মত তাঁর চিত্রের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মের রহস্য ভেদের চেষ্টা করেছেন সেই মহিলা শিল্পীর নাম এলিজাবেথ ব্রুণার।

হোরসট গেহর্ট সিকিম থেকে কুমায়ুন অঞ্চলের অনেক পোর্টরেট এঁকেছেন। তাঁর শিল্প রীতি কর্কশ এবং দৃশ্যপটের সুরের সঙ্গে সঙ্গতি বিশিষ্ট। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর ম্যাকস ম্যুলর ভবনে আয়োজিত তাঁর এক চিত্র প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি প্রথম দেখার পর থেকে শিল্পগত নৃজাতি বিজ্ঞানের মৌলিক দৃষ্টান্ত হিসাবে সেইগুলি মনে গাঁথা হয়ে আছে। তাঁর Portrait of a Man from Sikkim যার কার্ল ক্রিশ্চিয়ানসেন কর্তৃক আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়েছে সেটি আমার হিমালয় গ্রন্থের চিত্রাবলীর অন্যতম।

আরেকজন সমকালীন শিল্পী ওটো রিশথল। বেদান্ত ও উপনিষদের একজন ছাত্র। তিনি তাঁর চিত্রগুলিতে ভারতীয় প্রভাব বিষয়ে উত্তর দিতে গিয়ে একবার বলেছিলেন বেদান্ত চিন্তা তাঁকে সার্থকতার কাছে টেনে নিয়ে গেছে। এই শিল্পী বলেন যে বিশেষ ধরণের শিল্প কর্ম অধ্যাত্মিক সংযোগর ফলেই সৃষ্টি করা যায়।

> ক্রিয়া এবং ফলের সংযোগ কারণবাচক, কেবলমাত্র চিন্তায় ফলাফল অবশ্যম্ভাবী। ছবির জগতে তার অর্থ কি! বহিরঙ্গ মূর্তি অন্তরস্থ মূর্তির প্রতিকৃতি। কাল ও আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটতে পারে। ন্যায়বাগীশ এবং মূর্খ দর্শক তা প্রত্যক্ষ করতে আসতে পারেন। চিত্র হল স্রষ্টার নিজের প্রতিকৃতি। এই পরিণতিতে দর্শক নিজে অনুভব করেন। তাঁর উপলব্ধি ঘটে চরম অবস্থায়

তিনি বুঝতে পারেন—তৎ ত্বমসি। তুমিই সেই। এমন কি যেখানে অগভীরত্ব এবং অসহায়ত্বই হচ্ছে ফ্যাসন—যেখানে মুখোস নেই। এবং যেখানে তার প্রকাশ ঘটে, তখন যে মুখোস পরে থাকে তার কাছে তা প্রকটিত হয়। এইভাবে আমরা জগৎ সৃষ্টি করি।

…বেদান্ত আবার অন্যদিকে বলে যে শিল্প হল শিবের খাদ্য। শিবের দ্বারা যদি আমরা মানুষের সারবস্তু উপলব্ধি করি, তাহলে আমরা দেখি যে শিল্পগতঃ অভিজ্ঞতা একটা অনুভূতির উত্তেজনায় পরিণত হয় অর্থাৎ আত্ম উন্নতির উপাদান হয়ে ওঠে। মানুষের সত্তা কি উপলব্ধি করে তা মানুষের কাছে তাৎপর্যহীন হতে পারে না। এই সারবস্তু হল এক অনন্ত সত্তা যার অভিজ্ঞতা ব্যক্তিকে আরো গভীরভাবে শৃঙ্খলিত করতে পারে পশুত্বে অথবা তাকে দেবত্বের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে। অবশ্যম্ভাবী ভাবে সমগ্র সত্তা এইভাবে বিজড়িত। এই একটি কারণের জন্য একপেশে নন্দনত্ব একটা বিকট ব্যাপার। মানুষ সব রকম অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ ভাবে অংশভাগী তার সমগ্র দুঃখ এবং শোক এর এক একটি অংশ।

ভারতবর্ষ চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর ভিন্ন সঙ্গীতকারদেরও অনুপ্রাণিত করেছে। রিচার্ড ভাগনার বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট হওয়ার পর এটা বিস্ময়ের বিষয় নয় যে সঙ্গীত স্রষ্টারা ভারতীয় জগৎ নিয়ে আছন্ন। ভাগনারের সহযোগী সুরকারদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় বিষয় বস্তুতে অনুপ্রাণিত। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পল লিংকে (Im Reiche des Indra—ইন্দ্রের জগতে—১৮৯৯), এর আরও সাম্প্রতিক কালে ভলফগাঙ ফোর্টনার (যিনি দ্বাদশ স্তর বিশিষ্ট ভারতীয় সুর রচনা করেছেন। নিউ দিল্লী মিউজিক, ১৯৫৭)। অপর দিকে জার্মান সঙ্গীত ভারতের প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক জুবিন মেহতাকে আকৃষ্ট করেছে, এই সুরকার বোম্বাই শহরে জন্মেছেন এবং হানস্ স্বরোভ্‌সকীর অধীনে ভিয়েনায় সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন।

সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংযোগ সেতু রচিত হয়েছে ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের কথায় সুর সংযোজনার দ্বারা—জন গন মন…। ম্যাকস্ গাইগার নামক একজন অস্ট্রিয়ান সঙ্গীতবিদ্ কর্তৃক এই সুর রচিত হয়, তিনি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পাতিয়ালার মহারাজার নিমন্ত্রণে ভারতে এসে

পাঞ্জাবী শিখ রাজার কাছে কুড়ি বছরের ওপর ছিলেন। গাইগার ভারতের জাতীয় সঙ্গীতকে ষ্ট্রিং, ব্রাস এবং জাজ অর্কেস্টেশনের (স্বরারোপে) ব্যবস্থা করেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয় দেশের মধ্যে সৃজনশীল মধ্যস্থ স্থাপনে জার্মান ধর্মযাজক ফাদার জিওর্জ প্রকোসথ্ সক্রিয় সাহায্য করেছেন—তিনি পরে জ্ঞান-প্রকাশ এই নাম গ্রহণ করে ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দি ভাষী অঞ্চলে লোকগাথা ও লোকসঙ্গীত বিষয়ে গবেষণা করেন। প্রকোসথ্ একটি হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সহ প্রতিষ্ঠাতা এবং হিন্দিভাষায় তিনি স্তোত্রাদি রচনা করেছেন এবং সুর দিয়েছেন। ফাদার জোহানেস রৎসিকা কর্তৃক রেকর্ড কৃত একটি ক্রিসমাস ক্যারল (ক্রিসমাস কীর্তন) য়ুরোপীয় শ্রোতাদের সহজ লভ্য হয়েছে। Janoma Maria mákalale (মেরী মাতার পুত্র জন্ম) নামক এই চমৎকার রেকর্ডিং ক্রিসটোফারস পাবলিসিং হাউস থেকে প্রকাশিত। সুর সংগ্রাহকের তালিকাভুক্ত হওয়া ছাড়া এই সুর প্রায় আধা ধর্মীয় প্রকৃতির, সাইরো মালাংকারা এবং সাইরো মালাবার রীতির ইউনাইটেড চার্চের স্তোত্র জাতীয়। কতকগুলি স্তোত্র হিন্দিতে রচিত এবং ফাদার প্রকোসথ্ কর্তৃক গীত এদের মধ্যে শিরোনামাঙ্কিত গান 'জনম মেরী মাকা লালে' ছাড়া অন্য গানগুলি ভীল ও সম্বলপুর, মুণ্ডা বা মারি প্রভৃতি আদিবাসীদের ভাষায় রচিত। ফাদার প্রকোসথের সুর ও রচনা ভারতে সর্বত্র ক্রিসমাস ক্যারোল নামে পরিচিত। ফাদার রচিত অন্য গানগুলির মধ্যে 'জয় মামা দীওম' ও 'আও ধর্ম বীর প্রভু'। প্রথমোক্তটি ৭/৪ মাত্রায়। ক্রিসটোফারস পাবলিসিং হাউস, ফ্রাইবুর্গ কর্তৃক প্রকাশিত লোক গাথা সিরিজের গানগুলি এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত, এই সব রেকর্ড থেকে বিদেশী শ্রোতাদের কাছে ভারতীয় সুর পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে জার্মান প্রকাশকের উদ্যমের পরিচয় পাওয়া যায়।

জার্মান প্রাচ্যবিদ্‌রা অনেক গোড়া থেকেই ভারতীয় সঙ্গীতে আগ্রহান্বিত হন। ইতিমধ্যেই থিওডোর বেন্‌ফী Allegemeinen Encyclopädie der Wissenschaften und Künste (শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাধারণ বিশ্বকোষ) নামক কোষ গ্রন্থে এই বিষয় লিখেছেন এবং জি. ডব্লু. ফিংক Indische Tonkunst (ভারতীয় সঙ্গীত শিল্প) বিষয়ে ঐ বিশ্বকোষে একটি বিস্তারিত পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন।

তবুও যতদিন না ই. এম. ফন হর্নবোসটেল এবং কুরট সাখস Zeitschrift für Ethnologie (নৃজাতি বিষয়ক পত্রিকা) নামক পত্রে এই বিষয়ে একটি পথিকৃৎ প্রবন্ধ না প্রকাশ করেন ততদিন ভারতীয় সঙ্গীত সংক্রান্ত বাদ্যযন্ত্রাদি বিষয়ে পাশ্চাত্য জগতে নৃজাতিবিদ্ বা সঙ্গীতবিদ্গণ কোনো কিছু আমদানি করেননি। পরে সাখস্ ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়ার বাদ্য যন্ত্রাদি বিষয়ে একটি মহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মতে বাদ্য যন্ত্রাদি সাধারণ ভাবে সামাজিক যন্ত্রপাতিতে নান্দনিক কারণে প্রস্তুত হয়—তাঁর মতে ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার ক্ষেত্রে এই অভাবনীয় ব্যাপারটি প্রযোজ্য:

> ভারতীয় বাদ্য যন্ত্র সেই উন্নয়ণ ব্যবস্থার দ্বারা চিহ্নিত, কিন্তু যে হেতু উপজাতীয় স্মৃতি আরো গভীর এবং উপকথা আরও বৈচিত্র্যময় তাই বাদ্য যন্ত্র সামাজিক মেরুর সঙ্গে নান্দনিক মেরুর চেয়ে অধিকতর ঘনিষ্ঠ। সাংস্কৃতিক ইতিহাস বেত্তা অদম্য নান্দনিকত্ব বিষয়ে অনুতাপ করবেন যার অর্থ মহৎ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ধ্বংস সাধন, আর তার বিশিষ্ট চরিত্র বিবৃত করা, কারণ এটি মৌল বিবর্তনের ফলশ্রুতি নয় বরং য়ুরোপীয় প্রভাব থেকে আহৃত। এই অবস্থার বেদনাদায়ক দৃষ্টান্ত সামান্য পাশ্চাত্য বাদ্য যন্ত্র ঐতিহ্যাশ্রয়ী জাতীয় বাদ্য যন্ত্রের পরিবর্তে ব্যবহার করা। বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে, সারেঙ্গীর জায়গায় ধীরে ধীরে বেহালার প্রচলন হচ্ছে··· মুকলবীণার পরিবর্তে ক্লারিওনেট, মেলা—বা দেশীয় ঐকতান ব্যবস্থায় মুকলবীণা, নাগাস্বরম, এবং শ্রুতির পরিবর্তে দেখা যায় ক্লারিওনেট ফ্লুট আর পিকলো বাঁশী। ··এই সব অভাবনীয় ব্যাপার দ্বারা এই বোঝায় যে ভারতীয়দের অনুকরণ শক্তির কথা বিবেচনা করলে মনে হয় প্রাচ্য দেশীয় অধ্যবসায় বাদ্যযন্ত্রীয় অগাধ সম্পদকে হয়ত সংরক্ষণ করতে পারবে না এবং হয়ত অদূর ভবিষ্যতে য়ুরোপীয় মসৃণ সমতল কারক শক্তি এ অঞ্চলের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ মুছে দেবে।

লেখকের অন্তর সেই দিকে যায় যাঁদের যন্ত্রাদি শেষ পর্যন্ত সব সহ্য করে টিকে থাকবে। অন্য এক জায়গায় আমাদের পার্বত্য জাতি কর্তৃক ব্যবহৃত একটি বাদ্য যন্ত্রের কথা বর্ণনা করেছেন:

> আরেকটি কুকি জাতি লুসাই এবং নাগা বিভিন্ন আকারে বাঁশের অংশবিশেষকে একের ভিতর আর একটি প্রবেশ করায় এই

ভাবে একটি সরল বাঁশী গড়ে ওঠে, তার আওয়াজ কেন জোর হয়। যেমন ঘটে থাকে, আদিম মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি আধুনিক আইডিয়া অনুমান করেছে; মাত্র কয়েক বছর আগে গুস্তাভ গ্রাভিগ বার্লিনে একটি ট্রামপেট তৈরীর পেটেন্ট পেয়েছেন, এই যন্ত্রটি বিভিন্ন আকারের কতকগুলি পাইপের সমাবেশে গঠিত।

ফিল্মের জগতেও ভারত ও জার্মানীর সংযোগ আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর, ছায়াছবির জগতের মহান ধ্রুপদী চিত্র Light of Asia ম্যুনিখের এমেলকা ফিল্ম কোম্পানীর সহযোগীতায় প্রযোজিত হয়। এই প্রথম যুগের সহযোগীতা ডাসেলড্রফের পল জিলস কর্তৃক অনুসৃত হয়। তিনি ১৯৪১-এ ভারতবর্ষে একজন অন্তরীণ বন্দী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এবং এই দেশে ষোলো বছর বাস করেছেন। তিনি 'সর্ট' এবং 'ডকুম্যাণ্টারী' ফিল্মের এক সুবৃহৎ ব্যক্তিগত প্রযোজনার ব্যবস্থা করেন। Indian Documentary নামক ত্রৈমাসিক পত্র জিলস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, তার সাম্প্রতিক কাজগুলির মধ্যে Todas of Southern India (Die Letzen des Stammes—আদিবাসীদের শেষ চিহ্ন) এবং কেরালার বর্ণাঢ্য জগৎ বিষয়ক চিত্র Trommel, Schwert und Tanz in Malabar (ঢাক, তলোয়ার এবং মালবাড়ী নৃত্য) বিশেষ প্রশংসালাভ করে। এক হিসাবে জিলিসকে অসংখ্য ভারততত্ত্ববিদদের তালিকাভুক্ত করা যায়। যদিচ তিনি অতিশয় শক্তিশালী আধুনিক মাধ্যম গ্রহণ করেছেন এই দেশকে পাশ্চাত্য জগতের কাছাকাছি আনার প্রচেষ্টায়।

বিখ্যাত ছায়াছবি পরিচালক ফ্রিৎস ল্যাং-এর স্ত্রী থিয়া ফন হারবুর প্রচেষ্টায় এক অবাস্তব ভারতীয় স্বপ্নালোক জার্মান রোমাণ্টিক সিনেমার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তিনি এক ভারতীয় মহারাজার চরিত্র এবং দড়ির খেলার কৌশল ইত্যাদি তাঁর ছবিতে বিশেষতঃ Das indischen Grabmal (ভারতীয় সমাধি) ব্যবহার করেন। অধিকতর বাস্তব ভারতে রূপ অধিকতর সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্রীয় গান্ধী জীবন বিষয়ক ফিল্মে প্রদর্শিত হয়েছে। সেই ছবিতে জার্মান অভিনেতা হোরসট্ বাখওলৎস গান্ধীর বাতিকগ্রস্ত এবং অদ্ভুতভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হত্যাকারীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

পরিশেষে স্থাপত্য বিভাগ থেকে একটি দৃষ্টান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক, অর্থাৎ নয়াদিল্লীর শান্তিপথের ওয়েস্ট জার্মান এমব্যাসী (চাণক্যপুরীর কূটনৈতিক পল্লী) নির্মাণ কর্ম ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সুরু হয়। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ

থেকে এই বাড়িটি ব্যবহৃত হচ্ছে। ছয় একার ভূমিতে অবস্থিত এই প্রতিনিধি স্থানীয় এই ভবনটি ফ্রাঙ্কফুর্টের জোহানেস ক্রাইন কর্তৃক পরিকল্পিত। এলুমিনিয়ম জানালার কাঠামো এবং ঘুলঘুলির সমস্তরাল ঝাঁপ ভিন্ন এই নির্মাণকর্মের সমস্ত মালমশলা ভারতীয়। বিশেষভাবে রাজস্থানের ধূসর মাকরাণ প্রস্তর উল্লেখযোগ্য। যে সব জার্মান স্থপতি এই নির্মাণ কর্ম পরিদর্শন করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ওয়ালটার ওয়েৎসেন, সহযোগী ভারতীয় স্থপতি ছিলেন কার্ল মালটে ফন হাইনৎস—জার্মান হলেও ইনি ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। লেখকের লোভ থাকা সত্ত্বেও এই গ্রন্থের পরিধির মধ্যে নয়া দিল্লীর জার্মান এমব্যাসীর কথা অধিকতর বিস্তারিতভাবে বলা সম্ভব নয়। কারণ এখান থেকেই তিনি সুবৃহৎ ভারতভূমির প্রাচীন ও উত্তেজনাময় দেশকে ধাপে ধাপে আবিষ্কার করার কাজে ব্রতী হয়েছেন।

হ্যানিম্যানকে অনণ্য প্রশস্তি

"তাহলে কি হোমিওপ্যাথির সরকারি স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাশা করাটা অতিরিক্ত ব্যাপার? আমি, ইতিমধ্যে মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানাই তিনি যেন রাজ্যসভায় হোমিওপাথিক ব্যবসায়ীদের জন্য সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতাবলে একটি আসন ব্যবস্থা করুন এবং এইভাবে হ্যানিমান ও তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতিকে সম্মানিত করা হবে। আমার বিশ্বাস, হোমিওপ্যাথি বিশেষভাবে এই সরকারি স্বীকৃতি লাভের যোগ্য।"

সুধীরকুমার অধিকারী (অমৃতবাজার পত্রিকার ৮ই এপ্রিল, ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পত্রাংশ)

বিজ্ঞানের ইতিহাসে কদাচিৎ একটি শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র এর চেয়ে অধিক যুক্তিগ্রাহ্য প্রস্তাব দান করেছেন যেমনটি বাংলাদেশবাসী লেখক ও বুদ্ধিজীবি সুধীরকুমার অধিকারী কর্তৃক প্রস্তাবিত হয়েছে। তিনি একটি মাত্র প্রশস্তির প্রস্তাব করেছেন যা পার্লামেণ্ট কর্তৃক জার্মান চিকিৎসকের ২০১ জন্ম-শতবার্ষিকীতে করা কর্তব্য।

হ্যানিমান তাঁর স্বদেশের চেয়ে ভারতে অধিকতর পরিচিত ছিলেন। তিনি চিকিৎসা বিষয়ে এক বিশেষ বিভাগের ভিত্তি স্থাপনা করেন। তাঁর এই কর্ম যে বিশেষভাবে ভারতে স্বীকৃতিলাভ করেছে তার কারণ এই যে তাঁর চিকিৎসা বিষয়ক আবিষ্কার প্রাচীন ভারতীয় প্রজ্ঞা ভিত্তিক। তাঁর অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি আধুনিক পশ্চিম জগতের কাছে তিনি তার পরিচয় ঘটিয়েছেন, এইভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটা চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক সংযোগ সাধিত হয়েছে।

হোমিওপ্যাথির সঙ্গে যে ভারতীয় পদ্ধতি জড়িত তার নাম আয়ুর্বেদ। অর্থাৎ জীবনবেদ। কথিত আছে দেবতা ধন্বন্তরি কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরাধীকার এই আয়ুর্বেদ। আয়ুর্বেদ নিরাময়কারি শিল্প সংক্রান্ত কর্ম যা অনেক অধিকারী ব্যক্তির মতে চতুর্থ বেদের একটি অংশ। হিন্দুধর্মের সমগ্র চিকিৎসা পদ্ধতিকে এই নাম দেওয়া হয়েছে। (মুসলিমরা তাঁদের সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিকে ইউনানী নাম

দিয়েছেন।) আয়ুর্বেদীয় নির্দেশানুসারে সকলপ্রকার প্রাচীন খনিজ পদার্থ পাঠ করা কর্তব্য। এ ছাড়া ভেষজ এবং জীবতাত্ত্বিক নিরাময়কারী উপাদানগুলির যথাযোগ্য ব্যবহারের নির্দেশ আছে।

সামুয়েল ক্রিশিয়ান হ্যানিমান ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে মাইসেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লাইপজীগ এবং ভিয়েনায় চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠগ্রহণ করেন। তাঁর প্রধান গ্রন্থ Organon der rationellen Heilkunst (Organon of Rational Medical Art—1810) এবং তাঁর Reine Arzneimittel-Lehre (Pure Pharmacology—1811) এই উভয় গ্রন্থের মধ্যে মানবিক স্বাস্থ্যের সেবায় প্রাকৃতিক শক্তি সাহায্য গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রতিফলিত। যে চিকিৎসা পদ্ধতি উন্নয়নের জন্য তাঁর মৃত্যুকাল (২রা জুলাই ১৮৪৩) পর্যন্ত কাজ করে গেছেন তার ভিত্তি ছিল *Similia similibus curantur* এই নীতি। হোমিওপ্যাথির বংশ লতিকা পিছনের দিকে হিপোক্রাটিস পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর কাজ আরো অগ্রসর যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন জার্মানীর ষোড়শ শতাব্দীর চিকিৎসক ও রসায়নবিদ প্যারাসেলসুস। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে প্রবেশের সার্থকতার কৃতিত্ব হ্যানিমানের অপেক্ষায় ছিল।

হ্যানিমানের নাম আজও ভারতবর্ষে একটা ঘরোয়া নাম—সেখানে অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় তাঁর নামাঙ্কিত। কিন্তু ভারতবর্ষে তিনি Sendschreiben Über die Heilung der Cholera (Epistle on Curing Cholera) ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন বার্লিনের এ. হারসথ্ভালড। ভারতবর্ষের পক্ষে কলেরা কি প্রচণ্ড মহামারী এবং প্রকৃত পক্ষে সমগ্র এশিয়ার পক্ষেও তাই। মার্টিন গুমপার্টের এক দুঃসাহসী বিপ্লবীর জীবনকথা "হ্যানিমান" নামক গ্রন্থে এই ব্যাধি য়ুরোপেও কি পরিমাণ ত্রাসের সঞ্চার করেছিল তার বিবরণ দিয়েছেন। এই জীবনী গ্রন্থের যে ইংরাজী অনুবাদ ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত হয় তা থেকে নিম্নলিখিত উধৃতি দান করা হল:

> এশিয়াটিক কলেরার মারাত্মক গুরুত্ব বিশ্ব ইতিহাসে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পাওয়া যায়। তারপর সুরু হয় এর বিশ্ব-পরিক্রমা এবং ক্রমে এক বিশ্বজনীন ব্যাধিতে পরিণত হয়। আগস্ট মাসের মধ্যভাগে এই মহামারী বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। গঙ্গা এবং

ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী অঞ্চলে ধীরে ধীরে এই রোগ প্রবেশ করে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে নাগপুরে এর প্রাদুর্ভাব ঘটে, জুলাই মাসে রাজস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে আবার এক কলেরা-তরঙ্গ বেড়ে যায় এবং আগস্ট মাসে বোম্বাই শহরে তা ভেঙে পড়ে। সেই বছরই এই ব্যাধি ভারতবর্ষের সীমান্ত অতিক্রম করে যায়। সিংহলে এই রোগের প্রকোপ প্রচণ্ড মহামারি রূপে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে একটি মালবাহী জাহাজে বাহিত হয়ে ছড়িয়ে যায়; ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাধি মরিসসে দেখা যায় এবং পরে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ছড়িয়ে পড়ে। অচিরাৎ ফিলিপাইন, চীন, অষ্ট্রেলিয়া এবং সিরিয়ায় শিকড় নামায়। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাধি পারসিয়া থেকে নির্গত হয়ে রুশ অঞ্চলে ছড়ায়; বাকু থেকে জাহাজ যোগে যায় অস্ত্রকানে এবং এইভাবে ২২শে সেপ্টেম্বর সর্বপ্রথম য়ুরোপীয় ভূমিতে আবির্ভূত হয়। এক অসামান্য হিমপ্রবাহ সাময়িকভাবে এর অগ্রগতি ব্যাহত করে কিন্তু সাত বছরে এই ব্যাধি ৯০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা এবং ৬৬ডিগ্রি নিরক্ষবৃত্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। সহসা এই মহামারীর অবসান ঘটে এবং প্রায় চার বছর কাল এই ব্যাধি প্রশমিত ছিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে এক নতুন এবং অধিকতর তীব্রভাবে এই মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় আবার এশিয়াটিক কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটে। এইবার এর সব কিছু উপদ্রব ঝড়ের প্রকোপে ছড়ায়, এইবার হিমপ্রবাহ বা শৈত্যাধিক্য দ্বারা এ ব্যাধি প্রশমিত হয় না। এক বিশাল রুশ অঞ্চলে এই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত এবং মিনসক, গ্রোডনো, এবং ভিলনা নামক যেসব শহর এতদিন এর প্রকোপমুক্ত ছিল সেই সব শহরেও রোগ ছড়ায়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল ডায়বিটস্ কর্তৃক পোলাণ্ডের বিদ্রোহের রক্তাক্ত দমনের সঙ্গে পোলাণ্ডে কলেরা রোগের উপদ্রব ঘটে। সে সময় ফেব্রুয়ারী মাস, সেই বছর জুন মাসে এই ব্যাধি প্রাসিয়ান সীমান্ত কালিসথ্ শহরে পরিব্যাপ্ত হয়।

কলেরা এবং তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আরেকজন যিনি আত্মনিয়োগ করেন তিনি প্রখ্যাত শারীরবিদ রবার্ট কোস (১৮৪৩-১৯১০)। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কোস মিশর এবং ভারতে গমন করেন, ক্ষেত্রে বসে এশিয়ার মহামারী

বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে। এই মহান বিজ্ঞানী যিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন তিনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই এসেছিলেন ভারতীয় মহামারী সংক্রান্ত ব্যাপারে দীর্ঘস্থায়ী গবেষণার উদ্দেশ্যে। এই নীরব বিজ্ঞানী যিনি টিউবারকুলেসিস ভাইরাস আবিষ্কার করেন এবং স্লিপিং সিকনেস ও গো-বসন্ত (রাইনডারপেষ্ট) বিষয়ে গবেষণা করেছেন তিনি কি ভাবে বিউবোনিক প্লেগ ছড়ায় তা আবিষ্কার করেন। রবার্ট কোস সেই অবিস্মরণী মানবগোষ্ঠীর অন্যতম যাঁরা ভারতকে সাহায্য করেছেন এবং মানুষকে যে সব মহামারি আক্রমণ করে তার হেতু বিজ্ঞান (etiology) স্থির করেন। একটা নতুন আঙ্গিক বা কালচার-টেকনিক দ্বারা রবার্ট কোস সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধে আধুনিক রীতি দান করায় ঔষধ এবং চিকিৎসা জগতে নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কোস একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন যার নাম Reiseberichte (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)-তা কিঞ্চিৎ ভ্রান্তিজনক, কারণ প্রকৃত-পক্ষে এটি একটি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে গো-মড়ক, আফ্রিকা ও ভারতের বিউবোনিক প্লেগ সেটসি ও সুররা ব্যাধি, টেকসাস্ জ্বর, ট্রপিক্যাল ম্যালেরিয়া এবং কালা জ্বরের উল্লেখ করেন। ভারতে কোস-এর গবেষণার ফলাফল Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten (স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এবং সংক্রামক ব্যাধি বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়) এই পত্রিকা কার্ল ফ্লুগের সহযোগীতায় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে লাইপজীগে প্রকাশিত হতে থাকে।

কিন্তু আমরা হোমিওপ্যাথিতে ফিরে যাই। আজ হ্যানিমানের মতবাদ চতুর্দিকে স্বীকৃত। ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে হোমিওপ্যাথির য়ুরোপীয় পদ্ধতি বিষয়ে অবহিত হয় মার্টিন হোনিগবারগার নামক এক ব্যক্তির কাছ থেকে। হোনিগবারগারের জন্ম হয় ট্রানসিলভানিয়ায় ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেশত্যাগ করে মিশর, সিরিয়া, পারস্য, আফগানিস্থান এবং কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভ্রমণ করেন। পরিশেষে, তিনি একজন মিশরী চিকিৎসক বা হাকিম হিসাবে ভারতে আগমণ করেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে হোনিগবারগার লাহোরে গমণ করেন। সেইকালে পাঞ্জাবের শিখ রাজ্যের এইটি ছিল রাজধানী। রাজা রণজিৎ সিং-এর ব্যক্তিত্ব তাঁকে আকৃষ্ট করে। রাজা হোনিগবারগারের প্রতি প্রীতি হয়ে তাকে রাজ-বৈদ্য হিসাবে নিযুক্ত করেন। পরে তাঁর হাতে রাজকীয় অস্ত্র কারখানার ভার অর্পন করেন।

হোনিগবারগার এই অপ্রত্যাশিত কর্মটি মাসিক আটশত টাকা বেতনে গ্রহণ করলেন, এই বেতন পরে তিন হাজার টাকায় বর্ধিত হয়। আজো এই টাকা বেশ প্রচুর টাকা হিসাবে বিবেচিত। রণজিৎ সিং হোনিগবারগারকে একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের উপাধিতে ভূষিত করতে অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন এবং তাকে শাসনকর্তার পদ দান করতে মনস্থ করেন। এই জার্মান কিন্তু সেই পদ প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন আমি সর্বাগ্রে চিকিৎসক থাকতে চাই, সেই আমার সর্বপ্রধান কর্ম। চার বছর পাঞ্জাবে থাকার পর হোনিগবারগার অল্পকালের জন্য স্বদেশে ফিরে গেলেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার লাহোরে ফিরে এলেন, এবং যখন রাজা অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি তাঁকে হোমিওপাথিক ওষুধপত্র দিয়ে চিকিৎসা করলেন। রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর হোনিগবারগার (যাঁকে পাঞ্জাবীরা শিখ এবং পার্বত্য মানুষ হিসাবে গ্রহণ করেছিল) ১৮৪৪ পর্যন্ত লাহোর দরবারে থেকে গেলেন, সেই বছর রাজ-দরবারের চক্রান্তে তাঁর পদচ্যুতি ঘটল। তিনি কিছু পরে আবার পদটি পেলেন কিন্তু আবার ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সেই পদ থেকে অপসারিত হলেন। সেই সময় ব্রিটিশ সরকার পাঞ্জাবকে তাঁদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন। হোনিগবারগার উত্তর ভারতে ভ্রমণ করলেন। কিছুকালের জন্য কাশ্মীরে রইলেন, সেখানকার নতুন রাজা তাঁকে জমি কেনার সুবিধা দিলেন, সেই জমিতে চিনির কল বসানোর অনুমতিও দিলেন। তথাপি হোনিগবারগার য়ুরোপে ফিরে যেতে মনস্থ করলেন, সেখানে তিনি তাঁর শেষ জীবন ট্রানসিলভ্যানিয়া, জার্মানী ও ইংলণ্ডে অতিক্রম করেন। তিনি ভেষজ ও লতাপাতা বিষয়ক একটি অভিধান সংকলন করেন, সেইখানে তিনি বিভিন্ন উদ্ভিদের নামাবলী বিশদ ভাবে বিভিন্ন ভাষায় দান করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত হোনিগবারগারের আত্মজীবনীতে এই সব দৃষ্টান্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই গ্রন্থের নাম—Thirty five years in the East. তাঁর গ্রন্থ থেকে উদ্ভিদের নামাবলীর কিছু পরিচয় উধৃত করা গেল :

লাতিন : ক্যালেণ্ডুলা ; ইংরাজী : মেরি গোলড্ ; ফ্রেঞ্চ : ফ্লুয়ের ছ স্যুসী ; জার্মান : রিং গেলব্লুম ; টার্কিস : আয়নি সেফা সিৎসেগী ; এরাবিক : এডব্রিউন ; পারসিয়ান : গুল ই আসরাফি ; ভারত-কাশ্মীরী : হামিশ বাহার…

লাতিন : প্লাটানুস ওরিয়েন্টালিস ; ইংরাজী : প্লেন-ট্রি ; ফ্রেঞ্চ :

ব্রাটিনে; জার্মান: আরণবাম; তুর্কি: চিনার; আরব: জুলব;
পারসিয়ান: চিনার; ভারতী-কাশ্মিরী: চিনার।

হোনিগবারগারের জন্মের দশ বছর পূর্বে একজন জার্মান চিকিৎসকের মৃত্যু হয় এবং তিনি এই সব বিপরীত অঞ্চল যথা আইসল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হন। হোনিগবারগারের মত তিনি চিকিৎসা ও উদ্ভিদ বিস্তার ক্ষেত্রের গবেষণা সংযুক্ত করেন। বাল্টিকের কুরল্যাণ্ডের এই অধিবাসীর নাম যোহান গ্রেরহার্ড কোনিগ (১৭২৮-১৭৮৫)। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতার স্বীকৃতিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁকে নিযুক্ত করেন। তিনি হিমালয় থেকে সিংহল পর্যন্ত এই দক্ষতা প্রদর্শন করেন। কোনিগ একজন ব্রিটিশ কূটনীতিক হিসাবে শ্যামদেশে যান। তিনি মালয় উপদ্বীপেও সক্রিয় ছিলেন। তাঁর আজো অপ্রকাশিত রচনাদি তাঁর একজন সমকালীন পণ্ডিত স্যার যোশেফ ব্যাঙ্কস্ কিনে নেন।

কোনিগ অবশ্য হোমিওপ্যাথি বিষয়ে কিছুই জানতেন না—ভারতীয় চিকিৎসা বিষয়ে তাঁর মনোভঙ্গী যতদিন না তাঁর পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হবে ততদিন জানা যাবে না।

প্রথমতম হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালগুলির অন্যতম একটি হাসপাতাল ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তানজোরে স্থাপিত হয়। চার বছর পরে ট্যানার নামক জনৈক এ্যাংলসেসিয়ান হ্যানিমানের নিরাময়কারী পদ্ধতি কলিকাতায় আমদানি করেন। হ্যানিমান পদ্ধতিতে যে ভারতীয় চিকিৎসক সর্বপ্রথম চিকিৎসা করেন তাঁর নাম বাবু রাজেন্দ্রলাল দত্ত। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে The Calcutta Review পত্রিকায় ভারতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রথম বছরের বিবরণ প্রকাশিত হয়। মার্টিন হোনিগবারগার কলিকাতায় বাস করেন। এখানে আরেকজন ভিয়েনাবাসী ডাক্তার এসেছিলেন; তাঁর নাম লিওপোল্ড সালজার। তাঁর হ্যানিমান পদ্ধতির প্রয়োগ এমনই সার্থক হয় যে জয়পুরের মহারাজা তাঁকে তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। সেই বছরই কলিকাতায় সুবিখ্যাত চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার ডাক্তার সালজার এবং রাজেন্দ্রলাল দত্তের চিকিৎসা পদ্ধতি দেখে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং তিনি এলোপ্যাথি থেকে হোমিওপ্যাথিতে তাঁর চিকিৎসা ব্যবসায় পরিবর্তিত করেন এবং নিজে একজন "হ্যানিমান হোমিওপ্যাথ" হিসাবে পরিচিত হন।

সেই কাল থেকে বিভিন্ন নিরাময়কারী পদ্ধতি ভারতে একত্রিত করা

হয়েছে। ভারতবর্ষ ঐতিহ্যগতভাবে সমন্বয়ের দেশ। হোমিওপ্যাথিক ক্ষেত্রে জার্মান ও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সহযোগীতার সাম্প্রতিকতম বিজয়ের মধ্যে সেরপজেমলিন—এই ঔষধ রাওউলফিয়া সার্পেনটিনা (সর্প গন্ধা) থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে। ডাঃ সলিমুজ্জমান সিদ্দিকি ও ফ্রাঙ্কফুর্ট-অন-দি-মেনের জার্মান ডাক্তারদের যুক্ত প্রচেষ্টায় এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। রাওউলফিয়া সার্পেনটিনা একটি ওষধি। ভারত উপমহাদেশে এই ওষধি প্রচুর জন্মায়। কিভাবে এই নামকরণ হয়েছে জার্মান-ভারত সম্পর্কের সে আর একটি অধ্যায়।

১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আগসবার্গের অধিবাসী লিওনার্ড রাওউলফ ফ্রান্সের মঁপেল্লিয়ারে গমন করেন সেখান থেকে যান ইতালী। তিনি ৬০০ রকমের দুষ্প্রাপ্য ভেষজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করে স্বদেশে ফেরেন, এর মধ্যে কিছু কিছু তিনি প্রাচ্যদেশ থেকে ফেরা লোকজনের কাছ থেকে কিনেছিলেন। রাওউলফ অতি দ্রুত একজন উদ্ভিদবিদ্ হিসাবে পরিচিত হয়ে পড়লেন। কিছুকাল পরে তাঁর শ্যালক তাঁকে ভারতবর্ষে বানিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পাঠালেন। তাঁর সঙ্গে আরও দুজন গেলেন। অগসবার্গের ফ্রিডরিশ রেনৎস, এবং উলমের উলরিখ ক্রাফট।

যাই হোক উদ্ভিদবিদ্যায় অধিকতর আগ্রহ থাকার জন্য রাওউলফ বানিজ্যিক প্রতিনিধি হিসাবে তেমন সাফল্যলাভ করলেন না। তিনি লতা গুল্মাদি সংগ্রহ করতে এবং তার নিরাময়কারী গুণাগুণ বিচার করতে লাগলেন। পরিশেষে তিনি আপনার পরিচয় দিলেন আর্মেনিয়ান বলে এবং ভারতের দিকে ভ্রমনে গেলেন। তিনি শুনেছিলেন যে ব্লাড প্রেসার বা রক্ত চাপ হ্রাস করতে সক্ষম এমন এক ওষধি ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। তাঁর বাগদাদ গমনের শুধু প্রমানটুকু আমাদের আছে। তথাপি তিনি যখন জার্মানী প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি শত শত নূতন উদ্ভিদের নমুনা নিয়ে ফিরলেন। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর সেগুলি হাউস অব ভিটেলসবাখে চলে যায়। এ্যাপোকিনাসের নমুনা পরে ফরাসী উদ্ভিদবিদ চার্লস প্রামিয়ার কর্তৃক রাওউলফার নামাঙ্কিত করা হয় লিওনার্ড রাওউলফের সম্মানে। চিকিৎসা সংক্রান্ত বানিজ্যে এই উদ্ভিদের আজো প্রচুর চাহিদা বর্তমান।

উনবিংশ শতাব্দীতে যে সব জার্মান চিকিৎসকরা ভারতবর্ষে বসবাস করেছেন এবং কাজ করেছেন ভারতীয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁরা এক শক্তিপুর্ণ উদ্দীপনা সঞ্চার করেছেন।

ভারতবর্ষে নিরাময়কারি চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রথমতমদের অন্যতম যিনি বিশেষভাবে হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে কাজ করেছেন তাঁর নাম রুডলফ রথ (১৮২১-১৮৯৫)। তিনি 'মদনবিনোদ' গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—এই গ্রন্থটি প্রাকৃতিক পুষ্প উদ্ভিদ ইত্যাদি বস্তুর নিরাময়ক গুণাবলী বর্ণিত আছে। এ ছাড়া এর পূর্বেকার সংগ্রহ গ্রন্থ 'চরক-সংহিতা'র কথা বলেছেন—এই 'চরক-সংহিতা'র একটি নির্বাচিত সংস্করণ তিনি প্রকাশ করেন। এ কথা সত্য যে 'চরক-সংহিতা' ফাদার হেসলার কর্তৃক লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়, রথ কিন্তু এই অনুবাদে প্রীত হতে পারেন নি—তিনি যথাক্রমে ভুলার্স এবং স্টেনৎসলার কর্তৃক অনূদিত নির্বাচিত অংশেও সন্তোষলাভ করেননি। রথের পর—আর্নেস্ট হাস (১৮৩৫-১৮৮২) ভারতীয় ওষধি সম্পদের গভীরে গবেষণা করেন। সুশ্রুত এই নামটির তৎকৃত ব্যাখ্যা (সুশ্রুত ছিলেন প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের একজন বিশেষজ্ঞ) এই যে সুশ্রুত কথাটি গ্রীক হিপ্পোক্রাটিস কথাটির আরাবিক অপভ্রংশ। এই ব্যাখ্যার অতিশয় প্রবলভাবে আগস্ট ম্যুলার কর্তৃক বিরোধিতা করা হয়। তিনি স্বয়ং আরব ভাষার একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

জে. জলি কর্তৃক তাঁর "Grundriss" (বহিরেখা) নামক গ্রন্থে ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের চূড়ান্ত প্রশস্তি দান করা হয়। এই গ্রন্থটি দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় ওষুধপত্র বিষয়ে আদর্শ জার্মান ইতিহাস হয়ে থাকবে।

এই বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থাদি লিখেছেন আইভান ব্লথ, হোয়েরনলে, ফিসার, হ্রিয়েপগেন, হুয়েবটার, লুডার্স, কারফেল, ভেকারলিং ও সাইগেল প্রভৃতি। আলরার্ট এদার এবং রাইনহোল্ড এফ. জি ম্যুলার ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের শুধুমাত্র শরীর বিদ্যা-বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্র অতিক্রম করে গেছেন—আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসারে বিষয়টি চিকিৎসা ব্যবসায়ী হিসাবে বিচার করেছেন।

উপরোক্ত গ্রন্থাবলী ছাড়া ভারতীয় অঞ্চল এবং বিভিন্ন জাতি বিষয়ে চিকিৎসকের দৃষ্টিকোণে লিখিত অসংখ্য পুস্তিকা আছে। ডাঃ রালফ বারচার "যে জাতি কোনও অসুখ জানে না" এই নামে একটি বিবরণ লিখেছেন। সুদূর উত্তর কাশ্মীরের হুনজা অঞ্চলের জনগন সম্পর্কে এই উক্তি করা হয়েছে।

র‍্যালফ বারচার একটি সুষ্ঠু সিদ্ধান্তে পৌচেছেন :

> হুনজার জনগন জীবনের সম্পূর্ণতায় আশ্রয় নিয়েছেন এবং এই মনোভংগী অনুসারে একটা আভ্যন্তরীণ মনোভংগী গড়ে

তুলেছেন। এই সংস্কৃতির 'অনন্ত যৌবনে'র হয়ত এইটাই গোপন রহস্য। ...এই মানুষগুলির অসাধারণ শক্তিমত্তা ও অধ্যবসায় যা দিয়ে সব কিছু সম্ভব ; এখানে এমন এক শক্তি আছে যা আমাদের চেয়ে অনেক উন্নততর। তথাপি এর মধ্যে আবার অসাধারণ ঔদাসীন্য যা আমরা কেউই স্বেচ্ছায় নিজেদের ওপর নেব না। বিনা কারণে হুনজার জীবন পরিশ্রমে সমৃদ্ধ এবং সম্পদে ও পুষ্টিতে দরিদ্র। বিনা কারণে যে এখানে কবিতা দর্শন, শিল্প প্রভৃতি যে সব বস্তু নিয়ে আমাদের ধারণাগত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার অভাব ঘটেছে তা নয়।

ভিলবালড্ কারফেলের চিকিৎসাবিষয়ক সমীক্ষায় পাঁচটি রাসায়নিক পদার্থ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রাচীন ভারত ও ভূমধ্যসাগরীয় নিরাময় কলার সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন যে একটা ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক ধারা ভূমধ্যসাগর থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আমরা চিকিৎসাক্ষেত্রে মানবিক সংস্কৃতির সীমানায় পৌঁছেচি এবং আমাদের সামনে দুটি ধারা উপস্থিত তা হল জলঅগ্নি বা শ্লেষ্মা-পিত্ত (mucus-bile) ঘটিত উপাদান। একটি ধারা ভূমধ্যসাগর অঞ্চল থেকে ভারতবর্ষ হয়ে চলে গেছে সাউথ-সী অঞ্চলে এবং অপরটির তারিখ হল সেই সুদূর সুরু থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলে আসছে। অবশ্য মূল থেকে সরে গিয়ে আমাদের পঞ্জিকার সপ্তম এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেমাইট এবং ইসলামের মধ্য দিয়ে এসেছে। আমরা যদি ভারতীয়দের 'দোষা'র ও সেই সঙ্গে প্রাচীন মানুষদের হিউমোরেস (Humores) কে আভ্যন্তরীণ ক্ষরণের একটা দিক বলে গ্রহণ করি এবং কয়েকটি বিশেষ ধরণের মানুষের ক্রমবিকাশে তার বিশেষ অবদানের কথা ধরি তাহলে এল. বেরমান "পাঁচটি বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিত্বের"র এক তালিকা প্রস্তুত করেছেন এবং ব্যক্তিত্ব বিষয়ে তাঁর 'এণ্ডো ক্রিনোলজিক্যাল' বিশ্লেষনে, এবং ই. ক্রেটসনার "দেহের ভঙ্গীর তিনটি বিরাট গোষ্ঠী"র তালিকা করেছেন—তারপর এই রেখা সাম্প্রতিককালে এসে পৌঁচেচে এবং এই অসাধারণত্বের মধ্যে এবং সমান্তরাল অন্য অসাধারণত্বের ভিতর

একটা চিন্তাভঙ্গী বা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যা ভূমধ্যসাগরীয় পাশ্চাত্য সাংস্কৃতির ধারার দিকেই ঝুঁকে আছে।

চিকিৎসার ক্ষেত্র থেকে ঠিক এক ধাপ অগ্রসর হলে ভারতের সেই সব দানের কাছে পৌছান যাবে যা বিজ্ঞান ও গুঝা গিরির সীমানা ছুঁয়েচে। এর মধ্যে বিশেষ পরিচিত হল যোগ। এই গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান এবং তার অভ্যাস অনেক সময় পল্লবগ্রাহীর খেয়াল হিসাবে অপব্যবহৃত হয়। অনেক সময় বিভ্রান্ত ও ক্লিষ্ট মানুষকে যোগের পথ দেখানো হয় মনঃসংযোগ এবং বিশ্রামের দ্বারা নতুন শক্তি অর্জনের প্রতিশ্রুতি তার মধ্যে থাকে। কিন্তু যোগ ব্যায়াম দ্বারা নিরাময়ের প্রবক্তরা সহসা হয়ত আবিষ্কার করে বসবেন যে তাঁরা একটা নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন। সবিস্ময়ে তাঁরা দেখবেন তাঁদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ও পরিবেশে একটা ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিকরা স্বীকার করেন অনুশীলন ও সহিষ্ণু কসরৎ দ্বারা স্বাভাবিক প্রবণতার উন্নয়ন ও বর্ধন সম্ভব। এই পর্যন্ত অবিসম্বাদি সত্য। তথাপি আধ্যাত্মিক সংযোগ ও ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বর সন্দর্শনের প্রতিশ্রুতি যাঁদের দেওয়া হয়েছে দিব্য-প্রসাদ নামক বস্তুটি হয়ত তাঁদের নজর এড়িয়ে যাবে এবং জাতীয় দিব্য আশীর্বাদ সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণে ভারতীয় অধ্যাত্ম জগতে গন-পর্যটনকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানী ব্যক্তিরা সংশয়ের চোখে দেখে থাকেন। অপরপক্ষে যাঁরা ব্যবহারিক অনুশীলন হিসাবে যোগ ব্যাপারে আগ্রহী ভারতের এই বিশেষ দিকটির পথ নির্দেশক হিসাবে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ যোগদর্শন বিষয়ক রচনাদি পড়তে পারেন। যোগ ব্যাপারে এই পথান্তরের মধ্যে একটি জিনিষ দেখা যায়। অন্য যে কোনও যুগের চেয়ে আমাদের এই যুগে প্রকৃত মনস্তত্ত্বলাক্ষনিক চিকিৎসক প্রয়োজন মানসিক ও শারিরীক রোগ নিরূপণের জন্য।

আধুনিক গভীর মনস্তত্ত্ব, আধা মনস্তত্ত্ব ও মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শনের প্রযোজ্যতা সংক্রান্ত বিষয়টি ডাঃ হেলমুথ ফন গ্লাসেনাপ বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় মনোভংগী বিষয়ে সমীক্ষা করেছেন:

> বিচারের প্রয়োজনে, রাজনীতিজ্ঞ এবং প্রকৃতপক্ষে সকলেরই প্রয়োজন অপরের চিন্তার ক্ষেত্রে প্রবেশ করা, ঘটনা বিষয়ে অপরের প্রতিক্রিয়া এবং তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা মাফিক তার মোকাবিলা করার ব্যবস্থা বিষয়ে অনুমান করার জন্যই এই পথ গ্রহণ করা

প্রয়োজন। সুতরাং রাজনৈতিক পাঠ্য পুস্তক এবং সুভাষিত সংগ্রহে বিভিন্ন ধরনের উপদেশ ছড়ানো আছে। তার ভিতরকার কিছু উপদেশ এখানে পরীক্ষিত হল।

তথাপি ভারতীয়গন ব্যবহারিক মনস্তত্বে থেমে নেই তার দ্বারা শুধু মানুষের বাহ্যিক আচরণ বিচার করা যায়; গোড়ার দিকে ওরা চেষ্টা করেছিল (যদিও বিধিবদ্ধভাবে নয় এবং অনেক সময় বিনা পরীক্ষায়) মানবাত্মার গভীরে প্রবেশ করতে। এভাবে ওদের আধুনিক মনোবিজ্ঞান এবং গভীর মনস্তত্বের পথিকৃৎ বলা যায়। হিন্দুরা যে গুরুর অধীনে স্বেচ্ছায় আত্মনিবেদন করে তিনি উপদেশ দ্বারা তাঁর শিষ্যদের হীনমন্যতা দূর করেন। তিনি অচেতন পদার্থ থেকে দৃষ্টান্ত দেন—যেমন রহস্যময় চক্র (মণ্ডল, যন্ত্র) ইত্যাদি, শিষ্যকে কসরৎ দেন আধ্যাত্মিক সংঘাতের পর মানসিক প্রতিক্রিয়া স্থির করতে এবং অবদমনের অপকারী শক্তি থেকে আপনাকে মুক্ত রাখার শিক্ষা দেন। অচেতন থেকে সুরু করে অন্তিম লক্ষ্য হল মানুষের চেতন জীবনকে নিয়মবদ্ধ করা। সংস্কার ও বাসনার আসন হল মস্তিস্কে (চিত্ত) তা হল পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রভৃত অবচেতন ধারণা, মুখ্যতঃ চিত্তে সংরক্ষিত কিন্তু তা সচেতন রাজ্যকে আক্রমণ করতে সমর্থ যদি তাকে যথাযোগ্য ঘটনার দ্বারা পুনরায় সক্রিয় করা যায়। যোগ উন্নয়ন প্রচেষ্টায় মূল উৎপাটন করে বা চূড়ান্তভাবে বীজকে শান্ত করে—উর্বর ক্ষেত্রের মত মস্তিস্কে এই বীজ সজীব থাকে। যোগ প্রভাবে মনকে এসব নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিস্ক থেকে সমগ্র বস্তুটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। মুক্তির পর এই বস্তু তার প্রকৃত প্রকৃতি লাভ করে।

ধ্যানের অনুশীলন যে মুখ্য ভূমিকা ভারতের সকল ধর্মের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে এর প্রভাব সর্বজনবিদিত-তথ্য। যোগের বিভিন্ন ধরণের আত্মতাত্ত্বিক উদ্ভবের মধ্যে একটি বস্তু সর্বক্ষেত্রে এক, বৈষ্ণব, শৈব, ব্রহ্মবিদ বা নিরীশ্বরবাদী কিংবা অতীন্দ্রিয় মোক্ষকামির বহু বিভিন্ন ধারণার মধ্যে একটি মূল সুর আছে। এই যোগভ্যাসকারীর লক্ষ্য হল একটা ঐশী শক্তিলাভ যদ্বারা অনমনীয় মানসিক শান্তি ও চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করা যায়।

ভারতীয় মানসে এই চিন্তা কত গভীরে প্রবেশ করেছে তা এই প্রকৃত তথ্য থেকে দেখা যাবে যে শুধুমাত্র ধর্মীয় সম্প্রদায় বা রহস্য-বাদী অধ্যাত্মিক পদ্ধতি মুক্তির পথ হিসাবে ধ্যান ধারণার প্রশংসা করেন তা নয়। স্বাভাবিক দর্শনের শাস্ত্র 'ন্যায় বৈশেষিকী' বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার প্রতি অভিমুখী এবং অধিকতর মাটি ঘেঁষা হলেও এই বিষয়টিকে উড়িয়ে দেয় না। যোগ ব্যায়ামকে তাঁরা বিশেষভাবে গ্রহণ করতে বলেন কারণ তা মানসিকতার গঠনে সহায়ক। এতদ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় যা পরিশেষে ব্যক্তিগত আত্মাকে মানস থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে।...

যদি কেউ উপ-মনস্তত্ত্বের ক্রিয়াকে ব্যাপকভাবে অলৌকিক ও আধি-ভৌতিক বিজ্ঞানের সমীক্ষা মনে করেন, যথা স্বপ্নতত্ত্ব বিশ্লেষণ, ভবিষ্যৎবাণী ইত্যাদি তাহলে বলতে হবে ভারতীয়রা দীর্ঘকাল ধরে এই বিষয়ে সক্রিয়। অবশ্য এর মধ্যে বিচারমূলক বিবেচনার চেয়ে উদ্ভট এবং গোঁড়ামির পরিচয়টাই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। বিশেষভাবে এঁরা স্বপ্নতত্ত্ব বিশ্লেষণ স্মরণাতীত-কাল থেকে লালন করে এসেছেন।

অসংখ্য পণ্ডিত ব্যক্তি যোগের উপযোগীতা বিষয়ে গদগদ হয়ে বলেছেন, এবং অনাবিষ্কৃত মানবিক উৎসের মুক্তির প্রয়োজনে যোগ প্রক্রিয়া ব্যবহারের সর্বান্তঃকরণে প্রশংসা করেছেন। তথাপি প্রশ্ন থেকে যায় পাশ্চাত্য মনোভাবের কাছে এর আবেদন প্রয়োগ একেবারেই সম্ভব কিনা অথবা অর্ধ-উপলব্ধ বিষয়-গুলি বিভ্রান্তি এবং ব্যাভিচারে পরিণত হবে না। এই প্রসঙ্গে হেনরী বারভেন একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন তাঁর এক গ্রন্থে, তিনি পাশ্চাত্য প্রজ্ঞার কাছে যোগের পদ্ধতি ও প্রকরণ এবং সমগ্র জীবয়াববে তার প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন :

> জাতি ও ধর্ম নিরপেক্ষভাবে মরমী আবেগ সর্বকালে মহান ব্যক্তিত্বের কাছে দাবী করেছে তার অধিকার আদায়ের—যাঁরা তাঁদের আত্মিক গঠনের জন্য—প্রতিভাধর মানুষের মত অনুভূতির অনন্ত নিশ্চিতকে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছেন তাদের সৃজনশীল শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে। যাঁরা সিদ্ধিলাভের প্রয়াস করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রজালের শক্তি, অর্জনের চেষ্টা করেন স্বার্থপর আত্মশক্তি লাভের তৃষ্ণায় বা নিছক উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াসে যাঁরা যোগসাধনা

করেন তাঁদের পক্ষে এর বিপদকে কোনোমতে লঘু করে দেখা ঠিক হবেনা। কোনও ব্যক্তি অ-স্বাভাবিক শক্তি লাভের জন্য বল প্রয়োগ করতে প্রয়াসী এই সব শক্তি হল সম্মোহণ, উচাটন প্রভৃতি। অপরে নানা প্রকার মাদক সেবন করেন অর্থাৎ আফিম বা গঞ্জিকা কৃত্রিম স্বর্গরাজ্য লাভের আশায়, প্রকৃতপক্ষে সমাধি লাভের এর কিছু করার নেই। নিশ্চিত ভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে এই উপায়ে 'আত্মার বন্ধন শিথিল' হয় কিন্তু এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল আত্মার বিকৃতি। এই জাতীয় পরীক্ষ-নিরীক্ষ যোগের সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু। প্রকৃত যোগ এক উচ্চতর চেতনার দ্বারা চিহ্নিত, তার মধ্যে কোনো রকম বিভীষিকা দর্শন, জীবয়াববের বিকৃতি ঘটে এবং ব্যক্তিত্বের বিকার হয়।

যোগের চিকিৎসা শাস্ত্রীয় ও ব্রহ্মা বিদ্যাগত দিকটি অনেক ব্যক্তিকে কুলকুণ্ডলীনির সন্ধানে আকৃষ্ট করে, যোগ সর্প শক্তি যৌন আবেগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত। বারভেন এইখানেও এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন:

> তান্ত্রিক অতিন্দ্রীয় দর্শনের এই দিকটি উল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন, এ শুধু দীক্ষিত মানুষের দ্বারা সম্বোধিত হওয়া উচিত, কিন্তু অনেক একক ক্ষেত্রে অতিশয্যের ফলে পথ বিচ্যুতি ঘটেছে। উপযুক্ত ভাবে যদি বোঝা যায় তাহলে অতিন্দ্রীয় বিচারে 'সতীত্বে'র ধারণায় যৌন সঙ্গম নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু এর পবিত্র চরিত্রটি স্বীকার করা প্রয়োজন যৌন আবেশ থেকে মুক্তি লাভের জন্য।

এই সব ব্যাপার আমাদের কাছে ব্যাপক ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এই অনুমতি সমৃদ্ধ যুগে এসব প্রায়ই অতি লঘুভাবে বিবেচিত হয়। এর সংকট টুকুর মোকাবিলা করতে হবে, যদিও যেকব ভিলহেলম হয়ের যিনি উত্তম প্রাচ্যবিদ হলেও নিকৃষ্ট চার্চ-নীতি নির্ধারকে পরিণত হন, এই বিষয়টি অতিরিক্ত অনুমোদন দ্বারা বিচার করেছেন।

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে একটা বৈজ্ঞানিক অনুশীলন হিসাবে যোগ সার্থকভাবে গ্রহণ যোগ্য এবং এ এক মানসিক শৃঙ্খলা নীতি। তথাপি এই বস্তু অনুশীলিত হয়—তান্ত্রিক-ইন্দ্রিয়জ আচারগুলি মূলবস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিভিন্ন ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়—মুক্তির পথ প্রমাণ করে যে মানব সমাজের ঐতিহাসিক ধারা এবং তাদের সংস্কৃতি ঠিক যথাযথভাবে বোঝা

যায়নি। এই কারণে কার্ল ব্রোগায়ের লিঙ্গাত্মক সঙ্গীত একটা নতুন প্রজন্ম রচনা করবেনা কারণ তা অতি প্রাচীন এক আদিম সমাজের কালকে স্মরণ করে আনে।

এই সত্যকে আমাদের নজর এড়ালে চলবেনা যে মানুষ এবং বস্তুকে শুধু মাত্র দূর থেকে সঠিকভাবে বিচার করতে হবে। এই দিক থেকে একজন মহান্ পণ্ডিত যিনি প্রাচ্য প্রজ্ঞা এবং পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষ করেছেন তাঁর ভাষায় মন্তব্য উধৃত করা প্রয়োজন :

> প্রাচ্য-জগতের মূল্যবান উপহার সামগ্রী কেবল মাত্র উপযুক্ত দূরত্ব থেকে প্রকৃত আস্বাদ গ্রহণ সম্ভব। এই কাজ করলে, তা থেকে আমরা নান্দনিক উপভোগের চেয়ে কিছু বেশী পাব, অর্থাৎ প্রকৃত সমৃদ্ধিলাভ হবে।

এই দূরত্ব থেকেই সুমহান চিকিৎসক ও দার্শনিক আলবার্ট সোয়াইৎসার ভারতের অধ্যাত্ম জগৎকে স্পর্শ করেছেন।

ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট দর্শনের ক্ষেত্র জার্মানরা যে সমীক্ষা করেছেন তা এখানে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হয়েছে মাত্র। যে সব নামের তালিকাদান করা হয়েছে তার সঙ্গে আরো অনেক নাম যুক্ত করা যায়; এবং এই একই কথা বিজ্ঞানের অপর বিভাগ সম্পর্কে প্রযোজ্য।

ব্রোক হাউস, ভাইসেনবোর্ণ, ভোগৎ, হাস, থিব, সাইমন এবং মুল্যর প্রভৃতির নাম অন্যান্যের মধ্যে উল্লেখ্য। যে জাতি পৃথিবীকে 'শূন্যে'র অলৌকিক উপহার দান করেছেন তাঁরা প্রসিদ্ধ রেখেনমাইসটার (অর্থাৎ অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিত) এডাম রীস প্রভৃতির দেশ জার্মানীতে অজস্র বন্ধু পাবেন। এই সব মনীষীদের স্বজাতিরা সংখ্যা গনিতের প্রতি সমান প্রীতি সম্পন্ন।

অঙ্কশাস্ত্র যেখানে সচেষ্ট সেখানে জ্যোতি বিদ্যা ও জ্যোতিষ শাস্ত্র অতি সন্নিকটস্থ বস্তু। এখানেও, বহু সংখ্যক পণ্ডিত অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা কর্মে নিযুক্ত আছেন।

ওয়েবার, জ্যাকোবি এবং কোহল থেকে নিউগেবয়ের, ওলডেনবার্গ, এবং থিব থেকে ভ্যান ডি ভায়েরডেন প্রভৃতি জার্মান লেখকবৃন্দ নক্ষত্রের বিজ্ঞান এবং তার ব্যাখ্যা করেছেন। সেই সব জার্মানগন যাঁরা জ্যোতিষ প্রিয় জয়-পুরের মহারাজের দরবারে ছিলেন তাঁর কথা পরে আলোচিত হবে। সেভেরিণ নোটি এই রাজ-জ্যোতিষীকে একটি বিস্তারিত গ্রন্থের বিষয় বস্তু করেছেন।

দীর্ঘকাল ধরে জয়পুরের গোলাপি রঙের শহর জার্মান জ্যোতির্বিদ ও ভারতীয় পণ্ডিতগনের মিলন ক্ষেত্র ছিল।

চিকিৎসা তত্ত্ব ভারতীয়দের কাছে একটি মৌলিক বিজ্ঞানের বস্তু এবং দ্যুলোকস্থ তারামণ্ডল মানুষের স্বাস্থ্য ব্যাপারে একটা প্রভাব বিস্তার করে—এ সব আবার গভীর ভাবে পাঠযোগ্য বিষয়বস্তু। রসায়ন ও কিমিয়া বিষ্যার মত বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে কম ঘনিষ্ঠ নয়। যদিও প্রকৃত প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান মাত্র আটটি শাখার সমাবেশ (শারীর বিজ্ঞান, অস্ত্র চিকিৎসা, চক্ষু ও কর্ণ সংক্রান্ত ঔষধ, মাদক বিজ্ঞান, যাদু চিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা, জীবনের প্রাণরস বিষয়ক সমীক্ষা এবং কামকলা বিষয়ক চিকিৎসা) এবং তার প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী।

জলি থেকে কারফেল ছাড়িয়ে লিপম্যান পর্যন্ত অনেক নাম পাওয়া যাবে যাঁরা ভারতে গিয়েছিলেন আধুনিক পদার্থ ও রসায়ন বিষ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান ও আবিস্কারের আশায়।

জার্মান গবেষক রাসায়নিকরা সর্ব সময়েই ভারতবর্ষে বিশেষ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠ। অতীতে তাঁরা টাটার ব্যবসায়ে কাজ করেছেন; বর্তমানে গুরুত্ব জার্মান ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ভারতের শহরগুলিতে শাখা কার্যালয় খুলেছেন। যেমন বেয়ার কোম্পানীর রাসায়নিক কারখানার বোম্বাই শহরে সুবৃহৎ অ-য়ুরোপীয় কারখানা আছে। হোয়েখষ্ট্, বি এ এস এফ (বাদিসখে এনিলিন—উনড্ সোডা ফ্যাবরিক), হুলস্, হোয়রিংগার এবং সেরিং (জার্মান রেমিডিস এই সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান) প্রভৃতি সংস্থাগুলি ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারি ব্যবসার সম্পর্ক রেখেছেন।

আনবিক যুগও তার গোড়ার দিকে প্রতিক্রিয়া ভারতে ঘটেছে। সেই ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে একজন জার্মান রসায়নবিদ্ সি, ডব্লু, সখোমবার্গ মোনাজাইট আবিস্কার করেন মালাবার উপকূলের কৃষ্ণ বর্ণ বালুকা রাশিতে। তখন সেই অঞ্চল ছিল ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ পরিবারের অন্তর্ভূক্ত। মোনাজাইট সিরিয়াম ধাতুর ফসফেট, এর থেকে অন্য অনেক বস্তুর সঙ্গে থোরিয়াম নির্গত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে চার হাজার টনের মত মোনাজাইট জার্মানীতে রপ্তানি করা হয়। যুদ্ধের পর এই সংখ্যা দু হাজারে দাঁড়ায় এবং ত্রিশের দশকে পাঁচ হাজারে বৃদ্ধি পায়। থোরিয়ামের রণ-কৌশল মূল্য নির্নীত হওয়া মাত্র স্বাধীন ভারত মোনাজাইট রপ্তানি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের

ক্রিসমাস ইভের দিন প্রধানমন্ত্রী নেহরু আলায়াই নামক অঞ্চলে এই বহুমূল্য মৃত্তিকার শোধন কর্মের জন্য একটি কারখানা উদ্বোধন করেন। ফরাসী এবং জার্মান কারিগরগন তাঁদের প্রতিভাকে সংযুক্ত করে আনবিক শক্তিকে শান্তির কর্মে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে কাজ করছেন।

পূর্বে ভূ-তাত্ত্বিকদের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁদের পর আর বিস্তৃত এবং পরিপূরিত হতে পারে ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদ্যাবিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধের উল্লেখ করে।

পরিশেষে, কাম বিজ্ঞানের অনুবাদকদের এইখানে উল্লেখ করা যায়, গ্লাসেনাপ বেদান্ত-তাত্ত্বিক মধুসূদনের উক্তি উধৃত করে বলেছেন কামশাস্ত্র আয়ুর্বেদের অঙ্গ। এইভাবে, দৈহিক প্রেমের বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যার কাছে নতি স্বীকার করেছে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের উত্তরাধিকারে। মধুসূদনের মতে পাঠ্যপুস্তকের উদ্দেশ্য হল—"কাম ব্যাপারে অতিমাত্রায় মত্ততাকে পরিহার করার শিক্ষা এই শাস্ত্র দান করে কারণ এর ফলে পরিণামে ক্লেশ ভোগ করতে হয়।"

এই পরিচ্ছদটি চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয় নিয়ে সরু করা হয় তথাপি যে অসংখ্য নার্স এবং চিকিৎসকবৃন্দ (ব্যাক্তিগত ভাবেই হোক বা কোনো ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে) ভারতে অসুস্থ রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের উল্লেখ করা হয় নি। অসংখ্য আত্মত্যাগী হিমালয়ে কর্মরত জার্মান নানদের বিষয়, আসাম, রাজপুতানা প্রভৃতি ধর্মীয় সেবাব্রতী, কিংবা সিসটার উরশুলা আইখষ্টাডট যিনি ওড়িষ্যার জঙ্গলের এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের জননী সমা অথবা কুইলনের কোট্টায়ুম অঞ্চলে যিনি অনেকগুলি বৎসর কাটিয়েছেন সেই হুবার্ট রগেনডর্ফের কথা আলোচনা করা যেত। তাঁদের কাহিনী, এবং তাঁদের মত আরো অনেকের কাহিনী দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ভরানো যায়। তথাপি যাঁরা বলতে পারেন তাঁরা ওঁদের কর্ম বিষয়ে বলবেন মনে হয় না, এরা অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে নীরবে কাজ করতে ভালোবাসেন।

> যেখানে মানুষ শুধু মাত্র পারস্পরিক নিধন এড়াবার উদ্দেশ্যে শান্তি রক্ষা করতে চায়, মানব সমাজের বাসের পক্ষে সেই জগৎ যথাযোগ্য নয়। যুদ্ধের ফলে, আমরা মানুষের দুর্দশা ও দুঃখ ভোগের অন্তহীন দৃষ্টান্ত দেখেছি; অনেক জাতি পরস্পরের মধ্যে প্রাচীরের আড়াল রচনা করে বাস করেছে। যে প্রাচীর পারস্পরিক ঘৃণা এবং অবিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত। আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সত্ত্বেও মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে দূরত্ব যেন বেড়েই চলেছে। বিদ্বেষ পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রচারণা এখন আর যখন তখন মেরামত করা যায় না। তথাপি, আমরা অতীতের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছি, ক্রমশঃই বোধগম্য হচ্ছে যে আমাদের এই জগৎ শুধুমাত্র সহযোগীতার ভিত্তিতেই টিকে থাকতে পারে।
>
> কার্ডিনাল জুলিয়াস ডোপফনার
> (বোম্বাই শহরে ৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৪ প্রদত্ত ভাষণ)

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিশনারীরাই সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক বিনিময় সাধন করেছেন। ক্রিশ্চান এবং অ-ক্রিশ্চান ধর্ম বিশ্বাসী উভয়দের পক্ষে একথা প্রযোজ্য। যেমন সম্রাট অশোকের পুত্র সিংহলে বুদ্ধের বাণী প্রচার করেছিলেন। পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে অধিকাংশ ভারতীয় সাংস্কৃতিক বন্ধন বৌদ্ধ এবং হিন্দু সন্ন্যাসীদের পরিশ্রমের ফসল। আধুনিক ভারত বিদ্যা এবং প্রকৃতপক্ষে ভারত বিষয়ক সর্বপ্রকার পঠন-পাঠন মিশনারীদের কর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

এইখানে ত্রানকুয়েবরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—সেখানে প্রোটেস্টান্ট মিশনারীরা "ত্রানকুয়েবর স্পিরিট" বা ভাবধারায় লালিত আজও তামিলনাড়ে মার্টিন লুথারের অনুগামীদের এই ভাবে সংযুক্ত করেছে।

আমরা দ্রাবিড় দক্ষিণ-ভারতীয় মিশনারী পণ্ডিতগনের কথাও উল্লেখ করেছি। কোরমণ্ডল উপকূলস্থ তাঁদের প্রোটেস্টান্ট ভ্রাতৃবৃন্দের মত তাঁরাও

তাঁদের অধ্যাত্ম জগৎকে গড়ে তুলেছেন এবং তুলে ধরেছেন মালাবার উপকূলস্থ তাঁদের শ্রোতাদের জ্ঞানবর্ধনের জন্য।

এখন এই দেশের উত্তরাঞ্চলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। সপ্তদশ শতাব্দীতে জেসুইট সম্প্রদায়ের জার্মান শাখা সমুদ্র পারে মিশন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সক্রিয় মিশনারীগন কর্তৃক প্রেরিত রিপোর্ট হাতে-হাতে প্রচারিত হত এবং বিশেষ ভাবে পড়া হত। এই সব স্বপ্নদ্রষ্টাদের মধ্যে ছিলেন একজন তরুণ জেসুইট, এই সোসাইটির জেনারেল মুটিউস ভিটেলসখিকে প্রেরিত তাঁর চিঠিখানি সংরক্ষিত করা হয়েছে। বেদনাকর ত্রিশ বছরের যুদ্ধের প্রাক্ মুহূর্তে ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে এই চিঠি লিখিত হয়। এই যুদ্ধ দুই পক্ষের কাছেই ভীষন ক্ষতিকর হয় এবং অবর্ননীয় দুর্দশার কারণ হয়েছিল। ফ্রিডরিশ ফন স্পী, যিনি এই পত্র লেখক, তাঁর তখন বয়স মাত্র সাতাশ বছর। তাঁর পত্র খানি সেই কালের তরুণদের স্বপ্ন ও অভীপ্সার এক নিদর্শন।

> অনেক দিন ধরে, প্রকৃত পক্ষে আমার শৈশব থেকে আমি এক প্রচ্ছন্ন আগুনে জ্বলেছি, তাকে দমন করার সকল প্রকার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে তা বার বার শিখায় পরিব্যপ্ত ; ভারতবর্ষ আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। আমার মাতা-পিতা আমার মনকে অন্য পথে চালিত করার চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁরা বেশী দিন আর তা করতে সক্ষম হলেন না। পুরাতন ক্ষত আবার উন্মুক্ত হল ; প্রায় অন্য কোনো কিছুই আমাকে এই সোসাইটিতে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করেনি। কিছুকালের জন্য আমি মাথা ঠাণ্ডা করে রইলাম কিন্তু আমি লক্ষ্যচ্যুত হইনি। তারপর এই সেদিন সোসাইটিতে প্রেরিত হে পিতৃপুরুষ আপনার (Your Paternity-এই সম্বোধন আছে) পড়ে শোনানো হল। আর একবার ভারতবর্ষের কথা উল্লিখিত হতে আমার হৃদয় বিদ্ধ হল। হে পিতৃপুরুষ আমার ক্ষত স্থান উন্মুক্ত করা ছাড়া আমি আর কি করতে পারি ?

জেসুইট ডিকসনারী, দি সোসাইটি অব যীশস, পাষ্ট অ্যাণ্ড প্রেসেণ্ট—সপ্তদশ শতাব্দীর জার্মান জেসুইটদের বাসনা বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রচারক-লেখক জোসেফ ষ্টকলেইন Der neue Weltbott (নব জগৎ বার্তা) নামক একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন (১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে থেকে

অগসবার্গে এবং গ্রাটে ভীথ কর্তৃক প্রকাশিত) ভারতবর্ষে যাজক পণ্ডিতগণ কর্তৃক কর্মকাণ্ড বিষয়ে এই গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট আকর-গ্রন্থ। সর্বোপরি স্টকলেইন ভারত থেকে প্রেরিত ফাদার এনড্রিয়াস স্ট্রবোলের লিখিত পত্রাবলী প্রকাশ করেন। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয় এবং ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নারওয়ারে তাঁর মৃত্যু ঘটে। আরেকজন যাজক যিনি ভারতে সক্রিয় ছিলেন তাঁর নাম বার্নহার্ড বিশচপনিক। তিনি ওয়েস্টফালিয়ার মানুষ এবং ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মালাবার উপকূলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মর্মালাপুরে জার্মান-হাঙ্গেরীয় যেকব হুসেগারের মৃত্যু হয়। জার্মান-চেক কার্ল গ্রৎসিক্রিল গোয়াতে কাজ করেছেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে (১৭৮৫ খ্রীঃ) আর ম্যনিখের ক্রিডরিশ জেখ ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃতুকাল পর্যন্ত পার্ল কোষ্টে ছিলেন। প্রথম প্রজন্মের মিশনারীরা ছিলেন প্রখ্যাত পাণ্ডিত শ্রেণীর, যোশেফ স্তাইফেন টলার (১৭১০-১৭৮৫ খ্রীঃ) একজন প্রথম শ্রেণীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং ভৌগোলিক-তিনি জয়পুরে সক্রিয় ছিলেন। হিন্দুস্থানের আধুনিক ভৌগোলিক বিবরণের তিনি রচনাকার। এই গ্রন্থটির ফরাসী অনুবাদটির বিশাল পাঠক সম্প্রদায়। তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম ভারতীয় গণিতবিদ্যা, এবং ভারতের বিভিন্ন তীর্থগুলির প্রসঙ্গেও গ্রন্থ রচনা করেছেন।

যে সব পণ্ডিতবর্গ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অবদান রেখে গেছেন তাঁদের স্বীকৃতি লাভে বিলম্ব ঘটেছে, সেভেরিণ নোটি তাঁদের রচনাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ না করা পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল, তিনি শিল্প রসিক জয়পুরের মহারাজ জয়সিংহের (দ্বিতীয়) ক্ষেত্রেও অনুরূপ কাজ করেছেন। জ্ঞান অন্বেষনে নিবেদিত প্রাণ এই মানুষটির প্রতিটি কর্ম "উদার মনোভাবের পরিচায়ক"। এই দেশীয় শাসকটি তাঁর রাজধানীকে প্রকৃতপক্ষে জার্মান বিজ্ঞান কেন্দ্রে পরিণত করেন।

এইখানে ফাদার হাইনরিখ রোথের নামও উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম এবং ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে প্রথমতম জার্মান সংস্কৃত পণ্ডিত বলা যায়। তিনি যে সংস্কৃত ব্যাকরণ রেখে গেছেন তা কোনো দিন মুদ্রিত হয়নি অথচ ম্যাকস মূলর গ্রন্থটিকে "opus-exacti ssimum" বা যথাযথ মহাগ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন। আথানেসিয়স কারবারের China Illustrata নামক গ্রন্থে রোথ পাশ্চাত্য জগতের কাছে দেবনাগরী অক্ষর পরিচিত করেন।

প্রকৃত পক্ষে যেশুইট পণ্ডিতবর্গের নামগুলির অন্তহীন উল্লেখ করা সম্ভব। আলেকসান্দার বোমগার্টনার (১৮৪১-১৯১০) রামায়ন এবং রাম-সাহিত্য বিষয়ে লিখেছেন। সাধারণভাবে ভারতীয় রচনাবলীর এক সুবৃহৎ সমীক্ষাও তিনি রেখে গেছেন। জার্মান যেশুইটরা বোম্বাই শহরের এপষ্টলিক ভিকারেজ গ্রহণ করার পর ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজকে ভারতের এক মুখ্য শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করলেন। এইখানে 'জার্মান যুগের' স্মৃতি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এইখানে যাঁরা সব কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। যথা কীটতত্ত্ববিদ যোশেফ এ্যসমুথ, ফাদার্স সীয়েরপ এবং ষ্ট্রাইকেন। ষ্ট্রাইকেন উষ্ণ-প্রস্রবণ অঞ্চলে রেডিও এ্যাকটিভিটি বিষয়ে গবেষণা করেছেন আর ফাদার ব্রাটার উদ্ভিদতত্ত্বের ক্ষেত্রে ভারতের মুখ্য অধিকারী ব্যক্তিদের অন্যতম।

এইখানে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এলফোনস কাথ্ এর উল্লেখ প্রয়োজন। তাঁর কাছে ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ক গবেষণা ছিল পেশা ও বৃত্তি। কাথ্ সেই প্রজন্মের ঐতিহাসিকদের অন্যতম যাঁরা নিরন্তর ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন। আরেকজন হলেন কার্ল জোপেন তিনি Historical Atlas of India বা ভারতের ঐতিহাসিক মানচিত্র উপহার দান করেছেন।

চীনা এবং ভারতীয় ভাষায় প্রাচ্য বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে যোশেফ ডালমানের মধ্যে সমাবেশ ঘটেছিল। বৌদ্ধধর্ম, মহাভারত অথবা সাংখ্য দর্শন বিষয়ে এবং ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস বিষয়ে তাঁর রচনাবলীর মধ্যে তাঁর গবেষনার ব্যাপকত্ব প্রকাশিত। ভবিষ্যৎ ব্যাপারে ভারতের মহান্ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর প্রচণ্ড আশা ছিল ইস্রায়েল, হেলাস এবং রোমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এক চিরস্থায়ী মিলন সম্ভব হয়েছে।

যোহান বি হফমানের (১৮৫৭-১৯২৮) স্বার্থহীন কর্মের উল্লেখ প্রয়োজন—তাঁকে ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের পিতৃ পুরুষ বলে উল্লেখ করা হত। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ধীরে ধীরে ছোটনাগপুরের আদিবাসীগনের বাজকীয় এবং বুদ্ধিগত প্রধান হয়ে উঠ্লেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে হফমান মুণ্ডা ও ওঁরাওদের ভূমিসত্ত্ব বিষয়ক এক বিল প্রণয়ন করেন সেই বিলটি পাশ হয়ে পরে ইঙ্গ-ভারতীয় সরকার কর্তৃক আইন ভূক্ত হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে একটি খসড়া বিলের বিরোধীতা করে তিনি একটি সমবায় বিপনী উদ্বোধন করলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই বিপনী সরকারি স্বীকৃতিলাভ করে।

রাষ্ট্র তখন নির্দেশ দিলেন যে সব সমবায় সমিতিকে 'হফমান পদ্ধতি'তে রূপদান করতে হবে। ফাদার হফমানকে আবার ভারতীয় সমবায় ব্যবস্থার জনক বলা যায়। মুনডারি বিশ্বকোষে এই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পণ্ডিত মুনডারি জাতির স্মরণে স্মৃতি সৌধ রচনা করলেন।

এই বিশ্বকোষ সংক্রান্ত কর্মে তিনি আমরণ ব্রতী ছিলেন। তাঁর মুনডারি ব্যাকরণ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

প্রসঙ্গত: বেনেডিকটিন টমাস ওমের কথা উল্লেখ করা যাক। এই পণ্ডিত বিশ্লেষনী ধারায় এবং আত্ম সমালোচনা বিরহিত না হয়ে এশিয়া ও পাশ্চাত্য জগতের তুলনা করেছেন, আর ডাঃ সি বেকার আসামের প্রিফেকট যিনি জাতি-ভেদ প্রথা নিয়ে গবেষণা করেন বিজ্ঞান ও মানবিকতার ভূমিতে দাঁড়িয়ে। Anthoropos নামক পত্রিকাটির প্রতি প্রশংসাবাক্য প্রয়োগ করা প্রয়োজন, এবং সেই সঙ্গে Anthoropos Institute কে তাদের জাতি-সংযোজক ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য প্রশংসা কর্তব্য। এই ইনষ্টিট্যুটের ভারতীয় শাখা হিমালয় উপজাতি এবং ভারতের আদিম মানব বিষয়ে গবেষণা বিশেষজ্ঞ। ভিলহেলম কোপার্স ভীলদের সম্পর্কে একটি রিপোর্ট রচনা করেছেন, এদিকে মাথিয়া হেরমানস একক আদি জাতিদের ধর্মীয় ম্যাজিক বিষয়ে পরিকল্পিত গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেছেন। প্রথম খণ্ডটিতে ভাগোরিয়া ভীলদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, এরা এক চমকপ্রদ জাতি, ব্যাপক ভাবে চারদিকে ছড়িয়ে আছে, বিচ্ছিন্ন হলেও কিন্তু এরা বেশ ঐক্যবদ্ধ, এর নামকরণ করা হয়েছে 'ভীল কম্‌প্লেকস' বা ভীলদের সমাজ। ষ্টেফান ফুখস্‌ এবং ক্লাউস ক্লষ্টারমেয়ার নামক দু'জন সুপণ্ডিত খ্রীষ্টান সাধু ইনডিয়ান এনথ্রোপোস ইনষ্টিট্যুটের সুনামের জন্য দায়ী। তাঁরাও এই বিষয়ে গবেষণা করেছেন।

অতীত ও বর্তমানে যে সব যাজক সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষ ভারতবর্ষে সক্রিয় কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে সম্বলপুরের বিশপ নামে খ্যাত এইচ, ওয়েষ্টারমান, এস, ভি, ডি উল্লেখযোগ্য। তিনি 'Missa Cranta' বা রবিবারের প্রার্থনা তাঁর যাজক সমাজে আমদানি করেন। অজস্র হিন্দি স্তোত্র ও প্রার্থনা রচনা করেছেন। বোম্বাই শহরের আর্চ বিশপ জুরপেনস তাঁর কালের পক্ষে এক আদর্শ শিক্ষা পদ্ধতি গঠন করেন। বার্লিনের লিও মেট্রিন বোম্বাই ও মালাবার কোষ্টের এপষ্টলিক ভিকার হিসাবে Pastoral Gazette ও Indian

Messenger নামক পত্রিকা দু'টি প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ ভারতে যিনি খৃষ্টধর্মীয় আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করেন তিনি হলেন আর্চ বিশপ এলয়স মারিয়া বেনজিগের—মালায়ালম ভাষা ও সিরিয় মালাবার আচার অনুষ্ঠান বিষয়ে তিনি একজন অধিকারী ব্যক্তি।

মিশনারি আন্দোলনের প্রোটেষ্টানট শাখা, যার উত্তর ভারতীয় ত্রানকুয়েবর হল শ্রীরামপুর. অনুরূপ প্রতিভা সম্পদের পরিচয় দান করেছেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজটিকে রয়্যাল-ড্যানিস নির্দেশে য়ুনিভার্সিটি পর্যায়ে উন্নীত করা হয়।

শ্রীরামপুর ছিল ড্যানিস অঞ্চল এবং এখনকার ড্যানিস সম্রাট ছিলেন ডিউক অব শ্লেসভিগ্ এবং হোলষ্টিন, শ্রীরামপুরের তখন নাম ছিল ফ্রিডরিকসনগর, এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কীয়েল ও কোপেনহাগেনের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হল। এই কথা বিশেষ আগ্রহ সঞ্চয় করে যে ভারতের সর্ব প্রথম আ্নিকতম বিশ্ববিদ্যালয় জার্মান ড্যানিস আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। উত্তর ভারতে শ্রীরামপুর ছিল মুখ্য মিশনারী কেন্দ্র কারণ ব্রিটিশরা তাঁদের অধিকৃত অঞ্চলে মিশন প্রতিষ্ঠার পথে বেশ বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ভাষায় যে সর্বপ্রথম সংবাদ পত্র (এই পত্রিকাটি বঙ্গভাষায় রচিত) —তা শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়। যিনি এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর নাম উইলিয়াম কেরী, তাঁকে প্রবল ভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁর স্ত্রী সার্লোট এমিলি জার্মান ভূমিতে যাঁর জন্ম। এর কুমারী পদবী রিউমোর, তিনি কাউণ্টেস এলকেলডর্টের কন্যা, শ্লেসভিগে এঁদের বাড়ি। এই পরিকল্পনায় তাঁর বেশ কিছুকাল আগ্রহ ছিল।

ভারতে প্রোটেষ্টানট ক্রিয়া কাণ্ডের প্রথম দিকের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক হলেন জে, জে ভিটব্রেসট, তিনি ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের পরিস্থিতি বিশেষতঃ বাংলার বিষয়ে সমীক্ষা করেন। যাইহোক বাসনের ধর্মতাত্ত্বিক ডব্লু, হফমান এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন— "...বাংলা দেশের পক্ষে যা প্রযোজ্য—হিন্দু জীবন ও চরিত্রের মধ্যে একটা সমতা থাকায় এই গ্রন্থ হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমভাবে প্রযোজ্য।"

এইচ মোগলিংগ এবং টি, ভেটব্রেসট তাঁদের গবেষণায় ভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে সমীক্ষা করেছেন। তাঁরা কুর্গ দেশ সমীক্ষা করেছেন।

তথাপি উত্তর ভারতে ত্রানকুয়েবরের শব্দ তাত্ত্বিক উত্তরাধিকারকে অবহেলা

করা হয় নি। প্রথম হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বি ‍শুলৎস কর্তৃক সংকলিত হয়। তখনও লেখক মারাঠি গুজরাতি এবং তেলেগু ভাষার উল্লেখ করেছেন।

প্রোটেষ্টানট অঞ্চলে ধর্মীয় ইতিহাস বিষয়ে বিস্তারিত সমালোচনামূলক সাহিত্য পাওয়া যায়। আলব্রেসট্ ওয়েপকে ভারত তীর্থ যাত্রীদের রচিত গ্রন্থাদি পরীক্ষা করেছেন—"এবং ভারতীয় মিশনকে লক্ষ্য করে যে সব আধুনিক সমালোচনার দুর্মুখি আগুন প্রজ্বলিত হয়েছিল তার মধ্যে প্রবেশ করেন।" পল গেনরিস ধর্মীয় প্রচারনার অসামান্য সম্পদের একাংশের সমীক্ষা করেন।

আধুনিক প্রোটেষ্টানটগন সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় যে বিশপ হানস লিলজে এক সরল এবং হৃদয়গ্রাহী উপন্যাসিকা রচনা করেন মহান্ মিশনারী ৎসাইগেন বালবোর জীবন কাহিনী অবলম্বনে। ফ্রিডরিশ হাইনার এবং রুডলফ ওটো সকল প্রকার জ্ঞাত ধর্মমত অন্তর্গত দিব্য জীবন সম্পর্কে ধ্যান ধারণা করেছেন। ফ্রিডরিশ হাইনার "হিবার্ট জার্নালে" প্রশ্ন তোলেন ক্রিশ্চানগণ কি ভাবে একযোগে কাজ করতে পারেন। ওটো উলফ্ ভারতীয় ধর্ম ও রাজনীতির প্রান্তসীমা বিষয়ে সমীক্ষা করেন। ভারত সম্পর্কিত তাঁর সমীক্ষায় তিনি গান্ধীর সময় থেকে রাধাকৃষ্ণণ পর্যন্ত আলোচনা করেছেন। সামান্য তথ্য থেকে কিভাবে অনেক সময় ইন্দো-য়ুরোপীয় যোগাযোগ বিষয়ে নতুন দৃষ্টিকোণ উন্মুক্ত হয়ে যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় আর্নষ্ট বেনৎস হারমোনিয়াম বিষয়ে এক বিশ্লেষণ ধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন। এই বাদ্যযন্ত্র ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। কুর্ট হুটেন এবং সিগফ্রিড ফন্ কোরৎসফ্লিসখ্ পুনর্জন্ম চিন্তা এবং মিশনারি কর্মে এশিয়াবাসীদের প্রচেষ্টা বিষয়ে এক দূর প্রসারী অনুসন্ধান করেছেন। ভালথার হেলিংগার ভারতীয় অঞ্চলে জার্মানরা যে সব প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন করেছেন সেই বিষয়ে একটি ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। য়ুরোপ এবং ভারতের মধ্যে সংলাপ বিষয়টি ধর্মীয় বুদ্ধিজীবি ভাবাপন্ন একআরডট্ চক্রের সদস্যগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়েছে।

আর তথাপি, খ্রীষ্ট ধর্মমতাবলম্বী জোব্বা পরিহিত পণ্ডিতগণ যতই মহৎ এবং শ্রদ্ধার পাত্র হন তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষাদান করা ও একটা আদর্শ স্থাপনা করা। তাঁরা আধ্যাত্মিক এবং জড় জগৎ উভয় বিধ ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত

সহায়তা করেছেন। "ধর্মীয় উন্নয়ন সাহায্য" ব্যাপারে ক্যাথলিক প্রচেষ্টা (এই বিষয়টি মুখ্যতঃ অধ্যাত্মিক ব্যাপার বলে গ্রহণ করতে হবে) Misereor নামক চার্চ সংগঠনের মধ্যে অভিব্যক্ত, অন্যদিকে প্রোটেষ্টানট প্রচেষ্টা "Brot fur die welt" (বিশ্বজগতের জন্য রুটি) নামক সংগঠনের মধ্যে যোগসূত্র রেখেছিল। অধ্যাত্মিক সামাজিক চিন্তায় অনুপ্রাণিত এই সব মানুষ এক সুগভীর ভাবে ধর্মীয় বাতাবরণে পুষ্ট সমাজে ধর্মীয় কর্তব্য পালনের বাহক।

হিমালয়ের ডাক

জার্মান পর্বতারোহী ওটো ই এলার্স সর্ব প্রথম নেপালের দিক থেকে মাউন্ট-এভারেষ্ট গিরিচূড়া আরোহনের পরিকল্পনা করার পূর্বে সমগ্র ব্যাপারটি উদ্ভট কল্পনা মাত্র ছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে নেপালের অনুমতি গ্রহনের জন্য তিনি উপস্থিত হলে আবিষ্কার ও পর্বতারোহনের ব্যাপারে সর্ব প্রথম সাড়া পড়ে যায়—এই অনুমতি অবশ্য তিনি আদায় করতে পারেন নি কারণ তখন নেপালের নীতি ছিল বিশ্ব-জাগতিক ব্যাপারে যথাসম্ভব নির্লিপ্ত থাকা।

—আর রাহুল (দি হিন্দুস্থান টাইমস : ১৩ই মার্চ-১৯৬০)

হিমালয় পর্বতারোহনের ব্যাপারে ভারতীয় লেখক আর রাহুল একজন মূখ্য অধিকারী ব্যক্তি—হিমালয় পর্বত পৃথিবীর সর্ব-বৃহৎ দুর্ধর্ষ পর্বতমালা। এই কারণেই তিনি জার্মান পথিকৃৎকে এই স্বীকৃতিদান করেছেন—চোমলুঙগম সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় অভিযানের প্রস্তুতি পটে লিখিত "দেশের এই দিব্য জননী" সম্পর্কিত প্রবন্ধটিকে হালকা ভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের এই সুপরিকল্পিত অভিযান ভারতে পর্বতারোহণের ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়।

পর্বতারোহীকে এই বিপজ্জনক পথে যে বস্তুটি আকৃষ্ট করে তা হলো দুঃসাহসিকতা ও শৌর্যের পরিচায়ক—সেই সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্যপ্রীতিও তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তিনি অজানার চাবীর সন্ধান করেন, পাহাড়ের রহস্য তাঁর একার কাছে উদ্‌ঘাটিত হোক এই তাঁর কাম্য ছিল। তারপর, হয়ত একান্ত একাকী এবং পরিচিত পরিবেশের সংরক্ষণমুক্ত হয়ে একটি অনাড়ম্বর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ঈশ্বরের সম্মুখীন হওয়াটা হয়ত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কারণ চূড়ান্ত অবস্থায় পর্বতারোহী হয়ত তাঁর অদৃষ্টকে নিরহঙ্কার ভঙ্গীতে ঈশ্বরের কাছে সমর্পন করতে চান। কারণ, যদিও সকলে ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন না। ঈশ্বরের প্রতি এই পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ফলে পর্বতারোহী তাঁর জীবনকে ঈশ্বরের করুণায় অর্পণ করতে পারেন। কারণ যদিও অনেকে হয়ত ঠিক অনুভব করতে পারেন না ঈশ্বরের প্রতি এই আত্মসমর্পনের

ইঙ্গিত অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও অনেক ক্ষেত্রে যাঁরা পর্বতাভিযান করেন তাঁদের চিন্তার মধ্যে পাওয়া যায়। হয়ত সকলে এই ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হবেন না কিন্তু পর্বতারোহীর উত্তুঙ্গ পর্বতারোহনের মধ্যে নিম্নতম সমতলভূমি থেকে কঙ্কর কঠিন পর্বতের চূড়ায় ওঠার মধ্যে মানবজীবনকে পবিত্রতার সুউচ্চ শিখরে নিয়ে যাওয়ার প্রতীক পাওয়া যায় না?

স্মরণাতীতকাল থেকে, হিমালয়কে ভক্তি ভরে দেবভূমি বা দেবতার ভূমি বলা হয়েছে।

বিশ্বাসীর কাছে পর্বতের মহিমাণ্বিতরূপ শক্তিময় দৈব মহিমার হিমায়িত রূপ বলে মনে হয়েছে, এই রূপ মানুষের কাছে সুদূরের ভীতি সঞ্চার করে। মানুষ যদি ঈশ্বরের কাছে তীর্থগমন করে দূরত্বের ব্যবধান হ্রাস করতে পারে তবেই সে অনন্তের সমীপ্য লাভ করতে পারে। তাঁর প্রার্থনা প্রস্তর-বিছানো দুর্গম পথের অগ্রগমণের দ্বারা লব্ধ অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে থাকতে পারে। অথবা এক নিরহঙ্কার মনের সিদ্ধান্ত হতে পারে যে সিদ্ধান্তের ফলে মানুষ সেই শিখরের অভিমুখে ধাবিত হয়।

জার্মানী এবং জার্মান ভাষী আলপাইন দেশ সমূহের তরুণ পর্বত-অভিযাত্রীদের কাছে হিমালয়ের বিশেষ আকর্ষণের হেতু কি হতে পারে? ১৯২০-তে কি ঘটেছিল যার ফলে তাদের মনে এশিয়ার এই তুরুঙ্গ পর্বতচূড়া আরোহণের সঙ্কল্প জেগেছিল? পল বয়ের যিনি পথিকৃতদের অন্যতম, তিনি এই বিষয়ে কি বলেছেন দেখা যাক:

> ১৯১৯-১৯৩৯-এর মধ্যে খুব সামান্য ঘটনাই ঘটেছে যা প্রথম মহাযুদ্ধের ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। জার্মান পর্বতা-রোহীদের হিমালয় অভিযানের পরিকল্পনার সঙ্গে এই ভাবনা সংযুক্ত। আমরা যখন যুদ্ধান্তে ঘরে ফিরলাম—যা কিছু আমার জীবনকে এবং এমন অনেক শত সহযোগী সৈনিকের জীবনকে গড়ে তুলেছিল তা চূর্ণিত হয়ে পড়ে। সেই আশাহীনতার কালে আমি পর্বতের কোলে আশ্রয় নিই। আমাদের চারপাশের নগর-গুলি যে বস্তু আমাদের কাছ থেকে অপহরণ করে নিয়েছিল পর্বত আমাদের তা প্রত্যার্পন করতে সুরু করল। ঈশ্বরের চিরন্তন শক্তি দিয়ে পর্বত আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করে তুলল। পর্বত আমাদের কাছে প্রমাণিত করল যে সাহস, সংগ্রামী মনোভংগী

এবং দুর্বর্বতার মধ্যে চিরন্তন মূল্যকে সপ্রমান করল। মোহভঙ্গের সেই দিনগুলিতে যখন আমাদের প্রয়োজন ছিল এমন কোনো বস্তুর যার দ্বারা আমাদের অদম্য শক্তি, দুর্বর্বতা এবং সক্রিয়তার একটা পরীক্ষা হওয়ায় তখন এই মহান সুউচ্চ পর্বতকে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য করার মত কোনো কিছুর প্রয়োজন আমাদের ছিল।

মধ্যযুগে হিমালয়কে ওলডটেসটামেণ্টের ম্যাগগ ও গগের প্রতীক বলে সবাই জানত। যে জার্মান সর্বপ্রথম পর্বতারোহণে দুঃসাহস প্রদর্শন করেছেন বলে নথীপত্র পাওয়া যায়, তিনি হলেন যাজক যোহান গ্রুবের—যে সব জার্মান পণ্ডিত পিকিং-এ সক্রিয় ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি সেখানে রাজকীয় আবহাওয়া অফিসে কাজ করতেন। সোসাইটি অব দি যীসুস-এর জেনারেল গোলউইন নিকেলের অনুরোধে ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রুবের ফা-হিয়েন এবং সিন সিয়াং প্রভৃতি চীনা-ভারতীয় পর্যটকদের পদাঙ্কনুসরণ করেন, স্থলপথে হিমালয় অতিক্রম করে ভারতে উপস্থিত হন। গ্রুবের যে সমস্ত ছবি রেখে গেছেন তার মধ্যে লাসার যে প্রাসাদ ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে বোধিসত্ত্বের পঞ্চম অবতার অবালোকিতেশ্বর, দালাই লামা লা-জাং (নাগ-দবাং ব্লো-বাজাং) কর্তৃক নির্মিত হয় তার ছবি পাওয়া যায়। বর্তমানকালের জার্মান হাইরিখ হারের সেই একই পর্যটন অন্যদিক থেকে সুরু করেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বহু সংখ্যক জার্মান ভাবী হিমালয় অভিযাত্রী দেখা যায়। প্রথমতমদের অন্যতম হলেন ব্যারণ কার্ল আলেকজাণ্ডার ফন হুগেল। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রোজেনবার্গে তাঁর জন্ম হয়, তাঁর কাছে আমরা চারখণ্ড কাশ্মীর এবং শিখদের ভূমির জন্য কৃতজ্ঞ। ইতিহাস সমীক্ষা বিষয়ক গ্রন্থাদি ব্যতীত হুগেল সবরকমের উদ্ভিদ্ সংগ্রহ করেন, এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কয়েকটি বোটানিক্যাল সোসাইটি স্থাপনা করেন।

আরেক নতুন ধরণের ভ্রমনকারি ছিলেন সখালজিনভিট ভাতৃত্রয়, এডলফ, হারমান এবং রবার্ট সখালজিনভিট এই তিনজন তাঁদের বিজ্ঞান প্রীতির সঙ্গে পর্বতারোহণের আনন্দকে সংমিশ্রিত করেছিলেন। এঁদের দুটি ভাই-এর মধ্যে এডলফ (১৮২৯-১৮৫৭) সেণ্ট্রাল এশিয়ার এক আকস্মিক সংঘর্ষে নিহত হন এবং হারমান (১৮২৬-১৮৮২) ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে আল্পসের মণ্টি-রোসা সর্বপ্রথম আরোহণ করেন। ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই তিন ভাই (রবার্ট—১৮৩৩-১৮৮৫) নর্দান ইণ্ডিয়ান ও সেণ্ট্রাল এশিয়ান অঞ্চল ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত

হয়ে সমীক্ষা ভ্রমণে ব্রতী হন। আবিষ্কার বিষয়ে এই ভ্রাতৃগণের লিখিত তথ্যাবলী থেকেই আধুনিক হিমালয় সাহিত্যের সূত্রপাত।

আরেকজন যিনি হিমালয়কে ভালবাসতেন এবং সেইখানে বার বার গিয়েছেন তাঁর নাম ফার্দিনান্দ ষ্টোলিৎসকা; তিনি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান জিওলজিক্যাল সার্ভিসে কাজ করেছেন। তাঁর কর্ম-সূত্রে তিনি আন্দামান ও নিকোবরে (১৮৬৯-১৮৭৬) ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করেছেন তবে বিশেষভাবে হিমালয়ের পশ্চিম অঞ্চলে (১৮৬৪, ১৮৬৫ ও ১৮৭২) পর্যন্ত সমীক্ষা করেছেন। অষ্ট্রিয়ান সম্রাট-এর কূটনীতিবিদ হিসাবে কাজ করার সময় ষ্টোলিৎসকা হিমালয় অতিক্রম করে ইয়ারখন্দে তুর্কী সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। লে নামক স্থানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়—কাশ্মীর অংশের লাদাকের এটি একটি মুখ্য শহর, এর নাম 'লিট্ল টিবেট' বা ছোটো তিব্বত।

ষ্টোলিৎসকার ভূতাত্ত্বিক গবেষণার উত্তরাধিকারী হলেন দুজন ভিয়েনাবাসী কার্ল লুডভিগ গ্রীয়েসবাখ (জন্ম ১৮৪৭) এবং কার্ল দিয়েনার (জন্ম ১৮৬২)। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার প্রধান হিসাবে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গ্রীয়েসবাখ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সরকারকে সর্বভারতে এক অন্যতম আধুনিক ধরণের শাসন পদ্ধতিতে সহায়তা করেন। গ্রীয়েসবাখের কাশ্মীরের মানচিত্র (১৮৯১) সেই কাল পর্যন্ত হিমালয় অঞ্চলের যতগুলি আংশিক মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিল। দিয়েনার ছিলেন একাধারে ভূতাত্ত্বিক ও হিমালয় অঞ্চল ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন তার উভয়বিধ বৃত্তি অনুসারে। এর ওপর তিনি ছিলেন একজন অভিযাত্রী পর্বতারোহী. ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গঙ্গার উৎস মুখ পর্যন্ত পৌছেছিলেন। তিনি একাই যে বিজ্ঞানের সঙ্গে পর্বতারোহন মিশিয়ে ছিলেন তা নয়। তাঁর পদাঙ্কনুসরণ যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে ম্যাকস রীসথ ভিয়েনা থেকে ভারতে মোটর সাইকেলে এসেছিলেন হিমালয় অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য। তাঁর সঙ্গে শুধু ছিল একজন শেরপা পথপ্রদর্শক। রিস্থ গুরলা মানডাটার শিখর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি অভিযাত্রীর পোষাকে টৈলাস পর্বত আরোহণ করেন। এই পর্বত হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছে পবিত্র।

সেই থেকে অসংখ্য লেখক হিমালয় সম্পর্কে লিখেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীরা এই উচ্চতায় আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছেন থাইকষ্টাভ অভিযান

(১৯২৭-২৯) হিমালয় অভিযান (১৯৩৮-৩৯) থেকে ১৯৫৬-৫৭ মেডেল অভিযান পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত।

মাথিয়াস হারমানস এবং রেণেফন নেবেসকী ভজকোভিজ প্রভৃতি লেখকবৃন্দ হিমালয়ের উপজাতিদের বিষয় সমীক্ষা করেছেন।

হিমালয় অঞ্চলে যে সব বহুমুখী শক্তি সক্রিয় তার সূত্র সন্ধানে বর্তমান লেখকের অবসান বিষয়ে উল্লেখ করার অনুমতি হয়ত পাওয়া যাবে। আধ্যাত্মিক দিক থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট থাকায় তার দ্বারা পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আকৃতির পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে কিছুকাল ধরে এসব অঞ্চলের ভাবগত এবং সাময়িক গুরুত্ব প্রবল ছিল।

হার্বাট টিখি আরেকজন বৈজ্ঞানিকও পর্বতারোহণের ব্যাপারে যুগ্ম উদ্যোগী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে পরে আরও বিস্তারিত ভাবে বলা হবে।

আমরা এখন কিন্তু পার্বত্য অভিযাত্রা সংক্রান্ত ব্যাপারে মাঝখানে আছি। ওটো ই এলার্স হিমালেয়ের সর্বত্র পর্বতারোহীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করেছেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে একজন ইংরাজ ডব্লু এম কনওয়ে কারাকোরম অঞ্চলে প্রথমতম পর্বতারোহণ অভিযান চালান। তিনি তাঁর সঙ্গে কয়েকজন সুদক্ষ পর্বতারোহী সুইজারল্যাণ্ড থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম মাথিয়াস জুরবিতোন পরে (১৮৯৭) আমেরিকান ভূখণ্ডের সর্বোচ্চ গিরিশিখর মাউণ্ট একোনকাগুয়া জয় করেন। তাঁর সঙ্গে হিমবাহ বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন এসেছিলেন, তাঁর নাম ও, একেষ্টাইন—তিনি হিমালয়ের হিমবাহের গঠন প্রকৃতি আবিস্কারে প্রয়াস করেন এবং হিমবাহতত্ত্বের (glaciology) একটি সংহত পদ্ধতির মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত করেন।

ব্রিটেনের ডব্লু ডব্লু গ্রেহাম এলহার্মের চেয়ে কম প্রভাবশালী ছিলেন না। তিনি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শিখরের অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং তাঁর বাসনা ছিল যে অপরে তাঁর অভিজ্ঞতার অংশ গ্রহণ করুন।

১৯২১-থেকে ব্রিটিশরা মাউণ্ট এভারেষ্ট আরোহণ করতে প্রয়াস করেছেন —১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাক্তন সার্ভেয়ার জেনারেল জর্জ এভারেষ্টের নামে এই পর্বতটির নামকরণ করা হয়।

সারা পৃথিবীতে বিশ্বের সর্বোচ্চ এই গিরিশিখর জয়ের প্রচেষ্টা সংক্রান্ত সংবাদ সকলে আগ্রহের সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। পরবৎসর জর্জ লে ম্যালরী

পুনর্বার এই প্রচেষ্টা করেন। ম্যালরী এভারেষ্ট শৃঙ্গ পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে অনুসন্ধান অসীম অধ্যবসায়ের সঙ্গে ১৯২৪-পর্যন্ত করেছেন। সেই বছর তিনি এবং তাঁর সঙ্গী ম্যানভি আরভিন অনন্ত তুষার ও বরফ রাশির মধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন, পর্বতের অজস্র শীকারের তাঁরা অন্যতম। বিশ্বের পর্বত অভিযাত্রীদের প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের মানুষ বলা যায়। একথা বলা যায় যে অজেয়উচ্চতা সম্পর্কিত তাঁদের সকলের প্রেম বহু অগ্রসর শিল্প সমৃদ্ধ দেশসমূহের সঙ্গে সরল প্রাচীন আদিবাসীদের সন্তানের মধ্যে বোঝাপড়ার সেতু রচনায় সহায়ক হয়েছেন।

উচ্চতম গিরিশিখর জয়ের প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির অন্যতম একটি লিখেছেন ভিলহেলম এমার। এই গ্রন্থে নাটকীয় ভঙ্গীতে ম্যালরী এবং আর্ভিন যে অভিযানে প্রাণ হারিয়েছেন তার বর্ণনা লিখিত হয়েছে। এই গ্রন্থটিকে ১৯৩৬-এর বার্লিনে অনুষ্ঠিত ওলিম্পিক গেমসে আন্তর্জাতিক/শিল্পপ্রতিযোগিতায় একটি রৌপ্য পদক দেওয়া হয়।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে মাউণ্ট-এভারেষ্ট জয় করার জন্য আরও একটি অভিযান আয়োজিত হয়। এই সর্বপ্রথম এই দল ব্রিটিশ পর্বতারোহী দ্বারা সংগঠিত হয় নি, হয়েছিল সুইসদের দ্বারা। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর তাঁরা নেপালী সরকারের অনুমতি পেলেন, ১৯১০-এ এই অনুমতি প্রার্থনা করে তাঁরা বিফল হয়েছিলেন। ১৯৫০-এর মধ্যে রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তিত হয় এবং ১৯৫২-খ্রীষ্টাব্দে সুইসরা নেপাল যাত্রা করলেন। তাঁদের দলে আর ভিটার্ট, ই. হফসেটার, জে, জে, এস্পার, এল ফ্লোরি, আর অবার্ট, এবং আর ল্যামবার্ট প্রভৃতি দক্ষ পর্বতারোহীরা ছিলেন। তথাপি পাথর এবং বরফের এই দুর্গ মাউণ্ট এভারেষ্ট যা এক সুমহান শক্তির প্রতীক হিসাবে এবং সকলপ্রকার আক্রমণের হাত এড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণ চূড়া থেকে মাত্র ২০০ মিটার ল্যামবার্ট এবং তাঁর পথ প্রদর্শক শেরপা তেনজিংকে ফিরে যেতে হয়েছে। তাঁরা যে কোনো মর্তের মানুষের চেয়ে অনেকটা ওপরে উঠেছিলেন। তারপর পর বৎসর তেনজিং সুইডিস অভিযানের অভিজ্ঞতা নিউজিল্যাণ্ডের স্যার এডমণ্ড হিলারীকে দান করেছিল এবং তাঁরই সঙ্গে একত্রে পর্বতচূড়ায় আরোহন করতে পেরেছিল।

জার্মান পর্বতারোহীরা—এখানে পশ্চাৎ-দৃশ্যের অবতারণা করা যাক—প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন হিমালয় আরোহন করতে চায় তখন তাদের অনেক

অবিশ্বাসের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এর ফলে, অন্য সব পর্বতমালার প্রতি এদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়—তার মধ্যে ককেশাশ পর্বতের দিকে দৃষ্টি যায় এবং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে পল ব্যয়ের এবং তাঁর তিন সঙ্গী সেই পর্বত অধিরোহণ করেন। সেই একই সময় পর্বত অভিযাত্রী এবং বিজ্ঞানীদের দ্বারা সংগঠিত আর একটি দল জার্মান রাশিয়ান অভিযান পামির অঞ্চলে সক্রিয় হয়েছিলেন। সেইকালে একজন জার্মান পিক লেনিন নামক একটি গিরিশৃঙ্গে সর্বপ্রথম পৌঁছেছিলেন।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন যিনি পরে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এই অভিযানে তাঁর অংশ বিষয়ে নিম্নলিখিত রিপোর্ট রচনা করেছিলেন—

> ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে জার্মান ও রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা এবং পর্বতারোহীবৃন্দ তুর্কিস্থান ও পামির পর্বতমালার একটা সংযুক্ত অভিযান চালান। এই পরিকল্পনাটি জার্মান সায়ান্স এ্যাসোসিয়েশন, জার্মান ও অষ্ট্রিয়ান আলপাইন ক্লাব এবং লেনিনগ্রাদ একাদেমি অব সায়ান্স কর্তৃক সংগঠিত হয় এবং উইলি রিকমার রিকমারস নামক এশিয়ান পর্বতারোহণ অভিজ্ঞের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। যুদ্ধ পরবর্তীকালে এই ছিল আমাদের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক অভিযান। এর অন্যতম ফল হল সার্থক ফিলম 'পামীর'—এই ছবিটির অভিযান রাশিয়ান সিনেমা বিভাগের দ্বারা গৃহীত।
>
> আমার কাজ ছিল পামীরের ইন্দো-জার্মানিক জনগণের সমীক্ষা গ্রহণ। দীর্ঘদিন এদের বিষয়টি বিজ্ঞানীদের বিভ্রান্ত করেছে, যদিও তখনো পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে খুব কমই জানা ছিল।…আমি মার্চ মাসের শেষের দিকে বার্লিন ত্যাগ করি এবং লেনিনগ্রাদ ও মস্কো হয়ে তাসখন্দে যাই, সেখান থেকে তুর্কীস্থানের সমতলভূমি সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে। দুবার আমি ইসফারা গ্রামে গিয়েছি, এই গ্রাম ফারগানা উপত্যকায় অবস্থিত। প্রাচীন ইরাণী উচ্চ সাংস্কৃতিক ভূমি সমরখন্দ ও বুখারার প্রাচীন নিদর্শন এবং স্থানগুলি পরিদর্শন করি।
>
> জুন মাসে আমি অভিযাত্রী বাহিনীর সঙ্গে ওষ থেকে ফারগানা উপত্যকা ভ্রমণ করেছি—গ্রেট কারাকুল থেকে তনিমা অঞ্চলের ওপর দিয়ে। প্রধান অভিযান যখন উপরকার নদীর কাছে কর্মরত আমি উল্টো দিকে ভ্রমণ করি এবং আবার বারতাং অঞ্চলের

তাব্‌দিক গ্রামটিতে পর্যটন করি। আমার সহযাত্রীরা পরে পূব দিকে চলে যান তাঁদের পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে সরে গিয়ে, আমি অভিযাত্রী বাহিনীর ডাক্তার কোহলাড়পতের সঙ্গে উত্তরাঞ্চলে চলে যাই, প্রায় অনাবিষ্কৃত ইয়াসগুলাম উপত্যকায় চলে গিয়েছি। তারপর ওয়ানডজ, পানডজ, ও চিংগু উপত্যকাগুলি হয়ে নিম্ন আলাই উপত্যকায় গিয়েছি—সেখানে অভিযাত্রী বাহিনীর একাংশের সঙ্গে যুক্ত এই।

সেখান থেকে আমি একাকী পশ্চিমাঞ্চলে তাজাকিস্তানের রাজধানী দুসাম্বের দিকে চলে গেলাম। সেইখানে এবং তাসখন্দে আমার সমীক্ষা সম্পূর্ণ করে আমি মস্কো হয়ে স্বদেশে ফিরলাম।

পৃথিবীর উচ্চতম চুড়াগুলি সংখ্যায় প্রায় চোদ্দ হবে—এইগুলি আটহাজার মাইল উঁচু—এর মধ্যে এখনও তিনটি অজেয়। ব্রিটিশরা মাউণ্ট এভারেষ্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘায় উঠেছেন। ফরাসীরা উঠেছেন মাকালা ও অন্নপূর্ণা (১)। জাপানীরা মাউণ্ট মানসালু (এর অপর নাম কুতাং-১) এবং পর্বতারোহীরা যাকে সাধারণত বলে থাকেন "কে-২"—সেই শিখর হোগোরী-ইতালীয়ানরা অধিরোহণ করেন।

সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া এবং জার্মানী থেকে আগত পর্বতারোহীবৃন্দ নাঙ্গা পর্বত, মাউণ্ট-লোহৎসে, মাউণ্ট হো-ওইয়ু, ব্রড পীক এবং গাসেরব্রাম (২) বিজয়ী হয়েছেন।

বিশেষ করে নাঙ্গা পর্বত ভারতীয় উপ-মহাদেশে জার্মানীর নিজস্ব পর্বত। এর নাম প্রাতটি জার্মানের কাছে পরিচিত, এমনকি পর্বতারোহণ বিষয়ে যাঁরা অতি সামান্যই খবর রাখেন তাঁরাও এই কথা জানেন। ১৯৩২-থেকে বহুসংখ্যক জার্মান পর্বতারোহণের প্রচেষ্টা করেছেন। ১৯৩৪-এ জার্মানরা এর নামকরণ করেন "Killer Mountain"—বা খুনে পাহাড়। বৃটিশরা ১৮৯৫ থেকে এই রকম মনে করত, প্রথমবার পর্বতারোণ করতে গিয়ে সেই সময় মামেরীর জীবন হানি ঘটে। ১৯৩৪-খ্রীষ্টাব্দ আরেক বিষাদের কাল—সেই সময় উইলি মারকল, ভিলি ওলসতেনবাখ্, উলরিখ ভাইলাণ্ড এবং ছ'জন শেরপা প্রায় চুড়ার কাছে পৌছে এক প্রবল তুষার ঝঞ্ঝায় প্রাণ হারান। এর কয়েক সপ্তাহ আগে আলফেড ড্রেকসেল এই পর্বতের সর্বপ্রথম জার্মান শীকার।

১৯৩৭-এর পরবর্তী জার্মান-নাঙ্গা পর্বত অভিযান তিন বছর পূর্বে "খুনে

পাহাড়ে" যাঁরা পরাজিত হন তাঁদের জন্ম একটি স্মারক-ফলক সঙ্গে নিয়ে যান। কার্ল ভিয়েনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানটিও প্রচণ্ড হিমবাহের চাপে পড়ে এবং ষোলোজন পর্বতারোহীর মৃত্যু হয়, এঁদের মধ্যে সাতজন জার্মান এবং ন'জন ছিলেন শেরপা। ১৯৩৮-এ আরেক অসফল অভিযান আয়োজিত হয়। বর্ষা নেমে পড়ায় পল বয়েরের নেতৃত্বে সংগঠিত এই অভিযাত্রী বাহিনী ২৪,০০০ হাজার ফুট উঠেও নেমে আসেন। পরের বছর পিটার অফথনেই-তারের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযাত্রী বাহিনীও সাফল্য লাভ করেন নি।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হেরমান বুলের নেতৃত্বে আরেক অভিযান আয়োজিত হয়। সেই বছর ২৯শে মে তারিখে মাউণ্ট এভারেষ্ট বিজিত হয়। রাণী এলিজাবেথের করোনেশনের কালে এ যেন এক উপহার সামগ্রী। ৩রা জুলাই তারিখে বুল নাঙ্গা পর্বতের শিখর দেশে নিজের অভিযাত্রা শিবির থেকে একা ৪০০০ ফুট আরোহণ করেন। বিনা অক্সিজেনে তাঁর এই ৪৪ ঘণ্টা ব্যাপী প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে বীরত্বপূর্ণ। অবশেষে "খুনী পাহাড়" আত্মসমর্পন করল। তবে একত্রিশটি প্রাণ বলিদান করতে হয়েছে এই বিজয় লাভের জন্য। এই অধিরোহণ বিষয়ে বুলের রিপোর্ট আশ্চর্যভাবে একেবারে সাদাসিধে :

"মাত্র আর একশ মিটার বাকী। প্রতিটি পদক্ষেপ এক একটি প্রচেষ্টা।"

বুলের এই অত্যাশ্চর্য পারদর্শিতার পর ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন অষ্ট্রো-জার্মান অভিযাত্রী দলের চারজন সদস্য (তাঁদের মধ্যে আবার হেরমান বুল একজন) কারাকোরম পর্বতের বোলটারো অঞ্চলের ব্রড্ পীক্ অধিরোহন করেন। এইভাবে দুবার ২৫,০০০ ফুট সর্বপ্রথম অধিরোহণের ব্যাপারে সর্ব-প্রথম মানুষ যিনি এই অভিযাত্রায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি তৃতীয়বার বোগোলিসা পর্বত অভিযানে ব্রতী হন। এইবার কিন্তু পদস্খলিত হয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মাউণ্ট চো-ওইউ সর্বপ্রথম সেপ জোখলার, হেরবার্ট টিখি, এবং শেরপা পাসাং কর্তৃক সর্বপ্রথম ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর তারিখে বিজিত হয়। টিখি পরে এই অধিরোহণ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থটির নাম Grade der Gotter (ঈশ্বরের করুণায়)। হিমালয়ের রীতি অনুসারে এই তিন পর্বতারোহী পার্বত্য দেবীর উদ্দেশ্যে সামান্য নৈবেদ্য দান করেন। পাসাং ও টিখি কিছু মিষ্টান্ন রাখেন। জোখলার সেখানে একটি ক্ষুদ্র কাঠের

ক্রশ রেখেছিলেন। এইভাবে হিমালয়ের দেবলোকে ক্রিশ্চান প্রতীক প্রতিষ্ঠা করা হল।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দুটি ২৫,০০০ ফুট পর্বত লোহৎসে এবং গাসেরব্রাম (২)—সর্বপ্রথম অধিরোহণ করা হয়। সুইজ্যারল্যাণ্ডের আরনস্ট রীস এবং ফ্রিৎস লুখসিংঙ্গার মাউণ্ট লোহৎসে অধিরোহন করেন। এই অভিযানের দুটি দল মাউণ্ট এভারেষ্ট শৃঙ্গে অধিরোহণ করেন। গাসেরব্রাম (২)—তিনজন অষ্ট্রিয়ান পর্বতারোহী মোরাভেক, লারখ এবং ভিলেনপার্ট কর্তৃক ৭ই জুলাই ১৯৫৬।

১৯২৯ থেকে ১৯৫৫-এর ভিতর জার্মান পর্বতারোহীগণ কর্তৃক ১৯২৯-এর কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান বিষয়ে পলবয়ের বলেছেন—

> "এই গ্রন্থের ফরাসী সংস্করণের ভূমিকায় আঁরি দ্য সেগগনে যা বলেছেন আমাদের দলটি সেই মনোভংগীতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল,—তিনি বলেছিলেন :
>
> মানবিক ক্রিয়াকাণ্ড তার সাফল্যের দ্বারা ততটা সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে না যেমনটি প্রকাশিত হয় তার অন্তর্নিহিত মনোভংগীর মধ্যে। এইভাবে বিচার করলে কয়েকটি বস্তু আমাদের অধিকতর প্রশংসার যোগ্য।
>
> আমাদের কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান যেন আমাদের মনোভাবের ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ শুধুমাত্র সাধারণ পর্বতারোহণ নয়। আঁরি দ্য সেগগনে চতুরভাবে তা বুঝেছেন।
>
> যাই হোক আমাদের দলগতকাজ ছিল একেবারে আদর্শ এবং বিশ বছর পরেও সেই কথা বলার অধিকার আমার আছে মনে করি। আমাদের সহযোগীতা কখনও পরাহত হয়নি এবং সেদিনকার মত আজও তা সুদৃঢ়।"

হাইনৎস ক্রপারৎস ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে কিছু যোগাযোগ করেছিলেন সেই মাউণ্ট গোসেনথান অন্য সব ২৫০০০ ফুট। এই শিখরটি হিমালয়ের সেই অতিকায় গুলির অন্যতম যারা অপ্রতিহত ভঙ্গীতে প্রতিরোধ করে আজো সকল অভিযান ব্যর্থ করে অজেয় হয়ে আছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে অবশ্য হারআলড্ লেখেনপারগ বোধহয় যথাযথভাবে পর্বতারোহীদের প্রচেষ্টায় নিম্নলিখিত সারব্যাখ্যা করেছেন :

> "পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতগুলি আরোহণ করা হয়েছে। তাদের

অনধিগম্যতার কাল অতিবাহিত। হিমালয় বিজয়ের মহান যুগের অবসান ঘটেছে। এখন, লুসিয়েঁণ ডেভিস্ যেমন বলেছিলেন—পর্বত-আরোহীদের কাছেও পৃথিবী সঙ্কুচিত হয়ে আসছে।

ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা সহজেই বলা যায়। শতাব্দীকাল পূর্বের য়ুরোপীয় আলপ্সের সঙ্গে পার্থক্য নেই। অন্ততঃ একবারের জন্ম এই দ্বারটা ভঙ্গ করা গেল, মানুষের শক্তি প্রায় অপরিমিত। যা কাল অসম্ভব ছিল আজ তা সম্ভব। বিগতকালের মহৎ অভিযাত্রা আজকের সহণশীল ক্রীড়ার ব্যাপার।

তথাপি পাহাড় অপরিচিত থাকে। জাঁকজমক ও বৈচিত্র্যে অভিভূত করে। আর যতকাল মানুষ আছে তাদের অনেকের কাছে হিমালয় শিখর স্বর্গ এবং নরক দুই-ই মানবিক বোঝাপড়ার সংকীর্ণতার সঙ্গে অনন্তসৃষ্টির সংযোগ সেতু।”

আধুনিক জার্মান সাহিত্যে ভারতবর্ষের প্রতিফলন

Am Ganges duftet's und leuchtet's
Und Riesenbaume blühen
Und Schöwe stille Menschen
Vor Lotosblumen knien.

(সুরধনী গঙ্গা,
সুরভি আর সূর্যালোকে ভরা
তীরে তীরে ফুল ভরা
সুবিশাল কত সব গাছ।
প্রণতির ভঙ্গীতে পদ্মকলির সামনে
বসে আছে সুশোভন কত ভক্ত দল।)

—হাইনরিশ হাইনে
(Buch der Lieder)

ভারতীয় উপজীব্য নিয়ে আধুনিক জার্মান সাহিত্য সুরু হয়েছে ধ্রুপদী ও রোমান্টিক ধারা নিয়ে—এই উভয়ধারাই সংযুক্ত হয়েছিল শকুন্তলা পটে।

কিছু কিছু সাহিত্য-ঐতিহাসিকরা এই কালটিকে নয়া সাহিত্যের নবজন্মের কাল বলে চিহ্নিত করেছেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর এই 'ইণ্ডিয়ান' বা আরো সাধারণ ভাবে 'ওরিয়েণ্টাল রেনে াসের' সঙ্গে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ধ্রুপদী নবজাগরণের একদিক থেকে সাদৃশ্য আছে। প্রকৃত সমগ্র য়ুরোপকেই ঘিরে আছে বলা যায়। যদিও রুশ লেখকবৃন্দ প্রথম নবজাগরণের কালে মূল য়ুরোপীয় প্রাণকেন্দ্র থেকে সরেছিলেন—এই দ্বিতীয় নবজাগরণের তরঙ্গ তাদেরও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

তথাপি রোমান্টিসিষ্টদের মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্বজনীনত্ব; এর ফলে তাঁরা ইতিহাস ও প্রকৃতির প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রতীক ব্যাপারে গবেষণা এই কালের আরেক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—সেই ধারা আবার পুরাণও উপকথা এবং অধ্যাত্ম ব্যাপারের প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট ছিল। রোমান্সবাদীদের

কাছে পুরাণ মানসিকতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে এবং মানবিক ও দিব্য জীবনের সঙ্গে সংযোগ সেতুর কাজ করেছে।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ফ্রিডরিশ স্‌শলেগেল তাঁর "Über die Sparche und Weisheit der Indier" বা "ভারতবাসীদের ভাষা ও প্রজ্ঞা" নামক গ্রন্থে রোমান্সবাদীর বিশিষ্ট ধরনের বলিষ্ঠ উক্তি করেন যে তিনি মানবজাতির মৌল ভাষা আবিষ্কার করেছেন।

মোটামুটি প্রায় সেই কালেই যোশেফ গোরেস নামক লেখক বললেন—"Ein Dienst und eine Mythe war in uralter zeit, es war eine Kirche und auch ein Staat und eine Sprache" (অর্থাৎ প্রাচীনকালে একটি মাত্র ধর্মোপদেশ এবং পুরাণ ছিল, একটি মাত্র চার্চ, একটি মাত্র রাষ্ট্র ও একটি মাত্র ভাষা ছিল। প্রাচীনকালের জীবন ও সংস্কৃতির সম্ভাব্যতা বিষয়ে রোমান্টিসিষ্ট মনোভংগীর এক দৃষ্টান্ত এই বক্তব্যে প্রকাশিত। "Mythen-geschichte der asiatischen Welt" (প্রাচীন জগতের পৌরাণিক ইতিহাস) ১৮১০-এ প্রকাশিত পুরাণ বিষয়ক মহা গ্রন্থে গোরেস দেখিয়েছেন পৌরাণিক জীবনের ঐক্যবদ্ধ গতিবিধি। পূর্বজন্ম বিষয়ে ভারতীয় মনোভংগী গোরেসকে সচেতন না করলেও কিঞ্চিৎ অচেতনভাবে পুরানের কল্পনা জাগিয়েছে। তাঁর কাছে ইতিহাস এক চিরন্তণ রূপান্তরের বিষয়; এবং প্রায়ই বস্তুর নাম যখন পরিবর্তিত হয় তার মৌল প্রাণকোষ অপরিবর্তিত থেকে যায়। গোরেসের কাছে তাই পুরাণ ধর্ম বই আর কিছু নয়। ইতিহাসে তিনি উন্নয়নের পর্ব লক্ষ্য করেছেন যা ভারতীয় চক্র বা মানব সমাজের যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ফ্রিডরিশ ক্রয়েৎসার যিনি পুরাণের মধ্যে একটা এশিয় সংস্পর্শ ঘটিয়েছেন তিনি প্রতীকের কথা উল্লেখ করেছেন, তার বক্তব্য হল এই যে ঈশ্বরকে জানার ব্যাপারে প্রতীক হল প্রথম পদক্ষেপ।

দূর প্রাচ্যে পুরাণের উৎপত্তি হয়েছে এই তত্ত্বটির ধ্রুপদী বিষয়ের গবেষক-দের দ্বারা বিরোধিতা করা হয়েছে। বিশেষতঃ প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ কার্ল ওটফ্রীড ম্যুলার-এ তত্ত্বের বিরোধী। দর্শন শাস্ত্র থেকে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে সুপণ্ডিত হওয়ায় উনবিংশ শতকের শব্দতত্ত্ববিদ্‌গণ এই জাতীয় বিতর্কে ব্রতী হতে পারতেন।

পুরাণের মধ্যে আত্ম নিমজ্জনের এই প্রবণতা বিশেষভাবে কবিদের আকৃষ্ট করেছিল। জার্মান কাব্যে ভারতীয় উপজীব্য দীর্ঘকাল ধরে সুপরিচিত ভ্রমণ

কহিনীর এগুলি বাড়তি অংশ—বিশেষ করে 'বরোক্' সাহিত্য তার প্রাচ্যদেশীয় প্রবণতার জন্য বিশিষ্টতা প্রাপ্ত।

Die Asiatische Banise—(এসিয়াটিক বানিসে—বা রক্তাক্ত অথচ সাহসিক পেগু)১৬৬৩-১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে এইচ, এ ফন্ ৎসাইগলার এবং ক্লিপহাসেন কর্তৃক লিখিত হয় এবং ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে লাইপজীগে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম উৎকৃষ্ট উপন্যাস—এই উপন্যাসে দেখা যায় লেখক ভারতীয় পর্যটকদের ভ্রমন বৃত্তান্ত কিভাবে পাঠ করেছেন। এই গ্রন্থটি ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জে, বেক্কোউ কৃত একটি ওপেরা ও ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এফ, ডব্লু, গ্রিমের ট্রাজেডির মডেলের কাজ করেছিল। এবং গ্যয়টের "ভিলহেলম মাইষ্টার"-এর একটি চরিত্র এই থেকে গৃহীত, তিনি দুর্ধর্ষ চরিত্র চাউমিগ্রেমকে সৃষ্টি করেছিলেন। উপন্যাসের এই চরিত্রটিকে একটি পুতুলনাচের রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শন করা হয়। এই উপন্যাসটিতে আভার রাজা ডকেসেমসের সুন্দরী কন্যা হিগরানামার কথা বলা হয়েছে। এর জননী ছিলেন বঙ্গদেশের এক রাজকুমারী। তাই বর্তমান ব্রহ্মদেশের অধ্যাত্মিক দৃশ্যপট এবং ভারতের বৃহত্তর অংশ এই উপন্যাসটির পটভূমি।

আমরা ইতিপূর্বেই শকুন্তলা উপকথা বিষয়ে গ্যয়টের আনন্দের কথা এবং ভারতীয় পুরাণ ও অন্যান্য রচনা সম্পর্কে তাঁর সাধারণ মনোভংগীর কথা উল্লেখ করেছি। জনৈক ভিয়েনাবাসী লেখক মিখায়েল হাবের ল্যাণ্ডট কর্তৃক গ্যয়টের ভারতীয় উপকথা বিষয়ে মন্তব্য করা হয়েছে। তিনি ভারতীয় পুরাণ ও য়ুরোপীয় দর্শণ এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় শিল্প প্রসঙ্গে গ্যয়টের মেজাজের একটা বিচার বিশ্লেষণের প্রয়াস করেন।

> "ব্রহ্মার চতুর্মুখ বিষয়ে যাঁদের আপত্তি তাঁদের উচিত পুরাণের এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কাহিনী পাঠ করা। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে ব্রহ্মা তাঁর আত্মজা শতরূপার প্রেমে পড়েছিলেন এবং তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন। পিতার দৃষ্টি এড়ানোর জন্য শতরূপা অন্যদিকে চোখ ফেরান। এইভাবে লজ্জা পেয়ে দেবতা ব্রহ্মা সোজাসুজি তাকাতে বাধ্য হলেন কন্যার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে; পুনরায় যখন কন্যা আবার সরে গেলেন তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মার আরো দুটি মাথা গজাল, সব দিক থেকে দেখার সুবিধা হল। এই বহুশীর্ষত্বের বীভৎসতা বিষয়ে নান্দনিক দিক থেকে যারা সঙ্গতি খুঁজে পাবেন না,

সুন্দর কল্পনা বৈচিত্র্যের দিক থেকে তাঁদের এই বিষয়টি তারিফ করতে হবে।"

হাবেরল্যাণ্ডট্ পরে একটি সমীক্ষা সংগ্রহে পৃথকভাবে ভারতীয় উপকথার ভিত্তিতে রচিত গ্যয়টের কবিতাবলীর বিষয় আলোচনা করেছেন।

যদিও গ্যয়টের Westöstlicher Diwan (পূর্ব-পশ্চিম দিওয়ান) মুখ্যত: ইরাণীয় অধ্যাত্মজগৎকে স্তুতি জ্ঞাপন করা হয়েছে—ভারতের প্রভাব একেবারে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে এই গ্রন্থের একটি অংশ "পারসী নামে"—বা পারসী-গ্রন্থ প্রাচীন পারসিক ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি নিবেদিত—এই ধর্ম বিশ্বাস ভারতবর্ষে ত্রয়োদশটি শতক ধরে আশ্রয় পেয়েছে। বোম্বাই শহরের মন্দিরে পারসিকদের পবিত্র বহ্নি আজও দেবতার প্রতীক হিসাবে প্রজ্বলিত। গ্যয়টের ভাষায় এইসব এক একাধারে প্রার্থনা ও প্রবুদ্ধ হওয়া—

"Werdet ihr in Jeder Lampe Brennen
Fromm den Abglanz höhern Lichts erkenen
Soll euch nie ein Missgeschick verwehren,
Gottes Thorn am Morgen zu uerehren."

প্রজ্বলিত প্রদীপের শিখা
চোখে যবে লাগে,
উচ্চতর আশ্চর্য আলোয়
চিনে নেবে সে প্রতিফলন।
প্রতি প্রাতে ভক্তি ভরে
ঈশ্বরের স্বর্ণ—সিংহাসনে,
জানাবে প্রণতি।
কোনো কিছু অঘটনে
ঘটেনাক' যেন অবহেলা।

ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম মহান কবি, রাজনীতিবিদ এবং সেই সঙ্গে দার্শনিক ও পাকিস্তানের আধ্যাত্মিক জনক মহম্মদ ইক্‌বাল ঘোষণা করে ছিলেন হিন্দু-সম হিমালয় উপকথা। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে দর্শনে ম্যুনিখে স্নাতক হবার পর তিনি নীৎসের রচনায় গভীর ভাবে আদৃষ্ট হন। তাঁর কয়েকটি উৎকৃষ্ট উর্দু কবিতা প্রাচীন হাইডেলবার্গ শান্তমাধুরীকে নিবেদিত, এই

শহরটি তাঁর প্রিয় ছিল। তথাপি সর্বোপরি গ্যয়টের Westöstlicher Diwan গ্রন্থের একটি ভারতীয় উত্তর তাঁর 'পায়াম-এ-মাশরিক' (বা প্রাচ্যের বাণী) নামক কাব্য গ্রন্থে লিখেছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি গ্যয়টের ঋণ স্বীকার করেছেন :

"Westöstlicher Diwan নামক জার্মান জীবন দার্শনিক গ্যয়টের গ্রন্থ থেকে আমি এই গ্রন্থ রচনার প্রেরণা পেয়েছি। জার্মান ইহুদি কবি হেনরিস্ হাইনে এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে বলেছেন :

'এই গ্রন্থটিতে পাশ্চাত্যদেশ থেকে প্রাচ্যদেশের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে...এই গ্রন্থ থেকে দেখা যায় যে পাশ্চাত্যজগৎ তার নিজস্ব জগৎ নিয়ে ক্লান্ত এবং প্রাচ্যের বুকে তাই উষ্ণতার সন্ধান করছে।'

কিন্তু গ্যয়টের রচনার চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব বিশেষ করে ইকবালকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই জার্মান কবি সতীর্থকে আবেগভরা ভাষায় কবিতা নিবেদন করেছেন :—

"পশ্চিমের সেই ঋষি
পারস্যের মাধুরীতে মুগ্ধ
যে জার্মান কবি,
য়ুরোপের দূর প্রান্ত থেকে
পাঠালেন যিনি মুবারক,
রচিলাম এ পায়াস এ মাসরিক।
ছড়িয়ে দিলাম এই জ্যোৎস্নাধারা
পূবালী সাঁঝের
তাহার জবাবে।"

ভারতীয় পণ্ডিত প্রবর রণজিত এস পণ্ডিত (প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর ভগ্নী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের স্বর্গতঃ স্বামী) ফ্রিডরিশ সীলারের রচনাতেও ভারতীয় প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। ঋতুসংহারের যে অনুবাদ তিনি করেছিলেন তার ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন যে সীলারের "মারিয়া ষ্টুয়ার্ট" কালিদাসের মেঘদূতের আদর্শে রচিত কুইন অব স্কট মেঘদের কাছে অনুনয় করছেন যে মেঘদল যেন দক্ষিণ দিকে তাঁর যৌবনের ভূমিতে সরে যায়— এই অংশটুকু পণ্ডিতের কাছে কালিদাসের কাছ থেকে ঋণ করা মনে করেছেন।

জার্মান কবি নোভালিস (ফ্রিডরিশ ফন হারডেনবার্গ)—ভারতকে এক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত পদ্মরাগ মনি—দর্শককে তার ঔজ্জল্যে স্নান করিয়ে দেয়। প্রকৃত রোমান্টিক হিসাবে নোভালিস কল্পনা করেছিলেন যে জীবনের সব কিছু দর্শন ও কবিতা এবং ধর্ম ও পুরাণের দৈহিক প্রতিরূপ। গোরেস যখন লিখেছেন যে তাঁর মন ভারত দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে তখন তিনি রোমান্সবাদীদের প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ালেন—

"প্রাচ্য দেশকে, গঙ্গা ও সিন্ধুনদের তীরভূমিতে আমাদের মন রহস্যময় ভাবে আকর্ষিত হয়।

নোভালিস প্রাচ্যদেশকে প্রশস্তি জ্ঞাপন করেন এই কারণে যে—

প্রাচ্যদেশের দূর দৃষ্টি, বহু বিকশিত প্রজ্ঞা সর্বপ্রথম নবযুগের সম্ভাবনা অনুভব করেছে—রাজার রাজা যীশুখ্রীষ্টের অনাড়ম্বর দোলনায় তারকার দ্বারা প্রদর্শিত পথ ধরে প্রাচ্য দেশ এগিয়ে এসেছিল।"

নোভালিসের 'ইন্দোস্তান' কথাটি যা কিছু সুন্দর তার পরিচয় জ্ঞাপক। তাঁর Die Christenheit oder Europa (খৃষ্টধর্ম বা ইয়োরোপ) ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর বক্তব্য বিশদভাবে ওজস্বিনী ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেছেন।

এফ, এ, ফন হেডেনকে তাঁর প্রতিবাদীরা বলতেন যে এই কবি 'ইন্দো-ম্যানিয়া' ভারত বিষয়ে বাতিকে আক্রান্ত হয়েছেন। হেডেন ভারতের গরিমাকে উচ্ছাস ভরা প্রশস্তি দ্বারা কাব্যে গ্রথিত করেছেন। Dramatische Novellen (নাটকীয় ছোটগল্প) নামক তাঁর গ্রন্থ ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে কোয়ে-নিগসবার্গে প্রকাশিত হয়।

হারডারের Gedanken einiger Brahmanen (কিছু ব্রাহ্মণের চিন্তাধারা)—দ্বারা জার্মান কবিতায় ভারতীয় পুরাণের প্রভাব তরঙ্গের মত প্রবাহিত হয়। হারডারের কাব্যগ্রন্থ ভাগবদগীতার আদর্শে প্রভাবিত। আরও অনেক কবিতায় হারডার ভারতীয় উপজীব্যে ফিরে এসেছেন।

তাঁরপর এসেছেন সুদক্ষ অনুবাদক এবং কবি ফ্রিডরিস রুকার্ট (১৭৮৮-১৮৬৬), তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং সুক্ষ্মভাব সম্পন্ন গ্রন্থাদি রচনা করেন, তাঁর রচনার মাধ্যমে জার্মান পাঠক ইন্দ্রজাল ভরা অত্যাশ্চর্য বিষয় বস্তুর সন্ধান লাভ করেন।

রুকার্টের Die Weisheit des Brahmanen (ব্রাহ্মণের প্রজ্ঞা) নামক কাব্য-গ্রন্থটি কুড়িটি খণ্ডে সম্পূর্ণ।

যাই হোক, কবি রুকার্ট কখনও শব্দতাত্ত্বিক রুকার্টকে অতিক্রম করেন নি, তিনি বিভিন্ন ধরণের পদ্য প্রকরণ এবং ছন্দ দ্বারা কাব্য রচনা দ্বারা জার্মান সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর কাব্যের আঙ্গিক 'স্তবকে'র ভিত্তিতে রচিত। এই স্তবকগুলি বৈদিক পদ্যগুলির পদ্ধতিতে সাজানো। আট, এগারো বা বারোটি বাক্যাংশে এক একটি স্তবক রচিত। বিভিন্ন ধরণের পদ্যরীতি যা কালক্রমে প্রচলিত হয়েছে তার মধ্যে থাকে দু লাইনের এক একটি ছত্র, যার মধ্যে আটটি শব্দাংশ থাকে, পাশ্চাত্য জগতের কানে একঘেয়ে শোনালেও জার্মান কাব্য সাহিত্যে এর বহু অনুকরণকারী পাওয়া গেছে। এই কারণে রুকার্ট এবং ওটোফন প্লাস্নোপ এই ছন্দকে পরিমার্জিত করেছেন গ্রীক এবং লাতিন ছন্দ আমদানি করে। ট্রোবি বা ইয়ামবাস ছন্দ তাঁরা এর মধ্যে লাগিয়েছেন। এই একইভাবে হোলটৎসমান তাঁর 'ইণ্ডিয়ান লিজেনডস' নামক কাব্যের ছন্দ সিজারাস ভঙ্গীতে ভাগ করেছেন। গোড়ার দিকের জার্মানরা যে ভারতীয় পদ্য প্রকরণ নিয়ে পঠন-পাঠন করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় রুকার্ট-এর Yearbook for Scientific Critique নামক ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের ঘটকর্পরের বিশ্লেষণের মধ্যে পাওয়া যায়। তার মধ্যে ইন্দ্রবজ্র থেকে বসন্তমালিকা এবং রথোদ্ধত যে দ্রুত-বিলম্বিতণ ছন্দ গুলি এবং তার জার্মান অনুবাদ দিয়েছেন।

তাঁর কালের বহুমুখী ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষিত জনের মত রুকার্ট ছিলেন রোমানটিক—অবশ্য একটু পরিণত বয়সেই তিনি এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে রোমান্টিকবাদ ছিল একটা স্বাভাবিক বিষয় অনেকটা সুসান সোমারফিল্ড যে ভাবে এই আন্দোলনের ব্যাখ্যা করেছেন সেই রকম :

> "রোমান্টিকবাদ। যা একযোগে একটা জীবনের মনোভংগী এবং ঐতিহাসিক পর্বের মনোভংগীর প্রতিনিধিত্ব করে তা হলো সেই মাটি যা থেকে আমাদের আধুনিক কাল গড়ে উঠেছে অন্ততঃ তার সংবাদী ভঙ্গীতে। আমাদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ নিয়তির একটা তুলনামূলক পরিস্থিতি অনেক সম্ভাবনাকে গ্রহণ করে গড়ে উঠেছে, এর মধ্যে ভারতীয় সম্ভাবনাকে বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলতে হবে, তাদের উপলব্ধি, প্রতিশ্রুতি এবং সংকটের কথা। প্রাচ্য পরিবেশের অভিজ্ঞতা এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে যেখানে পাশ্চাত্য

দেশ এক অচিন্তনীয় আভ্যন্তরীন জগতের সন্ধান পায়, কারণ সেখানে সম্পর্কিত রূপ-কল্পের প্রতিধ্বনি জাগে। প্রাচ্য জগতের সঙ্গে সংযোগের এক গভীর মূল্য আছে কারণ তা এমন এক ভাবাবেগ সৃষ্টি করে যার ফলে আমাদের আভ্যন্তরীণ বাস্তবতার দিকে মুখ ফেরাতে হবে এবং আমাদের অস্তিত্বের সেই হল চরম হেতু। প্রাচীন সাংস্কৃতিক স্তরের যা কিছু আমাদের অন্তরে যা জড়তা পড়ে আছে তা সহসা আলোকিত হয়ে ওঠে, প্রাণবন্ত হয়।"

জার্মান-সাহিত্যে হেনরিক হাইনের (১৭৯৭-১৮৫৬) এক বিশেষ স্থান সংরক্ষিত আছে। তিনি রোমান্টিক বাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন আবার তিনিই তার ভীষণতম প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন ধীরে ধীরে তিনি 'তরুণ-জার্মান' নামক আত্ম-সংবেদনসিদ্ধ এক নীতির প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। হাইনে তাঁর অনুভূতি প্রবন আত্মাকে শ্লেষ ও ব্যঙ্গের প্রাচীরের আড়ালে গোপন রেখেছিলেন। তথাপি তার তীব্র শ্লেষাত্মক মনোভংগীর পিছনে দুঃখবাদের স্পর্শকে প্রায়শঃ গোপন রাখা হয়েছে। তাঁর প্রকৃত আত্মপরিচয় সবচেয়ে ভালভাবে বিচার করা যাবে তার সুভদ্র কবিতাগুলির মধ্যে, এসব কবিতায় কোন বক্রোক্তি নেই বরং তার মধ্যে গভীর মানবিক এবং রোমান্টিক ইন্দ্র-জালের স্পর্শ পাওয়া যায়। এই মনোভংগীতে হাইনে ভারতের ইন্দ্রজালস্পর্শের গ্রহীতা ছিলেন। তাঁর এই মনোভংগী সম্পর্কিত কবিতাবলীর একটি থেকে এই পরিচ্ছেদের মূলনীতিবাক্য গৃহীত হয়েছে। এইখানে আমরা আরো একটি কবিতা উদ্ধৃত করছি—তিনি এক অব্যাহত প্রজ্ঞার গীতিকবি ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এই কবিতায়—

"গানের পাখনা ছড়িয়ে
হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে ভেসে
দূরে বহু দূরে নিয়ে যাবো
তোমাকে ওগো প্রিয়া মোর
গঙ্গার তীরে তীরে বেড়াব আমরা
মধুগন্ধে ভরা কত সুন্দর সে ধরা।
শান্ত চাঁদনী রাতে মনোহর গোলাপ কানন
পরম আনন্দ নিয়ে করিবে তোমায়।

আনন্দ উছল কত উৎসুক উৎপল
সাদরে টানিবে বুকে নন্দিনী ভগিনী।
তালবনে চাঁদের আলোর ছায়া
ধীরে ডুবে যায়।
অধরা মাধুরী নিয়ে মনোহর অবসর
করিব মধুর।
আশ্চর্য সে স্বপ্নের গভীরে
আমরা আকুল হব
স্বপ্ন আর শুধু স্বপ্ন নিয়ে।

বন শহরে ছাত্র অবস্থায় হাইনের সঙ্গে ফন সখ্‌লেগেলের সঙ্গে দেখা হয়, ১৮১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখানে ছিলেন ভারতীয় ভাষার অধ্যাপক। তরুণ হাইনে সংস্কৃত ভাষা বিষয়ক বক্তৃতাদি শুনতেন এবং ভারতীয় সব কিছুর প্রতি একটা রোমান্টিক আবেগ অনুভব করতেন এবং সারাজীবন ধরে সেই মনোভংগী অন্তরে ধরে রেখেছিলেন। সখলেগেল প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা বলা যায়, শিক্ষক হিসাবে তাঁকে তরুণ হাইনে অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন। আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই নিবেদিতপ্রাণ পণ্ডিত যিনি শব্দতাত্ত্বিক সর্ববিধ ব্যাপারে যথাযথ ভাব রক্ষার দিকে বিশেষ জোর দিয়েছেন তাঁরও গভীর রসজ্ঞান ছিল।

গ্যয়টের ধারণা ছিল যে শুধু যাঁরা নিজেদের দেখতে পান পরিহাসের বিষয় বস্তু হিসাবে তাঁরাই একদিন বিরাট পুরুষ হয়ে উঠতে পারেন। সখলেগেল একটি ছোট্ট কবিতা রচনা করেছিলেন যার মধ্যে তিনি তাঁর নিজের অন্যান্য সংস্কৃত পণ্ডিতদের ভারতীয় কবিতা বিশ্লেষণের ব্যাপারে প্রযুক্ত গুরুগম্ভীর শব্দ সংযোজনাকে পরিহাস করেছেন "হিমাবত গ্যাঞ্জেস বিন্ধ্যফাইলোলজী" এই আখ্যা দিয়ে।

প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিতগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন আরেকজন তাঁর নাম কাউণ্ট এডলফ ফ্রিডরিশ ফন সখাক (১৮১৫-১৮৯৪)। রুকার্ট প্রসঙ্গে মার্কিন সাহিত্য ঐতিহাসিক এ, এফ, জে রেমি সখাক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন— "জার্মান ব্রাহ্মণদের একজন সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। "ভেলট্‌লিটারেতুর" ভাবধারার একজন যোগ্য প্রতিনিধি।" সখাক তাঁর সংস্কৃত আরবী ও পারস্য ভাষায় তাঁর অনুবাদাদির বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখেন। তথাপি তিনি

বরাবর অনুবাদের জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর Voices from the Ganges নামক গ্রন্থটি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাক— তিনি এমন সব উপকথা তার মধ্যে দিয়েছেন যা কবিকল্পনা। তা ছাড়া মাঝে মাঝে তিনি অপরের কাব্য-বৃত্তির অনুবাদকের ভূমিকা থেকে সরে গিয়ে নিজেই কবির ভূমিকা নিয়েছেন। তার সংগ্রহাদি যা মুখ্যতঃ পুরাণ ভিত্তিক. স্থাক নিজেই বলেছেন যে তিনি সর্বোচ্চ কবিজনসুলভ সুযোগ বা পোয়েটিক লাইসেন্স গ্রহণ করেছেন। স্থাকের কবিতার ভারত এবং তাঁর রচনাদি অতিরিক্ত রোমান্টিক ভঙ্গীতে রূপায়িত। তাঁর কাব্য-সংগ্রহের দ্বিতীয় কবিতা "The Last Rays of Shakuntala" যখন তিনি পারসিক মহাকবি ফেরদৌসীর প্রভাবে অভিসিঞ্চিত তখন রচনা করেন, অনেকটা Die Lieder-des Mirza Schaffy (মীর্জা সাফ্‌ফির গান) নামক গ্রন্থের লেখক ফ্রিডরিস মার্টিন বোডনষ্টেডট্-এর মত। এই লেখক ১০৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে অল্পকালব্যাপী এক ভ্রমণ যাত্রায় গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর নিজের 'শকুন্তলা' লিখেছিলেন, এই মহাকাব্য পাঁচটি গানের সমাবেশে গঠিত। আরেকটি কাব্য সংগ্রহের নাম Nächte des Orients (প্রাচ্যদেশীয় রাত); স্থাক গ্যয়টের "দিওয়ানের" মত আঙ্গিকে প্রাচ্যদেশে যাত্রা করেছেন। পারসিক সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক সংযোগের পর এখন তিনি ভারতীয় চরিত্র এবং ইন্দো-ইরানীয় ঐতিহ্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। Nächte des Orients নামক গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন কি ভাবে তাঁর কাছে নির্বান দর্শন জনৈক বৌদ্ধ ব্যক্ত করেছিলেন; হয়ত য়ুরোপীয় কবির কাছে তা গ্রহণ যোগ্য হয় নি।

অতঃপর স্থাক ভারতীয় দর্শনের সারবস্তু যা অনেক উপন্যাসকারও জার্মান বুদ্ধিজীবিদের দ্বারা নির্বান সাহিত্য হিসাবে প্রচারিত হাচ্ছিল তার সঙ্গে বিতণ্ডায় মেতেছিলেন।

সাহিত্যে সর্বপ্রথম ইন্দো-জার্মান প্রবাহ হল শকুন্তলা সাহিত্য। এইসব কাব্যিক উচ্চতায় পৌছেছিল। কালিদাসের সৃজনী শক্তির হাজার বছর পরে তার অনির্বাপিত আবেদনের শিখায় গ্যয়টে তাঁর নিজের প্রদীপ আবার জেলে নিয়েছিলেন।

অন্যান্য সাহিত্য প্রচেষ্টার কল্যাণে অনেক অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী কবিগণ ধাবমান যশ উপভোগ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় পূর্বোক্ত

জার্মান নির্বাণ-সাহিত্য বা সাধারণতঃ (এবং নির্বিচারে) ভারতীয় দর্শনকে আলিঙ্গন করেছিল—(কাউন্ট ফন সুধাকের মত নয়) একেবারে প্রাণমন দিয়ে গ্রহণ করেছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বা তার কাছাকাছি সময় থেকে এই সাহিত্য বিশেষ ধরণের ভারতীয় দর্শনের রোমাণ্টিকভাবে উচ্চাসন দান করে গ্রহণ করে, ব্যক্তিগত অস্তিত্বের অবসান এই রীতির বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্টেস ইভা ফন হান-হান দুই খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করেন যার নাম 'নির্বাণ'। জার্মান নির্বাণ গ্রন্থগুলি লিখেছিলেন এইচ. এলিসেন (১৮৭৬), ও ডব্লু. জেনসেন (১৮৭৭)। এদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এইচ, ক্রেবস ও লোয়েরকে, ভোলফসকেহল ও হাসেন ক্লেভার থেকে হেনরী বেনরাথ। কিছুকাল ধরে এঁরা সবাই তাঁদের রচনায় নির্বাণ দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন।

নির্বাণ কথাটি ম্যাজিকে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে সংসার সম্পর্কিত ধারণা অনেক জার্মান লেখকের কল্পনাকে প্রভাবিত করে। সংসার হল ব্যক্তিগত অস্তিত্বের চক্র, তার পুর্ণজন্ম এবং আত্মার দেহান্তর আছে—বিশ্বের নিয়তির সঙ্গে ও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত ভারতীয় দর্শনের এ এক প্রতীক। যদিও জার্মান সংসার সাহিত্যের লেখকগণ দীর্ঘকাল বিস্মৃত, এইখানে এ মেহসৈনার (১৮৫৫), জে হার্ট (১৮৭৯), ই, আরএৎসখেজ (১৮৯৩) এবং পরবর্তীকালের ডব্লু, ভোলফ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। Memoirs of an Idealist নামক গ্রন্থে মঁ ফন মেসেনবুর্গ ভারতীয় দর্শনের এই বিশেষধারায় প্রবক্তা ছিলেন। যাইহোক এই সাহিত্যিক দার্শনিক ব্যাখ্যা অতিশয় তীব্র ভঙ্গীতে সমালোচিত হয়—অন্য অপরের সঙ্গে এল জেকবোসকী তাঁর Leuchtende Tage (উজ্জ্বল দিনগুলি) নামক গ্রন্থে এই বিষয় লিখেছেন। এর আবার প্যারডি বা লালিকা হয়েছে, সেই প্যারডিকার হলেন এ. আর, মেয়ার।

একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল Nirvana und Samsara, এই গ্রন্থটি পিটার ফিলিপকৃত একটি সংকলন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ড্রেসড্রেনে প্রকাশিত। এই কবিতাগুলি গজলের পদ্ধতিতে লিখিত, পারসিক, আরবী, উর্দু ও তুর্কী কবিদের ব্যবহৃত একমাত্রা ছন্দের পদ্য। এর "হিন্দুত্বপূর্ণ" বিষয়বস্তুর এবং 'মুসলিম' রীতির জন্য হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে একটা সাহিত্যিক প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিস্ময়কর নয় যে জার্মান রচনাদির মধ্যে "কর্ম" কবিতার অস্তিত্ব আছে। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে হাইনরিস ৎসাইমার "কর্ম-ভাবনা'কে কেন্দ্র করে একটি বৌদ্ধ

কাহিনীর সংকলন গ্রন্থ রচনা করেন। এই নীতি অনুসারে প্রতিটি কর্ম তা সৎ আর অসৎ হোক পুরস্কৃত বা দণ্ডিত হয়ে থাকে শুভ বা অশুভ জন্মান্তরের দ্বারা। "নিও-বুদ্ধিষ্ট" চক্রের বাইরে রুডলফ ষ্টাইনার এবং ওটো জে হার্টমান ৎসাইমারের মানবিক অদৃষ্ট সংক্রান্ত মনোভংগীর অংশভাগী এই উপকথাবলীর সংকলনে প্রদত্ত মন্তব্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

"এই সমস্ত কাহিনীগুলি প্রকাশ করার উদ্দেশ্য উপলব্ধির দ্বারা অদৃষ্টবাদ সম্পর্কে ব্যাখ্যাদান অর্থাৎ জাতকের পূর্বজন্মের কর্মকে আবরণহীন করে প্রকাশ করা। এতদ্বারা দেখানো হয়েছে অদৃষ্টের আপাত অযৌক্তিকতার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং "আমাদের প্রাক্তন কর্মে"র ভিত্তিতে তার অর্থ বোধগম্য হয়। মানুষ যা কিছু অভিজ্ঞতালাভ করে বা ভোগ করে, জননী জঠর থেকে তার সূত্রপাত সব কিছুই তাঁর কৃতকর্মের ভিত্তিতে স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত। প্রতিটি কর্মের পরিমানহীন ভার—চিন্তায়, বাক্যে এবং কর্মে যা প্রকাশিত তা দৃষ্টান্তপ্রদ ভঙ্গীতে 'ধর্মরুজী' জাতীয় কাহিনীর মধ্যে বর্ণিত। ভারতীয়গণ অসম্পূর্ণতার যে শক্তি প্রকৃতির তুলনায় তাকে বন্ধন করে আছে তা বুঝতে পারে। এতদ্বারা তিনি এক একটা গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক সত্য, অর্থাৎ আমাদের নগণ্যতম অধ্যাত্মিক ক্রিয়াদি আমাদের ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমাদের জীবনের ক্রমবিকাশে তার অত্যাশ্চর্য ফলাফল ঘটে। এইসব কারণের প্রতিক্রিয়ার ফল সীমাহীন পরিমাণ হিসাবে বলা যায় গাছের বীজকে ফলধারণকারী বৃক্ষের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা করা যায়।"

'কর্ম-সাহিত্যের' জার্মান অনুরাগীরা কার্ল ব্লীবক্র (১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কর্ম' নামক নাটকের লেখক) গীতি-নাট্য 'মাজা'র লেখক ই, ক্লী ও এ. ভোগল, এঁরা আবার এম, বীয়ারের "পারিয়া" কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

মৃত্যুর অব্যবাহিত পূর্বে ফ্রিডরিশ হেব্বেল Der Brahmine নামক কবিতা রচনা করেন এর মধ্যে তিনি অহিংসা নীতির, হত্যা না করার নীতির বাণী প্রকাশ করেছেন। হেব্বেল Gyges and His Ring নামক গ্রন্থে আকস্মিকভাবে হেলেনিক নাটকের সঙ্গে ভারতকে হাজির করেছেন। এডুয়ার্ড গ্রীসবাখ্ তার কবিতা সংগ্রহ Der neue Tannhauser (নব তানহসের) নামক গ্রন্থে নব-জগৎ দিবস বিষয়ে বুদ্ধের অবদানের উল্লেখ করেছেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে পি, কারুস তাঁর গ্রন্থ Lieder eines Buddhisten (একজন বৌদ্ধের

গান) নামক গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। এরপর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হল গুমপেনবার্গের নাটক Alles oder Nichts (সব অথবা কিছুই নয়) এই নাটকের ভাবধারা হল নব্য বৌদ্ধবাদ। কার্ল ব্লীবক্র তাঁর "Heilskonig" বা 'রাজার সাধনা' নামক গ্রন্থে এবং পি, মুথ তাঁর Flugsamen aus einem abendlandischen Buddhagarten (বুদ্ধের পশ্চিমা উদ্যানের উড়ন্ত বীজ) নামক গ্রন্থে এই মতবাদ প্রচার করেছেন। জনৈক বেনামা লেখক Lieder vom Buddho Guru (বুদ্ধগুরুর গান) নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

তবুও ভারতীয় কুসুমকোরকে পূর্ণ সাহিত্য-রত্নহারের পরিমান বেড়েই চলল। ফ্রানৎস ভেরফেল Der Spiegelmensch (আয়না-মানুষ) নামক নাটক লিখলেন, রাইনহার্ড যোহানেস সোরজে প্রতীকি চরিত্র দিয়ে রচনা করলেন Indian Drama , লিওন ফয়েখট্‌ভানগার কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের এক মঞ্চ সংস্করণ রচনা করলেন এবং Calcutta May 4th নামক নাটকে ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিষয়ে লিখলেন। ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে আর যাঁরা লিখেছেন তাঁদের নাম এম, ফন সীগরথ (১৮৮১), এল, ফন, সুখরোদার (১৮৮০), পি, ভারথাইমার (১৯০৭), ভি, ফন, রিসনার (১৯১৫) এবং কে, করিণথ (১ ১৭), এঁরা সকলেই নাটক রচনা করেছেন।

ডব্লু, এচ, ফ্রীডরিশের কলম থেকে ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে মহাকাব্যের রীতিতে কবিতা রচিত হল। তাঁর মহাকাব্য জাতীয় গ্রন্থ Die Rache der Bajadere (বাজাদেরের প্রতিশোধ) যদিও আজ বিস্মৃত তথাপি এর দ্বারা বোঝা যায় যে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দেও দ্রুত-ভঙ্গীতে রচিত ভারতীয় মহাকাব্যের বেশ প্রশস্ত কার্পেট রচিত হয়ে জার্মান পাঠকদের সামনে প্রসারিত করা হল, তাঁরা অনেক আগে থেকেই ভারতীয় বিষয়বস্তু বিষয়ে অবহিত ছিলেন। ফ্রীডরিশের অনেক অনুকরণকারী হয়েছিলেন, তাঁরা অবশ্য অনেকেই আজ বিস্মৃত। তবে অনেকের সাহিত্যকর্মের উত্তমতর অদৃষ্ট আশা করা গিয়েছিল। যথা—

এ, ফন ডেকেন (১৮৮৪), এল জ্যাকোবীস (Gunita-কাব্য-কাহিনী ১৮৮৫) আর, এবারলীন (১৮৯১) এম, নোরদু (১৯০৪), এ, মোর্ডৎমান (১৯০৬), পি, ফীডলার (১৯১১), এইচ, ষ্ট্রাউস (১৯১২), এইচ, সিলিং (১৯১৫), ই, ভেইল (১৯২২) এ, এগিগমান (Bluten aus Indien

ভারতের কুসুমকোরক (১৯২২), জি, হার্টেনুথীয়েল (১৯২৩), ক্রিষ্টোফ কথস (১৯২৩), জি, সখাকে (১৯২৪), এম, এম, থুলফে (১৯২৬), ই, গোলিআস (১৯৩০), এল, ডি, ভোল (১৯৩২) ডব্লু, কুইনডট (১৯৩৩) সি. জে, লুস (১৯৩৪), এল, ফন ভীসে (নব ১৯৪৭), এবং ই, হেরিং (১৯৫৫)।

এবং আরো অনেক ছন্দোবদ্ধ রোমান্টিক ভারতীয় ইতিবৃত্ত পূর্ণ কাহিনী-গ্রন্থ সামনে উপস্থিত হয়েছে, এল, হিৎস (Gangwellen গঙ্গাতরঙ্গ ১৮৯৩) এল, ৎসোলার (১৮৯৮) ১৯০৫-এ লুডভিগ স্থরাফ প্রকাশ করলেন Tschandala Lieder (চণ্ডালের গান), এই গানটি বিপ্লবাত্মক যুগের অভ্যুদয় হয়েছে (১৯০৫ এশিয়া খণ্ডে বিপ্লবের সূচনা করে)। য়ুরোপেও সোস্যালিষ্ট ভাবধারার এবং নতুন কিছুর দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে।

ম্যাক্স্ ডথেন ডে নামক এশিয়া অভিমুখী লেখক বারাণসীতে বসে বারাণসী বিষয়ে এক কবিতা রচনা করেন। এর প্রথম লাইন যেন একটি মহাকাব্যের কাহিনীর মত :

Die Stadt Benares—"Pra̎chtigsthe" nennen die
Hindus ihre Ganges-Stadt."

(বেনারস নগরী হিন্দুরা বলে গঙ্গানগরী চমৎকার, চমৎকার···) তাঁর Der Siebente Ring (সপ্তম অঙ্গুরী) নামক গ্রন্থে স্তেফান জর্জ আনন্দ ও উচ্ছাসের কবিতা এল্লোরার মন্দিরকে নিবেদিত করলেন।

এগনেস মাইগেলকৃত কবিতা Die Gotter Indiens (ভারতের দেবদেবী) নামক গ্রন্থে অনুরূপ সুগভীর অনুভূতির পরিচয় আছে। নিকোলাস লীনাউ-এর গীতিকাব্য ধর্মী গ্রন্থের মধ্যে য়ুরোপের বেদেগণ কর্তৃক যে ভারতকে রূপায়িত করা হয়েছে তার এক স্মৃতিচিত্রন প্রকাশ করা হয়েছে। ব্যারণ বোরিস ফন মুনখহসেন Indischer Zug (ভারতীয় মিছিল), Die Veden (বেদগ্রন্থগুলি) Die drei Fremden (তিনজন অজ্ঞাত পুরুষ) প্রভৃতি গ্রন্থে মর্মর প্রাসাদের অপরূপ বাতাবরণ রচনা করেছেন ভারতীয় গাথাকাব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে।

আলফ্রেড মোমবার্ট-এর কাব্যিক রচনা রীতি অনেক ক্ষেত্রে মহাকাব্য ও গীতিকবিতার সংমিশ্রণ। তাঁর কাব্যে ভারতীয় দৃশ্যপটের একটা প্রতিরূপ ধরা পড়ে, হিমালয় সংক্রান্ত তাঁর বর্ণনায় এক রূপকথার কাহিনীতে (S'faira, der Alte—স'ফিরা, জনৈক বৃদ্ধ) ভারতীয় দৃশ্যপট ধরা পড়েছে।

ঠিক অনুরূপ ভঙ্গীতে লিখিত এ ফন বেরনুস Mythos vom Menschen (মানুষের রূপকথা) ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯২৭-এ প্রকাশিত মহাকাব্যধর্মী কবিতা 'মানস' নামক কাব্যে এলফ্রেড ডোবলিন প্রেম ও পুনর্জন্মের ব্যাখ্যাদানের প্রয়াস করেছেন। রুডলফ পানভিৎস ১৯২০তে-এক রূপকথার পর্যায় প্রকাশ করেন। থিওডোর ডাবলার লিখেছিলেন Das Nordlicht (উত্তর আকাশের আলো) এবং রুডলফ কাসনার ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যা করেছেন।

যাইহোক, সকলেই অবশ্য প্রাচ্য জগতের দ্বারা মোহিত হন নি। যেমন ম্যাকস ব্রড (Über die Schnheit hasslicher Bilder)-বা কুৎসিৎ স্মৃতিসৌধের সৌন্দর্য নামক একটি প্রবন্ধে এশিয়ার গৌরবকে ব্যঙ্গ করার প্রয়াস করেছেন। এবং লুডভিগ রুকিনার সকল প্রকার ভারতীয়বাদ ও এশিয়াবাদের প্রতি আক্রমণ করেছেন।

রাজা শূদ্রকের দশাঙ্ক নাটকের কাহিনী "মৃচ্ছকটিক" জার্মানরা অন্ততঃ ছয়বার অনুবাদ করেছেন (ভোলফ-১৮২৮, বোথলিংগক-১৮৭৭, ফ্রিৎসে-১৮৭৯, পোহল-১৮৯৩, হাবেরল্যানডট ১৮৯৩, কেলনার-১৮৯৪); তথাপি সেই কারণেই যে এইখানে তা উল্লিখিত হল তা নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে ফয়েখটভানগার এই নাটকটি মঞ্চের উপযোগী করে তোলেন (১৯১৬ বসন্ত-সেনা)। তাঁর নাট্যরূপান্তরে, নামভূমিকার নর্তকী বসন্তসেনা বিশেষ করে এক বর্ণাঢ্য চরিত্র। জুকমায়ার ও এল, বেলগারও এই কাহিনীর দ্বারা অনুপ্রেরণা লাভ করেন (১৯৩৩)। পরে গুনথার ১৯৪৩), মারটেনস (১৯৪৭) এবং ব্রুকনার (১৯৫৭)-সেই কাহিনীর পরিমার্জনা করেন। ব্রুকনার তাঁর নাটককে আবার বেতার অভিনয় উপযোগী করে তোলেন।

প্রত্যাশানুসারে ভারতের আধুনিক কবিতাও জার্মানীতে কম জনপ্রিয় নয়। লাইপজীগের কার্ল ভোলফ্ কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাবলীর মধ্যে জার্মান জাতির প্রশস্তি ও প্রশংসার নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় কবিতা হয় তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ নিজেরাই অনুবাদ করেছেন, যেমন হেরমান ভেল্লার কিংবা বাইরের মানুষ, যেমন ভারতবিদ্ ওটো ফন গ্লাসেনাপ, হেলমুথ ফন গ্লাসেনাপের তিনি পিতৃদেব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিরকালীন জনপ্রিয় হয়ে আছেন, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি সম্পূর্ণ নতুন করে সম্পাদনা করা হয়েছে। তাঁর প্রথম অনুবাদক হলেন ম্যাকস গীলিনজার

যিনি ১৯১৪-খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রথমতম জার্মান অনুবাদ করেছিলেন।

যেসব জার্মান লেখক এবং কবিগণ একসময় ভারতীয় ভাবধারায় এবং ভারতের মানসিক রত্নভাণ্ডার দ্বারা অনুপ্রেরণা লাভ করেন তাঁদের নাম অনন্ত-কাল ধরে উল্লেখকরা যায়। সেই কারণে, উপস্থিত তিন জন লেখকের ক্ষেত্রেই আমাদের এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা যাক যাঁরা বিশ্বসাহিত্যে জার্মানীর প্রতিনিধি এবং জার্মানীর সাহিত্য-ইতিহাসের বিয়োগান্ত অধ্যায়, তাঁদের নাম টমাস মান, স্তেফান ৎসোয়াইথ ও হেরমান হেস। মান তাঁর উপকথার পটভূমি হিসাবে ভারতকে গ্রহণ করেছিলেন। সে কাহিনীর নাম Die vertauschten Kopfe (রূপান্তরিত মস্তক)—প্রাচীন ভারতীয় কাহিনীর নবরূপায়ণ; স্তেফান ৎসোয়াইথ তাঁর ছোট গল্পের জন্য ভারতের দিকে তাকিয়েছেন—যেমন Die Augen des ewigen Bruders (চিরন্তণ ভাইয়ের চোখ)।

তবে হেস-ই ভারতবর্ষে গভীর ভাবে চিহ্নিত। তাঁর ভ্রমণ কথা 'Aus Indien' (ভারত থেকে) এবং উপকথা জাতীয় কাহিনী 'Siddhartha' (সিদ্ধার্থ) এই গ্রন্থ দুটির উল্লেখ অপরিহার্য। তাঁর Die Morgenland-fahrer (প্রাচ্য দেশীয় ভ্রমণকারী) এবং মহত্তম গ্রন্থ Das Glasperlens-piel ও তৎসহ Der Indische Lebenslauf—(ভারতীয় রেখাচিত্র) হেস কিভাবে ভারতীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার পরিচয় জ্ঞাপক।

হুগো বলের মত আর কেউই হেসের রচনায় ভারতীয় প্রভাব বিচারে সার্থকতা লাভ করেন নি, সেই কারণেই এই অধ্যায় শেষ করতে তার উক্তিই বিশেষ উপযোগী—

> "হেসের কাছে যাঁর জীবনের সুরু থেকেই ভারতীয় সঙ্গীত ও ভাবধারা একযোগে অন্তরকে স্পর্শ করেছে; তাঁর পিতৃভবনে গুণদার্তের প্রভাব এর মধ্যে আছে। তাই সিদ্ধার্থের সূচনাংশ ডেমিয়ানের চেয়েও আগে চলে গেছে। বন্ধু, এখন পথপ্রদর্শক, কল্ব শহরে তার দীক্ষার (ক্রিশ্চেনিং) কালেও দেখা যায় আর এই হল দ্বৈতচরিত্র; তাঁর পিতামহ, গুণদার্ত একটি মালায়ালাম অভিধান ছাড়াও একটি গানের বই রচনা করেছিলেন। আর কবির পিতা স্বয়ং, যিনি অতি ধীর, ভদ্র এবং অখ্যাত ছিলেন সেই

যোহানেস হেস তাঁর পুত্রের সম্পর্কে লেখক হিসাবে কৃতিত্বের অধিকারী।

পিতামহের মালায়ালাম গানগুলি বহির্বিশ্বের ক্ষেত্রে শুধু মাত্র যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রকাশন তা নয়। স্বয়ং হেস বলেছেন যে "আমাদের পিতৃপুরুষগণ এবং আমাদের পিতামহ শুধু যে কাব্যপাঠ করতে জানতেন তা নয় তাঁরা অনেক কবিতা সংগ্রহ করেছিলেন নকল করেছিলেন এবং মুখস্থ করেছিলেন।" তিনি একথাও লিখতে পারতেন যে তাঁরা যে সব কবিতা গান করতে পারতেন এবং একটি সঙ্গীতের সেই হল প্রকৃত মূল্য বিচার। কিন্তু হেসের বাড়িতে কল্ব শহরে মালায়ালাম গানও সুরে গাওয়া হত—শুধু বুক কেসের মধ্যেই পাণ্ডিত্য সীমাবদ্ধ ছিল না। কবির ভগ্নী আমাকে একখানি পত্রে সে কথা লিখেছেন: "আর যাই হোক বাসলে শহরে আমরা শুধুমাত্র মিশনের শিশুদের সঙ্গেই থাকতাম। আমরা সর্বপ্রকার মালায়ালাম গান গাইতাম এবং সেই মিশন বাড়িতে যত তরুণ শুধু প্রশিক্ষণের জন্য থাকতেন তাঁদের সকলকে জানতাম।" পিতামহের ভবনে কল্ব শহরে ভারতীয় জিনিষপত্র বোঝাই একটি আলমারি ছাড়া কৃষ্ণের ছোট ছোট অনেক ছবি, অনেক ধরণের পোষাকপরা মূর্তি ইত্যাদি ছিল; এবং "আমরা আমাদের কয়েকটি সুন্দর উত্তর-ভারতীয়, অংশতঃ মুসলমান পোষাক ছিল, যেগুলি আমার মার ভারতবর্ষের কালের জিনিষ, আমরা মাঝে সেগুলি নিয়ে সাজ-পোষাক করতাম। তবে তার চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ, আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা নিয়মিত সংযোগ।"

ভ্রমণ, অভিযান ও আবিষ্কার

ভ্রমণ মানুষের বহির্জগত বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করে।
যাই হোক এর মূল্য অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে যদি
যথেষ্ট জ্ঞানের ফলে মানুষের অন্তরে কিছু
পরিমাণ প্রাথমিক জ্ঞান না থাকে।"

ইম্যানুয়েল কাণ্ট

(Physiche Geographie)

কাণ্ট, আধুনিক জগতের অন্যতম মহৎ দার্শনিক এবং শ্রেণীগত অণুজ্ঞার (categorical imperative) জনক, ভ্রমণের মূল্য তিনি অন্য যে কোন দার্শনিকের চেয়ে দ্রুত বুঝতেন। অবশ্য একটা বেয়াড়া ব্যাপার এই যে ভ্রমণ বিষয়ের এত বড় পৃষ্ঠপোষক তাঁর কোনিগসবার্গ অঞ্চলের বাসভূমি ছেড়ে কোথাও কখনো যান নি। অপরের প্রশংসা থেকে তিনি বিদেশী জাতিদের সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন; বিদেশ সম্পর্কে তাঁর নানাবিধ মন্তব্যাদি রচিত হয়েছে অপরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ভালো করে পাঠ করার ভিত্তিতে। যে কাণ্ট চল্লিশ বছর কাল ধরে তাঁর ছাত্রদের কাছে প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন, মোগলদের ভারতীয় মূলভূমি থেকে কাশ্মীর সম্পর্কে (ককেসীয় পর্বতমালা) এবং বাঙলাদেশ সম্পর্কেই বেশ ভালো সংবাদ রাখতেন। তিনি বর্ষার প্রভাব ধর্মীয় এবং আদিবাসী জাতি ও বর্ণ বিষয়ে অবহিত ছিলেন, ব্রাহ্মণ থেকে মুসলমান, ইহুদী ও সেণ্ট টমাসের খ্রীষ্টানদেরও জানতেন।

এমন একটা সময় ছিল যখন ভ্রমণ কথাটি দুঃসাহসিক অভিযাত্রার সমানার্থক ছিল অবশ্য তদ্বারা এ বোঝাত না যে সব ভ্রমণকারীই দুঃসাহসিকতা সন্ধানী ছিলেন। যাই হোক, ভ্রমণ ব্যাপারটি দুঃসাহসিক ব্যক্তিদেরই এক চেটিয়া ছিল।

নবযুগের প্রত্যুষে আমরা ব্যাভিরিয়ার হানস সখিল্টবেরগারের নাম প্রাচ্য দেশীয় ভ্রমণকারীদের অন্যতম হিসাবে পাই। ১৩৯৪ থেকে ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মুসলমান দেশগুলিতে যুদ্ধবন্দী ছিলেন। সখিল্টবেরগার

একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখে রেখেছেন তার মধ্যে দেখা যায় তিনি কিভাবে 'ইনডিয়া মাইনর' নামক দেশে গিয়েছেন—এই কথার দ্বারা তিনি সম্ভবতঃ মোসলেম ভারতের অংশ বিশেষের কথা বলেছেন। "ইনডিয়া মেজর" অর্থাৎ দ্রাবিড় দক্ষিণ ভারত এবং 'ফারদার ইনডিয়া' সুদূর ভারত অর্থাৎ ইন্দো-চায়না এইসব দেশে তিনি যেতে পারেন নি। তিনি জিরাফ প্রসঙ্গে লিখেছেন তা লক্ষ্য করার মত, সম্ভবতঃ আফ্রিকায় মোসলেম রাজন্যবর্গ ভারতের মুসলমান রাজাদের দরবারে তা উপহার পাঠিয়েছিলেন—

> "আমি ইনডিয়া মাইনরেও গিয়েছি। এবং সেই দেশে অনেক হাতি আছে ; সেখানে জিরাফ নামে আর একরকম প্রাণী আছে। অনেকটা হরিণের মত দেখতে, একটা সুদীর্ঘ জন্তু গলাটা বেশ লম্বা ; প্রায় চার হাত লম্বা বা তারও বেশী সামনের পা গুলিও বেশ লম্বা আর পিছনের পা গুলি ছোট। ইণ্ডিয়া মাইনরে এমনই সব অনেক রকম জন্তু আছে। অনেক অষ্ট্রিচ এবং কাকাতুয়া আছে সেখানে, আরও এমন অনেক জন্তু আছে আমি যাদের নাম জানিনা।"

একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অনেক জার্মান ঐতিহাসিক সখিল্‌ট বেরগারের রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করেছেন তার কারণ তাঁর এই জিরাফ আর অষ্ট্রিচ। আমার দিক থেকে মনে হয় তিনি বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি। একটু রঙ ফলানোর চেষ্টা করলেও (এই রকম ধারা সেকালে প্রচলিত ছিল) তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত সার্বগ্রিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য।

যে মানুষটি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য না নিয়ে ভ্রমণ করেছিলেন তাঁকে অনুসরণ করেন ব্যবসায়ী এবং বনিকগণ, তাঁরা মরিচ এবং "জিনদেল বস্তু"র* লোভে গিয়েছিলেন পূর্বে বালথাসার স্প্রেনগারের পথিকৃৎ গ্রন্থের কথা উল্লিখিত হয়েছে। ভারত সম্পর্ক তথ্য প্রচারের জন্য বিদেশী পুস্তিকার অনুবাদ ও অন্যবিধ বস্তুর ভিত্তিতে গ্রন্থাদিও জার্মানীতে প্রকাশিত হল।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম আধুনিক সংবাদপত্রের এই সুবৃহৎ নাম ছিল :

"অভীসা, জার্মানী ও ইতালী, স্পেন, লো-কানট্রিস, ইংলণ্ড,

---

* Ziudel কথাটি গ্রীক ও লাতিন কথা : সিনডন থেকে উদ্ভুত। প্রথমে এই কথার দ্বারা তুলার জিনিষ বোঝাত, পরে সাধারণভাবে ভারতীয় বস্তু বোঝাত—কিংবা এই কথার অর্থ ছিল সিলকের কাপড়।

ফ্রান্স, হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া, সুইডেন, পোল্যাণ্ড, এবং পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের সমস্ত প্রদেশ প্রভৃতি সম্পর্কিত সংবাদপত্র বা যা কিছু ঘটেছে তার বৃত্তান্ত।"

এই সংবাদপত্রের নামকরণে ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করায় পূর্ব ভারতের যে বিরাট বিশিষ্টতা সেই কালে ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য ত্রিশ বছর-ব্যাপী যুদ্ধের ফলে অনেক সম্ভাবনাময় আবিষ্কার থেকে জার্মানীকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। এই পত্রিকা ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে সম্ভবতঃ জার্মানীর ভোলফেনবুট্টেলে প্রকাশিত হয়।

একজন তরুণ জার্মান বিপর্যয়কারী যুদ্ধ সত্ত্বেও যিনি ভারতদর্শন করেছিলেন তাঁর নাম আলব্রেস্ট ফন ম্যানডেলসলো। তিনি ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে উপস্থিত হন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ পাঠ এডাম ওলিয়ারিউস পরে প্রকাশ করেন, আর ভিকার ফোরট তা ফরাসী ভাষায় এবং জন ডেভিস তা ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। মোগল শাসন পদ্ধতি সংক্রান্ত রিপোর্ট এবং আগ্রা সহর বিষয়ক বৃত্তান্ত এই গ্রন্থের বিশেষ অকর্ষনীয় অংশগুলির অন্যতম।

এশিয়াতে যে বৃহৎ সংখ্যক তরুণ জার্মান আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন মেইসেনের যোহান ভেরকেন ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের পথে যাত্রা করেন ওলান্দাজবাহিনীর একজন "সোলজার ও কর্পোরাল" বা সৈনিক ও পদাতিক হিসাবে। ভেরকেন একটি বৃত্তান্ত রেখে গেছেন। জার্মান সাহিত্যে এই জাতীয় বিবরণ প্রথমতম।

ওলন্দাজ সার্ভিসে ছিলেন যোহান ফন ডার বেহর, তিনি পূর্ব ভারতে, সিংহলে ও জাভায় ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গিয়েছিলেন। আরো অনেকে তাঁর পদাঙ্কানুসরণ করেন। অনেকে তাঁদের অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশ করেছেন যা মি শ্রত বিষয় বস্তুর হলেও অনেক দিক থেকে কৌতুহলপ্রদ। কোনোটিতে ঐতিহাসিক বিবরণ কোনটিতে আবার নৃতাত্ত্বিক, ধর্মগত বিবরণ ইত্যাদি পাওয়া যায় এর সবগুলিই বিশেষ প্রয়োজনীয় বিশেষত তৎকালীন ভারতবর্ষ বিষয়ক যে সব তথ্য তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন তা মূল্যবান। যোহান যেকব মেরকলীন ১৬৪৪ থেকে ১৬৫৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে ছিলেন। আলব্রেস্ট হেরপোরট (বার্ণ-এর অধিবাসী) ১৬৫৯ থেকে ১৬৬৮ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। জে জে সার আরও বেশীকাল ছিলেন ১ ৪৪ থেকে ১৬৬০। জোহান সিগমুণ্ড ভুরকবেইনও বেশীদিন অর্থাৎ ১৬৩০ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। সোয়াবিয়ার ক্রিসটফ্ সোয়াইৎসার ১৬৭৫

থেকে ১৬৮২ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন এবং তার অভিজ্ঞতার এক হৃদয়গ্রাহী বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি ভাষা বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন এবং যা কিছু নতুন সেই দিকে তাঁর নজর ছিল। পরিশেষে, মারটিন ভিনটার জিসটের নাম উল্লেখ করা যাক, যিনি আরও অনেকের মত ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সার্ভিসে ছিলেন। তাদের কাহিনীগুলি পুনঃ সম্পাদনা করে দি হাগে ১৯৩০ থেকে ১৯৩২-এ প্রকাশিত হয় ষোলটি খণ্ডে—এক সুবৃহৎ পর্যায়ের অংশ হিসাবে।

এই সব জার্মান লেখকদের পরিপূরক হয়েছেন ওলন্দাজ লেখকগণ, যথা বালদিয়ুস ও ডেপ্পার। সেই কালে আমষ্টারডাম ও বিশেষ করে ন্যুরেমবার্গের মধ্যে প্রচণ্ড বাক্য বিনিময় হত। যে সব গ্রন্থ ডাচ ভাষায় প্রকাশিত হত আমষ্টারডামে সেইসব গ্রন্থ তৎক্ষণাৎ জার্মানীতে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হত। পরবর্তীকালে ভ্রমণ কাহিনীর অনুবাদ ও সংকলন গ্রন্থ এলটোনা, লাইপজীগ ও বার্লিনে প্রকাশিত হয়।

এনগেলবার্ট ক্যামপফার, কারসটেন নাইবুহর এবং কে ফন হুগেল এই পর্যায়কে বেশ তথ্যপূর্ণ অথচ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সাময়িক ভাবে লিখিত পাণ্ডুলিপির দ্বারা সমৃদ্ধ রেখেছিলেন।

প্রথম বিশ্বকোষ সর্বোপরি ইউনিভার্সাল লেকসিকন (হাল / সালে নামক স্থানে) জেডলার কর্তৃক প্রকশিত হয়। সকল প্রকার তথ্যাদি যা সংগৃহীত হয় তার বৈজ্ঞানিক সারাংশ এই সংগ্রহে দেওয়া হয়। এই একই উদ্দেশ্য প্রথম দিকের জার্মান ঐতিহাসিক যারা ভারতীয় অঞ্চল নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

এঁদের মধ্যে প্রথম হলেন এনটন ফ্রিডরিশ বুসখিং তিনি Neuen Erdbeschreibung (নূতন ভূগোল) নামক গ্রন্থ ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন - এরপর প্রকাশিত হয় Erdbeschreibung Von Ostindien (পূর্বা ভারতের ভূগোল) এই গ্রন্থ লিখেছিলেন ম্যাথিয়াস ক্রিশ্চিয়ান স্প্রেনগেল। এই গ্রন্থে ভৌগলিক তথ্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যাদি যুক্ত করা হয়েছে, গ্রন্থের লেখক গ্রন্থটির অসম্পূর্ণতার কথা স্বীকার করেছেন, এবং এই অসম্পূর্ণতা মুখ্যত সূত্রের অভাবের জন্য হয়েছে। যাই হোক স্প্রেনগেল গোড়ার দিকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখকদের প্রতি ঘৃণার ভাব প্রকাশ করেছেন।

"ওরা সম্পূর্ণভাবে অপ্রস্তুত অবস্থায় ভারতবর্ষে এসে

পৌঁছেছিলেন এবং কোনোরকম উত্তেজনাময় ভূগোল পান নি যা ভিত্তি করে ওঁদের অভিজ্ঞতা যাচাই করতে পারেন তাঁদের ভ্রমণ এবং ভ্রমণ বৃত্তান্তের দ্বারা ভারতবর্ষীয় ভূগোলের যেটুকু সুবিধা যা উপেক্ষনীয়। অধিকন্তু, ওরা কলমের এক আঁচড়ে সুদূরের প্রদেশগুলি একসূত্রে যুক্ত করেছেন। যে সব দেশ বিষয়ে তাঁরা বর্ণনা করছেন তা রূপকথা এবং বিস্ময়ের কাহিনীর দেশ নয়, যা তাঁদের বিবরণ অবিশ্বাস্য রিপোর্ট দিয়ে পূর্ণ করেছেন এবং সেই সঙ্গে ভুল ভাবে শোনা এবং ভুল বানানের নাম লিখেছেন।"

স্প্রেনগেল আরো অনেকের মত প্রথম দিককার ঐতিহাসিকগণ, যাঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনা করেছেন তাঁদের গোষ্ঠীভুক্ত। ভারতের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ইতিহাস প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের চিন্তাভাবনার বিষয় ছিল— তাঁদের মধ্যে হার্ডির কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। আর ঐতিহাসিকদের মধ্যে ও উটকে, টি, ক্রুসে, এম, ভিনটারনিৎস, এ, ওয়েবার ও জর্জ ওয়েবার উল্লেখ্য। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিদ্রোহের সময় শেষোক্ত জন নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছিলেন, এর মধ্যে তিতিক্ষার ভাব নেই—

"ভারতীয় জনগণ যা সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও জাতির জীবন-তরুর কাণ্ড হওয়ার যোগ্য তা অকালে শুকিয়ে গিয়ে একটা শুখনো ডালে পরিণত হয়েছে।"

ভারতীয় ঐতিহাসিক বিবর্ধন বিষয়ে যে সব বিশেষজ্ঞগণ কাজ করেছেন বা তার কোনো দিক থেকে বিচার করেছেন তাঁদের নামের তালিকা দীর্ঘ। হোলমোলট ও সথমিডট থেকে বানসে এবং এনগেলহারউট থেকে নরবার্ট ক্রেবস, হাইনরিখ ভেনৎস, লুডভিগ এলসডোরফ, ও ওটো ৎসাইয়েরের প্রভৃতি সমকালীন ঐতিহাসিকগণ পর্যন্ত এই তালিকা বিস্তৃত।

এ কথা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে ভারতের বর্তমানকাল প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু পূর্বকাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি, যদিও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ রেটক্লিফের একটা উপন্যাসের বিষয়বস্তু। (তাঁর প্রকৃত নাম ছিল হেরমান গোয়েডসথে) এই উপন্যাস সেই বছর প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থের নাম 'নানা সাহেব'। সি. ই. গ্যানটার 'নানা সাহেবে'র গল্পটিকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে নবরূপে রূপায়িত করেন, নানা সাহেব এই বিদ্রোহের প্রাণ পুরুষ। আগেকার গ্রন্থ ছিল ভ্রমণ

কাহিনীর একটা অংশ, অংশতঃ আবার ইতিহাসগ্রন্থ, উভয়বিধ শ্রেণীকেই নাটকীয় ভঙ্গীতে উপন্যাসের আঙ্গিকে রূপায়িত।

একথা বলাবাহুল্য যে ভ্রমণ কাহিনী সাধারণভাবে শুধু যে ভ্রমণকারীর চরিত্র প্রতিফলিত করে তা নয় তার মধ্যে সমকালীন মনোভঙ্গী ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

এইভাবে, অনেক শতাব্দী ধরে ভারতের মোহময় আবেদন ধীরে ধীরে 'আশ্চর্য দেশ' এই আখ্যা লাভ করে। ভারতবর্ষ এক ম্যাজিকের দেশ সেখানে পদ্মফুলের কুঁড়ি ফুটে থাকে, আধুনিক কালের মনে অনুরণিত হয়—সুতরাং যে সব বই প্রকাশিত হয়েছে মাত্র অল্পকাল পূর্বে তার নামকরণের মধ্যেও ভারতের স্বপ্নলোকের স্পর্শ পাওয়া যায়:

> ওটো, ফ, ফ্রায়েস: Indien—das Wunderland (ভারত—আশ্চর্য দেশ) (১৯২১): কার্ট বোয়েথ Indische Wunderwelt (ভারতের আশ্চর্য জগৎ) (১৯২৫); ই, লিৎসমান: Aus dem Lande der Marchen und Wunder (রূপকথা ও বিস্ময়ের দেশ থেকে); কে, রিব্বেক: Im Wunderlande Indien (ভারতে বিস্ময়কর দেশে); এল, হাল্লা: Unter Palmen und Märchentempeln (তালবনের ও রূপকথার মন্দিরের নীচে); এইচ, ফন ফ গাবলেনৎস: Steinerne Wunder (পাথরে বিস্ময়) (১৯৩৫); এনটন ল্যুবেকে: Indiens zweites Gesicht—Eine Reise durch das Land der Wunder und Wunden (ভারতের অপর মুখ—ক্ষত ও বিস্ময়ের দেশে পরিক্রমা) (১৯৩৫)।

এই আশ্চর্য স্বপ্নময় দিকটি মহারাজাদের পাগড়ি আর তরবারির হাতলের হীরক ও চুনির দ্যুতির সঙ্গে মিশিয়ে আছে। অনেকে বেশ খুসীর সঙ্গে রাজা-রাজড়ার ভারতবর্ষের জাঁক-জমকের বর্ণনা দিয়েছেন: রবার্ট ক্রাফট (Um die indische Kaiserkrone, 1928) ওটো মেয়ার (Zwanzig Jahre an indischen Furstenhofen—ভারতীয় রাজদরবারে কুড়ি বছর—১৯২২), এলিস সখালেক—(An den Hofen der Maharadschas—(মহারাজদের রাজ দরবারে—১৯২৯)।

এই জাতীয় ভ্রমণ কাহিনীগুলির মধ্যে বিশেষ ধরণের ছিল Indien und

seine Furstenhofe (ভারত ও তার রাজদরবার) এই গ্রন্থের লেখক আরনষ্ট কন হেস-ভারতেগ, প্রথম মহাযুদ্ধের অল্পকাল পূর্বে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক যে জগতের সঙ্গে তাঁর পাঠকদের পরিচয় ঘটিয়ে দিচ্ছেন তার এক রূপ-রেখা রচনা করেছেন :

> "কোনোদেশে এত বৈচিত্রময় প্রাসাদরাজি নেই, নেই এত বিচিত্র স্মৃতিসৌধ, নিদারুণ দুর্দশার পাশে এত বেশী জাঁকজমক কোথাও কেউ দেখেনি ; উজ্জ্বলতর আলো আর তার পাশে ঘন কালো অন্ধকার ভারতের মত আর কোথাও নেই ; ভারতের মত আর কোথাও প্রাচীন কালের সাংস্কৃতিক নিদর্শন এভাবে সংরক্ষিত হয় নি। প্রাচীন দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস, বিশেষ ধরণের রীতিনীতি এভাবে আর কোথাও বজায় নেই। হিন্দুস্তানের একটা সুবৃহৎ অংশ আধুনিক অভিযানকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তথাপি আজো বিভিন্ন প্রান্তে দেশীয় রাজন্যবর্গ রাজত্ব করছেন বৈচিত্র জাঁক-জমকের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে। তাঁদের নিজস্ব সেনাবাহিনী এবং মন্ত্রীসভাও আছে। উৎসবাদি, হস্তী ও ব্যাঘ্র যুদ্ধ এবং মহারাজ পরিচালিত শীকার অভিযান পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চমকপ্রদ ব্যাপার ; প্রকৃত-পক্ষে যে কোনও দিক থেকে এই সব রাজ্যগুলির অধিবাসীদের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে এরা এক অনন্য বিস্ময়ের বস্তু।"

এই জাঁক-জমকের আকর্ষণে যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে অনেক জার্মান রাজন্যবর্গও আছেন। কাইজারের জ্যেষ্ঠপুত্র ক্রাউন প্রিন্স ভিলহেলম বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। যদিও তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি এই ভ্রমণ বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন, এমন অজস্র ব্যক্তি আছেন যাঁরা ক্রাউন-প্রিন্সের এই ভ্রমণ বিষয়ে ভ্রমণকাহিনীর প্লাবন বহিয়ে দিয়েছেন। যথা : ও, বনগার্ড (Die Reise des deutschen Kronprinzen durch Ceylon und Indien—সিংহল ও ভারতে আমাদের ক্রাউন-প্রিন্সের ভ্রমণ কথা—১৯১১) এইচ, জাখ্‌খে (Mit dem Kronprinzen durch Indien—ক্রাউন-প্রিন্সের সঙ্গে ভারতে ১৯১৩)—এই ভ্রমণের এক উজ্জ্বল বৃত্তান্ত ষ্টৌনৎসে-সখেরে-র সর্টহ্যাণ্ড পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে (Die Reise des deutschen Kronprinzen nach dem Fernen Osten (দূর প্রাচ্যে জার্মান ক্রাউন প্রিন্সের ভ্রমণ) ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের লেখক

এ, স্পেথট্‌-স্নাউরক। এর আগের বছর ডসেলড্রুফের জনৈক প্রকাশক এম, কোরটেন লিখিত "একটি দেশপ্রেমাত্মক ভ্রমণ-নাট্য" প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের নাম—Die Reise des Kroprinzen nach Ceylon und Indien—ein Schulfestspiel nach den Berichten Von Oskar Bongard und Richard Knotel mit Benutzung der Lieder und Gesange Von Hermann kipper, op 106 : Des Prinzen Heinrich von Preussen Reise um die Welt, (সিংহল ও ভারতে ক্রাউন প্রিন্সের ভ্রমণ কথা : অসকার বনগার্ড, ও রিচার্ড নোটেল কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে রচিত স্কুল-ড্রামা ; সুর ও কথা হেরমান কিপপার কর্তৃক রচিত : op 106 ; প্রিন্স হাইনরিশ অব প্রাসিয়ার বিশ্ব-পরিক্রমার বিবরণ)।

আর যে সব রাজকুমার মহারাজাদের দেশে ভ্রমণে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অষ্ট্রিয়ান সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্চডিউক ফারডিন্যাণ্ড এবং ব্যাভিরিয়ার ক্রাউন-প্রিন্স রুপরেখট্‌ রচিত (Reise-Erinnerungen aus Indien—ভারতবর্ষের ভ্রমণ স্মৃতি—১৯২২) প্রিন্স লুডভিগ অব হেস ভারতবর্ষ থেকে একটি কাব্য-সংগ্রহ নিয়ে এসেছিলেন (অদ্যাবধি অপ্রকাশিত)।

অন্য আরো অনেক ভ্রমণ কাহিনীতে তপস্বী ঋষিগণ থেকে আনন্দময় বস্তুবাদী, ভয়ংকর মঙ্গল আর চাকচিক্যময় রাজপ্রাসাদ, কৃষ্ণবর্ণ দানব আর ভঙ্গুর নর্তকী ইত্যাদির মধ্যে যে বৈপরিত্য তা প্রকাশ করা হয়েছে। এ সবের মধ্যে ও, কফ্‌মানের Aus indiens Dschungeln (ভারতীয় জঙ্গল থেকে) (২য় সংস্করণ ১৯২৪); ইম্যানুয়েল ফাইডারের কৃত Volkstypen aus Indien (১৯২৪), প্রিন্সেস ইরমা ওডেসকালখীকৃত Durch Dschungel und Tempel (জঙ্গল আর মন্দিরের মধ্য দিয়ে) (১৯২৭)। কে, এল ক্লনগের Indische Busser (ভারতীয় অনুশোচনাকারী) (১৯২৮)। লোলা ক্রটস্‌বের্গকৃত Tiere, Tanzerinnen und Damonen (জন্তু জানোয়ার, নর্তকী ও দানব) (১৯২৯) এবং আলফনস নোবেল কৃত Temple, Palaste und Dschungel (মন্দির, প্রাসাদ এবং জঙ্গল) (১৯২৯)।

ভারতবর্ষ আবার চাঞ্চল্যকর ব্যাঘ্র-শীকারের দেশ। অনেকের কাছে ভারতের এই বস্তুটাই একমাত্র দর্শনীয়। আবার এমন অনেকে আছেন যাঁরা বন্য জন্তু-শীকারের উদ্দেশ্যেই ভারতে গিয়েছিলেন তাঁরা সেই সব প্রাণী জীবন্ত এনে পশ্চিম জগতের জু গার্ডেন ও এনিম্যাল পার্কগুলি সমৃদ্ধ করেছেন। যাঁরা

এই জাতীয় অভিজ্ঞতা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন হেরমান ভিয়েলের Fur Hagenbeck im Himalaya und den Urwaldern Indiens (হেগেনবেকের জন্ত হিমালয় ও ভারতের আদিম অরণ্যে) (১৯২৫), জন হেগেনবেকের Unter der Sonne Indiens (ভারতের আকাশের নীচে) (১৯২৬), এবং ও কফ্‌মানের Tiger-und Panther-jagden in Indiens Dschungeln (ভারতীয় জঙ্গলে ব্যাঘ্র এবং প্যান্থার শীকার)।

যাই হোক, একটা নতুন প্রজন্ম এগিয়ে আসছে। এমন অনেকে আছেন যাঁরা স্ত্রীলোকের সমস্যার প্রশ্নটিকেই নব্য ভারতের বৃহত্তম সমস্যা বলে মনে করেছেন। জার্মান লেখকবৃন্দও স্বাধীনতর ভারতে স্ত্রীলোকের ভূমিকা বিষয়ে অতি দ্রুত অবহিত হয়েছেন। ক্রিশ্চান মিশনগুলি থেকে কিছু সাহিত্য রচিত হল। (ও, গ্রুনডলার: Frauenelend und Frauenmission in Indien—ভারতের নারীর দুর্দশা ও ভূমিকা; এইচ, লোরবীয়র: Frauenleben und Frauenelend am heiligen Ganges—পবিত্র গঙ্গা তীরে নারীর জীবন ও দুর্দশা; ই, পোহল: Die Knechtschaft der indischen Frau—ভারতীয় নারীর দাসী বৃত্তি; এইচ, এইচ, রীয়েম—Bilder aus dem indischen Frauenleben—ভারতীয় নারীর জীবনের ভাবমূর্ত্তি; এস, ষ্টাম—Durch Nacht zum Licht—(রাত্রি থেকে আলোকে)। অন্য অনেকে গবেষক বা শুধু ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন যাঁরা সহসা তথ্যের মুখোমুখি এসে পড়েছেন (হেলেন ফ্রেনকেল—Die indische Frau in Dichtung und Leben—কাব্য ও জীবনে ভারতীয় নারী—১৯২২। এলসে লুডারস Unter indischer Sonne—ভারতীয় আকাশের নীচে—১৯৩০)। এলসিষ্ট্রাউব ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ করেন Ulm (1922), এই নাটকটি চতুর্থ অঙ্কে সম্পূর্ণ এইভাবে বর্ণিত, এর নাম "ভারতীয় নারীর প্রকোষ্ঠে" (Im Frauengemach Indiens)। এই জাতীয় আরেকটি গ্রন্থ ভারতের নারী আন্দোলন বিষয়ক। এই গ্রন্থের লেখিকা ইভা সরকার, প্রখ্যাত বাঙালী পণ্ডিত বিনয়কুমার সরকারের অষ্ট্রিয়া জাতা স্ত্রী। এঁদের উভয়ের বিবাহের ফলে ভারতের সঙ্গে জার্মান বিদগ্ধ সমাজের সংযোগ সুদৃঢ় হয়েছিল। ইভা সরকারের সমীক্ষাদির মধ্যে তাঁর স্বামী রচিত ভারতের জীবন দর্শন অন্তর্ভূক্ত। এই গ্রন্থটি লাইপজীগে প্রকাশিত হয়।

এর ফলে আরেকটি বিষয় বস্তুর সান্নিধ্যে আমরা এসে পড়ি, সেই বিষয়টি হল জার্মান জাতা রমনী যাঁরা ভারতকে বিবাহ সূত্রে তাঁদের স্বদেশ করেছেন তাঁদের বিবরণ। এই গৃহীত জন্মভূমি বিষয়ক সমস্যাবলী স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন এমন দুজনের বিষয় উল্লেখ করছি : এক, হউসভিরথ লিখেছেন—Meine indische Ehr (আমার ভারতীয় বিবাহ) ১৯৩৩; এবং গারটুড লেহমান কৃত Ichheirate in Indien (আমি ভারতে বিবাহ করেছি)—৪র্থ সংস্করণ, ১৯৫৩। এই দুখানি গ্রন্থে ভারতে জার্মানদের অবস্থা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে—একটি গ্রন্থে ঐতিহাসিক দৃষ্টি কোণে আলোচনা করা হয়েছে অপরটিতে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে। আন্না লুকাস কৃত Die Deutschen in Indien (ভারতে জার্মাণগণ) ও বোদো স্পেরলিঙের Die Rourkela Deutschen (রোউরকেল্লার জার্মানগণ) উল্লেখযোগ্য।

১৯১৪-১৯১৮ যুদ্ধের কালটিতে জার্মানরা কিভাবে ভারতে কাটিয়েছে তার কথা লিখেছেন পি, ভাফ—আহমেদনগর নামক গ্রন্থে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালের কথা লিখেছেন হাইনরিখ হারের—Sieben Fahre in Tibet (তিব্বতে সাত বছর—১৯৫২)। ভিলি হাস, যিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ভারতবর্ষকেই আশ্রয় করেছিলেন তিনি পরবর্তীকালে ভারতীয় পুরাণ কথার কাল ও প্রসার বিষয়ক ধারণা প্রসঙ্গে এক চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। জার্মানদের ব্যক্তিগত দুঃখের এক প্রমান প্রথম ভারত ভ্রমণ কালে আমার হস্তগত হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইনটারন্যাশন্যাল বুক হাউস বোম্বাই Germans Beyond Germany নামক এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। লেখকের নাম চেক ভাষায় লিখিত—ভিলেম হাস। আরেকটি গ্রন্থ যা এইখানে উল্লেখযোগ্য তা হল ওটো পানেথ কৃত স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ West-ostlicher Ruchblick (পাশ্চাত্য প্রাচ্য গতানুদর্শন)—এই গ্রন্থের কিয়দংশ ভারত বিষয়ে এবং আগের বইটির মত জার্মান-ইহুদী জীবন ও অদৃষ্ট প্রসঙ্গে এক অংশ রচিত হয়েছে বিরক্তিকর বৈদগ্ধ্যের অনুগত ভঙ্গীতে।

এলিজাবেথ ফল হেকিং রচিত জার্নালে ভারত জার্মান প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। এলিজাবেথের স্বামী ১৮৮৯-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত কলিকাতায় জার্মান কনসাল ছিলেন।

এই সূত্রে ক্লারিসা লাইকারের পাদেরবোর্ণ থেকে প্রকাশিত এক স্থানীয় পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উধৃত করার অনুমতি প্রার্থনা করি।

এই লেখিকা পরে ভারতবর্ষে তাঁর ভ্রমণ-বিবরণে তাঁর ভ্রমণ কথা বর্ণনা করেছেন। সেই গ্রন্থের নাম Umgang mit Indern (ভারতীয়দের সঙ্গে সামাজিক সংযোগ):

"রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে আমরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। এই দেশ প্রাচীন যোদ্ধবংশ রাজপুতদের দেশ। সেই রাত্রে আমরা যখন তাঁদের বারান্দায় বসেছিলাম তখন আরেকজন অতিথি এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এই তরুণ ভারতীয়টি একদা আরমসবের্গের একটি কারখানায় কাজ করেছেন। তিনি ভালো জার্মান বল্‌তে পারেন। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় ভারতীয় কত সহজে ভাষা শিক্ষা করতে পারেন।

তিনি যখন শুনলেন যে আমরা পাদের বোর্ণ থেকে এসেছি তখন তাঁর চোখ ঠিকরে গেল। তিনি তাঁর আত্মীয়দের বোঝাতে লাগলেন পাদের বোর্ণ-এর শহর কেমন জলময় এবং ময়ূরে ভরা। আমরা আশ্চর্য হলাম যে এই দুটি মাত্র বস্তু তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। তিনি কিন্তু তাঁর আত্মীয়দের বল্‌তে লাগলেন শত শত ঝরণা-কূপ সারা শহরে পরিপূর্ণ হয়ে আছে,—এই কূপ থেকে আবার একটা বিরাট নদীর জন্ম হয়েছে। একথা সত্য যে আমরা তাঁর উৎসাহ কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা করে দিলাম। বল্‌লাম মাত্র ২০০টি এই রকম কূপ আছে, অনেক শত নয়। আমরা যখন লক্ষ্য করলাম অন্যান্য ভারতীয়দের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আমরা বুঝ্‌লাম কেন ওম প্রকাশ (সেই তরুণটির নাম) এই জাতীয় প্রস্রবণ দেখে এত উৎসাহিত হয়েছিলেন। রাজপুতদের দেশে জল যেন এক ঐন্দ্রজালিক শব্দ; এই রাজ্যের অধিকাংশই আধা মরুভূমি। সুতরাং ওয়েসিস নগরে একটি প্রস্রবণের অধিকারী হওয়ার অর্থ দক্ষিণ-ভারতে শত শত তাল গাছ বা অন্য কোথাও একটা ক্ষুদ্র রাজ্যলাভ।

কোথায় ময়ূর ডেকে উঠ্‌ল তাতে আমাদের আলাপাচারে বাইরে থেকে বাধা—ওমপ্রকাশ বল্‌লেন: "পাদের বোর্ণ শহরে আমি দেখেছি একজন সাধু পুরুষের প্রস্তর মূর্তির সঙ্গে একটি ময়ূর

রয়েছে। এর ফলে আমার স্বদেশের কথা মনে হল। কারণ আমাদের দেশেও ময়ূর একটা পবিত্র প্রাণী।"

আমরা জয়পুরে রাজপুতদের বিয়োগার্থ বা বীরত্বপূর্ণ নিদারুণ কাহিনী বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য এসেছিলাম। তথাপি একবার জল এবং ময়ূরের কথা উল্লিখিত হল। আমরা এখন আর শ্রোতা নই, সবাই কাহিনী-কথক।"

মাত্র কিছুকাল পূর্বে জার্মান ভাষায় ইন্দো-জার্মান সহ প্রকাশন ব্যবস্থার ফলে ক্লারিসা লাইফারের একটি গ্রন্থ শকুন্তলা পাব্লিশিং হাউসের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে (সুন্দর নগরে মেমসাহেব : বোম্বাই, ১৯৬৮)।

ক্রিশ্চিয়ান ধর্মী মহলে অজস্র গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। এতদ্বারা বোঝা যায় যে ধর্মীয় সংলাপ ভারতকে ঠিকমত বোঝায় প্রকৃত চাবি কাঠি। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় : কে, হারটেনষ্টাইন কৃত—Auf Gottes Spuren in Indien (ঈশ্বর সন্ধানে ভারতবর্ষে— ১৯২৯)—এল, সখাল কৃত Vier Geschichten von Indischen Christen—(ভারতীয় খ্রীষ্টানদের চারটি কাহিনী ; জে, ভোরলাইনের Vierzig Jahre in Indien—Eirnnerungen eines alten Missionars (ভারতে চল্লিশ বছর প্রাচীন মিশনারীর স্মৃতি কথা)। ফ্রানৎস কোহলারের Indischer Geist und christliches Heil—ভারতীয় মনোভঙ্গী এবং ক্রিশ্চান তপস্যা ; এইচ, প্রাগের কৃত Das indische Apostolat—ভারতীয় দেবমণ্ডল ; ডি, বেকার কৃত Im stromtal des Brahmaputra—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ; এরিখ ষ্ট্যানগের Die Losungen reisen nach Indien ভারত ভ্রমণের সহজ উপায় ; এবং প্লাটনারের Indien—ভারত।

১৯১৪-১৯১৮-র যুদ্ধ কালীন সময়ে শরীরগত দুর্দশাক্লিষ্ট ভারত ও ভারতের স্বাধীনতা স্পৃহা একটি জনপ্রিয় বিষয়বস্তু ছিল। সেই কালের অনেক লেখা প্রাচীন হয়ে গেছে। তথাপি প্রথম যুদ্ধোত্তর দশকে এক রাজনীতি সচেতন ভারতীয় সাহিত্য জার্মানীতে গড়ে উঠল সংস্কৃতি ও ইতিহাস অভিমুখী প্রবাহের পাশাপাশি ; এ, কে, ভিকতর কৃত Deutschlands Anteil an Indiens—ভারতের অদৃষ্টে জার্মানীর অংশ (১৯১৮) ; এইচ, ভাবুবর্গের Um Indiens freiheit—ভারতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে (১৯২৩) : জোনাস মেয়ের কৃত Die nationale Bewegung in Indien—ভারতের জাতীয়

আন্দোলন (১৯২৪); জাকির হুসেন* ও আলফ্রেড এহরেনট্রিথের Die Botschaft des Mahatma Gandhi—মহাত্মা গান্ধীর বাণী (১৯২৫); কলিন রোজের 'Heute in Indien আজকের ভারত (২য় সংস্করণ-১৯২৬); আর্থার হোলিটসখার কৃত Das unruhige Asien—অশান্ত এশিয়া (নবম সংস্করণ ১৯২৭); যোশেফ হোরোভিৎসের Indien unter britischer Herrschaft—ব্রিটিশ রাজত্বে ভারত (১৯২৮): হিলমার টেসকে কৃত Das heutige Indien und seine Freiheitsbewegung—আজকের ভারত ও তার স্বাধীনতা আন্দোলন (১৯৩০), ফ্রিৎস ডায়েট্রিশ কৃত Die Gandhi Revolution (পল বিরুকোফ, রবার্ট ব্রাউন ও মারটিন বুবের এই গ্রন্থে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন : ১৯৩০)। এবং সি, জেড, ক্লোৎসেল কৃত Indien im Schmelztiegel—সংকটের মুখে ভারত (১৯৩০) প্রভৃতি গ্রন্থাবলী তার নিদর্শন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারত বিষয়ে আগ্রহ এখন রাজনৈতিক মানচিত্রে ভারতের স্থান সম্পর্কে পরিবর্তিত হয়েছে। মেহনার্ট, বেথটোল্ড, লানকৎকোসকী, ফন পখহামের, কাউন্টেন বার্ণষ্টোরফ প্রভৃতি গ্রন্থ তার নিদর্শন। বর্তমান গ্রন্থকারের বিশ্বাস যে তার নিজের গ্রন্থও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ইতিমধ্যে, অবশ্য, শীকারী, অভিযাত্রী, ইন্দ্রজাল সন্ধানীর দলে এক নতুন শ্রেণীর ভারত ভ্রমণকারীর দল যোগ দিয়েছেন। এই জাতীয় ভ্রমণকারীদের প্রতিনিধিরা বিনা আড়ম্বরে, বিনা অনুষ্ঠানে ভারতে এসেছেন তারপর এই উপমহাদেশে যথেচ্ছ বিহার করেছেন। এই সব আধুনিক ভ্রমণকারীদের অন্যতম হলেন ই, ট্রিংকলার (Quer durch Afghanistan nach Indien —আফগানিস্তান হয়ে ভারতবর্ষে) আরেকজন হলেন রিচার্ড হুলসেনবেক, তিনি একটি মাল জাহাজে করে এসেছিলেন (Der sprung nach Osten —প্রাচ্যদেশে ঝাঁপ) কুরট ফেবার আবার পদব্রজে সেই দেশে গিয়েছিলেন (Mit dem Rucksack nach Indien—ঝুলিঝোলাসহ ভারতে) (১৯২৯)। আরেকজন পদব্রজে ভ্রমণকারী হলেন আরনষ্ট পোহল (Quer durch den indischen Urwald zu Fuss—ভারতের আদিম অরণ্যে পদব্রজে—

---

* ১৯৬৭-তে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত "Zakir Husain" নামক এ. জি. নুরাণীকৃত গ্রন্থে ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি জাকির হুসেনের জার্মানীর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে সাংযোগ ছিল তা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

১৯২৯)। আরো একজন যিনি আপনাকে ভবঘুরে আখ্যা দিয়েছেন সেই আলেক্স মারহোলডের বই (Vagabund in Indien—১৯৩৭)। তারপর ম্যাক্স রাইসথ্ আছেন। তিনি ১৩,০০০ কিলোমিটার ভারতে এবং পল্লী-পথে মোটর সাইকেলে ঘুরেছেন (Indiens lockende Ferne—ভারতের সংকেতময় দূরত্ব) (১৯৫০) এবং পরিশেষে হাইনৎস হেলফজেন ইনি বাইকে করে পকেটে D. M. 3.80 নিয়ে বিশ্ব পরিভ্রমণ করেছেন (Ich radle um die Welt—Von Dusseldorf bis Burma, 1954)।

আরেক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা ভারত সম্পর্কে সর্বপ্রথম পড়াশোনা করেছেন এবং পরে তার মানসিক জগৎ লক্ষ্য করে আবিস্কারের অভিযাত্রায় বেরিয়েছেন। এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত হলেন কাউন্ট কাইসারলিঙ (Das Reisetagebuch eines Philosophen দার্শনিকের ভ্রমণ ডায়েরী ১৯১৯), ভালদেমার বনসেলস (Indienfahrt ভারত ভ্রমণ, ১৯২১); বার্ণহার্ড কেল্লারমান (Der Weg der Gotter দেবতাদের ধারা ১৯২৯); আলমা এম, কারলিন (Erlebte Welt অভিজ্ঞ জগৎ ১৯৩৩), হাঁগেন থুরনাউ (Im Banne Indiens ভারতের প্রভাবে ১৯৪২); থিওডোর লোরস (Begegn-ungen in Indien ভারতের মুখোমুখি ১৯৪৮); ভেরনার জিমারমান (Zu freien Ufern মুক্ত তীরভূমিতে ১৯৫০); ওয়ালটার আইডলিৎস (Bhakta eine indische Odyssee ভক্ত একটি ভারতীয় ভ্রমণপরম্পরা ১৯৫১); ওয়ালটার ম্যানগেলসডোরফ (Erlebnis Indien ভারত এক অভিজ্ঞতা); হানস হাসসো ফন ভেলটহাইম-ওস্ত্রাউ (Tagebucher aus Asien এশিয়ার ডায়েরী ১৯৫১); হারবার্ট টিচি (Die Wandlung des Lotos কমলের রূপান্তর) মারলাইস ফন লেরবার (Indischer Hochsommer ভারতের প্রচণ্ড গ্রীষ্ম-১৯৫৬), রাইনহার্ড রাফফালট (Drei Wege durch Indien ভারতের মধ্য দিয়ে তিনটি পথ ১৯৫৭); ডোলফ স্টার্ণবেরগার (Indische Miniaturen ভারতীয় ক্ষুদ্র চিত্র); হানস কোয়েষ্টার (Indien zwischen Gandhi und Nehru গান্ধী ও নেহরুর মধ্যেকার ভারত); গিসেলা বন Neues Licht aus Indien ভারত থেকে নবীন আলোক ১৯৫৮); ওয়ালটার মোলট (Sie hungern nach Brot und Freibeit ওরা স্বাধীনতা ও অন্নের জন্য বুভুক্ষু: আরনষ্ট মাজোনিকা কৃত ভূমিকা সহ ১৯৬০), হানস স্টেথে (Indischer Alltag ভারতীয় নিত্যকর্ম (১৯৬১); আরনষ্ট

বেনজ (Buddhas Wiederkehr und die Zukunft Asiens) বুদ্ধের প্রত্যাবর্তন ও এশিয়ার ভবিষ্যৎ, ১৯৬৩); ও গিসেলহার ভিরসিং (Indien —Asiens gefährliche Jahre—India এশিয়ার ভয়ংকর কাল, ১৯৬৮)।

অপরে আবার ভারতীয় উপমহাদেশকে তাঁদের পেশার দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করেছেন; তাঁদের গ্রন্থগুলিতে মত প্রকাশ করা হয়েছে, সমালোচনা করা হয়েছে, ব্যাখ্যা করা হয়েছে ও তুলনা করা হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই শিল্পীদের বিষয় বলেছি। তবে Aus Indien (ভারত থেকে) নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। এই গ্রন্থটি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সুইস শিল্পী পল বরকহাউট লিখেছেন। এই জাতীয় অন্য সব গ্রন্থ লিখেছেন জাহাজের ডাক্তার (এরউইন রোসেন বারগার : In indischen Liebes-gassen ভারতের প্রেমপথে, ১৯৩০); জনৈক শিল্পপতি (কে, জি, পিক : Reisebriefe eines österreichischen Industriellen aus Abessinien, Indien und Ostasien—জনৈক অষ্ট্রিয়ান শিল্পপতির পত্রাবলী : ভারত, আবিসিনিয়া, ও পূর্ব-এশিয়ায় ভ্রমণ বিষয়ক); জনৈক ভূতত্ত্ববিদ্ (হানস মোলিসথ : Als Naturforscher in Indien—প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী হিসাবে ভারতে, ১৯৩০), নৃতত্ত্ববিদ (লিও ফরবেনিয়াস : Indische Reise—ভারতীয় ভ্রমণ, ১৯৩০) এবং জনৈক চিকিৎসক (ওয়ালট লুকে : Mani Katni oder die Stimme Indiens—মনি কাটনি ভারতের কণ্ঠ, ১৯৪৮)।

'পেশাদার পর্যটকদের তালিকা ছেড়ে এখন একজন মনোবিজ্ঞানী মেডারড বোস-এর কথা উল্লেখ করে প্রসঙ্গ শেষ করি। অবশ্য এই তালিকা এখন অনেক দূর পর্যন্ত চালানো যায় যদি সমস্ত পেশাদার পর্যটক, প্রাচ্যবিদ্গণ ইত্যাদি যাঁদের কথা পূর্ব পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে তাঁদের কথা এর মধ্যে আনি।

সাইকিআরটিষ্ট বা মনোবিজ্ঞানীর কথা উল্লেখ বিশেষভাবে প্রয়োজন কারণ তিনি অন্য অনেকের বিষয়ের সঙ্গে "অচেতন" (unconscious) বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এডুয়ার্ড ফন হার্টমান লিখিত একটি গ্রন্থ জনমানসে সর্বপ্রথম এই ধারণা সৃষ্টি করে, তারপর অধিকাংশ ভারত ভ্রমণকারীদের মানসিকতাকে তা আচ্ছন্ন রাখে। এই সব পর্যটকদের প্রধান এবং মূল্যবান পুঁজি ছিল উদ্দীপনা। এই প্রসঙ্গে মেডারড বোস-এর বক্তব্য :

"একথা আজ আর গোপন নেই যে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের

অচেতন বিষয়ক বাঁধা ধরণা একটা অস্পষ্ট বিচারহীন চিন্তা মাত্র। উপরন্তু এই অভিধার দ্বারা আমরা অসতর্কভাবে গোড়াতেই মানব চরিত্রের একটা প্রচলিত অপরিহার্য আংশিক বিস্ময়কে চিহ্নিত করছি, এ এক অস্পষ্ট, বীজ সদৃশ, ভূতাবিষ্টের মত নামহীন, স্তর-বিশিষ্ট বস্তু. আমরা যখন এক মূলাধারকে অতিক্রম করি তখন এই অভিধার সাহায্যে যে বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব আছে তাকে বুদ্ধিগতভাবে গড়ার চেষ্টা করি।"

আমি এখন আপনাদের অনুমতি নিয়ে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে তুর্কিস্থানে থাকার সময় আমি ভারতীয় বংশোদ্ভূত একটা বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসি, তারা নীরবতার এক নিদারুণ ষড়যন্ত্রের শীকার। আমি সুনিশ্চিত যে সোবিয়েতরা এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত; কিন্তু প্রায় অস্পৃশ্যের মত একটা জাতি মস্কো সেণ্ট্রাল এশিয়াস্থ তাঁবেদার রিপাবলিকগুলির পক্ষে উত্তম প্রচার বলে বিবেচনা করা হয়নি। এই সব জনগণের মাতৃভাষা (যাঁরা এই নতুন আশ্রয়ে আফগানিস্তান হয়ে এসেছেন, আর সেই কারণেই তাঁদের আফগানি বলা হয়), আমার কাছে মনে হয়েছে এরা পশ্চিম ভারতের মানুষ, সম্ভবতঃ রাজস্থান কিংবা গুজরাট।

পরবর্তী বৎসরে প্রকাশিত আমার একটি গ্রন্থে আমি লিখেছিলাম :

"এদের ভাষা ইন্দো-ইরানীয়। আমি আফগান ভাষার কতকগুলি শব্দের তালিকা দিতে চাই : জল = পানি, দিবস = দিন, রাত্রি = রাত; অগ্নি = আগ্; চক্ষু = আঁখ। এই সব আফগানদের মধ্যে একটা আশ্চর্য রীতি আছে, ছোট ভাই জ্যেষ্ঠের বিধবাকে বিবাহ করে। ঠিক এই লেভাইট-জাতীয় বিবাহ এক শ্রেণীর গোত্রপতি তান্ত্রিক অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত আছে দেখা যায়।"

পরে যা ঘটেছিল তা সংবাদপত্রে রিপোর্ট হিসাবে প্রকাশিত হয়। অন্য অনেক সংবাদ পত্রের মধ্যে Echo der Zeit থেকে নিম্নলিখিত উধৃতি গৃহীত হল :

"ফরাসী পত্রিকা ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের "লা মঁদ" সোভিয়েত অঞ্চলে একটি ভারতীয় জাতি আবিস্কারের সংবাদ প্রকাশ করেছেন। এই সংবাদ সরকারী সোবিয়েত এজেন্সি Tass কর্তৃক প্রচারিত, সংবাদে বলা হয়েছে যে এই ক্ষুদ্র ভারতীয়সম্প্রদায়

আজারকিস্তান এবং উজবেকীস্তানের কিছু অংশে বসবাস করে। এই সদ্য আবিষ্কৃত নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জাতির আবিষ্কার পৃথিবীর যে কোনও অঞ্চল থেকেই এরা আসুক না কেন ভাষাতাত্ত্বিক মহলে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে সন্দেহ নেই। ফরাসী পত্রিকাটি বলছেন: যে সব নৃতাত্ত্বিক লেনিনগ্রাদ থেকে এদের ভাষা বিষয়ে সমীক্ষার উদ্দেশ্যে এসেছেন তাঁদের কাছে এদের 'পারিয়া' বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তাঁদের নিজেদের ভাষায় তাঁরা পরস্পরের পরিচয় দেয় "আফগানি" বলে। Tass বলছেন এতাবৎ একমাত্র ভারতীয় ভাষা যা সোবিয়েত ইউনিয়নে পরিচিত ছিল তার নাম "রোমানি", জিপ্সীদের মাতৃভাষা।"

এই পর্যন্ত বেশ। বেশ কৌতূহলপ্রদ সংবাদ এবং যদি আপনার মনে লাগে তাহলে রীতিমত চাঞ্চল্যকর। আমরা শুনেছি বহু সম্মানিত ভাষাতত্ত্ববিদ লেনিনগ্রাদ থেকে তুর্কেস্তানে উড়ে গেছেন বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য। নব আবিষ্কৃত জাতির ভাষা সোবিয়েত ভাষা-মানচিত্রে যোগ করবেন (যদিও Tass সোবিয়েত রাষ্ট্রের একটি জাতিকে 'পারিয়া' বিবেচনা করে এই চিন্তা কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তি-জনক।) তথাপি এশিয়াতে বিশেষ করে এই সংবাদ প্রতিধ্বনি জাগাবে এবং ভারতের কাছে এক অতি আশ্চর্য নতুনত্ব মনে হতে পারে। কিন্তু ঠিক কি তাই? আমরা Tass এবং লেনিনগ্রাদের ওরিএন্টাল ষ্টাডি ডিপার্টমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করি একটি জার্মান গ্রন্থের প্রতি। এই গ্রন্থে আফগানি সম্প্রদায়ের কথা মাত্র কয়েক শত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আলোচ্য গ্রন্থটি ওয়ালটার লাইফার কৃত Weltprobleme am Himalaya—হিমালয়ের বিশ্বজাগতিক সমস্যা। এই গ্রন্থ ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মেরিয়েন বার্গ ভেরলাগ অব ঔরজবার্গ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে একটি ক্ষুদ্র সুন্নি জাতীয় আফগানি জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এদের দেখতে ঠিক ভারতীয়দের মত।"

এই সূত্রে য়ুরোপের এক বিচ্ছিন্ন ভারতীয় জাতির কথা উল্লেখ করা কর্তব্য, এরা জিপসী বা বেদিয়া সম্প্রদায়। একটি জার্মান বিজ্ঞান শাখা আছে যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, ইতিহাস, রীতি-নীতি ও শিল্প বিষয়ে

গবেষণা করেছেন৭ সম্প্রতি এই গবেষণার অবস্থা গ্রেলমান, পট, ভিলসো-লোকী, বোহৎলিংগক এবং অন্যান্যদের সমীক্ষার উপর নির্ভরশীল, এ ছাড়া হায়মান আরনলড সেণ্ট্রাল য়ুরোপের জিপসীদের উৎপত্তি ও জীবন প্রসঙ্গে একটি গ্রন্থে একত্রিত করে প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু অনেক শ্রেণীর ভারতীয় পর্যটকদের কথায় ফিরে আসি। আরেকটি ধরণের পর্যটকরা ছিলেন তরুণ গোষ্ঠীভূক্ত, এঁরা ভারত দর্শন করে ফিরে এসে তাঁদের অভিজ্ঞতার বিবরণ স্পষ্ট ভাষায় পক্ষপাতহীন ভঙ্গীতে লিখেছেন। এই জাতীয় প্রথমতম গ্রন্থ হল Indienfahrt eines Wandervogels—ওয়াণ্ডারভোগল যুব-আন্দোলনের জনৈক সদস্য কর্তৃক ভারতভ্রমণ কথা:: লেখক—হাইনৎস ক্লোপেনবুর্গ। তিনি ব্রীমেন থেকে কলকাতায় গিয়েছিলেন। এই গ্রন্থটি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে Die Indienfahrt des Nerother Wandeıvogel Dentscher Ritterbund (1927-28) নামক আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থের লেখকদ্বয়ের নাম: কার্ল মোহরী ও ওটো ওয়েনৎসেল।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে যখন একজন ভারততত্ত্ববিদ যেকব ভিলহেলম হয়ের "arteigener arischer Christus" (আর্য—প্রকৃত খৃষ্টানুসারী) এই মতবাদ প্রচার স্থরু করেন তখন একদল তরুণ খৃষ্টান প্রাচীন আর্যদেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, আর্যদেশ হল ভারতবর্ষ। প্রত্যাবর্তনের পর তাঁরা যে তথ্য প্রকাশ করেন তার নাম Jung-Indien, wie Wir es erlebten (তরুণ ভারত—আমরা যেমন দেখেছি)। এই গ্রন্থপাঠে দেখা যায় যে তরুণ সম্প্রদায় চিরকালের মত তাদের মত পার্থক্য প্রকাশ অবাধে ব্যক্ত করেছেন:

> " ......প্রকৃতপক্ষে; কি অস্বস্তিকরভাবে এই দুটি এত ঘনিষ্ঠ: একদিকে আশ্চর্য আবিস্কার এই যে জাতীয় মুকুটগুলি সেই চিরন্তন সম্রাটের মুকুটের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা, প্রতিটি প্রভাব অপরের উপর ফলিত, জাতীয় ভাবাদর্শ এবং মানবিক উপকথা, ঈশ্বরের আপনাকে যীশুখ্রীষ্টরূপে প্রকাশ করার মত ব্যাপারটিকেও সরিয়ে দিতে পারে।
>
> আর তথাপি, এ হল প্রকৃত আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের প্রমাণ যখন ...বাদামী রঙের ভারতীয় বিশপ আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর অকাট্য বিচারে ঈশ্বরের কৃপায় আত্মপ্রকাশের সঙ্গে মানবিক উপকথার সংমিশ্রণ বিষয়ে মত প্রকাশ করলেন। এবং মানবিক

ভাবাদর্শের তুর্বল সুরুয়াকে ঈশ্বরের প্রকাশের আগুনে পাক করে নিতে উপদেশ দিলেন।"

কয়েক বছর পরে, তুজন বার্লিনের ছাত্র শুভেচ্ছার রাষ্ট্রদূত হিসাবে ভারতে গিয়েছিল এবং তাঁদের শ্রোতাদের জানিয়ে ছিলেন বিচ্ছিন্ন শহরের সংবাদ শুনিয়েছিলেন।

ট্রেড-ইউনিয়ন ডিলিগেশন কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের মধ্যে এমন অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। ভারত থেকে ফিরে তাঁরা যে সব রিপোর্ট দিয়েছেন তা বহুবর্ষের গবেষণার ভিত্তিতে রচিত প্রবন্ধাদির সমতুল। এই গবেষণা যে সখলাগিনভিইটা—শাকুনলুনস্কী ভাতৃত্বের দ্বারা সূত্রপাত করা হয়। এঁদের বিষয় গোড়ার দিকে একটি পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। তাঁদের ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন কাউণ্ট ইগন ফন্ আইকষ্টেডট্। বিশেষ ধরণের গবেষণা ছিল ভিলহেলম ফিল্খনারের ক্ষেত্রে। নেপালের ম্যাগনেটিক সারভের (১৯৩৯-১৯৪০) প্রধান হিসাবে তিনি তাঁর ভৌগোলিক পঠন-পাঠনের পরিপূরক হিসাবে নেপালী ও ভারতীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানাদি তথ্যাদি সংগ্রহ করেন এবং তাঁর বন্ধু শ্রীধর মারাঠের সহযোগীতায় ইন্দো-জার্মান সংযোগ হিসাবে সেই গ্রন্থ যুগ্মভাবে প্রকাশ করেন। ফ্রাঙ্কফুরটের প্রফেসার হেরমান নিগ্‌গেমেয়ার তাঁর অনেক বর্ষব্যাপী গবেষণার ফল তাঁর ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের গোন্দ-জাতি বিষয়ক সমীক্ষার অংশ হিসাবে প্রকাশ করেন।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জার্মান-ইণ্ডিয়া একসপিডিসনের নেতৃত্ব করেন ব্যারণ ফন মেডেল—তিনি পশ্চিম ঘাট থেকে হিমালয় পর্যন্ত ভারতের গাছপালা এবং বন্য জীবন বিষয়ে চর্চা করেন।

জার্মান গবেষণা জাহাজ "Meteor"-এর ভারত মহাসাগরে জলযাত্রার সঙ্গে যে প্রাচীন ঐতিহ্য ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সুরু হয় তার সঙ্গে সংযুক্ত। সেই সময় ব্রিটিশ জাহাজ Challenger জার্মান জাহাজ Gazelle ও Valdivia-র সঙ্গে একটি মানচিত্র রচনা অভিযানে এসেছিলেন। এঁদের সঙ্গে আরো তুটি জাহাজ যোগ দেয়। Gauss ও Planet, Valdivia বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই অভিযান চালিয়ে গেছে। জার্মান নেভাল ষ্টেশনের উদ্যোগে Segelhand-buch für den indischen Ozean mit Atlas—(ভারত মহাসাগরের নৌবিষয়ক গ্রন্থ ও মানচিত্র ১৮৯১-৯২)—১৯০৮ থেকে ভারতীয় মহাসাগর বিষয়ে মাসিক নেভিগেশন চার্ট প্রকাশিত হতে সুরু হয়।

১৯৬৫-র জার্মান হিমালয়-অভিযানে গঙ্গাপূর্ণ অঞ্চল মানচিত্র নির্মান সমীক্ষা সূত্রে জরিপ করা হয়—জার্মান ভৌগলিক পঠন-পাঠন এই ঐতিহ্যাশ্রয়ী ক্ষেত্র থেকে যে কম লাভবান হয়েছে তা বলা যায় না। টাইফেন টেলারের কাল থেকে এই বিভাগ ভারত বিষয়ে পঠন-পাঠন সুরু করে। ইনি সাধরণভাবে য়ুরোপীয় কার্টোগ্রাফারদের অভিজ্ঞতা প্রচার করেন এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষে, তথ্য দৃষ্টে এই কথা বলা যায়। ডব্লু রোসিয়েন কিভাবে সুন্দর ত্রয়োদশ শতাব্দীর মানচিত্র ভারতকে প্রদর্শন করেছে তা লিখেছেন। এই নবলব্ধ জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত তথ্য যোগ করে যে সব নতুন মানচিত্র রচিত হয়েছে তার মধ্যে ১৭৯৭-এর সি. মাননারটের হিন্দুস্তানের মানচিত্র উল্লেখ্য। এই মানচিত্র প্রকাশ করেন এ. জি. স্নাইডার অ্যাণ্ড ভাইগেল, ন্যুরেমবার্গে। আরেকটির পরিকল্পনা করেছিলেন জে. সি. এম. রাইনেকে। তাঁর ম্যাপে গঙ্গার উভয় তীরস্থ পূর্বভারত প্রদর্শিত। এই মানচিত্র দুই পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এই শেষোক্ত মানচিত্র প্রকাশিত হয়। ভারতের প্রথম আধুনিক মানচিত্র ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান বিশেষজ্ঞের সহযোগীতায় প্রস্তুত হয়। ফাদার জোপ্লেনের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। ভারত বিষয়ে প্রকৃত উদার মন নিয়ে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী রচনায় বৈজ্ঞানিকরা যে প্রয়াস করেছেন প্রকৃতপক্ষে কার্টোগ্রাফি বা মানচিত্র রচনা তারতম্য।

সব কিছুর মধ্যেই একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় বিশ্বজগতের সকল ধর্মগুলির মধ্যে একটা সংলাপ সূত্র স্থাপনের—শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ এই ভাবেই গড়ে উঠবে।

আরনেষ্ট বেনৎস

[ফ্রাঙ্কফুর্ট-অন-দি-মেইন-এ পলস চার্চ-এ ১৯৭১-র ২২শে অক্টোবর তারিখে প্রদত্ত ভাষণের অংশ···]

নানা রকমের চাপ এবং উত্তেজনার সংসারে, নিরাপত্তাহীনতা এবং নিরর্থকতার এই যুগে, সেই সঙ্গে রাজনৈতিক চালবাজ ও মুরুব্বিদের লোভ ও শক্তিমত্তার আনন্দের এই কালটিতে বিশ্বজগৎ যদিও কারিগরি বিদ্যায় অধিকারী হয়েছে তথাপি আমরা এক নৈতিক সংকটের কালে উপনীত হয়েছি। দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ তাই এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতির উপায় সন্ধান করেছেন। জড়বাদী যুগের এই পরিণত অবস্থায় এত বেশী বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেয়েছে, আগে কখনও সেই অবস্থা আসেনি। এই উভয় বস্তুই একাধারে রোগলক্ষণ আবার সেই সঙ্গে ত্রাসের সংকেত। তথাপি সুস্পষ্ট এবং ত্রাণকর বাণী যা আশা ও বিশ্বাসকে আবার উদ্ধার করতে পারে তা শুধু এক সুগভীর নব উপলব্ধি ও সদ্য প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা প্রসূত বিশ্বাস দ্বারাই লাভ করা সম্ভব; যাঁরা সর্বপ্রকার ধর্মীয় বাঁধন থেকে দূরে সরে আছেন আজ তাঁরাও এই সত্য অনুভব করতে সুরু করেছেন।

ফরাসী বিদ্রোহকে (অনেকে যেমন সমকালীনদের বাঁধা ধরা বিশ্বাসের প্রতি নিট্সের নিন্দাবাদকে মনে করতেন) অনেকেই আধুনিক ইতিহাসের এক অধ্যাত্ম জলছত্র মনে করেছিলেন। তার থেকে একদিকে ক্ষতির বোধ আর অপর দিকে নতুন করে বিচার করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। তথাপি আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের আহ্বান এদিনের মত আর কখনও এমন সর্বব্যাপীত্ব লাভ করেনি। স্মরণ কালের মধ্যে সহ অধিবাসীদের প্রতি এমন অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতা, এত অধঃপতন আর দেখা যায়নি। অবতারদের আবির্ভাব ঘটে আর্তের ডাকে সাড়া দিতে, সকল শ্রেণীর সেবাধর্মী ধর্ম প্রচারকদের অভ্যুদয় ঘটে যাঁরা জনসেবায় প্রসারিত বাহু মেলে এগিয়ে আসেন।

এই পরিচ্ছেদের শিরোনামে যে উদ্ধৃতি দান করা হয়েছে তা মারবুর্গের প্রফেসর আরনেষ্ট বেনৎস-প্রদত্ত ভাষনের অংশ, জার্মান-বুক-ট্রেড কর্তৃক হিন্দু দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণকে যিনি পরে ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়ে ছিলেন তাঁকে 'পীস্-প্রাইজ' দান করার উপলক্ষে এই ভাষণ দান করা হয়।

স্বীকৃতির প্রতিভাষনে, রাধাকৃষ্ণ উচ্চ আশা ব্যক্ত করেন যে বিশ্বাস হয়ত আমাদের কালের সমস্যার জবাব দিতে পারবে :

> "আজ যেমনটি ঘটেছে আগে কখনও সে রকম ঘটেনি। খৃষ্টান এবং অ-খৃষ্টান ধর্ম গুলি পরস্পরের প্রতি ক্রিয়াশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল। এখানে একথা সুস্পষ্ট করা যাক যে এক 'বিশ্ব-বিশ্বাস" (World faith) গজিয়ে উঠবে এই বিশ্বাস রাখিনা। এই বিশ্বাসের আকৃতি হবে নানা ধর্ম মতের সার সংকলন বা 'একলেকৃটিক' এই ধারণায় আমি বিশ্বাসী নই। এমন এক ধর্ম গ্রহণের প্রচেষ্টা হবে যা কোনো বিশেষ ধর্মমত নয় এই বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য নয়। এ যেন কোনো বিশেষ ভাষায় কথা না বলে কথা বলার প্রচেষ্টা। আমরা বিভিন্ন ধর্মকে স্বীকার করি কিন্তু তাদের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ঐক্য বর্তমান তার সন্ধান পাই না। আমরা বৈচিত্র্যকে প্রসারিত করতে চাই না, বা একটা সমতা বিস্তারে প্রয়াসী হই না। মতানৈক্যের অর্থ বিভেদ নয় এবং বিভিন্নতার অর্থ বিরোধ নয়। প্রতিটি ধর্ম তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার সঙ্গে অপর ধর্মের মূল্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা করবে। আমরা কোনো বিশেষ অন্তগৃহীত জাতি বা নির্বাচিত জনসমাজ বা বিশেষ ধরণের সত্যে বিশ্বাসী নই। আমাদের ধর্মগুরুগণ তাঁদের অতিথেয়তা সকল ধর্মমতের মানুষের প্রতি প্রয়োগ করেছেন এবং ঘোষণা করেন—"তিনিও দেখেন যিনি সর্বজীবে ঈশ্বরকে দেখেন।" বিভিন্ন ধর্মমত যেন বিভিন্ন অঙ্গুলি—মহান ঈশ্বরের প্রেমময় হস্তের অঙ্গুলি আমাদের সকলের প্রতি প্রসারিত—সত্তার পূর্ণতা সকলের প্রতি উৎসর্গীকৃত।"

ধর্মতত্ত্ববিদ্ এবং সমালোচক হোরষ্ট বারকলের মতে রাধাকৃষ্ণণের এই ভাষণ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্লড পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়নসে প্রদত্ত স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণের সঙ্গে তুলনীয়। উভয় ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে

যে পুর্ণনবীকৃত হিন্দুধর্ম ও ধর্মমতের মধ্যে ঐক্য সাধনার কথা বলেছেন। কিন্তু এই সংলাপের সূত্রানুসরণ করার পূর্বে আমি যথাক্রমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিদায়ক্ষণের কাছে ফিরে যেতে চাই, বিতর্কে যার সূত্রপাত এবং সুস্পষ্ট সুভদ্র বিবৃতিতে যার শেষ।

আমরা এই গ্রন্থের অন্যত্র আলোচনা করেছি যে বৌদ্ধ ধর্মমতের সঙ্গে মোকাবিলায় ঈশ্বরতত্ত্ব ও দার্শনিক বিষয়াবলীর পঠন-পাঠনকালে পাশ্চাত্য ছাত্র সমাজ তাঁদের নিজস্ব জগতের প্রতি একটা বিশ্লেষণী মনোভঙ্গী অনুসরণ করেন।

নব্য বৌদ্ধ যাঁরা সপেনহাওয়ারী দর্শনের প্রবক্তা তাঁদের সঙ্গে আরেক দল বিশ্লেষণী মনোভঙ্গী সম্পন্ন পরিদর্শকের অভ্যুদয় হল বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে। বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে ম্যাক্স মূলরের সঙ্গে তার অবস্থানের মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালটুকু জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চলে কাটালেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় ব্রাহ্মণ বন্ধুদের কাছে লিখিত এক পত্রে স্বামিজী ম্যাক্স মূলরের সঙ্গে তাঁর আলাপাচার বিষয়ে উচ্ছ্বসিত ভাবে লিখ্‌লেন। তারপর তিনি সুইজারল্যাণ্ড এবং সেখান থেকে হাইডেলবার্গ, কোবলেনৎস, কলোন, এবং বার্লিনে ভ্রমণ করা স্থির করলেন। শেষ অবস্থান হল কীয়েলে, এইখানে তিনি পল দেউসেনের (১৮৪৫-১৯১৯) সাক্ষাৎকার পেলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে দেউসেনের নাম তাঁর ভারতীয় বন্ধুগণ প্রীতিভরে পরিবর্তন করেন 'দেবসেনে'। প্রফেসর দেউসেন স্বামীজীকে এতই পছন্দ করতেন* যে তিনি হামবুর্গে আবার তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে ইংলণ্ড পর্যন্ত গেলেন। দেউ সেনের গ্রন্থ Die Elemente der Metaphysik (অধ্যাত্ম বিদ্যার উপাদান) ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় পদ্যে অনুবাদ করেন ভারতীয় বিচারক এ গোবিন্দ পিল্লাই।

এর আগের বছর দেউসেন সপেনহাওয়ার সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর গ্রন্থের সংস্কৃতি সংস্করণের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় পাঠকদের কাছে সপেনহাওয়ারের বাণী যা দেবসেন কর্তৃক ব্যাখ্যত বা প্রচার করা। অপর দিকে

---

* বিবেকানন্দও তাঁর দিক থেকে দেউসেন কর্তৃক বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি সব বস্তুর সঙ্গে বেদান্ত সূত্র তৎত্বমসি-র বিশেষ ব্যাখা গ্রহণ করেন। এই সূত্রে স্বজনদের প্রতি প্রেমের অভিব্যক্তি প্রকাশিত। দেউসেন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই গোষ্ঠীর কাছে এই ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন।

জার্মানীতে বিবেকানন্দচক্র প্রতিষ্ঠিত হয় Freunde indischer Weisheit (ভারতীয় প্রজ্ঞার মিত্রগণ) এই প্রতিষ্ঠান বেদান্তের মর্মকথা দ্বারা রচিত পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করেন।

যাইহোক, এই পাণ্ডুলিপি যে খ্রীশ্চান ঈশ্বরতাত্ত্বিকদের বিরুদ্ধভাবাপন্ন করে তুলেছিল তা নয়। তাদের মুখ্য আপত্তি ছিল অন্যত্র, এই সব লেখকদের বর্তমান প্রভাব সর্বত্র একটা কৃত্রিম মনোভঙ্গী রচনা করছিল। সমালোচকদের মতে এ হল কপট হিন্দুত্ব এবং তদ্বারা ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য জগতের বাস্তব বিষয়ক ধারণাকে ভেজালে পরিণত করছেন।

এই প্রশ্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের প্রয়োজন। তথাপি এই গ্রন্থটির উদ্দেশ্য হল সকল ক্ষেত্রে ভারত-জার্মানীর সংযোগের একটা সমীক্ষা রচনা করা, তার বেশী কিছু নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সত্যবিষয়ক সিদ্ধান্ত এবং পুর্ণজন্ম বিষয়ক-বিশ্বাস যে সব দার্শনিক আধ্যাত্ম ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে এসেছেন তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে এই সব প্রশ্নের সমাধান দেওয়া হবে। হিলকো ভিয়ারডো সুখোমেরুস একবার একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন—ভারতীয় মানসের প্রকৃত সারবস্তু কি যার দ্বারা আর সব কিছু পরিমাপ করা যায় এবং বিচার করা যায়? তাঁর নিজের প্রশ্নের জবাবদান প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> "ভারতীয় মানসে অন্ততঃ উপনিষদের কাল থেকে প্রধানতঃ এই ভাবটুকুই সক্রিয়—প্রকৃত সারবস্তু বর্তমান জগতের বহির্দেশেই বর্তমান। এর নাম ব্রাহ্মণ্যবাদের অলৌকিক প্রতীতিবাদ। কিন্তু বাস্তবতাকে এই বিশ্বের বহির্ভূত বস্তু একথা বলা হলে বা তা অলৌকিক প্রতীতিবাদ এই উক্তি করলে সংজ্ঞা সঠিক হয় না। বাস্তবতাকে আরো নিবিড়ভাবে নিরূপণ করতে হবে বিশেষ করে তার আয়তন। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে এর মূল্যায়ন করতে হবে যা এর অন্তরস্থ বস্তুর এবং সর্ববিধ ঐহিক এবং জাগতিক বস্তুর বিরোধী বস্তু হিসাবে। যা প্রকৃত বাস্তব তা সর্বপ্রকার বৃদ্ধি এবং পরিবর্তন থেকে দূরে সরে দাঁড়াবে, সে হবে এক অপরিবর্তনীয় বস্তু। কারণ যা পরিবর্তনশীল তার মধ্যে অনিত্যতার বীজ বর্তমান এই ধারণা করা যায় কিংবা বলা যায় সে বস্তু সম্পূর্ণতার চেয়ে নিম্নস্তরের, অর্থাৎ সে এমন এক বস্তু যার মধ্যে কোনো একটি

পদার্থের অভাব আছে। এই জগতে এমন কিছুই নেই যা পরিবর্তনশীল নয় আর সেই হেতু এই বস্তু বা এর দ্বারা প্রভাবিত যে কোনো বস্তুকে নিক্রমণের চূড়ান্ত বিন্দু হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, কিংবা এর সংজ্ঞার আয়তনে বাস্তবতার যে ভাবধারা আছে সেটি বিবেচনা করতে হবে।…যা বাস্তব তার সংজ্ঞায় বর্তমান জগৎকে ঠেলে সরিয়ে রেখে (বিস্ময়ের বিষয় নয়) সব সময় না হলেও বার বার পৃথিবীর বাস্তব চরিত্রকে অস্বীকার করা নয় তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীকে প্রধানতঃ এক দৃশ্যমান অস্তিত্ব হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে।"

তথাপি পাশ্চাত্য খণ্ডের মুমুক্ষু দর্শন-তিয়াসীর কাছে নিক্রমণের বিন্দুটি বিভিন্ন। আবার স্খোমেরুসের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক :

"ভারতীয় মানসের মত য়ুরোপীয় মানস কিছু কম আগ্রহ নিয়ে বাস্তবের এক অতিন্দ্রীয় রূপ বা বাস্তবের অভিষেকের সন্ধান করেনি। য়ুরোপীয় মানস কখনই এ কথা বলে নতি স্বীকারে রাজী হয়নি যে এই হল মুখ্য গুণ—যেন নীতির দিক থেকে সর্বপ্রকারে সকল অংশ সহ জগৎ সংসার বিরোধী। বিপরীত দিকে, অপরিহার্য বস্তুকে নিরূপণ করতে। য়ুরোপী মানস সর্বদাই বর্তমান জগৎ থেকে আহৃত বাস্তবতার প্রত্যয় সম্পর্কে এবং তার ভিত্তিতে এইরূপ করতে অভিলাসী। সুতরাং পাশ্চাত্য জগতের দার্শনিক পদ্ধতি অনুযায়ী সর্বেশ্বরবাদে আগ্রহ অর্থাৎ, জগৎ সংসারে অতীন্দ্রিয়কে মগ্ন করার অভীপ্সা, তার প্রকৃতিকে বিশ্ব সংসারের সঙ্গে একাত্ম করেছে। এইভাবে, ভারতীয় বাস্তব প্রত্যয় মুখ্যত অমহাজাগতিক এবং ঈশ্বরাবির্ভাবগত মানসিকতা প্রসূত পাশ্চাত্যজগতের প্রত্যয় মহাজাগতিক এবং সর্বেশ্বরবাদী।"

মোদ্দাকথা, সাধারণভাবে য়ুরোপীয়গণ অধ্যাত্ম ভারতকে খোলা মন নিয়ে দেখছেন, আর যে সব জার্মানরা বিশেষভাবে তা করেছেন তাঁরা সর্বেশ্বরবাদী মনোভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন যার শিকড় রয়েছে বিশ্বজগতের বাস্তবতার ভূমিতে। বিপরীত দিক থেকে ভারতীয়গণ ঈশ্বরাবির্ভাবগত প্রত্যয়ে স্থির মনে হয় এই স্থলে বিশেষ ভারতীয় মনোভঙ্গীর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আবার সখোমেরুসের সংজ্ঞা উধৃত করা যাক :

"পূর্বজন্মের তত্ত্বের দুঃখবাদী ব্যাখ্যা ঈশ্বরাবির্ভাবদের দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত নয়। এ একধরণের দর্শন যা সর্বেশ্বরবাদের বিপরীত। আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ জগৎসংসারের বাস্তবতার ভিত্তিতে চালিত নয় বরং বিশ্বের বাইরে দণ্ডায়মান কোনো বস্তুর দ্বারা চালিত এবং বস্তুতঃ এর থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঈশ্বরাবির্ভাববাদী দর্শন ইতিপূর্বে উল্লিখিত এক বাসনা থেকে উদ্ভূত, সেই বাসনা হল এক বিশ্বজনীন শক্তি লাভ যদ্দ্বারা মনের সমস্ত কামনা পূরণ করা সম্ভব। এই মতকে সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বজনমান্য করার জন্য তাকে এই জগতের বাইরে রাখা হয়েছে, তাকে ঘুরিয়ে···একটা অতীন্দ্রিয় কিছু এবং সেই সঙ্গে এক যোগে এমন কিছু অত্যাসন্নের কাছে আনা হয়েছে—এ যে সকল শক্তির বাহক তা নয় বরং এমন কিছু যা প্রকৃতই বর্তমান, যা প্রকৃত আধ্যাত্মিক এবং প্রকৃত সচ্চিদানন্দ তার প্রতি অভিমুখী করা হয়েছে। এই অতীন্দ্রিয় গুণের ওপর পৃথিবীকে বিস্মৃত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পৃথিবীকে অপদার্থ মনে করা হচ্ছে, কেন, পরিণামে যা অস্তিত্বের বিধেয় তাকে অস্বীকার করা হয়। অতীন্দ্রিয়গণকে ব্রহ্মণ বলা হয়, সেই ব্রহ্মণ বিষয়ে ভারতে আগ্রহ ধীরে ধীরে একাদশদর্শিতা ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রহ্মণকে সন্ধান করে তাতে লীন হওয়ার বাসনা জাগে। পরিশেষে, শুধু একমাত্র ব্রহ্মণকেই জ্ঞান বলে স্বীকার করা হয়েছে; যিনি অন্য কোনো কিছুকে তাঁর জ্ঞানের আধার হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাঁকে অজ্ঞানত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ মনে করা হয়েছে।"

কয়েকজন জার্মান লেখক কর্তৃক ভারতীয় মানসের এই দিকটিকে প্রচার করা হয়েছে, সর্বোপরি তা করেছেন রুডলফ্ ষ্টাইনার, কাউণ্ট হেরবান, কাইসারলিঙ, এবং লিওপোল্ড্ ৎসাইগলার।

এই তিনজন ভারতবর্ষের প্রতিশ্রদ্ধা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন এদের অবদানের বৈশিষ্ট সপেনহাওয়ারের মতবাদকে সমর্থন করেছে। সপেনহাওয়ার-এর সেই মতবাদ ছিল মানব সমাজের কাছে মৌল অশুভবস্তু হল ইচ্ছাশক্তি। সমকালের ফ্যাসনদোরস্ত য়ুরোপীয় দার্শনিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে এঁরা ভারতবর্ষে অধ্যাত্মগুণের সন্ধান করেছেন এবং যা কিছু জড়বাদী একপেশে মনোভঙ্গীতে তাঁরা আপত্তি তুলেছেন। এইভাবে তাঁরা বিশ্বের মোহিণীমায়া

অর্থাৎ ভারতীয় মায়াবাদের প্রবক্তা হয়ে উঠলেন অথচ তাঁদের পাশ্চাত্য পরিবেশের বাঁধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করেন নি। আমরা যে দার্শনিকদের কথা উল্লেখ করেছি তাঁদের তিনজনের একজনও তাঁদের রচনার মধ্যে য়ুরোপীয় উত্তরাধিকারকে পরিহার করার প্রচেষ্টা করেন নি।

যাই হোক ষ্টাইনারের ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রভাব অবশ্য এমনই সুদৃঢ় হয়েছিল যে তিনি তাঁর বিদাত্মক এবং অধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করার সাহস দেখিয়েছেন হয়ত তিনি স্থূলসংসারের বাস্তবতার প্রতি ঘৃণা বশতঃই এই রকম করেছেন। অমহাজাগতিক অভিজ্ঞতা থেকে তিনি নতুন এবং প্রত্যাসন্ন উচ্চতর জগতের বাণী আহরণ করেছেন। এ জগৎ নতুন জাতের প্রাণী বা অতিমানব দ্বারা অধ্যুষিত এরা সর্বপ্রকার লৌকিক বন্ধন থেকে আপনাকে মুক্ত করতে সকল হয়েছেন। এরা পাশ্চাত্য পোষাকধারী যোগী, এক ধরণের আধ্যাত্মিক ফাউস্ট, যারা স্টাইনারের অনুগামীদের মধ্যে এমন অনেক ভক্ত দেখেছেন যাঁরা এক নবীন মানব সম্প্রদায়ের ছাঁচে গঠিত।

যদি সপেনহাওয়ার, এডুয়ার্ড ফন্ হারটমান এবং দেউসেন ভারতের দর্শনের সেই ব্যাখ্যা করে থাকেন যেখানে স্বয়ং নীটশেও মনুসংহিতার বিধান দ্বারা এর যে দিকটি উদ্‌ঘাটিত তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন—এর নাম দি থিওসফিক্যাল সোসাইটি। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই সভা স্থাপনা করেন জার্মান রাশিয়ান হেলেনে ব্লাভাটসকী (হেলেন ফন হান এই নামে জেকাটেরিনোস্লাভে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম এবং মার্কিন নাগরিক হিসাবে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়) পাশ্চাত্য দেশীয় বুদ্ধ ও কৃষ্ণতত্ত্বে বিশ্বাসীদের আগ্রহ তিনি বৃদ্ধি করেছেন। এই থিওসফি আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হল মাদ্রাজের এ্যাডিয়ার নামক স্থান হেলেনে ব্লাভাটসকীর শিষ্যা অ্যানি বেদান্ত সেখানে অনেক বছর সক্রিয় ছিলেন। হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যান বিষয়ে এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের নিজস্ব ভাবাদর্শ ছিল। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অঞ্চলে এই সোসাইটি স্থাপনার অল্পকাল পরে ফ্রানৎস হারটমান জার্মানীতে এই থিওসফি ভাবাদর্শ প্রচার করেন। তুলনামূলক ঈশ্বর তত্ত্ব দ্বারা এই ভাবাদর্শ প্রণোদিত এবং হিন্দু কর্ম-বাদকে সমন্বয় সাধন দ্বারা প্রাতিষ্ঠা করাই এর লক্ষ্য ছিল, অবশ্য উচ্চতর উন্নয়ন এবং বিবর্তন ইত্যাদি আধুনিক মনোভঙ্গী এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। রুডলফ ষ্টাইনার (১৮৬১-১৯২৫)—১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান শাখার সেক্রেটারি জেনারেল পদে মনোনীত হলেন। তিনি একজন জবরদস্ত মানুষ এডেল্লারে যে সব

ভাবাদর্শ প্রচার করা হত তিনি তা থেকে সরে এলেন এবং অচিরাৎ এই আন্দোলনের সদস্যদের বিরোধীতার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটি কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ষ্টাইনার তাঁর সঙ্গে কয়েকজন জার্মান সদস্যদের একটি গোষ্ঠি নিলেন এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এনথ্রপোসাফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই পদক্ষেপে পাশ্চাত্য ঐতিহ্য প্রত্যাবর্তনের লক্ষণ দেখা গেল এবং শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টের বাণী ও উপদেশাদিতে প্রত্যাবর্তন ঘটল। অবশ্য ভারতীয় এবং ভারতীয় ধরণের বা হিন্দু ধারার কিছু কিছু মতবাদের সঙ্গে সংযোগ রয়ে গেল। Chirstengemeinschaft বা "ক্রিশ্চান সম্প্রদায়" যাঁরা নতুন আকারের ধর্ম বিশ্বাসের সন্ধানী তাঁরাও এই এনথ্রপোসফিষ্টদের পরিবার ভুক্ত হলেন। ষ্টাইনার এবং প্রোটেষ্টানট যাজক ফ্রিডরিশ রিটেল মেয়ারের (১৮৭২-১৯৩৮) সঙ্গে যোগাযোগের এই হল প্রতিক্রিয়া। চার্চের পুর্ণনবীকরণের উদ্দেশ্যে এই সম্প্রদায় এক নতুন সংস্কারাত্মক অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন। ১৬ই সেপটেম্বর ১৯২২ তারিখে রিটেল মেয়ার সর্বপ্রথম তাঁর প্রবজ্যার (ordination) প্রথম কর্তব্য পালন করলেন। আশা করা গিয়েছিল যে অতঃপর এক নতুন যাজক সমাজ তৃতীয় অধ্যাত্মিক ক্রিশ্চান চার্চ প্রতিষ্ঠা করবেন। নতুন সম্প্রদায়ের সদস্যদের অবশ্য তাদের স্ব স্ব ধর্ম পরিত্যাগের কোনো প্রয়োজন ছিল না।

প্রতিষ্ঠিত চার্চগুলির তরফে গোড়ার দিকে মনোভাব ছিল যে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে খৃষ্টধর্মের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে ভবিষ্যমুখী এক ঈশ্বরতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। পরে যখন কর্ম আর পুর্ণজন্ম "খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের কাছে অধিকতর মুখ্যবস্তু হিসাবে গৃহীত হল তান তা সংশোধিত হল। পরিশেষে জার্মানীর কাউন্সিল অব প্রোটেষ্টানট চার্চ ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা সুরু করলেন যার ফলে রাষ্ট্রীয় গির্জা গুলির কাছে সুপারিশ পাঠানো হল যে একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা হোক, ক্রিশ্চান আর Christengemein schaft গোষ্ঠির মধ্যে, উভয় সম্প্রদায়েই সদস্যভুক্ত হয়ে থাকার ব্যাপারে নিরুৎসাহ করা হোক—ষ্টাইনারের সমন্বয়বাদী দর্শন উপলব্ধির নতুন উৎস ছিল আপত্তিকর অঙ্গ।

ক্লাউস ফন ষ্টাইগলিৎস রুডলফ ষ্টাইনারের Christosophyকে প্রোটষ্টানট দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরীক্ষা করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ষ্টাইনার একটা বিষয় ঠিকমত বুঝতে পারেন নি তা হল শেষ অবস্থায় যীশুখ্রীষ্টে

আস্থা স্থাপনের অর্থ সে বাস্তবতাকে বিশ্বাস করা যা আমাদের ভাবনায় যে বাস্তবতা বিরাজিত তা থেকে পৃথক। তবে ষ্টাইনারের গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি প্রশংসাযোগ্য কিছু বস্তু পেয়েছেন :

"ষ্টাইনারের গ্রন্থের প্রতি প্রাপ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শনে আমরা অস্বীকার করব না। অনেকের কাছে এটি একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার মনে হবে যে দেবতাকে নরত্ব আরোপের (Athroposophy) দ্বারাই যীশুখ্রীষ্টকে এমন এক কঠোর প্রশ্নে উপনীত করা হয়েছে। আর ষ্টাইনার এমনই আবেগভরে আপনাকে ঈশ্বর তত্ত্বের সঙ্গে জড়িয়েছেন যে তিনি বারবার এবং নিবিড়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ দিকেও বিজড়িত হয়ে পড়েছেন। খ্রীষ্টধর্মের ভবিষ্যৎ বিষয়ে তাঁর আন্তরিক উৎকণ্ঠা আমাদের এই বিশ্বাসের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে যে তাঁর সংগ্রাম এমন এক চিন্তা প্রসূত যা আধ্যাত্মিক হলেও তার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক এবং সে এক বিয়োগান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। আর তিনি সাধু একটা খ্রীষ্টীয় অনুভূতি মাত্র লাভ করেছিলেন কিন্তু খ্রীষ্ট কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত ঈশ্বরের মধ্যে যে বাস্তবতা আছে তা লাভ করতে পারেন নি।"

জর্জ ভিসেভম তাঁর Das Abendland unter dem geistigen Einfluss Asiens (এশিয়ার অধ্যাত্ম প্রভাবে পাশ্চাত্য জগৎ) নামক গ্রন্থে ভারত কর্তৃক প্রভাবিত আরেক বিভিন্ন গোষ্ঠির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :

"অপর কিছু ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত রহস্যময়তার দ্বারা বিবর্ধিত খৃষ্টধর্মের তত্ত্বের কথা বলেছেন ভাইহেন ব্রোণের Heims der Liebe (প্রেমের-নীড়) নামক প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা কার্ল আরনেষ্ট ল্যাংগের অনুগামীগণ। যোহানেস মূলারের (১৮৬৪-১৯৪৯) মত একই পন্থায়...তিনি বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের মাধ্যমে একটা ধর্মীয় মিলনের প্রয়াস করেছেন। Von der Verwirklichung Gottes (ঈশ্বরের প্রতিরূপ—১৯৫৪) নামক তাঁর প্রবন্ধে আমরা পড়ি : "আভ্যন্তরীন মহত্ব বিষয়ে সকল মানবের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, তথাপি সকলেই তাঁদের নিজেদের মধ্যে নিয়ে আছেন এক মহৎ একত্ব, ঈশ্বরের পরমাশক্তির উজ্জ্বল প্রভাব। লাও সে, কুঙ-সে, মোহম্মদ, বুদ্ধ, জরথুস্ত্র, মোজেস, পৃথিবীর আরও

সব মহান্ ধর্মগুরুদের যাই কেন নাম হোক না কেন—ঠিক ভারতীয় মহান গুরু এবং ঋষিদের মত, সবাই এক সুস্পষ্ট সংজ্ঞা বিশিষ্ট বিষয়ে একাত্ম তা হল যীশুখ্রীষ্টের মধ্যে প্রকাশিত দিব্য-চেতনাই সর্বোচ্চ দিব্য বাস্তবতা।…"

এই যুক্তি ভারতীয় সাধু শিবানন্দের যুক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সমান্তরাল, এই স্বামিজী ১৯৩৬-এ সুইজারল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়াতে ডিভাইন লাইফ সোসাইটি স্থাপন করেন। সুইজারল্যাণ্ডে মার্গারেট স্নাইডার পুস্তিকাদির মাধ্যমে যেমন স্বামিজীর অনুগামী সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন তেমনই লিফ্‌টল্যাণ্ড পাবলিসিং হাউস অষ্ট্রিয়াতে এই জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁদের ডোরনব্রিণের প্রকাশালয়টি উৎসর্গীকৃত করেন। তাঁদের অন্যতম প্রকাশনার Das Leben und Schaffen im Ashram des grossen indischen Meisters Swami Sivananda—(মহান ভারতীয় সাধক স্বামী শিবানন্দের আশ্রমের জীবন ও কর্ম) এই পুস্তিকার লেখক স্বামী পরমানন্দ। শিবানন্দের একদল জার্মান শিষ্য তাঁর নিজের নাম সম্পূর্ণ পরিহার করেন। তাঁর অধ্যাত্মিক নাম হয়েছিল স্বামী স্বরূপানন্দ। দুঃখের বিষয় অবশ্য তাঁর রচনাদির মধ্যে ভারতবর্ষ যথাসম্ভব উত্তম ভঙ্গীতে প্রতিফলিত হয়নি।

য়ুরোপে যে সব ভারতীয় তাঁদের বাণী প্রচার করেছেন বাংলাদেশের শ্রীঅরবিন্দ তাঁদের একজন। ইনি প্রখ্যাত স্বদেশ প্রেমিক নেতা এবং দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। তাঁর কর্মকেন্দ্র পণ্ডিচেরী "লা মেরে" কর্তৃক পরিচালিত। আমি এই কেন্দ্রের পাঠাগার ভবনের এক প্রান্তে যে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম তা আজো আমার স্মরণে আছে। আমার আলোচনা হয়েছিল এই কেন্দ্রের অনুবাদক ও গ্রন্থগারিক মেধানন্দের সঙ্গে (তাঁর প্রকৃত নাম ছিল ফ্রিৎস ভিনকেলষ্ট্রোয়েটার)। তিনি তাঁর এই ভারতীয় নামটি পেয়েছেন "লা মেরে"র কাছ থেকে তাঁর প্রতি মেধানন্দের সুগভীর ভক্তি, সেই ভক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে "লা মেরে" কর্তৃক অনুমোদিত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাবিষয়ক পদ্ধতি বিষয়ক পুস্তিকার নিম্নলিখিত ভূমিকাংশে—

"লা মেরে (শ্রীমা) যখন প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিষয়ে কথা বলেন তখন তিনি শুধু মাত্র তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেন না এবং শতশত

বালক-বালিকার শিক্ষক ও অভিভাবক হিসাবে তাঁর সাফল্যের দ্বারা নয় সেই সঙ্গে তিনি আবার অধ্যাত্মিক উপদেষ্টা এবং সারা বিশ্বে ছড়ানো সহস্র সাধকের তিনি গুরু, কঠিন যোগ সাধনার পথ নির্দেশক। তিনি যে তাঁর সকল সন্তানের দ্বারা পূজ্য এবং প্রায় দিব্য স্থান লাভ করেছেন এই সংবাদ শুধু তাদেরই বিস্মিত করবে যাঁরা এই আকর্ষনময়ী ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ সংযোগে আসেন নি, তার উজ্জ্বল প্রেম আর অতিপ্রীয় শক্তির পরিচয় পান নি।"

আমি ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে "লা মেরে" কে সর্বপ্রথম দেখি আশ্রমে তার নিজস্ব ভূমিতে। এই আশ্রম য়ুরোপীয় স্বচ্ছতায় উজ্জ্বল এক মহিলার সারা জীবনের সাধনার ফল। যে ভাবে এই ফরাসী মহিলা হিন্দু নারীত্বের সর্বোচ্চ সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং দিব্য সম্মান লাভ করেছেন তা প্রকৃতই বিস্ময়ের বিষয়। একজন প্রোটেষ্টাণ্ট ঈশ্বর তাত্ত্বিক ও তাঁর মুগ্ধমনের পরিচয় না দিয়ে পারেন নি :

> "এই মহিলাটির সম্পর্কে ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা প্রসঙ্গে বহুবিধ মানসিক সংরক্ষণ সত্ত্বেও (তাঁকে আবার একটি যোগে অবতার, দিব্য অতি-মানস হিসাবে অর্চনা করা হয়), আমি সামগ্রিক পরিবেশ পুষ্টিত তাঁর প্রচ্ছন্ন শক্তি এড়িয়ে যেতে পারিনি, তবে অবশেষে অরবিন্দের তিরোধানের পর যিনি এই আশ্রমের প্রকৃত কেন্দ্র বিন্দু তাঁকে পাশ কাটিয়ে চল্‌তে পারিনি।"

এই হিন্দু প্রভাবকে প্রশংসা করে ওয়ালটার এলডিৎসের গ্রন্থাদি আছে তার দ্বারা হিন্দু চিন্তার গভীর প্রবেশ করার সুবিধা হয়। এলডিৎস ভারতের মহাঋষি মহেশের আহ্বান অনুসরণ করেছেন।

হিন্দুধর্মের জার্মানভাষী অনুগামীদের সম্পর্কে কিছু বলা প্রায় অসম্ভব অগেহানন্দ স্বামীর নাম যদি উল্লেখ না করা হয়। হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর সাধুর এই নাম। তাঁর প্রকৃত নাম লিওপোলড ফিসার, ১৯২৩-এর ২০শে এপ্রিলে ভিয়েনা শহরে তাঁর জন্ম হয়। অতি অল্পবয়স থেকেই ভারতের প্রতি আগ্রহ থাকায় ফিসার সুভাষচন্দ্র বসুর ভারতীয় কূটনৈতিক দপ্তরে কাজ করেছেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের একজন প্রথমশ্রেণীর সাধুর পদে উন্নীত হন। তার কিছু পরে তিনি গোড়া দ্রাবিড় পন্থার দশনামী সম্প্রদায়ের কাছেও দীক্ষা গ্রহণ করেন। দার্শনিক রচনাদির একজন সুচতুর লেখক হিসাবে তিনি খ্যাত,

বহুবিধ সচল এবং অচল ভারতীয় উপ-মহাদেশের ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত —তিনি পার্থিব আনন্দের ও সুচারুবস্তু আদি বিষয়েও তেমন উদাসীন নন। হিন্দু সন্ন্যাসীদের যা সার তার গণ্ডীর মধ্যে হয়ত এই বিশেষ সাধু একটু বেশী দূরে চলে গিয়েছেন কারণ তাঁকে ভারত ত্যাগ করতে হয়েছে। যদিও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ওপরে ক্যানাডায় তিনি আজো ভারতীয়দের গুরু ও পুরোহিত হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন, বর্তমানে ক্যানাডাই তাঁর বাসভূমি। আশ্চর্যের বিষয় যে অগেহানন্দ (ফিসারের সন্ন্যাস আশ্রমের নাম) কথাটির অর্থ "গৃহহীনত্বের আনন্দ"। কার্ল ক্রিশ্চিয়ান সেন তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব বিষয়ে মন্তব্য করেছেন :

> ইংরাজী শিক্ষার জন্য তিনি একদল ভারতীয় শিক্ষক স্থির করলেন, তাঁর মাধ্যমেই তিনি একটি ভারতীয় সমিতির সদস্য হওয়ার সুযোগ পেলেন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই। এই সব সদস্যদের কাছ থেকে তিনি হিন্দুস্থানী শিখে নিলেন এবং বাড়িতে বসে নিজে নিজে সংস্কৃত শিখলেন। তারপর এল সেই সময়কার সুনিশ্চিত অভিজ্ঞতার কাল Konzerthanssal রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় নর্তক উদয়শঙ্করের আবির্ভাব হল। ফিসার তখন গ্রামার স্কুলের ছাত্র—এই অভিনয় তিনি অসহ্য উৎকণ্ঠায় দর্শন করলেন। তাঁর প্রত্যাশা অসার্থক হয়নি। তিনি মুগ্ধ আগ্রহে ভারতীয় দেবদেবী দেখলেন—এরাই এতকাল তাঁর স্বপ্ন ও কল্পনায় জড়িয়ে ছিলেন তাঁরা আজ নৃত্যের মাধ্যমে এসে আত্মপ্রকাশ করলেন। নান্দনিক উপভোগের চেয়েও এ অনেক বেশী—এ অনন্তশক্তির ধর্মীয় অভিজ্ঞতা। অতঃপর এই তরুণ ভিয়েনাবাসী যিনি আজীবন ভারতীয় মিশনারী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন তাঁর স্বদেশে বসেই বিদেশীদের দেবীর কাছে আত্ম সমর্পন করলেন। তাঁর যোড়শ জন্মদিনে, ফিসার ভারতীয় সমিতি ভবনে ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতি দেখলেন এবং শপথ নিলেন যে তিনিও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শরীক হবেন—
>
> তারপর এল যুদ্ধ, লিওপোলড ফিসার ছিলেন প্রটেক্টরেটর নাগরিক তাই তাঁকে যুদ্ধের কাজে ডাকা হল না কিন্তু তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর ভারতীয় রাষ্ট্রদপ্তরে কাজ নিলেন। তারপর একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘট্‌ল ; এই যে বহিরাগত ব্যক্তি, পেশাদার সৈনিকদের দলে এই যে

পণ্ডিত, এশিয়াবাসীদের মধ্যে সেণ্ট্রাল য়ুরোপের অধিবাসী অথচ তিনিই সেদিন রাষ্ট্রদপ্তরের বৈদগ্ধ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলেন। কারণ একমাত্র তাঁরই সংস্কৃতে অধিকার ছিল। তিনি বেদ, উপনিষদ ও ভগবদগীতা পাঠ করতে পারতেন। ফিসারের ভারতীয় সহযোদ্ধ-গণের পুরোহিতের পদও তিনি গ্রহণ করলেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার তিনমাস পূর্বে ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন বা ভারতীয় রাষ্ট্রদপ্তর ওয়াফেন এস এস এর সঙ্গে যুক্ত হল। তাঁরা টুটলিঙ্গেনের কাছে ফরাসীদের কাছে ধরা পড়লেন। তারপর ব্রিটিশ অন্তরীণ শিবিরে বন্দী হতে হল। হিন্দু পুরোহিত ভিয়েনার লিওপোল্ড ফিসার আরও সকলের সঙ্গে মার্চ করে চললেন। অনেককাল আগে থেকেই স্থির করেছিলেন যে ভারতীয় দেব-দেবীদের তিনি দেখবেন এতদিনে তীর্থযাত্রার সুযোগ পাওয়া গেল। তিনি আপনাকে ভারতীয় বলে পরিচয় দিলেন, তাঁর উজ্জ্বল গৌরকান্তি বিষয়ে কৈফিয়ত দিলেন যে তিনি একজন কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। বৃটিশরা তাই বিশ্বাস করল। দুটি বছর কাল ধরে এবং তাঁর সহযাত্রীবন্ধুগণ ভারতে ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন। তারপর এল গভীর হতাশা—তাঁকে অস্বীকার করা হল এবং বোম্বাই শহরের পরিবর্তে ভিয়েনায় পাঠানো হল। এই প্রতীক্ষার কালটুকু ফিসার অন্তবিধ প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশোনা চালিয়ে গেলেন। তারপর তাঁর বন্দী-জীবনের সম্পর্কের অনুগ্রহে তিনি সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতে স্বাধীনতা লাভের পরের বছরই যাত্রা করার সুযোগ পেলেন।"

যাই হোক, আমরা এখানে দর্শন ও ঈশ্বরতাত্ত্বিক সংযোগ বিষয়ে আলোচনা করছি। যিনি সর্বপ্রথম এই সংযোগ স্থাপন করলেন তিনি রুডলফ ষ্টাইনার। ১৯২২-এর জুন মাসে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে প্রাচ্য পাশ্চাত্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি সেকেণ্ড ইণ্টারন্যাশন্যাল কনগ্রেস অব দি এনথ্রোপ-সফীক্যাল ম্যুভমেণ্ট ইন ভিয়েনায় ভাষণদান প্রসঙ্গে এই বিশ্লেষণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার রহস্য ব্যাখ্যা করেন:

"আমি এইবার সার সংক্ষেপ করে একটি চিত্রের কথা উত্থাপন করতে অভিলাষী যার মধ্যে দুটি মনোভঙ্গী প্রকাশিত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বোঝাপড়ার ব্যাপারে এটি যে কি তা দেখানোই আমার

উদ্দেশ্য। আরো এক চিত্র দ্বারা এর সমীকরণ করছি, যেকালে প্রাচ্য দেশীয় শারীরিক অনুভূতিসূচক জগৎ এবং মায়ার প্রভাবে প্রভাবিত মানব জীবন সর্বপ্রধান সেইকালে যেই মহাপুরুষ যিনি বুদ্ধ নামে পরিচিত তিনি তাঁর পরিক্রমণের কালে মাটির পৃথিবীতে মানুষের নিদারুণ দুর্দশার রূপ প্রত্যক্ষ করলেন। সেই রূপগুলির মধ্যে কি ভাবে একটি মৃতদেহও এসেছিল আর কিভাবে বুদ্ধ মৃত্যুর মুখোমুখি হলেন এবং কিভাবে মানবের মৃত্যুর সঙ্গে সেই সংযোগের ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে বাঁচার জন্যই ক্লেশ ভোগ করা।

খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ছয়শো বৎসর পূর্বে এই ছিল প্রাচ্য দেশীয় সংস্কৃতির ভঙ্গী। এর ছয়শো বৎসর পরে খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তিত হল এবং তার পর থেকে এক অনন্য প্রতীকের অস্তিত্ব দেখা গেল; এর নাম ক্রুশ; উদ্যত ক্রুশ, তার সঙ্গে ত্রাণ কর্তা সংযুক্ত, মৃত মানবের দেহ ক্রুশে বিদ্ধ। অসংখ্য মানুষ এই দেহের দিকে তাকায়, পাশ্চাত্য জগতে এই দেহের চিত্রের প্রতি তাকায়, ঠিক যেমন অসংখ্য মানুষ যাঁরা বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন সেই দেহের দিকে তাকান যে দেহ থেকে বুদ্ধ তাঁর তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। প্রাচ্য দেশ ঠিক যেমনটি ঘোষণা করেছেন, বাঁচার অর্থ ক্লেশ ভোগ করা আমরা মুক্তির জন্য মোক্ষের জন্য আকুল—পাশ্চাত্য জগতের মানুষ মৃতদেহের চিত্র পরিকল্পনা করেছেন। তথাপি দেহের দিকে তাকিয়ে তারা শুধু কোনো বাক্য উচ্চারণ করে না; বাঁচার অর্থ ক্লেশ ভোগ। না, মৃত্যুর দৃশ্য তাদের কাছে একটা প্রতীক, পুনর্জন্ম, আভ্যন্তরীণ মানসিক শক্তির অভ্যন্তর থেকে প্রাণশক্তির উজ্জীবন; এই প্রতীকে বলা হয়েছে যে মানুষের ক্লেশ বা যন্ত্রণার হাত থেকে এই শারীরিক খোলস থেকে মুক্ত হলেই ত্রাণ পাওয়া যায়। তবে সেই শরীরের দিক থেকে সন্ন্যাসীর মত মুখ ফিরিয়ে নিলেই হবে না। তাকে পরিপূর্ণভাবে দৃষ্টির গোচরে রাখতে হবে, তাকে মায়া বলে গ্রহণ করে নয় তাকে শ্রমের দ্বারা. ক্রিয়ার দ্বারা, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দ্বারা জয় করতে হবে।...একটি দর্শণ প্রাচীন এবং জর্জরিত। কিন্তু এর মধ্যে এমনই মহত্ত্ব বিজড়িত যে একে জরাজীর্ণ মনে হবে

না, তার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাতে হয় যেন তাকে অর্চনা করতে হবে। যা প্রাচীন মানুষ তার অর্চনা করে। কিন্তু এ জিনিষ কেউ প্রত্যাশা করে না যে প্রাচীনরা নবীনদের মনোভঙ্গীর স্বীকার করে ঘোষণা করবেন। পাশ্চাত্য জগতে আজ আমরা যার সম্মুখীন তার মধ্যে সূচনার বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই মনোভংগীতে আমরা দেখিয়েছি যা মনের ভাবাদর্শ বলে মনে হয় সেই গুণের পরিণতি কি ঘটে। যা নবীন, যার ক্রমবিকাশ ঘটবে, একটা তারুণ্যের শক্তি তা থেকে উদ্ভূত হবে, নিজস্ব ভঙ্গীতে অধ্যাত্মিকতা লাভের প্রয়োজনে। প্রাচ্যদেশ তার অধ্যাত্মভঙ্গী প্রাকৃতিক বিধানেই লাভ করেছে। আমরা যদি প্রাচ্যদেশকে তার অধ্যাত্মিক গুণের জন্য শ্রদ্ধা করি তাহলে অন্ততঃ একটি বস্তু আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের পাশ্চাত্য সূচনা থেকেই আমাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিকতা গড়ে নিতে হবে।"

দীর্ঘকাল ধরে এই ছিল একমাত্র সুগভীর সংলাপ, আত্মগত সংলাপ হয়ত পরিচালিত হয়ে থাকবে। অতি সম্প্রতি বিতর্কমূলক ভঙ্গী একটা সুভদ্র— সমালোচনাত্মক, চিন্তামূলক বিচার যাকে বলা যায় 'সহিষ্ণু' মনোভংগী তার উদ্ভব ঘটেছে।

একটা কোনো সংলাপে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত মনোভংগী স্বাভাবিক কারণেই প্রাচ্যদেশীয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্য জগতে মিশনারী প্রচেষ্টা চালানোর সুবিধা হয়েছে।

ভারতীয় বা ইঙ্গ-ভারতীয় ধর্মমতগুলির মত। ইসলাম ও জার্মানীতে ধর্মান্তরকরণে প্রয়াসী হয়েছিল তার দূতগণ অবশ্য পাকিস্তানি মুস্‌লিম, ভারতীয় মুসলিম ন'ন। পাকিস্তানী রাজনীতিবিদ মোহম্মদ আসাদ রচিত Road to Mecca-র কথা বিশেষভাবে মনে জাগে, সাহিত্যিক ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের দিক থেকে এই গ্রন্থটি আগ্রহ সৃষ্টি করে। এই গ্রন্থের মুসলিম লেখক ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে জীবনযাত্রা সুরু করেন। তিনি অষ্ট্রীয়ান ইহুদী-ঘরের সন্তান, তাঁর নাম ছিল লিওপোলড ভাইস। মুখ্য জার্মান-ভাষী সংবাদ-পত্রগুলির মধ্য-প্রাচের পত্রকার হিসাবে কিছুকাল কাজ করার পর ভাইস ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হন। কবি ইকবালের দলবলের দঙ্গে তাঁর অবিরাম সংযোগ ঘটল—এই কবিই এক সময় পাকিস্তান পরিকল্পনায় প্রবক্তা

ছিলেন। আসাদ কবির কাছাকাছি একটি স্থানে বসবাস সুরু করলেন। এবং পরে পাকিস্তানী নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেন। দু বছর কাল ধরে ইউনাইটেড নেশনদের জাতিপুঞ্জের সভায় তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলেন।

একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচণ্ড ইসলামী প্রচারণা করা হয়ে থাকে, এই সম্প্রদায়ের নাম আহমদিয়া, এঁরা হামবুর্গ ও জ্যুরিখে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কোরাণ-জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন। যাইহোক, গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায়রা আবার আহমদিয়াদের প্রত্যাখ্যান করেছেন।

জ্যুরিখের বালগারিষ্টে যখন মাহমুদ মসজিদ প্রতিষ্ঠা হল তখন ওয়ালথার ব্যমগার্টনার কর্তৃক আহমদিয়া সম্প্রদায় প্রসঙ্গে লিখিত একটি প্রবন্ধ New Zurcher Zeitung-এ প্রকাশিত হ'ল। নীতি, ও পারিবারিক জীবনের উন্নয়ণের ব্যবস্থার প্রশংসা করে সেই জেহাদ বিরোধী মনোভঙ্গীর উল্লেখ করে ব্যমগার্টনার বলছেন—

> "এইভাবে, আহমদিয়া প্রকৃতপক্ষে একটি সহানুভূতিশীল ইসলামীয় সংস্কারপন্থী আন্দোলন বর্তমান কালের বহুবিধ অনুরূপ আন্দোলনের অন্যতম। তথাপি আরও কয়েকটি বস্তু সম্পূর্ণ "অ-ঐশ্লামীয়" ধারণা সৃষ্টি করে। যেমন এর বিচিত্র খ্রীষ্টতত্ব। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দৃঢ়ভাবে খ্রীষ্টতত্ব বনাম গোঁড়া ইসলামীতত্ত্বের প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত হিসাবে যীশুখ্রীষ্টের অভ্যুত্থান ঘটেনি, তিনি মৃত। তাও আবার ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নয় আরও অনেক পরে কাশ্মীর নগরে তাঁর মৃত্যু হয়।.........
>
> এসব ব্যাপার অন্য দিক থেকেও তেমন মনোহর নয়। শ্রীনগরে যীশুখ্রীষ্টের কবর আবিষ্কার বলে যা উল্লেখ করা হয়েছে। মির্জার কাছে যা যীশুখ্রীষ্টের তথাকথিত কাশ্মীর যাত্রার অকাট্য প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হয়েছে তার ফলে অবস্থার উন্নতি হয়নি। প্রশ্ন ওঠে মিরজা তাঁর সংস্কার কার্যক্রমে এমন সব উদ্ভট কল্পনার প্রশ্রয় দেন কেন, তিনি নিজেই কি এই সম্ভাবনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন। তাঁর অবশ্য প্রয়োজন ছিল, তিনি প্যালেষ্টাইনের ইহুদী এবং তাঁর নিজের স্বদেশ কাশ্মীরের মধ্যে একটা সেতু রচনার প্রয়োজনেই এই তথ্য ব্যবহার করেছেন। এই ব্যাপারে তিনি সম্ভবতঃ প্রেরণা

পেয়েছেন (তিনি স্বয়ং তার উল্লেখও করেছেন) কুখ্যাত জুয়াচোর নিকোলাস নটোভিবের Lavie inconnue de Tesus Paris 1894 নামক যীশুর জন্মজীবনীর ওপর নির্ভর করেছেন। এই লেখক ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক যীশুকে ভারতে পাঠিয়েছেন এবং সেখানে বছর দুই বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী পঠন-পাঠনের কথা বলেছেন। আহমদিয়া রচনাবলীর যে কোনো পাঠকের উচিত একটি প্রশ্নের যাচাই করা কিভাবে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মিরজা ঐতিহাসিক যীশুর সঙ্গে সম্পর্ক কল্পনা করেছেন।

এই প্রশ্নটি আমাদের আরেক গুরুতর প্রসঙ্গে নিয়ে যায়: মির্জা নিজের জন্য যে ভূমিকা দাবী করেছেন সেই বিষয়ে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তাঁর অনুগামীদের আদেশ দিয়েছেন তাঁকে খালিফ হিসাবে অর্চনা করতে; অর্থাৎ ভবিষ্যৎবাণীর নির্দেশানুসারে তিনি মহম্মদের উত্তরাধিকারী যেহেতু তিনি কোরাণে অজ্ঞাত; কোরাণে মহম্মদের সঙ্গেই অভ্যুদয়ের সমাপ্তি। এমন কি "লাহোর পার্টি" যা ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে আহমদিয়া পার্টির বিভাজন ঘটিয়েছে অনুরূপ ভাবে মিশনারি কর্মাদি করে থাকে। তাঁরা একটা নিজস্ব কোরাণ প্রচার করেছেন। তাঁরা মির্জার এই উপাধি দিতে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁকে একজন সংস্কারক হিসাবে স্বীকৃতিদান করেছেন মাত্র······

অতএব আহমদিয়াদের দুটি ধারা: একটি ইসলামি সংস্কার আন্দোলন যা সকলে সরাসরি সেই ভাবেই গ্রহণ করেন—বিশেষ করে ধর্মযুদ্ধকে প্রত্যাখান করার জন্য। তবে এই বিশেষ শিক্ষার আরেকদিক আছে···যা আমাদের উভয়ের কাছেই সোজাসুজি গ্রহণ যোগ্য নয় এবং গোঁড়া ইসলামিদের কাছেও গ্রহণীয় নয়। এই ভঙ্গীই সমগ্র ইসলামী জগতে বিস্তার লাভ করার আহমদীয় আশার মূলে কুঠারাঘাত করবে।"

জার্মান মুসলমানগণ য়ুরোপের এক অন্যতম মনোহর ধর্মক্ষেত্রে সমবেত হতে ভালোবাসেন—১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সৃখভেটৎসিনগেনের ক্যাষ্টেল পার্কে প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়। স্থাইটিক মসজিদ সাম্প্রতিক কালে নির্মিত মসজিদগুলির অন্যতম —হামবুর্গের অসেনঅলস্টারে মসলেমলীগ কর্তৃক নির্মিত হয়েছে এই মসজিদ। এ কথা উল্লেখ করা কর্তব্য যে কোরাণের প্রথমতম আরবী পাঠ—(মানবিক

ও ধর্মবিশ্বাসের ও ঈশ্বরানেষ্টনের শ্রদ্ধাপূত দলিল)—যা ক্রিশ্চানদেশে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় তা ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হামবুর্গে প্রকাশিত। এর সম্পাদক ছিলেন হিনকেলমান, তিনি, সেন্ট ক্যাথরিণ চার্চের প্যাসটর, তিনি পীয়েতবাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। বাসেলে ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম লাতিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়, এই অনুবাদ করেছিলেন ঈশ্বরতাত্ত্বিক প্রোটেষ্টানট থিওডোর বেইলাণ্ডার। হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মগুলির প্রভাব তুচ্ছ। জৈনধর্মের প্রধান ভাষ্যকারগণ ভারততত্ত্ববিদ যথা আলব্রেসট ওয়েবার, হেরমান জ্যাকোবী, আরনষ্ট লেউমান, ওয়ালথার সর্খুব্রিঙ, যোহানেস ক্লাট, আরনষ্ট ওয়াইনাভিসখ্, জর্জবুলার, রিচার্ড পিস্খেল, যোহানেস হারটেল. হেলমুথ ফন গ্লাসেনাপ, লুডভিগ এলসড্রফ, যোশেফ ফ্রিডরিশ কোহল, ফ্রাঙ্ক রিচার্ড হাস, গুস্তাভ রথ, সার্লোট ক্রাউসে, ওটোষ্টাইন, থিওডোর জ্যাকারিয়ে ও ক্লাউস ব্রুউন। জৈনধর্ম তার অহিংস নীতির জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ; অর্থাৎ জীবাকে সম্মান দিতে হবে, তাকে হত্যা নয় জৈনধর্মের এই হল মূলনীতি। ক্লাউস ব্রুউন জার্মান জৈন গবেষনার এক বিস্তারিত প্রশস্তি রচনা করেছিলেন। সেই রচনাটি Voice of Ahimsa নামক পরলোকগত কামতা প্রসাদ জৈনের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জ্যাকোবী জৈনধর্মের আধ্যাত্মিক ধারা অনুসরণ করেন ম্যাক্সম্যুলারের "প্রাচদেশের পবিত্র গ্রন্থা"দির উত্তম অনুবাদের মাধ্যমে।

সার্লোট ক্রাউসের নাম ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এই মহিলাটি শুধু যে একজন জৈন গবেষক তা নয় তিনি জৈন ধর্মমতেও বিশ্বাসী এবং তা অনুসরণ করে থাকেন।

জৈনধর্মের সঙ্গে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলেন লোহার ওয়েনডেল তিনি লণ্ডনে জৈন দার্শনিক চম্পট রায় জৈনের সংস্পর্শে আসেন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। সেই থেকেই তিনি অধ্যাত্ম ভারতের মোহে মুগ্ধ হন। আমার স্মরণে আছে 'ষ্টেটস-ম্যান' পত্রিকার নিহাল সিং যখন আমার দিল্লীস্থ বাসভবনে লোয়ার ওয়েনডেল-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন। সেই সময় ওয়েনডেল প্রায় চার বছর ধরে জার্মান ও ফ্রেঞ্চ ভাষা শেখাচ্ছিলেন ; তিনি গ্যয়েটের 'ফাউষ্ট' ও উমাশ্বতী-র "তত্ত্বার্থসূত্রে"র একই ধরণের বৈদগ্ধ্যগত মূলসূত্রের সন্ধান পেয়েছেন। পরে তিনি এই ভাবনার কথা 'Voice of Ahinsa' নামক পত্রিকার বিশেষ জার্মান সংখ্যায় লিখেছেন এবং তাঁর আধা-জীবনীমূলক গ্রন্থ Thought, Life and Humanity নামক গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। যে কয় বছর তিনি ভারতে

ছিলেন তিনি জার্মান ফরাসী সম্পর্ক ও কমনওয়েলথের সঙ্গে জার্মান সম্পর্ক বিষয়ে সমীক্ষা করেন। ওয়েনডেলের মস্তিষ্কপ্রসূত সন্তান ব্যাড গডেসবার্গের চম্পট রায় জৈন লাইব্রেরী ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উদ্বোধিত হয়। এই উদ্যোগ এবং তাঁর রচনাবলীর দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি কি বলিষ্ঠ ও মৌলিক মানসের অধিকারী ছিলেন—তিনি সেই শ্রেণীর মানুষ যাঁরা তাঁদের প্রতিভা স্বার্থহীন ভঙ্গীতে জন-সংযোগ বিকাশের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

ভারতবর্ষ যখনই কোনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাশ্চাত্য জগৎকে শোনাতে পেরেছে (আর তার মধ্যে জার্মানীর বিদগ্ধ সমাজ অন্তর্ভুক্ত)—তখন তা সে বিদগ্ধ রাজনৈতিক পণ্ডিত সমাজ দিয়ে সম্পন্ন করেছে। অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাহাত্মা গান্ধী সকলেরই জার্মানদের উপর এক মহান প্রভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব মূলতঃ ছিল সাহিত্যিক, এমন কি পীয়েকজিনসকার গ্রন্থ Tagore als Erzeihar (ঠাকুর পণ্ডিত হিসাবে এই গ্রন্থটির মূলে ফরাসী ভাষায় প্রকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথকে বিদগ্ধ জনতার নেতৃস্থানীয় হিসাবে উপস্থাপিত করে। জার্মানীর অরবিন্দ ও ঠাকুরচক্র সত্ত্বেও ভারতের এই দার্শনিক সাহিত্যিক প্রতিনিধিদের প্রভাব কিছুটা বহিরঙ্গ। গান্ধী, মহাত্মা অপরদিকে ভাবাবেগ সৃষ্টি করেছেন এবং সচেতন করেছেন। এর পিছনে ছিল রঁমা রঁলার গ্রন্থ, আর অংশতঃ জার্মান লেখকবৃন্দ রচিত অজস্র গান্ধী সাহিত্য। এই সব লেখকবৃন্দের অন্যতম হলেন ভেরনার জিমারমান, তাঁর লিখিত ক্ষুদ্রাকৃতি গান্ধী জীবনী ভক্ত হৃদয়ের ভক্তি রসাপ্লুত। এ. ষ্ট্রোল তাঁর সহযোগীদের মধ্যে গান্ধীবাদের ধর্মীয় দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিশ্বব্যাপী। রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন খাঁটি দার্শনিক, এঁরা তাদের কর্তব্য শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমিত মনে করেন নি, তাঁরা জাতির মধ্যে এবং বিভিন্ন ধর্মমতের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেছেন সৎকর্ম ও সুনীতির দিক থেকে আবেদন জানিয়ে। এই লক্ষ্য নিয়ে যে সব গোষ্ঠী এখনও কাজ করছেন তাঁদের মধ্যে Religioser Menschheitsbund (মানব জাতির ধর্মীয় পরিষদ) গান্ধীবাদের আদর্শে স্থাপিত। এই নামটিকে কিঞ্চিৎ সর্বব্যাপী মনে হতে পারে কিন্তু প্রতিষ্ঠাতারা অনুভব করেছিলেন যে প্রতিটি মানুষ "জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে নৈতিক মানকে" উন্নত করার ব্যাপারে সংযোজকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন।

রুডলফ ওটো, মারবুর্গের অধ্যাপক, তিনি ১৯২১-এ এই পরিষদ বা ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন গভীর ভাবে ভক্তিবাদে প্রভাবিত মানুষ। হিন্দুধর্মের এই অংশটি দৈব করুণার প্রতি গভীর ভাবে বিশ্বাসী। ওটো-র এই পরিষদ কোনোরকম উপধর্ম বিশ্বাস প্রবর্তনে প্রয়াসী হন নি তিনি "Esperanto of Religions" (ধর্মমতের বিশ্ব বিকল্প) বলে যা উল্লেখ করেছেন তার জন্য কাউকে কখনও আহ্বান করেন নি। প্রত্যেকেই ঈশ্বরানুসন্ধানের ব্যাপারে যথেচ্ছ পথ গ্রহণ করতে পারেন তবে তাঁকে একথা মনে রাখতে হবে যে সব মানুষই ভাই। আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য কাজ করার জন্য ধর্মমতভিত্তিক একটা যৌথ সমিতির কথা এই জার্মান অধ্যাপক কল্পনা করেছিলেন। এই পরিষদের লক্ষ্য ছিল সহনশীলতা। পরিষদের বার্লিনের নিকটবর্তী ভিল হেলমস হাগেনের অধিবেশনে যাঁরা ভাষণ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ক্যাথলিক, প্রোটেষ্ট্যানট, বৌদ্ধ এবং হিন্দুরাও ছিলেন। এইখানেই রুডলফ ওটো "Weltgewilsen" বা বিশ্ববিবেক কথাটি রচনা করলেন।

'রিলিজিয়ান ফেডারেশন অব ম্যানকাইনডে'র মার্কিন সদস্যগণ কর্তৃক ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'চার্চ পিস ইউনিয়ন' স্থাপিত হয়, এবং মূল ফেডারেশনের সদস্যবৃন্দ একযোগে এই পরিষদে যোগ দিলেন এই আশা নিয়ে তৎকালীন হতাশাজর্জর জার্মানীর পক্ষে যা সম্ভব তার চেয়ে মার্কিনরা অধিকতর প্রাণশক্তি নিয়ে কাজ করতে পারবেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার যখন ক্ষমতার আসীন হলেন তিনি "রিলিজিয়াস ফেডারেশন অব ম্যানকাইনড" নিষিদ্ধ করলেন, ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয় নি। তখন যাঁরা সেই প্রচেষ্টার প্রাণ পুরুষ ছিলেন তাঁরা হলেন কে, কুসনার ও ফ্রিডরিশ হাইলার। শেষোক্ত ব্যক্তি মারবুর্গের অধ্যাপক রুডলফ ওটো-র মতো তাঁর পূর্বস্থরীর মতো ভক্তিবাদে গভীর অনুরাগী ছিলেন। "রিলিজিয়াস ফেডারেশন অব ম্যানকাইনড" বর্তমানে ওয়ার্লড ইউনিয়ন অব রিলিজিয়ানসে"র সঙ্গে সংযুক্ত, এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ং হাসবাণ্ড নামক ইংরাজ ভদ্রলোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'ওয়ার্লড ফেলোসিপ অব রিলিজিয়নসে'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে বলে, এই প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর দিল্লীতে।

এটা অবশ্য কাকতালীয় ঘটনা মাত্র বলা যায় না যে "রিলিজিয়াস ফেডারেশন অব ম্যানকাইনড"-এর সদস্যগণ ভারতের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ

সহমর্মীতা অনুভব করবেন। একথা প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ এবং পরবর্তীকালের সদস্যগণের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। যাঁরা বর্তমান সদস্য তাঁদেরও বাদ দেওয়া যায় না, এঁর উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে আছেন ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি, রাজনীতিবিদ দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। তথাপি এর প্রথম যুগে সেই শ্রদ্ধা আকর্ষনী ব্যক্তি গান্ধিজীর আদর্শেই ইউনিয়নের জার্মান সদস্যগণ আপনাদের গড়তে চেষ্টা করেছিলেন। ডাঃ কারোলা বারথ কর্তৃক একটি প্রবন্ধে এই মনোভংগী প্রকাশিত, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে "ভেরিতাতি"তে এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। ফেডারেশন সদস্য প্রফেসর জোহানেস হোসেনের প্রতি সম্মার্থে এই স্মারক ভাষণ রচিত হয়।

> "মহাত্মা গান্ধী রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের ব্যাপারে যখন লণ্ডনে উপস্থিত সেইকালের ঘটনা; সেখানে অবস্থান কালে, তাঁর সঙ্গে জার্মান কোয়েকারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে, তাঁরা জানতে চান জার্মানী ঘুরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব কিনা। রুডলফ ওটোর সঙ্গে তাঁর বন্ধুরা কলোনে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে পরামর্শ করলেন, তিনি প্রস্তাব করলেন মহাত্মাজীকে তাঁর ভ্রমণ পথ নির্বাচনের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হবে তবে একযোগে "রিলিজিয়াস ফেডারেশন অব ম্যানকাইনডে"র একটি গোষ্ঠী স্থাপনা করা হবে এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ অতিথিকে যথাযোগ্যভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হবে এবং এই যোগাযোগের ফলে একটা স্থায়ী লাভের অংশ ভোগ করা সম্ভব হবে। দুঃখের বিষয়, গান্ধিজীর এই যাত্রার ব্যাপারটি সফল হল না। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অবস্থার জন্য তাঁকে তাড়াতাড়ি স্বদেশে ফিরতে হল। কিন্তু কলোন গোষ্ঠী রয়ে গেল। তার সঙ্গে সংযুক্ত হল একটি "গান্ধী সোসাইটি" মহাত্মাজীর মানসিকতার মূলতত্ত্ব চর্চা করা হল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। যোহানেস হেসসেন উভয় চক্রের নেতৃস্থানীয় সদস্যগণের মধ্যে অন্যতম।"

গান্ধীজী হয়ত কোনো দিন জানতে পারেন নি যে তিনি ফেডারেশনের একটা অতিশয় উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী স্থাপনার প্রেরণা স্বরূপ, এই অবস্থা থেকে বোঝা যায় তাঁর প্রভাব কি গরিমা বিশ্বজনীন ছিল। তবু, আরো একবার কারোলা বারথ্ থেকে উধৃতি দেওয়া যাক:

"আমাদের রিলিজিয়াস ফেডারেশন অব ম্যানকাইনডে"র সভানুষ্ঠান ছাড়াও আমাদের চক্র পক্ষকালে একবার গান্ধী সোসাইটির অধিবেশনে মিলিত হত। আমরা সেইখানে গান্ধীর রচনা এবং বক্তৃতাদি পাঠ করতাম ও সত্যগ্রহ, অহিংসা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, ও সর্তহীন সত্যভাষণ বিষয়ক তাঁর নীতিগুলি আলোচনা করতাম। আমরা গান্ধিজীর লণ্ডনস্থ বন্ধুগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলাম। তাঁদের পত্রিকা "দি ফ্রেণ্ডস অব ইনডিয়া" পাঠ করতাম, এবং মাঝে মাঝে যে সব ভারতীয় কলোন ঘুরে যেতেন তাঁরাও আস্তেন তাঁরা আমাদের চক্রে ইংলণ্ডের পথেও বা ফেরার পথে ভাষণ দিতেন। রুডলফ ওটোর সুপারিশে আমাদের এখানে এসেছিলেন ফেডারেশনের ভারতীয় শাখার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং মাদ্রাজের সেণ্ট টমাস খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মিঃ এ, পল। একটি সুন্দর সমাবেশে তাঁকে "গান্ধী একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব" এই প্রসঙ্গে কিছু বল্‌তে অনুরোধ করা হল। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অনশনের ধর্মীয় পটভূমি বর্ণনা করলেন এবং অস্পৃশ্যদের প্রতি ব্যবহার বিষয়ে তাঁর সংগ্রামের উল্লেখ করলেন। এ এক আনন্দ সমাবেশ, যাঁরা এই সমাবেশে উপস্থিত ছিল তাঁরাও লাভবান হলেন।"

রুডলফ ওটোর ভাবাদর্শ যে সব বস্তু পবিত্র সেই সব বস্তুকেই তুলে ধরেছেন এবং তা শুধু যুগে যুগে ছাত্র সমাজকে নতুন ছাঁচে গড়ে তোলার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে, তারা আজো জীবিত, আকারে ক্ষুদ্র হলেও এই সব গোষ্ঠী প্রাণবাণ এবং তারা সকল প্রকার ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সংযোগ সেতু রচনায় আত্মনিবেদিত। তাদের মূলনীতি হল সহনশীলতা।

তবুও গান্ধিজী এবং তাঁর উপদেশ বিষয়ে কিছু বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বরও ধ্বনিত হয়েছে। ওটো ভোলফ্, খ্রীষ্টানভূমিতে দাঁড়িয়ে যিনি গান্ধীর রচনাবলী বিশ্লেষণ করেছেন সবচেয়ে বেশী করে তাঁর আপত্তি ক্রশ বিষয়ক ভাবাদর্শ বিষয়ে গান্ধীর মনোভঙ্গী। গান্ধীর রাজনৈতিক ভাবনার মধ্যে ভোলফ দেখেছেন এক—

"সুমহান পবিত্র অহিংসার নামে এক রাজনৈতিক ও নৈতিক ব্ল্যাকমেইল পদ্ধতি।"

এর উপর, ভোলফ্ অনশন পদ্ধতির মধ্যে পেয়েছেন "ঈশ্বর খ্রীষ্টানদের প্রতি যে দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন তার সঙ্গে গরমিল"। বিভিন্ন ধর্মমত বিষয়ে গান্ধীর মনোভঙ্গীকে তিনি অনুরূপভাবে নির্মম সমালোচনা করেছেন :

> "গান্ধী বিবেচনা করেন নীতির দিক থেকে ধর্মকে ঐতিহাসিক ভাবে অতি ঐতিহাসিক (Supra-historical), নিছক বাস্তব, বলে নয়। তিনি সুগভীর যুক্তিবাদে তার বিচার করেন। তাঁর কাছে ধর্ম "মহান ধর্মগুরুদের উপদেশ"। এখন আপনারা এই উপদেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন বা হজম করতে পারেন, তাকে সম্পূর্ণ করতে পারেন, অধিকতর বিকশিত করতে পারেন, তাদের মিশিয়ে নিতে পারেন। পরিশ্রুত করতে পারেন—যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে "এই ধর্মের সান্নিধ্য পাওয়ার মানসে এ ধর্ম ঐচ্ছিক হয়ে আছে সকলপ্রকার সীমিত ধর্মোপদেশের মধ্যে। অন্ততঃ সকল সহনশীল ও উন্নতমনা জ্ঞান বিকারণকারী ব্যক্তির এই লক্ষ্য এবং আদর্শ হওয়া উচিত। অতএব গান্ধী মনে করেন যে তিনিও খ্রীষ্টধর্ম থেকে খোসা ছাড়াতে পারেন—"ক্রুশের নীতি" কে একটা যুক্তিবাদী, সাধারণ ভাবাদর্শ হিসেবে অনুসরণ করা যায়, আর তার প্রতি অধিকতর সার্থক, ব্যক্তিগত ঐতিহাসিক সংজ্ঞা দান করা যায় সেই বাস্পীয় বাস্তবতা যা খ্রীষ্টধর্মের মাধ্যমে ইতিহাসে রূপান্তরিত তার বীর্যবান ভূমিতে কিছু করার না থাকলেও। এইখানে কোনো নির্দিষ্ট উপলব্ধি নেই, কোনো ঈশ্বর মানুষকে তার নাম ধরে আহ্বান করছেন না, বা তাঁকে কোনো চুক্তিতে বাঁধছেন না, মানুষকে সীমাবদ্ধ করছেন না; গান্ধী তাঁর মুক্ত-চক্র স্বয়ংসিদ্ধ বিষয়নিষ্ঠতায় দৃঢ়ানুবদ্ধ। আর সেই কারণেই খৃষ্টের ক্রুশ বিষয়ে কোনে বোঝাপড়া গড়ে ওঠেনি বরং একটা স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দীতা গড়ে উঠেছে। এর ফলে, ন্যায় সঙ্গতভাবে আধুনিক জাতীয়তাবাদ খৃষ্টের অভিমুখী হিসাবে মহাত্মাকে নেতা বলে গ্রহণ করে না তাঁকে গ্রহণ করে ভারতীয় ত্রাণকর্তা হিসাবে। একথা অবশ্য সত্য যে এর লৌকিক তরঙ্গে এই জাতীয়তাবাদ এর সকল দেবত্বকরণকে সম্পূর্ণরূপে তাৎপর্যহীন বিবেচনা করে।"

কম্যুনিষ্টদের তরফ থেকে আরও বেশী সমালোচনা এসেছে। এঁদের

প্রবক্তা হলেন ওয়ালটার রুবেন। ইনি আলব্রিখটের ইষ্ট জার্মানীর একজন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিত। যাই হোক ভোলফ্ যিনি বহুবিদ ক্রিশ্চান ভাবধারার একটি প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁর সঙ্গে মার্কসিট রুবেনের বক্তব্যের অনেক পার্থক্য আছে, ভোলফ্ গুরুতর বিষয়ে গান্ধীর চিন্তাধারা বাতিল করেছেন বটে কিন্তু এর মধ্যে ক্রিশ্চান অহিংসা ভাবধারাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে একটা চ্যালেঞ্জও আছে মনে করেছেন। ভোলফ্ গান্ধীজীকে একজন গুরু হিসাবে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব বলে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি তাঁকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। রুবেন আবার অপরদিকে ঠাণ্ডা রাজনীতিবিদের মত এতটা মহৎ সমালোচক ন'ন, আর সেই কারণে তিনি গান্ধীর মতবাদের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক দিকটির নিন্দা করেন:

> "এইভাবে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে স্বদেশের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। তিনি ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনকে তার চূড়ান্ত অবস্থায় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে পথে বসিয়েছেন, অথচ স্তালিন ১৯১৮-এই বৈপ্লবিক সংগ্রামের অনুরূপ প্রাথমিক তরঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন: "প্রকৃতই, অক্টোবর বিপ্লব, পৃথিবীর প্রথমতম বিপ্লব যা তাঁবেদার প্রাচ্যদেশীয় মেহনতি জনগণকে তাদের শতাব্দীর তন্দ্রা থেকে জাগরিত করেছে, এবং বিশ্বজাগতিক সাম্রাজ্যবাদের সংগ্রামে অংশ নিয়েছে। পারসীয়া, চীন, এবং ভারতবর্ষে সোবিয়েত আদর্শে যে সব শ্রমিক ও কৃষকদের সমিতি গঠিত হয়েছে এ তার যথেষ্ট প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়..."
>
> এই কথাগুলির দ্বারা স্তালিন মহান সোস্যালিষ্ট অকটোবর বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া যা পূর্ব এবং পশ্চিম, ভারতে এবং আমাদের জার্মান মাতৃভূমিতে ঘটেছে তার প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। কেউ যদি এই বিষয়টি আরো অধিকতর সম্প্রসারিত করে তাহলে দেখা যায় যে বিপ্লবের কালে প্রতিক্রিয়া তার দালালদের অবস্থার উপযুক্ত ভূমিকায় উপস্থাপিত করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য। এইভাবে গান্ধী ভারতের বুর্জোয়া সমাজের ও ভারতীয় ভূস্বামীদের দালাল হিসাবে সে ভূমিকা পালন করেছেন ভারতের শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলনে তা আমাদের দেশে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯১৯-এর বসন্তকালে এবার্ট ও স্‌খিদেখান। নোসকে ও লেগিয়েন যা করেছিলেন

তার সঙ্গে তুলনীয়…তবে, গান্ধীবাদ 'সোস্যাল ডেমোক্রাটে'র নীতি নয়। কারণ গান্ধী প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের শান্তি, সন্ন্যাস, অনশন, ও সুতাকাটা ইত্যাদির সঙ্গে আপনাকে জড়িয়েছেন—তার গো-মাতার পবিত্রতা ও জাতিভেদ প্রথা। তবু, বুর্জোয়া ও ভূস্বামীদের স্বার্থ সংরক্ষণে তাঁকে বিপ্লবী আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে হয়েছে—এবং এই ভূমিকা আমাদের দেশের দক্ষিণ পন্থী স্যোসাল ডেমোক্রাট-দের অনুরূপ একই ভূমিকা।…

এইভাবে গান্ধীবাদী সরকার ১৯৪৭ থেকে শ্রমশিল্প বা কৃষি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিছুই করেননি। এই সরকার আধা-ঔপনিবেশিক একটি পুতুল সরকার। এরা ভূস্বামী ও বুর্জোয়াদের স্বার্থ সংরক্ষণ করছেন। যুদ্ধের কাল থেকে এরা আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে এক সুবর্ণ সূত্রে বাঁধা এর যুদ্ধকালীন সরবরাহের দাম দেওয়া হয় নি, এর লভ্যাংশ অ-রূপান্তরিতব্য ষ্টার্লিং হিসাবে লণ্ডনকে দেওয়া হয়েছে, গ্রেট-ব্রিটেন দ্রবাদি সরবরাহের জন্য এমনকি যন্ত্রপাতিও নয়, দায়ী করে রাখা হয়নি।

এই দল, তথাকথিত, কনগ্রেস পার্টি আজো ভারতবর্ষে এ তাবৎ সর্বোচ্চ শক্তিমান দল। ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করেছে এই তথাকথিত দাবীর কৃতিত্ব নিয়ে এই পার্টি বেঁচে আছে। এই তথ্য এঁরা চেপে গেছেন যে নৌ-বিদ্রোহ এবং ভারতীয় জনগণ শ্রমিক ও কৃষকদের সংগ্রাম মনোভংগীই ইংলণ্ডকে তার প্রাচীন ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা ত্যাগ করে এক প্রচ্ছন্ন ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্তনে বাধ্য করেছে। তবে ভারতের এক বৃহত্তম অংশের মোহভঙ্গ ঘটেছে এবং নেহরুর অধীনে গান্ধীবাদীদের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ বেড়ে চলেছে এবং নেহরু তাঁর নিজের দলের একথা বজায় রাখা কঠিন বলে অনুভব করছেন। মধ্যম আকারের বৃহৎ শিল্প ব্যবস্থা-গুলি ব্রিটিশ ও মার্কিন আমদানির চাপে জর্জর এবং তারা ভারতের বর্তমান ঋণভারের দিকে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সর্বনাশা যুদ্ধবাজ মনোভংগী সভয়ে লক্ষ্য করছে।"

এই বিদ্বেষপূর্ণ ভয়ংকর সমালোচনার মধ্যে কম্যুনিষ্ট সুলভ অসাধুতা আছে প্রসঙ্গতঃ মূল গ্রেট সোভিয়েত এনসাইক্লোপিডিয়া অনেক আগে এসব অনুমান

করেছেন এবং তাঁরা গান্ধীর মধ্যে এক নরম বুর্জোয়া চরিত্র লক্ষ্য করেছেন এবং কেরালার আঠারো মাসের কম্যুনিষ্ট মুখ্যমন্ত্রী ই, এম, এস নাম্বুদ্রিপাদ কর্তৃক তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি গান্ধীজীকে একজন আদর্শবাদী মনে করেন, কোনো এক কালে হয়ত তাঁর কথার মূল্য ছিল কিন্তু তিনি তাঁর আদর্শ ও নিজের জগতের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছেন। নাম্বুদ্রিপাদ গান্ধীবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন তবে সতর্ক এবং সাময়িকভাবে। তবু, অনেক কাল আগে কে, জি, মাসরুওলা বলেছিলেন গান্ধী ও মার্কস্ দুই বিভিন্ন জগতের প্রতিনিধি। মাসরু-ওলার গ্রন্থের ভূমিকায় অহিংস বিষয়ে গান্ধীর প্রথম উত্তরাধিকারী বিনোবা ভাবে বলেছেন—গান্ধী ও মার্কস বিভিন্ন ওজনের ও আকৃতির কুদলান্তরবাসী যার রাজনৈতিক ফলাফল মার্কসিষ্ট বিজয়ের ফলে বিপর্যয়কারী হয়ে উঠ্‌তে পারে। গান্ধী তাঁর কাছে মহাত্মা, মার্কস মহামুনি—মহান চিন্তানায়ক।

যাঁরা গান্ধিজীর ব্যক্তিত্ব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে গুস্তাভ মেনস্‌খিঙ মহাত্মাজীর সাফল্যের হিসাব নিকাশ করার চেষ্টা করেছেন এবং এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে কিছু পরিমাণ একদেশদর্শীতা এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে অধ্যাত্মিক ধর্মীয় সংমিশ্রণ জনগণের হৃদয় জয় করার জন্য তাঁর অন্যতম হাতিয়ার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন, য়ুরোপ ভ্রমণ কালে তিনি এই বৈপরীত্য বিষয়ে উল্লেখ করেন যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সহযোগীতা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি পাশ্চাত্যদেশে এসেছেন, অথচ গান্ধিজী স্বদেশে বসেই অসহযোগ প্রচার করছেন। গুস্তাভ মেনস্‌খিঙ দুই ভারতীয় মনীষীর মধ্যে এই বৈপরীত্য বিচার করে যা দেখেছেন তা বর্তমান লেখককে ভারতীয় জীবন ধারা হৃদয়ঙ্গম করার উপযুক্ত প্রমাণ সরবরাহ করেছে :

> "আর এই ভাবে দুই মহান ভারতীয় পরস্পর বিরোধী। আমরা তাঁদের দুজনকেই দেখি আদিম বৈপরীত্যের মুখ্য প্রবক্তা সারা বিশ্ব জুড়ে এ এক পৌনপৌনিক বৈচিত্র্য, মানুষের জগতের যা কিছু পবিত্র এবং মহৎ তার অন্তর্নিহিত ট্রাজেডি একে ঘিরে আছে। গান্ধী স্বয়ং স্বাধীন এবং পবিত্র আদর্শের জগতে বিচরণ করেছেন। তার স্বদেশীয় জনগণের জীবনের সামাজিক অভিশাপ দূর করার প্রয়োজনে তিনি তাঁর অন্তরের সমস্ত শুভশক্তিকে বর্তমানের সমস্যা সমাধানে নিযুক্ত করেছেন বাকী আর সব কিছুকেই গুরুত্বের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ বিবেচনা করে সরিয়ে রেখেছেন। তথাপি

জনগণের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা বিষয়ে কোনো সহানুভূতি নেই তাই তাঁরা তাদের-নেতার বাণীর প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে মাগ্ন করছে। এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথকে উৎপীড়িত করেছে। যাই হোক যদিও কবি তাঁর নিজস্ব জগতের মধ্যে আত্মার পবিত্রতা সংরক্ষণে সচেষ্ট তথাপি জনগণকে স্বাধীনতার অভিযানে নেতৃত্ব দিতে অপারক হয়েছেন। জনগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও পবিত্র যোগাযোগ বিষয়ে এ এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব। আর তবু, আগে আর কখনও জনগণ আত্মিক শক্তিতে প্রভাবিত কোনো ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে এমন বিস্ময়কর ভাবে চালিত হয়নি কিংবা এমন নিরাপদ ভাবে তাদের আসন্ন জনতাসুলভ প্রবণতাকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি ভারতের গান্ধীর মত একাজ আর কেউ পারেননি। আর কোথায় রাজনীতিবীদ এভাবে জনগণের অপরিণত অবস্থায় অকপটে স্বীকার করেছেন। নিজের উপর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে ব্যাক্তিগত ভাবে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছেন?”

হিটলার জার্মানীর দ্বারা আর একটি সংলাপ প্রজ্বলিত হয়। দুজন মধ্যে এই সংযোগ ঘটে। গান্ধিজীর ‘হরিজন’ পত্রিকায় (১৯৩৮-এর ২৬শে নভেম্বর তারিখে) একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যার মধ্যে জার্মানীর ইহুদীর অহিংস নীতি গ্রহণের উপদেশ দেওয়া হয়।

মারটিন ববের যেরুজালেম থেকে এর উত্তর দিয়েছিলেন, ববের জার্মান ইহুদি বিদগ্ধ সমাজের প্রাক্তন প্রধান এবং পরে ইস্রায়েলী বুদ্ধিজীবিদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা। ববের ১৯৩৯-এর ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যা লিখে-ছিলেন তা এক যন্ত্রণাকাতর উত্যক্ত মনের পরিচায়ক:

“ইহুদীরা অত্যাচারিত, লুণ্ঠিত, অসৎ ব্যবহারে জর্জর। তাদের উৎপীড়ন করা হচ্ছে। আর আপনি মহাত্মা গান্ধী। তাদের স্বদেশেই এই অবস্থার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থার তুলনা করেছেন—তুলনা করেছেন আপনি যখন “সত্যের শক্তি” বা সত্যাগ্রহ করেছিলেন তার সঙ্গে। আপনার মতে, ভারতীয়রা ঠিক এই অবস্থায় ছিল আর সেখানকার লাঞ্ছনার মধ্যেও একটা ধর্মীয় স্পর্শ ছিল। সেখানেও সংগঠন শাদা এবং কালোর মধ্যে এশিয়া-বাসীগণ সমনীতি খারিজ করে দিয়েছিলেন। আমি আপনার

প্রবন্ধের সমগ্র অংশের প্রতি ছত্র বার বার পড়েছি, তার অর্থ বুঝিনি। আমি আবার আপনার দক্ষিণ আফ্রিকা পর্বের ভাষণ ও রচনাবলী আবার পড়লাম—আমি অবশ্য এসব বেশ ভালোভাবেই জানতাম এবং আমি গভীর মনোযোগ ও কল্পনা সহকারে আপনার প্রতিটি অভিযোগ সম্পর্কে চিত্র রচনার প্রয়াস করেছি ; আপনার তৎকালীন বন্ধু এবং ছাত্রগণের রিপোর্টের সঙ্গে তা মিশিয়েছি। কিন্তু এসবই আপনি আমাদের বিষয় যা বলতে চেয়েছেন তা বোঝার পক্ষে আমার সহায়ক হয়নি। আমার কাছে সর্বপ্রথম পরিচিত ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত আপনার একটি ভাষণে আপনি দৃষ্টান্ত হিসাবে দুটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করেছিলেন। আপনার শ্রোতারা ধিক্কার উচ্চারণ করেছিল। একদল য়ুরোপীয় একটি গ্রাম্য বিপনীতে আগুন দিয়েছিল এবং কিছু ক্ষত সাধন করেছিল, আরেকজন শহরের অন্য একটি দোকানে কিছু আগুনে বাজী ছুঁড়েছিল। আমি যদি এর বিপরীত হিসাবে হাজার হাজার ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং ভস্মীভূত ইহুদী ব্যবসার কথা উল্লেখ করি তাহলে আপনি হয়ত বলবেন পার্থক্যটা পরিমাণে, উভয় কার্যই একই ধরণের। কিন্তু মহাত্মা আপনি কি সিনাগোগ (ইহুদী ধর্ম মন্দির) ভস্মীভূত করা বা পবিত্র পুঁথি পোড়ানোর কথা জানেন না ? আপনি কি জানেন প্রাচীন এই সম্প্রদায়ের কি পরিমাণ পবিত্র সম্পত্তি আগুনের কবলে গেছে ? আমি কখনও শুনিনি বুয়র বা ব্রিটিশরা দক্ষিণ আফ্রিকায় কোনো হিন্দু মন্দির স্পর্শ করেছে। আর তার পর আমি ঐ ভাষণের আর এক সুস্পষ্ট অভিযোগের বিরুদ্ধে বলতে চাই ; তিনজন ভারতীয় স্কুল শিক্ষক রাত ন'টার পর পথে বেরিয়েছিলেন, কারফিউ আইনের অবমাননা করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। তাদের গ্রেপ্তার করা হয় ও পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। আপনি যে সব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তা এই পর্যন্ত। কিন্তু মহাত্মা. আপনি কি জানেন না বন্দীশিবির (কনসেনট্রেশন ক্যাম্প) কাকে বলে, সেখানে কি হয়, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের উৎপীড়নের আকৃতি কি এবং ধীর ও দ্রুত হত্যা করার পদ্ধতি কি ?

বর্তমান শাসক সম্প্রদায়ের অধীনে যে পাঁচ বছর আমি

কাটিয়েছি, আমি ইহুদীদের তরফ থেকে অনেক সত্যাগ্রহের দৃষ্টান্ত দেখেছি। তারা তাদের অধিকার ত্যাগ করতে চায়নি বা পদদলিত হতে চায়নি, তারা কিন্তু কোনো রকম সহিংসা প্রতিরোধ করে না। তাদের এই মনোভঙ্গীর ফলাফল এড়ানোর জন্য কোনো রকম ছল-চাতুরীও করেনি। যাই হোক স্বভাবতঃই অপর পক্ষে মনে এত-দ্বারা কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

যাই হোক এই সব ক্রিয়া কলাপে বিপক্ষের ওপর কোন প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। সুনিশ্চিতভাবে এমন এক প্রাণশক্তির পরিচয় যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের অভিব্যক্তি। কিন্তু যাকে কার্যকরী মনে করা যায় এমন সাধারণ আচরণবিধির প্রতিশ্রুতি হিসাবে আমি জার্মান ইহুদীদের তরফে এটি স্বীকার করে নিতে পারি না! অবিচারশীল আত্মার প্রতি একটা কার্যকরী অহিংসা মনোভঙ্গী গ্রহণ করা যায় ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া বিষয়ে শিক্ষা দানের ভিত্তিতে কিন্তু এই ভাবে কেউ একটা দানবীয় বিশ্বজনীন ষ্টীম রোলারের সামনে দাঁড়াতে পারে না। এমন অনেক পরিস্থিতি আছে যেখানে দৃঢ় চিত্তের সত্যগ্রহ কখনই সত্যের শক্তির সত্যাগ্রহ হতে পারে না। 'শহীদত্ব' কথাটির অর্থ প্রমাণ; কিন্তু সেই প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য যদি কেউ না থাকে তাহলে কি হয়?"

লেখক জিওর্জ জেনৎসথ এই সংলাপটি বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন:

"গান্ধী এবং ববের এই দুই মহামনীষীর মধ্যে যে বিরোধ যা ১৯৩৯-এ একটি বিতর্কিত প্রশ্ন ছিল। এখন তার সোজা উত্তর দেওয়া যায়। মারটিন ববের একথা ঠিকই বলেছেন যে অহিংসা একতরফাভাবে সব মানবিক সমাজে প্রযোজ্য নয়। এই বিধি প্রয়োগ করতে এক নতুন ধরণের মানুষ প্রয়োজন। গান্ধী যখন বলেছিলেন যে মনের খড়্গ। 'একটি অমূল্য এবং অতুলনীয় অস্ত্র এবং যাঁরা এ অস্ত্র ব্যবহার করতে জানেন তাঁরা কখনও প্রতিহত হন না। পরাজয় বরণ করেন না—' তখন তিনিও ঠিক কথাই বলেছেন।"

৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ যুদ্ধের অল্পকালের মধ্যেই মহাত্মাজী যখন হিটলারকে

আবেদন জানিয়েছিলেন যুদ্ধবিরতির জন্ম সম্ভবতঃ মার্টিন বেবেরের উক্তিতে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। গান্ধীজীর এই পত্র অবশ্য ডিকটেটরের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটায়নি। তবে এর মধ্যে এই পত্রের সাধু প্রকৃতির লেখকের বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর বন্ধুরা মানবিকতার নামে হিটলারকে এই পত্র লেখার জন্ম প্রণোদিত করেছিলেন। এখনও পর্যন্ত আমি তার মনোভংগী পূরণ করিনি। তাঁর অনুভূতির দ্বারা মনে হয়েছিল যে এই পত্রটি হয়ত ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক বিবেচিত হবে। কিন্তু এখন তিনি দেখবেন যে এই মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল না। কারণ একটি মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যই তাঁকে হিটলারকে পত্র দ্বারা আবেদন পাঠাতে হয়েছিল। তিনি হিটলারকে বলেছিলেন যে হিটলারই একমাত্র ব্যক্তি যিনি যে যুদ্ধ মানব সমাজকে আবর্জনাস্তূপে পরিণত করতে পারে সেই যুদ্ধ রোধ করতে পারেন। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন কোনো উদ্দেশ্যের পূরণে কি প্রকৃত-পক্ষে এই মূল্য দেওয়া যায়। উদ্দেশ্য যতই মূল্যবান মনে হোক তিনি হয়ত শান্তির আবেদনে সাড়া দেবেন। বিশেষতঃ সেই মানুষের আবেদন যিনি যুদ্ধকে একটা উপায় হিসাবে পরিহার করেছেন বিশেষ যত্ন সহকারে বিবেচনা করে এবং তাঁর প্রচেষ্টা কার্যকরীভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

১৯৪১-এর ক্রিসমাসে গান্ধী আবার হিটলারকে পত্র দিলেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় পত্রটি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আটক করলেন। এই পত্রে গান্ধী হিটলারের কাছে অনুনয় করেছিলেন, (যিনি অবশ্য চিঠিখানি কোনদিন দেখতে পাননি) হিংসার গরিমা প্রচারে বিরত থাকতে এবং শান্তির মহৎ আদর্শকে অনুসরণ করতে।

ধর্ম এবং রাজনীতির সীমানায় যে কঠোর সংলাপ চলেছে তার থেকে আমাদের অধিকতর প্রীতিপদ ক্ষেত্রে তাকান যাক—সেখানে শুধুমাত্র বিশ্বাসের আশ্রয়। এইখানে আমরা সেই প্রত্যাবর্তনের পথে আবার ফিরে আসি। তামিলদেশবাসী দার্শনিক রাজনীতিবিদ্ ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের প্রসঙ্গে। ১৯৬১-তে জার্মান বুক ট্রেডের ‘পীস প্রাইজ’ গ্রহণ করা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক বহিরেখাকে গ্রহণ করার ব্যাপারটিকে তুলে ধরেছে।

Gesprach mit Radhakrishnan (রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে সংলাপ)-নামক শিরোনামে Stimmen der Zeit (যুগের স্বর) নামক পত্রে যোশেফ নেউনার এই বিষয়ের এক সংবেদনশীল রেখাচিত্র এঁকেছেন :

"এইভাবে, রাধাকৃষ্ণণ এবং খ্রীষ্টধর্মের যদি ফলপ্রসূ সংযোগ ঘটে তাহলে যে যেমন সেই ভাবে তাদের উভয়কে আমরা গ্রহণ করতে পারি এবং সংযোগের বিন্দুগুলির সন্ধান করতে পারি। একটি প্রশ্ন তুলে সুরু করা যাক, প্রথম দর্শনে বিষয়টি হয়ত পাগলামি মনে হবে ; কি কারণে রাধাকৃষ্ণণের রচনা আমাদের কাল ও যুগের পক্ষে এতখানি উপযোগী মনে হয়, এত বেশী সংখ্যক আধুনিক মানুষের দৃষ্টি ও অনুমোদন লাভ করতে পেরেছে কেন ? আমরা বহির্জাগতিক এবং আকস্মিক বিষয়গুলি এড়িয়ে যাই, তাঁর সুদূর প্রসারী বিশাল শিক্ষা, প্রকাশ করার অত্যাশ্চর্য শক্তি, তাঁর ব্যক্তিত্বের বীর্যবত্তা এবং সর্বোপরি তাঁকে যে প্রাচ্যদেশীয় সৌরভ ঘিরে আছে তার জন্য তিনি বিশিষ্ট। এইসব হয়ত তার আবেদন বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে ; তবু প্রকৃত হেতু পাওয়া যাবে তাঁর ভাবাদর্শের মধ্যে। এই সবই কয়েক মূলকথায় একীভূত করা যাবে ; তাঁর বিশ্বজনীনত্ব, যা পৃথিবী ও মানব সমাজের একত্বকে স্বীকার করে, তাঁর বীর্যবত্তা, যা সকল মানুষের সকল সম্প্রদায়কে উপলব্ধি করার জন্য সদা অগ্রসর, এবং সকল পার্থিব বস্তুর স্বীকৃতি···

আমরা যাঁরা ক্রিশ্চান তাঁরা কি এই থেকে একটি জ্ঞান পাই না ? হয়ত বিশ্বশান্তির ব্যাপারে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অবদান হল অপরের কাছ থেকে জ্ঞান নেওয়ার আগ্রহ। এমন নয় যে 'গস্‌পেল' (ধর্মগ্রন্থ) এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, যার ফলে আমরা আর একবার তার মৌলিক শক্তির পাঠ নিতে পারি।"

আরও অনেকে এই সংযোগে যোগদান করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ওহ্‌ম, ভোলফ্‌, বাসেভাউ এবং হিল্লিগায়—মাত্র কয়েকটি নাম উল্লিখিত হল। ক্যাথলিক চিন্তাবিদ কার্ল রাহনার আর একজন যিনি আমাদের কালের এই সংলাপের গুরুত্ব বিষয়ে জোর দিয়েছেন। ম্যুনিখ য়ুনিভার্সিটির ধর্মীয় ইতিহাস ও ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ের অধ্যাপক হিসাবে রোমানো গুয়ারদিনির উত্তরসাধক রাহনার প্রকৃত সংলাপ যে ঠিক কি বস্তু তা নির্দেশ করেছেন এবং সতর্ক করে দিয়েছেন—"কাপুরুষ সুলভ সমন্বয়বাদী সংলাপ, এই জাতীয় সংলাপে অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের নিজস্ব বিশ্বাসকে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে এগিয়ে নিয়ে যান না, ফলে তাঁরা সত্যকথা বল্‌তে পারেন না, কারণ তাঁদের পরস্পরকে অল্প

কথাই বলার থাকে।" ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন তারিখে যখন তাঁকে রিউখ্‌লীন পুরস্কার দেওয়া হয় তখন পি ফরৎহাইমে প্রদত্ত এক ভাষণে এই কথা বলে তিনি তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করেন :

"ঈশ্বর যদি আমাদের শত্রুকে ভালোবাসার নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কঠোরতম সংলাপকে প্রীতির বাক্যে ভরে দেওয়ার অনুজ্ঞা দিয়েছেন। তবু যেখানে ভালোবাসা আছে সেখানে তা মিলনের সহায়ক হয়েছে। এই কারণে কোনো প্রকৃত সংলাপ পরীক্ষিত এবং সাধারণভাবে অধিকৃত সত্যের আলোকে প্রকাশিত সীমাহীন প্রয়াস, আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে তা আগে থেকেই অবস্থিত, অবশ্য যদি আমরা এই অবস্থা কামনা করি তাহলে এ সেই প্রেম যা প্রত্যয়যোগ্য।"

এই কথাগুলির আলোকে এ কথা বোধগম্য নয় যে মহত্তম ক্রিশ্চান চার্চের মধ্যে, রোমান ক্যাথলিকরা অ-খ্রীষ্টানদের সঙ্গে এবং অ-একেশ্বরবাদী জঙ্গে সংযোগ সাধনে প্রস্তুত কেন ? এই আলাপাচারের দপ্তরের নেতৃত্ব করছেন ভিয়েনার আর্চবিশপ কার্ডিনাল ক্রানৎ কোনিগ, ইনি ১৯৬৪-র ৩রা ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাই শহরে ইউকারিষ্টিক কংগ্রেসে ভাষণ দান করেন। সেখানে তিনি সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের সদস্যদের ভ্রাতৃত্বমূলক সংযোগের পথ প্রদর্শন করেন, এই কথা প্রকাশ করে যে ক্রিশ্চান চার্চগুলি একটা সংলাপে ব্রতী হতে নতুন করে আগ্রহী হয়েছেন। বোম্বাই শহরে তখন স্বয়ং পোপও উপস্থিত ছিলেন ; এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে প্রধানতঃ হিন্দুপ্রধান দেশে এই খ্রীষ্টীয় সংলাপের প্রবক্তা হলেন একজন জার্মানভাষী খ্রীষ্টীয় যাজক। কার্ডিনাল কোনিগের ভাষণ যা Echo der Zeit নামক রেকলিং হসেনের পত্রিকায় ১৯৬৫-র ৬ই জুন তারিখে প্রকাশিত হয় তার নিম্নোধৃত সারাংশ থেকে বোঝা যাবে এই সংলাপ কত ব্যাপক হতে পারে :

"আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তা ক্রমশঃ অধিকতর ভাবে অর্থনৈতিক ও কারিগরি ব্যাপারে একটা সমতার স্তরে পৌছাচ্ছে অথচ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাত্মিক বৈপরীত্য বিষয়ে কোনো বোঝাপড়া হচ্ছে না। ঘন কালো মেঘে ছাওয়া এই পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ ঐক্য সাধনে সর্বাধিক প্রয়োজন একটা পারস্পরিক অধ্যাত্ম বোঝাপড়া আমাদের সকলের শুভেচ্ছাকে দৃঢ়তরকরণ। পারস্পরিক অবিশ্বাস

দূর করতে হবে; পরস্পরের প্রতি হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে হবে। আমাদের পরস্পরের মধ্যে সংলাপ প্রয়োজন। এই সংলাপ এমন হবে যদ্বারা বোঝাপড়া এবং শান্তি বৃদ্ধি পায়—আমি আপনাদের সকলকে অতিশয় আন্তরিকতার সঙ্গে এবং বিনয় সহকারে আমন্ত্রণ জানাই। আমাদের এই সংলাপ সুরু করার প্রচেষ্টার আরও অকটি হেতু আছে: বর্তমান জগৎকে যে সমীকরণ প্রয়াস ও সম্পূর্ণ রূপান্তরকরণ প্রয়াস ঘিরে আছে তার জন্য। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং আমাদের বর্তমান কালের উপযোগী করে তাকে এক সূত্রে বাঁধাই হল বর্তমান কালের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় এবং সর্বজনীন দায়। এ সমস্যা বিশ্বব্যাপী এবং আত্মিক মূল্য বিষয়ে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের সকলকে একযোগে আন্দোলন করতে হবে, কাজ করতে হবে। এই ভাবনার মধ্যেও আছে সংলাপের একটি প্রস্তাব, সেই সংলাপ যা পারস্পরিক বোঝাপড়াকে সমৃদ্ধ করে। আমরা যাঁরা ক্রিশ্চান, তাঁদের কাছে এ কথার অর্থ এই যে মহান্ অ-খ্রীষ্টান ধর্মমতগুলির প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে এবং তাদের মূল বিষয় অন্তরে সপ্রশংস মনোভঙ্গী নিয়ে সংলাপ সুরু করতে হবে। একথা সত্য যে য়ুরোপীয়গণ এবং মাঝে মাঝে কিছু বিদেশী মিশনারিরাও ভুল করেছেন। তাঁরা যদি আপনাদের অনুভূতিকে ক্ষুন্ন করে থাকেন এবং আপনাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন না হয়ে থাকেন তাহলে আমার পক্ষে তা প্রকৃত বিষাদ ও দুঃখের কারণ।

অ-খৃষ্টান ধর্মমতগুলি যা এখানে সম্মানিতভাবে প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁদের সঙ্গে আমরা শুধু মানবিক পরিণামের দিক থেকে সমশ্রেণীর তা নয় অমরত্বের কামনা শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগের মধ্যে পাওয়া যায়। এ কামনা পাওয়া যায় সেই ধ্যানের মধ্যে বর্তমান যে ধ্যান ধারণা সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে মানব মনের সহচর। যে ঈশ্বর আমাদের নিঃশ্বাস ও শক্তিদান করেছেন, জীবন দান করেছেন তাঁর বিষয়ে মহান বাণী উচ্চারিত হয়েছে হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জরথুষ্ট্রিয় ধর্ম প্রভৃতির ধর্মগ্রন্থে। খৃষ্টানদের সুগভীর বিশ্বাস যা আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে আছে আমি তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না।

উপনিষদাবলীর (বৃহদারণ্যক উপনিষদ) মধ্যে আলোক ও অমরত্ব বিষয়ে একটি প্রার্থনা আছে, তার মধ্যে আমরা অন্তিম লক্ষ্যে পৌছানোর জন্ত মানুষের বাসনার এক অভিব্যক্তি পাওয়া যায়—

"অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়"

বৌদ্ধ ধর্ম আমাদের পরিবর্তনশীল জগতে একটা আত্যন্তিক অসম্পূর্ণতা বোধ করেন এবং এই শিক্ষা দান করে যে মানব সন্তান কিভাবে দৃশ্য এবং স্পর্শন যোগ্য সংসারে সুদূরে এক শান্তির আশ্রয়ে নিয়ে যেতে পারে শুধু মাত্র ত্যাগ ও তিতিক্ষার দ্বারা, এইভাবে সকল ধর্ম মানব জীবনের হেঁয়ালির একটা সমাধানের চেষ্টা করেছে : মানুষ কোথা থেকে আসে ? মানুষ কোথায় যায় ? কি ভাবে মানুষ এ জগতে তার অস্তিত্বের প্রতি ন্যায় বিচার করে প্রকৃত শান্তির পথে পৌছাতে পারে ? যদি আপনার এবং আমাদের ধর্মে এই প্রশ্নগুলির জবাব বিভিন্ন ধরণের হয়, তাহলে সেই সর্বজনীন উদ্ভব সূত্র মানব জীবনের কামনা-বাসনা একটা সংলাপের পক্ষে উত্তম যোগসূত্র এবং তার দ্বারা অধিকতর গভীর এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে পৌছাতে পারি।

খৃষ্ট কোনো বিশেষ জাতি বা কোনো সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ন'ন। মহাত্মা গান্ধী বিশেষভাবে বলেছিলেন যে খৃষ্ট ভারতেও শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি খৃষ্টের প্রতি ভারতের শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

আমাদের এমন এক সহযোগীতায় পৌছানো যাক যেখান থেকে আমরা আপনাদের স্বদেশ বিষয়ে আপনাদের প্রেমকে সুদৃঢ় করবে, অপর দিকে সেই মনোভংগীর সমাজ সেবা এবং সর্বজনীন অধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতি অধিকতর জোর দেওয়ার ব্যাপারে ফলপ্রসূ হবে। এইভাবে আমরা অধ্যাত্মিক বাস্তবতার অন্তর্নিহিত সত্য বস্তুর সাক্ষ্যদান করতে পারব এবং আমাদের সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে ও বাইরে যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ন'ন সেই মানুষকে ঈশ্বর আবিষ্কারে সাহায্য করতে পারব।

অর্থনীতি এবং সভ্যতার ক্ষেত্রে আজকের জগৎ মহত্তর দৃঢ়তার

পথে পৌছেচে। সীমানাগুলি ক্রমশঃই মুছে যাচ্ছে, জাতিসমূহ এবং সারা বিশ্বের সংস্কৃতি আজ একযোগে চলছে। কিন্তু রাজনৈতিক ও ভাবগত সংঘাত, অস্ত্রশস্ত্রের কলাকৌশল, শান্তি ও মানব সমাজের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে এক ক্রমবর্ধমান সংকট হয়ে উঠ্ছে। ধর্মহীন মানুষ. আজ পর্যন্ত, এই সংকটের সম্মুখীন হওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আমি বিশ্বাস করি যে বিশ্বের সর্বধর্মের পারস্পরিক সহযোগে শান্তির পক্ষে এবং জাতির প্রকৃত ঐক্য সাধনের প্রস্তুতিতে প্রচণ্ড সহায়ক হয়ে উঠ্বে।

স্বার্থহীন ভাবে এবং বিনয়ের সঙ্গে আমাদের উদ্বেগ আকুল সমকালীনদের ধর্মের আলোক এবং শক্তির সাহায্যে শান্তির পথ সন্ধানে সচেষ্ট হতে হবে।"

বোম্বাই শহরে ক্যাথলিক খৃষ্ট ধর্ম হিন্দুধর্মের প্রমুখ প্রতিনিধি রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে একত্র মিলিত হয়েছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি যেমন পাশ্চাত্যের সঙ্গে হিন্দু সংযোগ স্থাপনে কাজ সুরু করেছেন বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তেমনই ফ্রাঙ্কফুর্ট-অন-মেইনে কার্ডিনাল কোনিগ্ এই মহান হিন্দুর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন প্রেম এবং সহনশীলতার মনোভংগী নিয়ে।

এই সংযোগের শহরে সক্রিয় ছিলেন ফাদার ক্লাউস ক্লষ্টারমেয়ার, ইনি অনেকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা, যারা হিন্দুধর্ম বুঝতে চান এই গ্রন্থগুলি তার পক্ষে বিশেষ সহায়ক, (Hinduismus, কলোন-১৯৬৫, ও Christ und in Vrindaban, কলোন ও ওলটেন, ১৯৬৮) এই লেখক সম্পূর্ণ হিন্দু পরিবেশে বক্তৃতা দিয়েছেন (বৈষ্ণব বিশ্ববিদ্যালয়—মথুরায় কৃষ্ণ-দৃশ্যপটে অবস্থিত)। শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ফলে তিনি ভারতীয় ও হিন্দু অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে কথা বলার পক্ষে বিশেষ অধিকারী। মুক্তির পথ, মুক্তি তত্ত্ব এবং দর্শন বিষয়ে ক্লষ্টারমেয়ারের বিশ্লেষণের মধ্যে যে প্রেম ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় সেই অধিকার খুব অল্প লোকেরই বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কৃতির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য ক্লষ্টারমেয়ার বিশেষ উদ্যোগ ও আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন।

হোরসট বুরকলে Dialog mit dem Osten (প্রাচ্যের সঙ্গে সংলাপ) নামক গ্রন্থের লেখক। তিনি নতুন জগতের আসন্ন রূপরেখার উদ্ভবে এক বিশ্বজনীন সংলাপের কল্পনা করেছেন। যাই হোক এই নব নির্ধারিত

মেহে বঙ্কিমার এখন অমর-মূল্যবোধ এবং সত্যের, প্রাচীন রূপ প্রকাশিত, এই মূল্যবোধও সত্য আজো অন্য অঞ্চলে তার প্রভাব বিস্তার করে।

"রাধাকৃষ্ণণের মনোভংগী আমাদের কাছে বিশেষভাবে ভারতীয় মনে হতে পারে, কিন্তু তা-এক নতুন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গসপেলের বাণীকে ক্রমশঃই স্বীকার করে নিতে হবে। একটা বদ্ধ এবং আত্মকেন্দ্রিক পেগানবাদ উদ্বোধিত হয়েছে। আধুনিক যুগের অভিমুখী ক্রমবিকাশ আমাদের কাছে যুগব্যাপী প্রগতিশীল পদ্ধতি বলে মনে হয়েছে, সেই সব অঞ্চলের ক্ষেত্রে যে সব অঞ্চল এতাবৎকাল তাদের নিজস্ব ধর্মমত থেকে নির্দেশ এবং ভাবধারা সংগ্রহ করে এসেছে। পারিপার্শ্বিকতার এই পরিবর্তন একযোগে বাকী জগৎ সংসারের সঙ্গে এক ঘনিষ্ঠতার সুযোগ এনে দিয়েছে যা আগে কোনো কালে জানা ছিলনা, এর সমস্যাবলী একটা জবাব চায় কারণ বর্তমান কালের সর্মগ্র মানব সমাজের কাছে এ এক গুরুতর প্রশ্ন। এই ভাবে পেগান মানব ও তার ধর্মীয় জরুরীত্ব হারিয়েছে। তার ধর্মীয় আত্মসমাহিত অবস্থার সঙ্গে পরিবর্তিত পরিবেশ জনিত পরিস্থিতির মধ্যে একটা বিস্তীর্ণ ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে। একদিকের ফাঁক বর্তমানের ক্ষতিকে আতংকিত করছে, যে বর্তমান জীর্ণ ধর্মীয় বন্ধনগুলিকে নির্বাসিত করে এমন এক সদাশয়তার মধ্যে নিয়ে এসেছে যা ঐতিহাসিক দিক থেকে অর্থহীন। সেইদিকের ফাঁক একটা সামগ্রিক সাংসারিকতার অপেক্ষায় আছে যে সাংসরিকতা তাকে এত বেশীভাবে গ্রাস করেছে যে নব আবিস্কৃত জাগতিক অস্তিত্ব তার কাছে বিশ্বাসের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই ফাঁকটিকে বন্ধ করার প্রচেষ্টায় পিতৃপুরুষের ধর্মকে রূপান্তরিত হতে হয়েছে।

এর ফলাফল যে কি তা বিশেষভাবে রাধাকৃষ্ণণের অভিজ্ঞতায় প্রদর্শিত হয়েছে। তিনি যে কাজে ব্রতী হয়েছেন তা হল নিজের ধর্মমতের বলবত্তা বিচার করেছেন বর্তমান জগতের প্রশ্নের পরি-প্রেক্ষিতে। যা অবশ্যম্ভাবী তা ঘটে: যিনি আধুনিক মানুষের ব্যাপারে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং তার ফলে পৃথিবীর সমস্যা এবং

জীবনের সমস্যার মুখোমুখি এসে পড়েন, সেই আধুনিক মানুষকে তার ধর্মীয় গণ্ডীর বাইরে আসতে বাধ্য হতে হবে।

এই সংকটময় আধুনিক যুগের সামনে পেগানবাদের সংস্কার বাইবেলীয় প্রত্যাদেশের আলোকে পরিপূরিত এবং পূর্ণতা প্রাপ্তির মধ্যে অবস্থিত। শুধু এইভাবে রাধাকৃষ্ণণের নব্য-হিন্দু ব্যাখ্যানের প্রচেষ্টায় প্রতিটি ধারায় যা প্রকাশিত, কারো সম্পর্ক কি সেই বাস্তবতার সঙ্গে সংস্থাপিত হতে পারে যার উৎপত্তির মূলে তার নিজস্ব ধর্মীয় জগতের কোনো অংশ নেই। এ হল পশ্চাৎপসারী গতি যা খৃষ্টিয় ব্যাখ্যায় আরোপ করা হয় তা পূর্বেকার মিশনারী সার্ভিস ও চার্চের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে বিজড়িত। এ রকম যে হতে হবে তা হল এক ঐতিহাসিক ঘটনা—যা এই সব দেশের চার্চ ও মিশনারীকে অতিক্রম করে গেছে। ভিন্ন ধর্মগুলিতে হোলি গোষ্টের প্রভাব বিষয়ক প্রশ্ন ওঠানো যেতে পারে, যেমন ঘটেছিল এক্যুমেনি-ক্যাল কাউন্সিল অব চার্চেস নয়াদিল্লীর থার্ড প্লিনারী সেশনে—এইসব কণ্ঠ এশিয়াস্থ খৃষ্টধর্মের এই নতুন অভিজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ত্রাণকর্তা হিসাবে যীশুর উপদেশবাক্য এবং বর্তমান কালের জগতের মধ্যে আছে এক বিচ্ছিন্নকারী উত্তর খৃষ্টান বিদ্বেষের বাধার প্রাচীর। এর আশ্রয়ে 'জাগরণের আন্দোলন' ছড়ানো আছে তারা মানব সমাজকে বর্তমান যুগের ছকে এক নয়া ধর্মীয় ভাবধারার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। রাধাকৃষ্ণণের বাণী সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে এই অবস্থার সংবাদ এনে দিয়েছে। যেখানে এই ধারা প্রবেশ করে সেখানেই একটা 'মনোভংগীর গোষ্ঠী' রচনা করে, এই চিন্তাধারা বিশ্বাস করে যীশুখৃষ্টের প্রাধান্যের বাণীর দ্বারা এরা সমর্থিত। এই 'সুদূর বাধা'-কে ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব শুধুমাত্র সেই খৃষ্টধর্ম দ্বারা যে খৃষ্টধর্ম যা স্পষ্ট করে সেই মানব সমাজের প্রতি তার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে, যে মানব সমাজকে 'গস্‌পেল' সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেছে এবং যদ্দারা এই সংসারে ঈশ্বরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী দৈব সহায়তা পাওয়া সম্ভব একথা বলা হয়েছে। চার্চ-মিশন পৌনঃপৌনিকভাবে এক আবশ্যকীয় স্মারক যা স্মরণ করিয়ে দেয়।

যীশুখৃষ্টের সম্প্রদায় শুধুমাত্র তার নিজের প্রয়োজনে অস্তিত্ব বজায়

রাখেনি। Missio Dei-এর মধ্যে অংশ থাকায় এর এক ঐতিহাসিক বিশ্বজনীন কর্তব্য আছে। এই দায়িত্বপালন করতে এর প্রয়োজন ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করায় ঐতিহাসিক পন্থায় চাই নিরন্তর পুর্ণনবীকৃত বাধ্যতা। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণে বিচার করলে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি তাঁর সন্তানকে মর্তধামে পাঠিয়ে মানব সমাজকে দীক্ষিত করায় উদ্যোগ—সেখানে রাধাকৃষ্ণণের কণ্ঠস্বর মনে হয়—যেন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অপর দিকে তাঁরই বিবেক—চার্চের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে—তোমরা আবার তোমাদের দায়িত্ব পালন করো।"

ইন্দো-জার্মান সহযোগীতার প্রতীক

রাউরকেল্লা ইস্পাত কারখানার কাজ সুরু হল, অনুরূপ অর্ধ-সমাপ্ত ইস্পাত-কারখানার কাজ সুরু হল, আশা করা যাক, খনিজ-সম্পদের জন্য প্রখ্যাত এই অঞ্চল কালক্রমে ভারতবর্ষের "রুর ডিস্ট্রিকট" এই গৌরব অর্জন করুক।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ

(৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ : রাউরকেল্লা)

এই শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই ভারতে ইস্পাত কারখানা ছিল মুখ্যতঃ টাটা প্রভৃতি প্রখ্যাত শিল্পপতিদের প্রচেষ্টায় এগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই কারখানার উৎপাদন শক্তি সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত এক উন্নতিশীল তরুণ-জাতির পক্ষে ক্রমশঃই অনেক কম হচ্ছিল। আর যেহেতু এই দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ সেই কারণে সরকার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও রাষ্ট্র-চালিত নতুন ইস্পাত গঠনে প্রয়াসী, আর সেই কারণেই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত হল ওড়িষ্যা, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের আকর-লৌহ প্রধান অঞ্চলে ইস্পাত-কারখানা প্রতিষ্ঠা।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে সরকারী কর্তৃপক্ষগণ জার্মান কোম্পানীগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলেন। সার্ভে করা এবং স্থান নির্বাচন ইত্যাদি প্রাথমিক কাজগুলি একযোগে এর কিছু পরেই সম্পন্ন হল, যে স্থান নির্বাচিত সেখানে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা হল। বোম্বাই-কলিকাতা রেলপথের রাউর-কেল্লা অঞ্চলটি অবশেষে স্থির করলেন। এই অঞ্চলটি কোয়েল ও শঙ্খ নদীর উৎপত্তি স্থান থেকে তেমন দূরে নয়। এই দুই নদী মিলে ব্রাহ্মণী নদী গঠিত হয়েছে। যদিও উচ্চশ্রেণীর আকার মাফিক আকর-লৌহের এই অঞ্চলে সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল তথাপি এই অঞ্চল তখনও অনুন্নত ছিল।

রাউরকেল্লা একটা পয়মন্ত নির্বাচন হয়ে দাঁড়াল। একথা সত্য যে জঙ্গলের আবহাওয়া সেইখানে কর্মরত জার্মানদের শক্তি অনেকখানি হ্রাস কিন্তু সাওতাল ও খয়রা প্রভৃতি আরণ্য অধিবাসী দেখল তাদের আবাস স্থান প্রস্তর

যুগ থেকে সহসা কারিগরিগত শিল্পের উন্নত যুগে রূপান্তরিত হল। রাউর-কেল্লার প্রথমাংশটিতে জার্মান শব্দ "রুর" প্রতিধ্বনিত, এবং জার্মান ইঞ্জিনিয়ারগণ, শ্রমিকগত এবং নগর-পরিকল্পনা বিশারদগণ "রুর" উপত্যকা থেকে এসে এই শিল্পাঞ্চলের পরিবেশ গঠন করেছেন যা এতাবৎ ফলমূল আহরণকারী দেশী লোকদের আস্তানা ছিল তা নতুন নগরীতে পরিণত হল।

অনেক বছর পূর্বে, সাহসিক শিল্প পথিকৃত জামশেদজী টাটা জার্মান ইঞ্জিনিয়ার এবং শ্রমিকদের তাঁর ইস্পাতী সাম্রাজ্য গঠনের কালে নিযুক্ত করেছিলেন। সেখানকার কাজ সুরু হয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। টাটা জাতিতে ছিলেন পারশী। শিল্প গঠনে নেতৃত্ব করার ব্যাপারে তাঁর ছিল মার্কিনী দূরদৃষ্টি আর খুঁটিনাটির ব্যাপারে ছিল জার্মান নজর।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারত সরকার এবং ক্রুপ ও ডেমাগ কোম্পানীর বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদিত হল এই আধুনিক ইস্পাত কারখানা নির্মাণের উদ্দেশ্যে। এই নব গঠিত জার্মান সংযোগটির নাম হল "Indiengemeinschaft Krupp-Demag" বা ক্রুপ-ডেমাগের ভারতীয় গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী অতঃপর আরো কয়েকটি জার্মান কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল যারা নানাভাবে রাউরকেল্লা কারখানা নির্মাণের ব্যাপারে সহায়তা করেছেন। ভারতীয়গণ একটি বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাঁচী শহরে হিন্দুস্থান ষ্টীল (প্রাইভেট) লিমিটেড এই নামে। এরা উপরোক্ত সংযোগের অংশীদার হিসাবে কাজ করবেন স্থির হল। ক্রমশঃ হিন্দুস্থান ষ্টীল "পাবলিক সেকটরের" সর্বভারতীয় ইস্পাত কারখানায় পরিণত হল। জার্মাণ ও ইণ্ডিয়ান অংশীদের মধ্যে আদর্শ সহযোগীতার পরিচয় পেয়ে, ভারত সরকার "হিন্দুস্থান ষ্টীলে"র কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করলেন, কারণ ইতিমধ্যে ভিলাই-এ একটি ষ্টীল-মিল স্থাপনের জন্য সোভিয়েতের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় (২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫) এবং দুর্গাপুরে আরও একটি কারখানার জন্য গ্রেট ব্রিটেনের ইণ্ডিয়ান ষ্টীল ওয়ার্কস কনষ্ট্রাকসন কোম্পানী লিমিটেডের সঙ্গে (৩১শে অক্টোবর, ১৯৫৬) আর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দি হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেড তার নামের অংশ থেকে "প্রাইভেট" কথাটি লুপ্ত করে দিল।

রাউরকেল্লা যেখানে কাজকর্ম বেশ মন্থর গতিতে চলল সেখানে প্রথম চুল্লী ১৯৫৯-এর ৩রা ফেব্রুয়ারী থেকে প্রথম জ্বালান হল। প্রেসিডেণ্ট প্রসাদ এই

কারখানার উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। তাঁর সেই ভাষণ (যার থেকে এই পরিচ্ছেদের শিরোনামের উদ্ধৃতিটুকু গৃহীত হয়েছে) জার্মান প্রচেষ্টার প্রতি প্রশস্তি জ্ঞাপন করল এবং সেই সঙ্গে নীতিগত মূল্যবোধের প্রসঙ্গেও জোর দিলেন, সম্ভবতঃ কারিগরি শিল্পমনা শ্রোতাদের মানবিক ও আধ্যাত্মিক দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল :

> "এখন যখন রাউরকেল্লার চাকা ঘুরতে সুরু করল এবং হিরাকুদ ড্যামের জল চারিদিকে প্রবাহিত হতে সুরু করেছে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় এই অঞ্চলের মানুষের পক্ষে সুদিন অচিরাৎ সমাগত হবে।
>
> আমার জার্মান বন্ধুদের প্রতি আমি একটি বিশেষ কথা বলতে চাই। জার্মান ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট যে তৎপরতায় সহায়তা করতে রাজী হয়েছেন এবং যাঁরা সবাই এই অনুদার আবহাওয়ায় কঠোর-ভাবে পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সকলের সহযোগীতার মনোভংগী ও কারিগরিগত দক্ষতার ফলেই রাউরকেল্লা ইস্পাত কারখানার উদ্ভব সম্ভব হল।
>
> প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যানুসারে "জ্ঞানদান" বা জ্ঞানদান করা একটা উত্তম কর্ম, যে তা গ্রহণ করে তার পক্ষে নিঃসন্দেহে তা আশীর্বাদ, আর যে দাতা তার পক্ষে অধিকতর মহৎ আশীর্বাদ। আমি আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে এই মনোভংগীতে অংশ গ্রহণ করবেন, আর আপনারা যেমন আমাদের জনগণের কাছে কারিগরিগত বিদ্যা শেখাচ্ছেন আপনারা এই নতুন কারিগরিগত সাফল্যে নিশ্চয়ই সন্তোষ লাভ করছেন। আপনাদের সকলকে ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়গণ যাঁরা সুদূর জার্মানী থেকে এইখানে এসেছেন আমি তাঁদের সাদর অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।"

আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে রাউরকেল্লা আজ ভারতের কারিগরিগত বিপনি-বাতায়নে পরিণত। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শিল্প বিষয়ে উন্নত দেশসমূহের ইস্পাত কারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে।

ভারতীয়গণ যে রাউরকেল্লা বিষয়ে গর্ববোধ করেন তা সহজবোধ্য, কিন্তু যাঁরা ভারতীয় রাজধানী পরিদর্শনে যান তাঁরা নয়াদিল্লীর গেটের বহিসীমায় মেহরৌলীতে গেলে ভালো করবেন। সেইখানে চন্দ্রবর্মন কর্তৃক আমাদের

পঞ্চম শতাব্দীতে যে স্তম্ভ স্থাপনা করা হয়েছে তা দেখা প্রয়োজন। মরিচাহীন লোহায় নির্মিত এই স্তম্ভ এই সত্য প্রমাণ করে যে শিল্পোন্নত দেশগুলি তাদের ইস্পাত কারখানা এমন এক শ্রেণীর জনগণের কাছে এনেছেন যাঁরা সুদীর্ঘকাল পূর্বেই লৌহ এবং তার গুণাগুণ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন।

আজ ভারতবর্ষ পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় শক্তিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে চলে। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জাপান, ক্যানাডা, এবং ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানী "এইড ইণ্ডিয়া কনসরটিয়ম" স্থাপনের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করেছেন। যে প্রতিষ্ঠান ১৯৬১-র ১লা জুন ওয়াশিংটনে ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পূরণে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। সাধারণতঃ একে "এইড ইণ্ডিয়া ক্লাব" বলে উল্লেখ করা হয়, এই কনসরটিয়মে পরে আরও কয়েকটি য়ুরোপীয় দেশ যোগদান করেন, আর আরও অনেকে চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যথা: সুইজারল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়া। এই ক্লাব প্রতিষ্ঠার মাত্র চারদিন পরে আরও একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় পাকিস্তানের শিল্প প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার উদ্দেশে। উদ্দেশ্য ছিল অবিভক্ত ভারতের দুই উত্তরাধিকারী দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যে বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করা—বহুমুখী অংশীদারী ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বীর মনোভংগী দূর করা। তথাপি ১৯৬৫-র গ্রীষ্মকালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধ সুরু হয় তাতে বিশেষ করে এই সত্যই প্রকাশিত হয় যে একমাত্র অর্থনৈতিক সাহায্য ভাবাবেগ দমনের সহায়ক নয়।

জার্মান শিল্প প্রচেষ্টা ভারতীয় অংশীদারদের সঙ্গে আরও কয়েকটি চুক্তি করেছেন—তার মধ্যে একটি টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড লোকোমোটিভ কোম্পানী (টেলকো) এবং জার্মানীর ডেমলার-বেনজ কোম্পানী। এরা মার্সেডিজ-বেনজ মোটর লরী ভারতের উৎপাদনের জন্য ১৯৫৪-র ২রা মার্চ তারিখে চুক্তি করেন। উভয় দেশের সরকার এই লেনদেনের ব্যাপারকে সানন্দে সমর্থন জানিয়েছেন এবং আজ জামসেদপুরের টাটা-মার্সেডেজ ওয়ার্কসের তৈরী ডিজেল ট্রাকগুলি ভারতের রাজপথে এক সুপরিচিত দৃশ্য। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের মত গোড়ার দিকেও জে, এম, হানক "ইণ্ডিয়ান-মার্সেডেজ-টাউনে" জার্মান ক্রিয়া-কলাপের ব্যাপারে যে সমাদর তার কথা বলেছেন:

"এই মোটর কারখানায়, পঞ্চাশজন জার্মান আজো ইঞ্জিনিয়ার ও ফোরম্যান হিসাবে কাজ করছেন; লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে এঁদের

সংখ্যা পাঁচ। সংবর্ধিত TELCO, কারখানায় ছুটি কারখানা ইন্দো-জার্মান সহযোগীতার যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করে। এই ব্যবস্থা টাটা-র সঙ্গে এমনই সাফল্য লাভ করেছে তাই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ ভারতীয় অংশের জার্মান বিশেষজ্ঞের কাজের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা আছে। এঁরা যুক্তিসংগতভাবে এবং সংহত ধারায় পরিকল্পনা ও নির্মাম উভয়বিধ কাজের সুযোগ পেয়েছেন। জামসেদপুরের অফিসের মত, এই কারখানাগুলিও জার্মানীর যে কোনো অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে আধুনিক এবং উত্তম বলা হত।"

৬ই আগস্ট ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে আরও একটি কনট্রাকট সই করা হল তার ফলে বারেসেল কুনজে-র জার্মান প্রতিষ্ঠানের ওপর বানিহালের রেল ও রাজপথের টানেল নির্মাণের ভার দেওয়া হল।

এই ধরণের সংযুক্ত উদ্যোগ আজ প্রায় চার শতেরও বেশী সংখ্যায় পৌছবে। এদের মধ্যে ২৮০টি যুদ্ধের পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে, এর মধ্যে ৯০টিতে মূলধনের লগ্নী করার ব্যাপার আছে আর বাকীগুলিতে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

১৯৫৩ থেকে বস জিএমবিএচ বাঙ্গালোরে একটি শাখা স্থাপনা করেছেন। এই শহরটি ইতিমধ্যে দক্ষিণ-ভারতে জার্মান শিল্প উদ্যোগের একটি কেন্দ্র পরিণত হয়েছে। আজ থেকে দশ বছর আগে—সংখনডলিঙ্ কোম্পানী এইখানে 'স্পীডোমীটার' প্রস্তুত করছেন; এবং প্রফেসার ট্যাংক বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিমানবাহিনীর জন্য অতিদ্রুত (সুপারফাষ্ট) যন্ত্রাদি নির্মান করছেন। দি হিন্দুস্থান মেশিন টুলস লিমিটেড, যা জার্মান সাহায্যে স্থাপিত হয়েছে, আজ য়ুরোপে মাল রপ্তানি করছে। জার্মান "এইজি" মনোরম বাঙ্গালোরে গভর্ণমেণ্ট ইলেকট্রিক ফ্যাক্টরিতে একটি আসন পেয়েছে। উত্তরাঞ্চলে জব্বলপুর ও কানপুরে এমএএন মেশিন ওয়ার্কসের ইঞ্জিনিয়ারগণ ১৯৫৮ থেকে সক্রিয় আছেন। এদিকে "ওয়েষ্ট ফালিসখে মেটাল ইনডাষ্ট্রি কেজি হুয়েক অ্যাণ্ড কোং" ১৯৬১ থেকে দিল্লীতে আলোর যন্ত্রপাতি নির্মাণ করছেন। সখভিনফুরটের কুগেল-ফিস্খের জিওর্জ সখাফের অ্যাণ্ড কোম্পানী ১৯৬০ থেকে বোম্বাই শহরে কর্মে লিপ্ত আছেন। সেই বছরই ভিসবাদেন-বাইব্রিখের কেমিসখে ভেরকে আলবার্ট এই শহরে একটি ভারতীয় শাখা স্থাপনা করলেন। ট্রয়সডরফের ডিনামিট নোবেল এ জি ১৯৫৭-র দিকে ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করেন;

এবং বি এ এস এফ ১৯৬৩ থেকে বোম্বাই শহরে আছেন। হোয়েখট্ অ্যাণ্ড বেয়ার-লেভারকুসেন অনেক দশক ধরে ভারতের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রেখেছেন; ক্রুপ, গুটেহফমুনগস্থুটে, মানেসমান, ক্লোকনার-হামবোলডট্-ডয়েৎস এবং ক্রাউস-মাফেই প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানেরও ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে।

এই ধারার প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে কয়েকটি জার্মান কোম্পানী ঐতিহ্যগত প্রাক-যুদ্ধকালীন সংযোগের সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছেন। ফ্রাঙ্কেনথালের কে এস বি (ক্লিন, সথানৎসলিন অ্যাণ্ড বেকার) ত্রিশের দশকে ব্যবসায়িক সংযোগ পুর্ণনবীকরণ করেছেন, তাঁরা ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে পুনার নিকটস্থ পিমপিরিতে একটি পাম্প কারখানা স্থাপন করেছেন। বর্তমান কালের ভারতের সীমেন্স কোম্পানীর বহুবিধ সংযোগ ১৮৬৭-১৮৭০ থেকে সুরু হয়েছে। এই কালে তাঁরা লণ্ডন থেকে কলকাতা পর্যন্ত টেলিগ্রাফ তার বসিয়েছেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে টাটাকে সীমেন্স কোম্পানী জেনারেটার সরবরাহ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, এমন অনেক ইন্দো-জার্মান বাণিজ্যিক সম্পর্কের অনেক দৃষ্টান্ত দেখানো যায়।

আজ বহুসংখ্যক কোম্পানী সক্রিয় আছেন যাঁদের নামের মধ্যেই ইন্দো-জার্মান অংশীদারীর পরিচয় পাওয়া যায়—যথা, সিন্ধু-হোখ্‌টিয়েফ এঁরা কাণ্ডালা পোর্ট নির্মান করেছেন, বাজাজ টেম্পো লিমিটেড এঁরা টেমপো ডেলিভ্যারি ভ্যান প্রস্তুত করে থাকেন। ভারত ফ্রিৎস ভেরনার (প্রাইভেট) লিমিটেড মেসিন টুল প্রস্তুতকারক, বেয়ার (ইনডিয়া) লিমিটেড, হোয়েখ্‌ট ডাইস অ্যাণ্ড কেমিক্যাল ও সরাভাই মেরাক লিমিটেড কেমিক্যালস সরবরাহক। অন্যান্যদের মধ্যে আছেন টাটা-ডিডিয়ার রিফ্রাকটরিস লিমিটেড এবং গোয়েৎসে (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড। ইন্দো-জার্মান অংশীদারী বাখ্‌রানাঙ্গাল ড্যাম থেকে কোয়না ড্যাম পর্যন্ত সার্থক প্রমাণিত হয়েছে। যেমন কাণ্ডলা থেকে বিশাখা-পত্তনমের ডকের ব্যাপারে প্রমাণিত। প্রকৃতপক্ষে, হিমালয় থেকে কেপ কমোরিণ পর্যন্ত এমন কি শিল্প সংশ্লিষ্ট স্থান আছে যার সঙ্গে কোনো না কোনো জার্মান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ নেই!

তবে একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ভারতবর্ষ মুখ্যতঃ কৃষিপ্রধান কাঠামোর দেশ। আর জার্মান সাহায্য, প্রেসিডেন্ট প্রসাদ কর্তৃক উল্লিখিত জ্ঞানদান—ভারতের সেই অংশে পরিচালিত হয়েছে যেখানে গান্ধীর প্রভাব আজো সজীব। জার্মান সরকারের আর্থিক সমর্থন এবং কৃষি ব্যাপারে

জার্মান বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় হিমাচল প্রদেশের মণ্ডীতে একটি আদর্শ খামার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৬৭-তে দক্ষিণ-ভারতে আর একটি দ্বিতীয় মণ্ডী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওয়ালটার সখীল এই আদর্শ খামার বিষয়ে সংক্ষেপে ১৯৬৪তে বলেছেন, তখন তিনি অর্থনৈতিক সহযোগী বিষয়ক মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন :

"আমি একটি বিশেষ ধরণের প্রকল্পের সাফল্যের কথা উল্লেখ করব। ভারতের মণ্ডীর কৃষিবিষয়ক উপদেষ্টা প্রকল্প এইখানে ভারত সরকার এবং আমাদের যুক্ত প্রচেষ্টায় একটি কৃষিবিষয়ক জেলাগত নিবিড়করণ কার্যসূচী পরিচালিত হয়। এই কার্যক্রম সমগ্র অঞ্চলের দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি আদর্শ স্বরূপ। আজ পর্যন্ত আমরা ৮'২ মিলিয়ন দয়েস মার্ক (জার্মান মুদ্রা) এর জন্য চিহ্নিত করে ধরে রেখেছি আর আমরা পনেরজন বিশেষজ্ঞকে পাঁচ বছর বা ঐরকম কাজের জন্য ঐ সব জেলাগুলিতে কাজ করতে পাঠাব। প্রাথমিক ফলাফল বিশেষ ভাবে উত্তম। এই প্রকল্প এবং অনুরূপ অন্য প্রকল্পগুলি আন্তর্জাতিক আকর্ষণ লাভ করেছে; বহু দাতা দেশ কর্তৃক এই সব অঞ্চলগুলি পরিদর্শিত হয়েছে এবং অনুরূপ প্রকল্পের পক্ষে আদর্শ বলে স্বীকৃত হয়েছে। হয়ত আমার এইখানে যে সব বিশেষজ্ঞগণ ইতিমধ্যেই মণ্ডীতে আছেন বা যাঁরা অচিরে সেইখানে যাবেন তাঁদের কথা বলা প্রয়োজন। এই দলের প্রধান হিসাবে আমাদের সেইখানে একজন সংহত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপদেষ্টা আছেন পরিচালন ব্যবস্থার জন্য, তথ্যসরবরাহ ও স্ট্যাটিসটিকসের জন্য, শস্য এবং চারার কৃষিকর্মের জন্য। বীজ উন্নয়নের জন্য উপদেষ্টা আছেন; মৃত্তিকা বিশ্লেষক হিসাবে একজন কলাকুশলী আছেন, একজন শস্য ও রাষ্ট্রখামার কলাকুশলী, ফল এবং সব্জী চাষ-বাসের একজন উপদেষ্টা, একজন বাগিচা বিশেষক আর একজন চারা সংরক্ষণকারী কলাকুশলী, পশুপ্রজননের জন্য উপদেষ্টা, গবাদি পশুর জন্য ওষুধপত্র এবং কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা, পশুকে খাদ্যদানের জন্য কলাকুশলী, সেচ এবং ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণের কলাকুশলী এবং কৃষি কর্ম-নির্বাহক উপদেষ্টা আছেন। আমরা কারিগর কামার এবং চক্র পরিচালক প্রভৃতির ব্যবস্থা রেখেছি। আমার মনে হয় এত রকম

ক্রিয়া কলাপের সংযোগ উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যবহারিক প্রয়োগের ব্যাপারে যুক্তি সঙ্গত পন্থা।"

রাউরকেল্লায় সুর ধরা হয়, এ এক চমৎকার প্রতীক, সবচেয়ে বড় কথা এ এক স্মারক যে উৎসাহপূর্ণ ক্রিয়া কলাপ এবং কাউকে সাহায্য করার ইচ্ছা কারো শিল্পগত এবং অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ।

যাই হোক, শিল্প ব্যবস্থা নিজের ক্ষেত্রেই আপনাকে সীমাবদ্ধ রাখবেনা—শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার যোগ থাকা প্রয়োজন। পণ্ডিতগণ যে সাফল্যের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পারেন কলাকুশলী কারিগরদের সঙ্গে তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন ম্যুনিখের জার্মান ম্যুজিয়মের অস্কার ফন মিলার। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাংলায় গিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশের মালদহের সন্নিকটস্থ শ্যামসীর মহালক্ষ্মী অয়েল মিলের ব্যাপারে বোরসিগ অ্যাণ্ড ক্রপের কারিগরি সাহায্য গ্রহণ করেন এবং তার সঙ্গে কর্মীপ্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেন। আশ্চর্য নয় যে এই পরীক্ষা অপরের পক্ষে আদর্শের কাজ করেছে। বিনয়কুমার সরকারেরও কৃতিত্বের বৃহত্তম অংশ প্রাপ্য। এই বাঙালী পণ্ডিত জার্মান বিদগ্ধ জীবন বিষয়ে এতই অনুরাগী ছিলেন যে তিনি Bayerische Industrie und Handelszeitung (৪৯ খণ্ড, ডিসেম্বর ১৯৩০) যে চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন আজ চল্লিশ বছর পরেও তার যুক্তিযুক্ততা হ্রাস পায়নি :

> "...জার্মান মেসিন কারখানাগুলির আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, পণ্ডিত এবং ব্যবসার নেতৃস্থানীয়দের এই সত্যের দিকে তাকাতে বলি যে সব শিল্পোন্নত জাতি ভারতীয় যুব সমাজকে কারিগরিগত প্রশিক্ষণে প্রভাবিত করবেন—এতই ঘনিষ্ঠভাবে শিল্পায়ত্ত করণ প্রচেষ্টায় বিজড়িত। তাঁরা পরবর্তী প্রকল্পের ভারতীয় জনগণের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে পরিচালিত করবেন। এই কারণে আমি সুনিশ্চিত যে জার্মানীস্থ কারিগরি বিদ্যা ও বিজ্ঞানের মহান্ নেতৃবৃন্দ ভারতের জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাক্যে এবং কার্যে সহায়তা করবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় কলিকাতায় যে ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটুটের আমি প্রতিনিধি—সেটি জার্মান উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার শাখাস্বরূপ—এতদ্বারা পারস্পরিক উচ্চমানের কর্ম বিনিময় সম্ভব হবে এবং পরে তা বিশ্ব-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা শক্তি হয়ে উঠ্‌বে। সঠিক-ভাবে এবং কার্যকরভাবে এই প্রস্তাব করা যায় মেকানিক্যাল,

ইলেকট্রিক্যাল ও কেমিক্যাল ইনজিনিয়ারিং-এর ব্যাপারে এই ইনষ্টিটুটের কলিকাতাস্থ প্রতিষ্ঠানে প্রতিবছর একজন ইংরাজী-ভাষী অধ্যাপককে পাঠান হোক। এই সব প্রফেসররা ভারতীয় শিক্ষা-নবীশদের যে শেখাবেন তা নয় বরং এ হবে তাঁদের সমীক্ষা-ভ্রমণ এবং তাঁদের গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। জার্মান অর্থনীতি, কারিগরি বিদ্যা এবং সংস্কৃতির নেতৃবৃন্দের পক্ষে সম্ভবপর হবে। ধরা যাক দশ বছরের জন্য জার্মান অর্থনীতির দশজন প্রতিনিধিকে কলিকাতায় একটি টেক্‌নিক্যাল-একনমিক কেন্দ্রে পাঠান। জার্মান একাডেমি কর্তৃক ভারতীয় ক্ষেত্রে যে কাজ সুরু করা হয়েছে তাকে সুদৃঢ় এবং দীর্ঘস্থায়ী করা হোক।"

অংশীদারী—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংযোগের সংক্ষিপ্তসার

"ভারতীয় জনগণের দক্ষিণ এশিয়ার রূপান্তরের ব্যাপারে অখণ্ড বঙ্গের বিভাজন (১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭) সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দিক থেকে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এশিয়ার এই বিস্ময়কর ব্যাপারের এক সমান্তরাল সাদৃশ্য য়ুরোপের রূপান্তর—বরং বলা যায় ইওরো-আমেরিকান জনগণের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে অখণ্ড জার্মানীর বিভাজন ব্যাপারে। (মে, ১৯৪৫)।

বিনয়কুমার সরকার
(Dominion India in World Perspectives)

জার্মানী য়ুরোপের মধ্যমণি। নব্য-জার্মানী বিশ্বজগতের অগ্রগতির ব্যাপারে সর্বোত্তম নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটা উচ্চতর বোঝাপড়ার ব্যবস্থা করবে। অপর দিকে, ভারতবর্ষ এশিয়ার মধ্যমণি। অতীতে মানব সমাজের অগ্র-গতিতে ভারতের অবদান কিছু কম নয়—এবং সন্দেহ নেই যে স্বাধীন ভারত বিশ্বজগতে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে। এইভাবে জার্মান জন সমাজ ও ভারতীয়দের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বোঝাপড়া হবে এবং ভারতবর্ষ সেই মহান লক্ষ্য অর্থাৎ বিশ্বজাগতিক শান্তির ব্যাপারে বিশেষ মূল্যবান অবদান রাখবে।

তারকনাথ দাস
(Indien in der Weltpolitik)

প্রথম উধৃতি নেওয়া হয়েছে বিনয়কুমার সরকারের বন্ধুগণ কর্তৃক সংগৃহীত লেখকের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অজস্র প্রবন্ধাবলীর নির্বাচিত সংকলন গ্রন্থ থেকে। এই উধৃতিটিতে অখণ্ড বঙ্গদেশের ভাগাভাগির কথা উল্লেখ করা

হয়েছে। নিজের দেশের অবস্থা বর্ণনা সূত্রে বহুমুখী ঐতিহাসিক প্রতিভা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিনয়কুমার সরকারের মনে বেদনাদায়ক ভাবে বিভাজিত জার্মানীর কথা জেগেছে। জার্মানীর প্রতি তাঁর অনুরাগের এ এক প্রতীক। অদৃষ্টের কাছে পরাজিত জার্মানী যেমন রাজনৈতিক "পশ্চিম" ও রাজনৈতিক "পূর্ব" বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে বিরোধীর হাতে তুলে দিয়েছে ঠিক সেই ভাবেই বাংলাদেশ আঘাত পেয়েছে—ভারতের কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছে। বিনয়কুমার সরকার জার্মানীর বিভাজন অনুরূপ বেদনায় অনুভব করেছেন যেমনটি ঘটেছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ তাঁর কাছে ভারতের প্রতীক, যেমন জার্মানী য়ুরোপের প্রতীক।

জার্মানীর মত, ভারত এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র উপমহাদেশকে বিভাজনের বেদনা ভোগ করতে হয়েছে। আর সেই সঙ্গে এসেছে শরণাগতের স্রোত। ভারতের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক-ধর্মীয় বিরোধের ফলে এই অঞ্চল বিভক্ত হয়েছে—এবং খুঁটি-নাটির দিক থেকে যদিও ভারতের অবস্থা জার্মানীর থেকে পৃথক—তার মধ্যে আছে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটা সর্বোপরি সমান্তরাল ঐক্য অভ্রান্তভাবে বর্তমান। অতীতের দিকে তাকালে যখন উত্তর—রিফর্মেশন জার্মানী বিরোধে জর্জর হয়ে পড়েছিল শোচনীয় ত্রিশ-বছরের যুদ্ধে—তখনও এই একই অবস্থা ধর্মীয় সংঘর্ষ থেকে রাজনৈতিক শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছিল।

শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে উভয় দেশের রাজনীতি ও জনজীবন মুখ্যতঃ সাংস্কৃতিক। জার্মানীর জনগণ আর ভারতের জনগণ চিরদিন চিন্তা-নায়ক ও দার্শনিকদের প্রতি প্রশস্তি জ্ঞাপন করেছেন, তাঁদের সংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করেছেন এবং তাকে পবিত্র সম্পদ মনে করেছেন। ভারতীয়গণ তাদের ভূমির পবিত্রতা বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং সেই দেশের সর্বোচ্চ পবিত্র অঞ্চল হিমালয়কে বলতেন দেবভূমি, পুণ্যভূমি। অন্যদিকে জার্মানগণ তাদের সাম্রাজ্যকে একটি জাতীয় রাজ্য হিসাবে নয় বরং তাকে খৃষ্টধর্মের পবিত্র আশ্রয় মনে করেছেন—তাঁরা বলতেন Heiliges Römisches Reich—বা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য।

জার্মান বা ভারতীয়দের কারো কাছেই এই পরিকল্পনায় জাতীয়তাবাদ প্রবেশ করেনি। একালে অতি জাতীয়তার মনোভংগী অনেককাল পূর্বে জার্মান ও ভারতীয়দের বিদগ্ধ রাজনৈতিক পণ্ডিতগণ চিন্তা করেছেন। ভারতীয়

সংস্কৃতি চালিত শান্তি-ভাবনা এবং তৎসহ একটি শান্তির ক্ষেত্র। যে শান্তি ঈশ্বরের শান্তি—ঈশ্বরের সন্ধি—Treuga Dei—এই নীতি জার্মানীর মনোভংগীকে মধ্য যুগ থেকে প্রভাবিত করেছে। কানটের অনন্ত শান্তির সন্ধানের সূত্রে তাকে নবকলেবর দান হয়েছে এবং তাঁর দার্শনিক উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক সেই শান্তির ভাবাদর্শের মনোভংগীতেই অনুসৃত হয়েছে। বিংশ-শতাব্দীর রাষ্ট্র চিন্তায় এই সেই ভূমি যা বিশ্বজনীনত্বের ভাবধারাকে লালন করেছে, বুডেনহোভ-কালেরগী-র Paneuropa একদিকে অপরদিকে চিত্তরঞ্জন দাশের Panasia।

জার্মান ভারত উভয় দেশেরই জাতীয়তাবাদ বিষয়ে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা ঘটেছে এবং আধুনিক রাজনৈতিক বোঝাপড়ার পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে। ফলে, তারা শিল্পোন্নতভাবে নির্দিষ্ট ভবিষ্যতে এক নয়া দিগন্তের জন্য প্রয়াস করেছেন। ভারতীয়গণ ক্ষুদ্র সূচনাকে বিরাটভাবে বিস্তারিত করেছেন, অপরদিকে জার্মানগণ এক যুদ্ধ জর্জর বিধ্বস্ত দেশের শিল্পের পুর্ণগঠন করেছেন। কলাকৌশল, শিল্প-ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উভয় দেশই এক নতুন পদক্ষেপ সুরু করেছেন—একটি দেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসনের তাঁবে ছিল আর অন্য একটি দেশ যা মাত্র কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বছর মাত্র সামরিক প্রাধান্য লাভ করেছিল।

পেশায় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ গোটলিয়ের ভিলহেলম লীটনার (১৮৪০-১৮৯৯) কর্তৃক রচিত একটি কাহিনীতে ভারত যে জার্মানীর কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দেশ ছিল তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই লেখক আরব ও ঐশ্লামীয় পঠন-পাঠনে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। চিন্তাশীল উনবিংশ শতাব্দীর এই সন্তান ইংলণ্ড হয়ে ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন—সেইখানে তিনি লাহোরের গভর্ণমেণ্ট কলেজের প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেইখানে তিনি আঞ্জুমান-ই-পানজাব নামক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনা করেন। এর ওপর তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা এবং Indian Public Opinion নামক সামরিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, এই জার্মান প্রফেসর সমগ্র ভারতীয় ছাত্রসমাজের একটি প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবীর একজন প্রবক্তা। তাঁর কালের উদারনীতিক দর্শনের নীতির সঙ্গে তাল রেখে তিনি ভারতকে য়ুরোপীয় এশিয় এক সাম্রাজ্যের মধ্যমণি মনে করতেন এবং 'কাইসার-ই-হিন্দ' কথাটি তিনিই সৃষ্টি

করেন। এই কথাটির মধ্যে ইরানীয় ঐতিহ্য এবং জার্মান লাতিন সম্রাটের উপাধি সংমিশ্রিত। ডিজরেলীর এই উপাধিটি এত পছন্দ হয়েছিল যে তিনি রানী ভিকটোরিয়ার কাছে সেই প্রস্তাব রাখলেন। রানীও সেইখানেই তা গ্রহণ করলেন প্রকৃতপক্ষে এমনই দ্রুততালে ব্যাপারটি ঘটল যে প্রিন্স অব ওয়েলস যিনি সেই সময় ভারতে অবস্থান করছিলেন তিনি একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। এই উপাধিটি পারসিক ধারায় ব্যবহৃত। এর প্রতীকত্ব বিষয়ে অনেকে চিন্তা করতে পারেন এবং পারসিক থেকে গ্রীক, রোমান থেকে জার্মান ও এ্যাংলো-স্যাকসন প্রভৃতির Translatio Imperi-সন্ধান করতেন। এই চক্র ভারতে এসে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

এইবার আমাকে সাম্প্রতিক অতীত ও *বর্তমান কালের রাজনৈতিক ও* অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে কিছু আলোচনার অনুমতি দান করুন। বার্ণহার্ড হারমস প্রখ্যাত জার্মান অর্থনীতিবিদ্ (১৮৭৬-১৯৩৯) উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ কালের পূর্ব পর্যন্ত একটা বিশ্ব অর্থনীতির অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। কিন্তু অনেক আগেই মহান শক্তিবর্গ মশলা ইত্যাদির অবাধ বাণিজ্যের জন্য লড়াই করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল যে কালোমরিচ, আদা ইত্যাদি যাতে মালাবার উপকূল থেকে আনা যায় তার সঙ্গে এলাচি বীজ, মধ্যযুগে এই বস্তুটির মূল্য ছিল অনেক বেশী। সিংহল থেকে তাঁরা আনতেন দারুচিনি, ইন্দোনেশিয়া থেকে সুপারি এবং লবঙ্গ কারণ মধ্যযুগীয় খানার ব্যবস্থা ছিল মশলাদার। ইতিমধ্যে সুইস চারণ ষ্টাইনমার মশলাযুক্ত খাদ্যবস্তুর বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করে বলেছিলেন যে মশলা যুগ গরম খাদ্য আহার করার ফলে তাঁর মস্তেম পাত্র জোলো মনে হচ্ছে। আলেকজান্দার সুপান এই মশলা বাণিজ্যের গুরুত্ব বিষয়ে একটি বর্ণনা দিয়েছেন

> "তৃষ্ণা সৃষ্টি করার জন্য খাদ্যপত্র 'মশলা' দিয়ে বিকৃত করাই যথেষ্ট হত না এইসব খাদ্য না রেঁধে কাঁচা খাওয়া হত এবং তাঁরাই খেতেন। শুধু এইটুকু যদি হৃদয়ঙ্গম হয় তাহলেই বোঝা যাবে বিগত শতাব্দীগুলিতে মশলা বাণিজ্যের কি ভূমিকা ছিল। রৌপ্যের সঙ্গে স্বর্ণ এবং দুষ্প্রাপ্য 'ফার' তখনকার কালে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতির পরিচয় জ্ঞাপক ছিল এবং মানবসমাজকে এই ভাবেই তা চালিত করেছে।"

মশলা-বাণিজ্য এবং মিশনারী প্রচেষ্টা নিরন্তর ইয়োরোপীয় এশিয় সম্পর্ক নির্ধারণ করেছে, তার ওপর অবশ্য লুসিটেনিয় ছাপ ছিল। জার্মানরা ভারত

থেকে ধ্রুপদী মশলাপাতি আমদানি করতেন প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত। এই তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা যায় 'নীল' কে, কারণ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে একা জার্মানী প্রায় ১,০০০ টন প্রাকৃতিক নীল আমদানি করত। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এই আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। শতাব্দীর শেষের দিকে এই দেশ ২৫৬ টন কৃত্রিম নীল রপ্তানী সুরু করেছে।

অনেক বছর ধরে ক্যালিকো (মালাবার উপকূলের কালিকট নামক শহরের নামানুসারে) - য়ুরোপ ভারতের মুখ্য রপ্তানি দ্রব্য ছিল। আরেক প্রকার তুলার আমদানির নাম ছিল 'চিনৎস' (হিন্দি শব্দ ছিট থেকে)। বেশী দিন নয় ভারতের ছাপা সুতীবস্ত্র পাশ্চাত্য জগতে পুরোপুরি অনুকরণ করা হয়েছে। সংরক্ষক শুল্কের জন্যই অধিকাংশ য়ুরোপীয় দেশ সমূহকে এর থেকে দূরে রাখা গেছে।

মশলা এবং সুতীবস্ত্রের প্রথম যুগের ভারতীয় বাণিজ্য বৃহৎ আকারের বাণিজ্য বা আধুনিক বাণিজ্যের গণ-উৎপাদনের আওতায় পড়েনি। সুয়েজ ক্যানাল উন্মুক্ত হওয়ার পর এশীয় বাণিজ্য এই সুযোগ গ্রহণ করেছে।

সাম্প্রতিক কালের সামরিক ও রাজনৈতিক কলহের ক্ষেত্রে "সুয়েজ ক্যানাল" এশিয় বাণিজ্য ও পরবর্তীকালের বাগদাদ রেল প্রকল্পের জন্য, বাণিজ্যিক বিমানবহর বা ইয়োরোপীয়-এশিয় টেলিগ্রাফ সংযোগ যা জার্মান বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান "সিমেন্স" কর্তৃক ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপনা করা হয়, তার জন্য সমান গুরুত্বের দাবী রাখে।

ইজিপ্ট বা মিশর এবং সাধারণভাবে কারিগরি শিল্পের কালে সুয়েজ অঞ্চল সর্বদাই ভারতের সঙ্গে এক সংযোগ পথ। সেই কারণে মনে হয় এই ক্ষেত্রে একবার পশ্চাত প্রক্ষেপ প্রয়োজন :

সেই ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে, জার্মান দার্শনিক লাইবনিৎস (১৬৪৬-১৭১৬) য়ুরোপীয় ও এশিয় শক্তিদের অবস্থা বিষয়ে একটি সমীক্ষা করেন। তিনি য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোনো এক প্রকার শ্রম বিভাজন পছন্দ করতেন তাই তিনি ফ্রান্সের রাজার (১৬৭২) সঙ্গে যোগাযোগ করলেন মিশরীয় অঞ্চল ক্রয় করার প্রস্তাব নিয়ে। "De expeditione Aegyptiaca···Juste dissertatio—" তাঁর পাণ্ডুলিপির সংক্ষেপিত অংশ তার বন্ধু মিনিষ্টার অব দি ইলেকটোরেট অব মেইনজ, বইনেবুর্গের কাছে পাঠান হল। কিন্তু এই সংক্ষিপ্তসার হাতে পাওয়ার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হল। এই সংক্ষেপিত অংশের Consilium

Aegytiacum নামে পরিচিত। লাইবনিৎস চেয়েছিলেন ফ্রান্সকে ভূমধ্য-সাগরে এবং ভারত মহাসাগরে য়ুরোপের মহান্ নৌ-শক্তিতে পরিণত করা এই প্রস্তাবের বশে মিশরকে অধিকার করে। এর প্রশস্ততর ভাবগত অর্থ হল এই অঞ্চলে ফরাসী রাজত্বের জাতীয়তাবাদী মনোভংগীর সদ্ব্যবহার করা আর অন্যদিকে য়ুরোপকে একটি বিশ্বজনীন রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য সমর্থন লাভ। সেকালের সন্তান লাইবনিৎস য়ুরোপের প্রাধান্য বিষয়ে সুনিশ্চিত ছিলেন—অবশ্য অনেক দিক থেকে তাঁর চিন্তাধারা ছিল সর্বজনীন। এই দার্শনিকের স্বপ্ন সারা য়ুরোপে এক ধরণের একাডেমি স্থাপনা আর এইসব বুদ্ধিজীবি ঘাঁটিগুলিকে এশিয়ায় অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করা, বিশেষ করে ভারত ও চীন দেশের সঙ্গে। তথাপি লাইবনিৎসের এই প্রকল্প একেবারে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয় যতদিন না নেপোলিয়ন তার পূর্ণ বিচার করেন।

জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থার যুগে ভারতবর্ষে জার্মানীর বাণিজ্যিক অংশ তুচ্ছ হয়ে পড়ে। একথা সত্য, যে বহু জার্মান অনেক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (অনেক ক্ষেত্রে বেশ উচ্চ পদ)। এই সব বিদেশী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে কিন্তু সেই সব জায়গায় তাঁরা মাত্র অন্য জাতিসমূহের এক চেটিয়া কারবারী প্রচেষ্টার যন্ত্র মাত্র ছিলেন।

মাত্র ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে জার্মান মালিকানার জাহাজ ভারতে যাত্রা করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার পতাকা ছিল কালো-সাদা প্রুসিয়ান পতাকা। পূর্বেকার প্রচেষ্টা ছিল অসটেনড থেকে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যথাক্রমে এমডেন ও ত্রিয়েস্তে অনুরূপ ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টা তেমন সাফল্য লাভ করেনি।

সেই সময় ব্রিটিশের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মিত্র জাতিদের জাহাজগুলি সামান্য সুবিধা দিতেন যদিও ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাকে সরকারী মর্যাদা দান করা হয়নি।

হানসিয়াটিক নগরগুলি তাদের ঐতিহ্যগত বালটিক ও নর্থ-সী অন্তর্গত দেশ-সমূহে বাণিজ্যিক পথগুলির বিস্তারের জন্য দীর্ঘকাল কোনো চেষ্টা করেনি এ কথা লক্ষ্যণীয়। ১৭৮৭-র পূর্বে হামবুর্গ-ভিত্তিক জাহাজ ভারত মহাসাগর থেকে স্বদেশে ফিরে আসেনি— তাদের পতাকা ছিল দ্বিতীয় ইমপিরিয়াল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিমধ্যে যার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। যাই হোক, অল্প বন্দর-শুল্কের জন্য হামবুর্গ অনেক ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজের চূড়ান্ত যাত্রাস্থল হয়ে উঠেছিল। ১৭৯১ থেকে ১৭৯৯ বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে এক চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে এই

শক্তিশালী বাণিজ্য কেন্দ্র। বিশেষ করে দুই প্রতিষ্ঠান ভারতীয় বাণিজ্যে সক্রিয় ছিল এই আট বছরের মধ্যে। আর একত্রিশটি নৌ-জাহাজ এশিয়া থেকে ফিরতি পথে হামবুর্গ বন্দরের ডকে ছিল। এদের নাম যোহান বেরেনবার্গ অ্যাণ্ড গস্‌লার ও প্যারিস অ্যাণ্ড কোং।

তথাপি এই তেজী বাজার স্বল্পকালস্থায়ী হল। হানসিয়াটিক নগর সমূহের বাণিজ্য নেপোলিয়ানের উচ্চাশার প্রতিরোধে ইংলণ্ড ও কন্টিনেন্টাল দেশ সমূহের প্রচেষ্টায় ভীষণভাবে ব্যহত হল; ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের পর য়ুরোপ থেকে দ্রব্যাদি বহির্ভূত করার জন্য নেপোলিয়ানের উদ্যোগের ফলে যে অর্থ নৈতিক সংকট সৃষ্টি হল তার ফলে হানসিয়াটিক বাণিজ্য একেবারে নিশ্চল হয়ে পড়ল। যদিও ভারতের সঙ্গে জার্মান বাণিজ্যিক সম্পর্ক কিছু পরিমানে উন্নত হল ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের পর, তথাপি দীর্ঘকাল তা বেশ নরম রইল। প্রকৃতপক্ষে ১৮২৬ থেকে ১৮৩৫-এর মধ্যে মাত্র দুটি জাহাজ হামবুর্গে তালিকাভুক্ত হয়।

হামবুর্গের যে সব ব্যবসায়ী অবস্থা পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনের নাম গ্লোয়ার। তিনি বার বার বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য প্রস্তাব রচনা করেছেন মাদ্রাজের সন্নিকটস্থ তৎকালীন ড্যানিস-ত্রানকুয়েবরের সঙ্গে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে (Darstellung des englischostindischen Kompagnie-und Privathandels—ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও বেসরকারি বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাণিজ্য উপস্থাপন) এবং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে (Ideen uber die Eroffnung eines Freihafens in der danisch-ostindischen Niederlassing—ড্যানিস ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসটাব্লিশমেন্টে একটি উন্মুক্ত বন্দর (ফ্রি-পোর্ট উদ্বোধনের পরিকল্পনা) তিনি হামবুর্গের সিনেটর সি, এম, সখরোডের ও জি, সি, লোরেনজ মেয়ার এই দুজনের কাছে পাঠালেন। কিন্তু তার এই চিন্তাধারা বধিরের কাছে পৌছাল।

অন্যদিকে প্রাশিয়ায় ভারতীয় বাণিজ্য ব্যবস্থার একটা নতুন আগ্রহ সৃষ্টি হল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে 'মেনটর' নামক বাণিজ্যিক জাহাজকে Preussische See Handlungs Geselischaft নামক প্রতিষ্ঠান বিশ্ব পরিক্রমার জন্য সমুদ্র যাত্রায় পাঠানো হল। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮২০ খৃষ্টাব্দ থেকে একটি স্বতন্ত্র ব্যাঙ্কিং ও মার্চাণ্ট হাউস হিসাবে সক্রিয় ছিল। Prinzessin Louise নামক আরেকটি জাহাজ ১৮২৫ থেকে ১৮২৯ এর মধ্যে যাত্রা করেছিল, উভয় জাহাজই ভারতীয় বন্দরগুলিতে নোঙর করেছিল। ফন রোদার এই কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট তিনি

জে, সি, এইচ, ডব্লু অসওয়ালড নামক একজনকে এই সমুদ্র যাত্রার কালে দায়িত্বভার দিলেন। ১৮৩১-এ হামবুর্গে অবস্থান করে ভিলহেলম অসওয়ালড ইংরেজীভাবাপন্ন হয়ে আত্ম পরিচয় দিতে লাগলেন উইলিয়াম অসওয়ালড এই নামে। ফন রোদার যে সব সমুদ্রযাত্রা তাঁর প্রেরণায় ঘটেছিল তার জন্য বেশী কৃতিত্ব দাবী করলেন। তিনি বলতে লাগলেন জার্মান পতাকাবাহী-জাহাজ হিসাবে এই সর্বপ্রথম বিশ্ব পরিক্রমা। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ইমপিরিয়াল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যিক জাহাজ "কোবেনৎসেলকে অনুরূপ সমুদ্র যাত্রায় পাঠালেন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম জার্মান বাণিজ্যিক প্রতিনিধিত্ব স্থাপিত হল। হেসের এ, এচ, হুস্থকে বোম্বাই শহরে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। সেখানে তিনি একযোগে হানসিআটিক অ্যাণ্ড ফ্রি সিটি অব হামবুর্গের কনসাল হিসাবেও কাজ করলেন। দ্বিতীয় হামবুর্গ কনসুলেট সেই বছরই কলিকাতায় উদ্বোধন করা হল—সেখানকার জার্মান প্রতিনিধিদের নেতৃত্বভার ছিল টি, এচ, ভ্যাটেনবাখের ওপর।

আশ্চর্যের বিষয়, জার্মান রাজন্যবর্গের হ্যানোভার বংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল গ্রেট ব্রিটেনের কিন্তু তাঁরা ভারতের সঙ্গে কনস্যুলার সম্পর্ক স্থাপন করলেন অনেক পরে। প্রথম হ্যানোভারীয় কনস্যুলেট ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম উদ্বোধন করা হল, আরাকানে (বর্মার) অঞ্চলের আকিয়াবে। দ্বিতীয়টি খোলা হল ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে কলিকাতায় এবং তৃতীয় ও সর্বশেষটি খোলা হল ১৮৬১তে করাচী শহরে। ব্রেমেনের হানসিয়াটিক পোর্ট-এর কলিকাতায় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দেও একটি কনস্যুলেট ছিল—১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে অপর একটি খোলা হল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের পর বোম্বাই শহরের ব্রেমেন কনসাল হামবুর্গ, ওলডেনবার্গ ও অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যেরও প্রতিনিধিত্ব করলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে স্যাকসনীর প্রথম কনসাল বোম্বাই শহরে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল ওটো ম্যলার। তিনি সেই একটি সময়ে "Directeur du Comptior d'Escompte de Paris et Charge par interim du Vice-consulat de France" হিসাবেও কাজ করেছেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দেই প্রাসিয়ার রাষ্ট্র কনস্যুলেট স্থাপনের কথা চিন্তা করেছেন—কিন্তু প্রথম দুটি কনস্যুলেট বোম্বাই ও কলিকাতায় মাত্র ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে খোলা

হল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে নয়া জার্মান রাইখের প্রতিনিধি হলেন ইমপিরিয়াল জার্মান কনস্যুলেটস; কিছুকাল পরে এই সংখ্যা তিনটিতে সীমিত করা হল—কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর (ঘটনার অনুমানে) কলিকাতায় একটি জার্মান কনস্যুলেট জেনারেলের অফিস ১৯২২-এর জানুয়ারী মাসে খোলা হল, ১৯২৮-এ অপর একটি বোম্বাই শহরে এবং ১৯৩৬-এ তৃতীয়টি মাদ্রাজে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রথম জার্মান কনস্যুলেট জেনারেল ১২ই মে ১৯৫১ তারিখে বোম্বাই শহরে প্রতিষ্ঠা করা হল। কলিকাতা (২০-৬-৫৪ কনস্যুলেট পরে ২৪-৯-৫৪ তারিখে কনস্যুলেট জেনারেলে রূপান্তরিত) এবং মাদ্রাজে (১৫-১১-৫৪—কনস্যুলেট হিসাবে ৩০-১১-৬৪ তারিখে কনস্যুলেট জেনারেল রূপান্তরিত) ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল নয়াদিল্লীতে জার্মান এমব্যাসী খোলা হয়।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে যখন বিদেশী বাণিজ্যিক জাতিসমূহ ব্রিটিশের সঙ্গে সম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল তখন ভারতের সঙ্গে জার্মান বাণিজ্য সামান্য প্রেরণা লাভ করল। পরবর্তী বৎসরে, ভারত থেকে দুটি জাহাজ হামবুর্গে এসে নোঙর করল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়ে গেল ১৪টিতে এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তা ২৮শে পৌছাল। ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান অঞ্চল থেকে আমদানির পরিমান ১৮৪৮-এ ৩০০,৯২০ থেকে বেড়ে ১২৬ মিলিয়নে পৌছালো, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এবং ৬'৩৯ মিলিয়নে পৌছাল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সে বছরটি একটি চিহ্নিত বৎসর কারণ এই বছরের চেয়ে বেশ কয়েক বছর অবস্থার অধিকতর উন্নতি করা যায়নি। অপ্রত্যাশিতভাবে নয়, হামবুর্গের জাহাজওলাদের একটি কারখানা ভ্যাখসমুথ অ্যাণ্ড কোরগমান ভারতাভিমুখে একটি নিয়মিত বাণিজ্যিক পথ ১৮৬০-র গোড়ায় খুললেন—উত্তর য়ুরোপে হামবুর্গ সর্বশ্রেষ্ঠ গুদাম ও মালওঠানোর কেন্দ্রে পরিণত করা হল ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মাল চালনার জন্য। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে হানসিআটিক সিটি সিংহলের পয়েণ্ট দ্য গ্যলে একটি কনস্যুলেট খুললেন। সেই কনস্যুলেট দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশেরও কর্মভার গ্রহণ করল।

কিন্তু এশিয়া বাণিজ্যের সুযোগ যে হামবুর্গ গ্রহণ করল তা নয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর সিটি অব ব্রি মেন Anna und Elise নামক একটি জাহাজকে প্রথম ইষ্ট-এশিয় বাণিজ্য যাত্রায় পাঠালেন স্যাকসোনিয়ান ও ওয়েষ্ট ফ্যালিয়ান ধাতব দ্রব্যাদি এবং বস্ত্রাদির জন্য নতুন বাজারের সন্ধানে।

"Liepziger Zeitung" নামক সংবাদপত্রের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৫ তারিখে একটি সংবাদ প্রকাশিত হল—"ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও চায়নার সঙ্গে বাণিজ্য" প্রসঙ্গে। এই রিপোর্টে বলা হল "আম্না এবং এলসি" জাহাজের যাত্রার ফলে জার্মান মালপত্রের বাজার সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া গেছে। এখন শোনা যাচ্ছে কলিকাতা ও বোম্বাই শহরের বাজারের অবস্থাও নিরীক্ষা করা হবে। এই প্রস্তাব অচিরেই কার্য্যকরী করা হল।

প্রায় ঠিক সেই সময়েই ত্রিয়েস্ত ষ্টক মার্কেট কমিশন ইষ্ট-এশিয়ায় একজন বাণিজ্যিক বিশেষজ্ঞ পাঠালেন। এই দূত, পি, এরিথসেন ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী ম্যাকাও থেকে স্বদেশে একটি রিপোর্ট পাঠালেন। তিনি সুপারিশ করলেন ত্রিয়েস্ত থেকে আলেকজান্দ্রিয়া (তখন অষ্ট্রিয়ান) একটা সিপিং লাইন বা জাহাজী পথ খোলা হোক–সেইভাবে একটি স্থল এবং সামুদ্রিক সংযোগ অষ্ট্রিয়ান বাণিজ্যিক ব্যবসায়গুলির জন্য ভারতও ইষ্ট-এশিয়ায় একটি বাণিজ্যিক পথ খুলে দেবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সুয়েজ ক্যানাল নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হল এবং এশিয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাপারে একটা উঁচু ভাব দেখা গেল। বিশেষ করে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ভারত বিষয়ে জার্মান বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি একটা বর্ধিত আগ্রহ দেখাতে লাগলেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে একটি আইন দ্বারা সকল রকম শুল্ক ব্যবস্থা লোপ করে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাম্রাজ্যে অবাধ বাণিজ্য চালু করা হল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সর্বপ্রথম একটি জার্মান ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হল। এই ব্যাঙ্কটির নাম জার্মান এশিয়াটিক ব্যাঙ্ক। বার্লিনে ও সাংহাইতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মুখ্যতঃ জার্মান-চাইনিজ ব্যবসায়িক মূলধনের সুবিধার জন্য এই ব্যাঙ্ক খোলা হয়। এই সময় হায়দ্রাবাদের নিজামের মন্ত্রী সাহাবুদ্দিন জার্মান বিসমার্ক রাইখের আদর্শে একটি ভারতীয় ফেডারেশন গঠনের জন্য উদ্যোগী হলেন। তিনি নিজেই ইতালীয়ান পণ্ডিত এনজেলো দ্য গুবারণাতিসিকে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে ছিলেন ("Viaggio nell" India Centraee, Firenze 1886)।

জার্মান জাহাজ মালিকগণও ভারতবর্ষ আবিষ্কার করলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হানসা লাইন ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে নিয়মিত ইষ্ট-এশিয়া সার্ভিস খুললেন।

বেশ কিছু সংখ্যক জার্মানও ভারতের স্বার্থে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করলেন। যেমন প্রথম ইনসপেকটার জেনারেল অব ফরেষ্টস প্রফেসর (পরে স্যার) ডিয়েট্রিখ ব্রানডিস এবং তার উত্তরাধিকারী সুখলিখ্ ও রিবেনট্রপ। জেনারেল

স্যার উইলিয়াম লকহার্ট ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানালেন কাপ্তেন ক্রেডনার-কে, তিনি প্রুসিয়ান ফুট রেজিমেন্টের কর্মী ছিলেন। তাঁকে বলা হল ওরকাজাই ও আফ্রিদিদের বিরুদ্ধে অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে, এর মধ্যে একটা বোঝাপড়া এবং সম্মতির পরিচয় পাওয়া গেল, কিন্তু অপর দিকে মাটির তলায় অর্থনৈতিক ঈর্ষা এবং রাজনৈতিক হিংসা আন্তর্জাতিক সুসম্পর্কের ব্যাপারে ঘুন ধরিয়ে দিচ্ছিল।

সেই সব কালে যখনও পর্যন্ত হাজার হাজার যাত্রী ভারতের উপকূলে ভীড় জমান নি তখন কিছু সংখ্যক যাত্রী বেশ সাড়া জাগিয়ে তুললেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় লেখক ওটো এহলার্স ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বেশ বিলম্বিত অবস্থানের উদ্দেশ্যে উত্তর ভারতে এলেন এবং ব্রিটিশকর্তৃপক্ষ তাঁকে মহাসমারোহে ও সৌজন্যের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। ভাইসরয় লর্ড ল্যানসডাউন তাঁকে সিমলায় আমন্ত্রণ করলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইন্দো-চীন ভ্রমণ বিষয়ক একটি রিপোর্ট এহলার্স লর্ড ল্যানসডাউনকে পাঠালেন, সেই রিপোর্ট বড়লাটের প্রশাসন কর্তৃক পুর্ণমুদ্রিত হল।

১৯০১-এর অক্টোবর মাসে লর্ড হ্যানডেন জার্মান বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বীতার ব্যাপারে ক্রম বর্ধমান ব্রিটিশ উদ্বেগের কথা উল্লেখ করলেন। বাগদাদ রেলওয়ে প্রকল্পের ব্যাপার ব্রিটিশ এবং জার্মানদের ভিতরকার রাজনৈতিক সংঘাতকে প্রকাশ্যে এনে দিল কিন্তু উভয় দেশের মনের পশ্চাদপটে ছিল ভারতবর্ষ। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ থেকে নেপোলিয়ান যখন ভারতের বিরুদ্ধে একটা বিরাট অভিযান করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অতি সত্বর বাগদাদে একজন রেসিডেন্ট পাঠালেন। মেসোপটোমিয়ায় কোনোরকম রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক ব্যাপারের কোনোরকম ইঙ্গিত পেলেই ব্রিটিশদের অন্তরে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হত (মেসোপটোমিয়া কিন্তু তখনও ওটোমন সাম্রাজ্যের একটা অংশ)। বাগদাদ রেলওয়ে লাইন নির্মাণের ব্যাপারে যে সুযোগ দেওয়া হয় সেটি অনুরূপ একটি কারণ। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কনস্তানটিনোপলে কাইজারের দ্বিতীয়বার ভ্রমণ কালে এই বিষয়ে কথাবার্তা হয়। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ এখনও কিভাবে ব্রিটিশ ইতিহাস গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হয়। এই রকম একটি দৃষ্টান্ত হল তরুণ ঐতিহাসিক রবীন্দ্র কুমার তাঁর ডক্টরেট থীসিসের জন্য যে গ্রন্থটি পেশ করেন তার মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় মনোভংগী এবং ব্রিটিশ স্বার্থের কথা আলোচিত হয়েছে। ১৮৯৯

খৃষ্টাব্দে জার্মানী প্রস্তাব করেছিল বাগদাদ লাইনটিকে একটা আন্তর্জাতিক প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করতে। এই কারণে, ফ্রেঞ্চ শিল্পপতিরা জার্মান-তুর্কী উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, এখন ব্রিটেন ইতঃস্তত: করছে, তারপর সুরু হল বিতর্ক এবং পরিশেষে ব্রিটেন একটি আন্তর্জাতিক প্রকল্পের যুক্তি প্রায় মেনে নিতে বসেছিল। রাশিয়ানরা স্পষ্টত:ই বিরোধী ছিল। অথচ কাউণ্ট ভ্লাদিমির কাপনিষ্ট নামক জনৈক রাশিয়ানই সর্বপ্রথম একটি রেলওয়ে লাইনের পরিকল্পনা নিয়ে তুর্কীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন—এই পথটি সিরিয়ান পোর্ট থেকে কুয়েত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। সেই কালে এর ফলে ব্রিটেন ও কুয়েত এর সঙ্গে একটা গোপন চুক্তি সম্পাদিত হল। বাগদাদ লাইন যা ১৯৪০ পর্যন্ত নির্মিত হয়নি—য়ুরোপীয় ভাবাবেগকে প্রায় দুই দশক কাল উত্তপ্ত রেখেছিল—একেবারে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত। এর ফলে কয়েকটি মৈত্রী গড়ে উঠ্ল এবং য়ুরোপীয় বিপর্যয়ের এটি একটি অন্যতম কারণ। যাই হোক, ব্রিটেন যে সময় শেষ লাইন পাতলেন তখন ইরাকে তার রাজনৈতিক উপস্থিতির কাল শেষ হয়ে আসছিল, যেমনটি ঘটেছে ভারতে, যে দেশের কথা আগাগোড়াই ব্রিটিশদের মনের গহনে ছিল।

রাশিয়াতে প্রতিক্রিয়া ঘটল সুস্পষ্ট ভঙ্গীতে। জার্মানভাষী পত্রিকা St. Petersburger Herold ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী রাশিয়ান সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়ায় দৃষ্টান্ত দিলেন ..

> "লেখকের মতে জার্মান কাইসারের প্রাচ্যদেশের সফরের পর আমরা আর একটুও বিলম্ব করতে পারিনা পারসিয়ার মধ্য দিয়ে রেলপথ রচনার ব্যাপারে, কারণ জার্মানদের আগে-ভাগে আমাদের পারসিয়ান গালফে পৌছতেই হবে। আমাদের রেলওয়ে ক্যাসপিয়ান সী থেকে তেহেরান যাবে। ইস্ফাহান, ইয়েসড, কিরমান, বামপুর এবং সেখান থেকে পারসিয়ান বেলুচিস্তানে; সেখান থেকে একটি শাখা লাইন পারসিয়ান গালফে যেতে পারে। পারসিয়া বা মেসেপটোমিয়াতে রাশিয়া ব্যতীত আর কারও প্রভাব থাকা ঠিক নয়···বর্তমানে, রাশিয়া ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধরত নয় কিংবা রাশিয়া ব্রিটিশ আধিপত্য খুন্ন করার জন্য ভারত আক্রমনও চায় না। কিন্তু এই অবস্থায় পরিবর্তন ঘটতে পারে যদি

রাশিয়ার স্বাভাবিক বিস্তার ব্রিটিশ বাধা দেয়—বৃহৎ এবং শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে যাতে তার পূর্ণ অধিকার বর্তমান।"

প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও ঈর্ষার এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় মানবিকতার একটি সামান্য মন্তব্য প্রকাশ করি! ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে ভারতীয় দুর্ভিক্ষের জন্য যখন ভিলহেলম (২) অর্ধ-মিলিয়ান মার্কের মত অর্থ দান করলেন তখন ভারতে প্রশংসার তরঙ্গ প্রবাহিত হল। ভারতীয় সংবাদপত্রও এই ভঙ্গীর অনুমোদনে পঞ্চমুখ হলেন।

অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীর যুদ্ধজাহাজ Aspern ও জার্মান যুদ্ধজাহাজ Thetis ১৯০২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষদিকে কলিকাতায় এল তখন সেটিকে সামরিক নয় সামাজিক ঘটনা বলেই গ্রহণ করা হল।

সামান্য কালের জন্য রাজনৈতিক মেঘ ১৯০৩-এর দিল্লী দরবারের জাঁক-জমক এবং পরিস্থিতির জন্য চাপা পড়ে গেল, সেইখানে সপ্তম এডওয়ার্ড কাইসার-ই-হিন্দ হিসাবে অভিষিক্ত হলেন। এই উৎসবে কাইসারের প্রতিনিধি ছিলেন হেসের গ্রাণ্ড ডিউক লুডভিগ। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ৩ই জুনের বাজেটে এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত পার্লামেণ্টারি মেমোরাণ্ডামে যেখানে সপ্তম এডওয়ার্ডের করোনেশনের ঘোষণা বিধৃত হয়েছে সেখানেও তিনিই একমাত্র অতিথি যাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে—রাজপরিবারের তিনিই একজন মাত্র সদস্য। তথাপি ভাইসরয় লর্ড কারজন যে ব্যানকুয়েট বা মহাভোজ দান করেন সেখানেও গ্রাণ্ড ডিউককে কুইন ভিকটোরিয়ার দৌহিত্র এবং একজন রাজপদে অধিষ্ঠিত রাজকুমার হিসাবে সম্মানিত হলেন।

ইতিমধ্যে বাণিজ্য ব্যবস্থা একটা নতুন ধরণের বাজার সৃষ্টি করল। কয়েক মিলিয়ন মার্কের মোট বাণিজ্যের ব্যাপার থেকে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া থেকে জার্মানীতে মাল আমদানির ব্যাপারে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ শতাব্দীর শেষে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠল (১৯০২ : ২১৪.৫ মিলিয়ন মার্ক ; ১৯০৩ : ২৫৩.২ মিলিয়ন মার্ক)। অপর দিকে ভারতে জার্মান মাল রপ্তানি তখনও অনেক পিছনে পড়ে রইল (১৯০২ : ৫৭.৪ মিলিয়ন মার্ক ; ১৯০৩ : .৭৬ মিলিয়ন মার্ক)।

সংক্ষিপ্ত হলেও সপ্রশংস প্রতিধ্বনি উঠল যখন জার্মান সাংবাদিকবৃন্দ সফরে এলেন। ডব্লু. টি. ষ্টেড ছিলেন Review of Reviews পত্রিকার সম্পাদক। এই সফরকে অভিনন্দিত করলেন। তিনি বললেন এই আদর্শে ব্রিটিশ সাংবাদিকদের

ভারতে পাঠানো হলে ভালো হয়। এই প্রস্তাব শুনে রক্ষণশীল ব্রিটিশ সংবাদপত্র The Englishman প্রস্তাব করলেন (১লা অক্টোবর ১৯০৬) ষ্টেডকে ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট মনোনয়ন করা হোক। ভারতীয় প্রতিক্রিয়া অতিশয় অনুকূল।

এই গ্রন্থের অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে, জার্মান ক্রাউন প্রিন্স ১৯১০ এর শেষ দিকে ভারতে এলেন। তাঁর তিনমাসব্যাপী সফরের কালে তিনি সমগ্র দেশের চারদিকে বেড়ালেন—দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত।* অন্যান্য স্থানের সঙ্গে হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই, দিল্লী, জয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলে কাইজার তনয় ব্রিটিশ ও ভারতীয় গৃহকর্তাদের কাছে মহাসম্মানে অভ্যর্থিত হলেন। লক্ষ্ণৌ থেকে কলিকাতা যাত্রার কালে ১৯১১-র ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁর পিতাকে লিখিত একটি পত্রে তিনি লিখলেন :

> "আমি ভারতবর্ষে যত কিছু দেখ্‌লাম তার মধ্যে আফগানিস্তান সীমানার এই সীমান্ত প্রদেশ আমার কাছে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার করেছে। রায়লপিণ্ডি আর পেশাওয়ার দুটি সুবৃহৎ ব্রিটিশ সৈন্য ঘাঁটি—এরা সীমান্ত অঞ্চলের প্রহরী সৈন্য সরবরাহ করে। পেশওয়ার এশিয়ায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, খাইবারের মুখে মেরুদণ্ড বিশেষ। এই প্রদেশের লাটসাহেব স্যার জর্জ রস-ক্যামবেল। এই দেশে আমি এ পর্যন্ত যাঁদের দেখেছি তাঁদের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব। প্রায় কুড়ি বছরকাল তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই সীমান্তে নির্জন পরিবেশে কাটাচ্ছেন; তাঁকে অজস্র অভিযান ও সংঘর্ষে সামিল হতে হয়েছে আফগান ও আফ্রিদিদের বিরুদ্ধে। তাঁর নিজের দেশবাসী এবং বন্য-পার্বত্য-জাতি উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই তিনি শ্রদ্ধেয় এবং ভীতির পাত্র। আমি অতি দ্রুত তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হলাম। তিনি আমাকে ভারতের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে অনেক কথা শোনালেন এবং অন্য অনেকের চেয়ে বেশী করে তিনি আমাকে বিভিন্ন ধর্ম এবং উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য বিষয়ে অবহিত করলেন।
>
> দিল্লী থেকে কাউণ্ট দোহ্‌না, আমার বন্ধু ফিনকেনষ্টাইন, ডাঃ ভাইডেনমান এবং আমি স্যার জন হিউয়েটের সঙ্গে মির্জাপুরে

* অষ্ট্রিয়ান সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্চডিউক ফার্ডিন্যাণ্ড ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন।

শিবিরে গেলাম। এই পূর্ণাঙ্গ শিবির-জীবনে আমরা এক সপ্তাহ কাটালাম, চারটি বাঘ দুটি চিতা, একটি শূকর, একটি নীল গাই এবং অজস্র পক্ষী শিকার করেছি।

দেশীয় লোকদের জীবনধারা খুব কাছ থেকে দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। ভারতবর্ষে যত বেশী সফর করা যায় ততই দেশীয় লোকজনদের দেখে বিস্মিত হতে হয়। এই সমস্যার চাবি-কাঠি হয়ত কোনোদিন কোনো য়ুরোপীয় ব্যক্তির হাতে পড়বেনা।

আমি শিক্ষিত শ্রেণীর শিক্ষিত দেশীয় ব্যক্তিদের সাগ্রহে দেখেছি। অনেক এই জাতীয় তরুণ-তরুণী ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত—তারা য়ুরোপীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত এবং ইংলণ্ডের আদরে তারা নষ্ট হয়ে গেছে। তারা যখন স্বদেশে ফিরে আসে তখন আর কিছুতেই স্বস্তি পায় না···

ব্রিটিশরা তাদের সহযোগী ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে পোলো খেলে তবে অন্য কোনো রকম যোগাযোগ নেই বললেই চলে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এই হল নরম জায়গা। কি ভাবে এই সমস্যা সমাধান করা যায় তা কেউই আজ পর্যন্ত স্থির করতে পারেনি। তবে আমি একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। একদিন একটি ভারতীয় রেজিমেণ্টের দেশীয় অফিসারবৃন্দকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল—চমৎকার দেখতে, বেশ সুদক্ষ কর্মীদল। কিন্তু আমাকে তাঁদের সঙ্গে করমর্দন করতে দেওয়া হলনা, শুধু তাঁদের তরবারির খাপ স্পর্শ করলাম, তাঁরা সেইগুলি এগিয়ে দিয়েছিলেন।

এলাহাবাদে একটি বর্মী রাজপুত্রী আমার কাছে একমাত্র আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। তিনি তাঁর জাতীয় পোষাক পরেছিলেন, সে পোষাক জাপানীদের পোষাকের খুব কাছাকাছি। আমাদের মধ্যে বেশ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠ্‌ল। তাঁর পিতা বর্মার রাজার ভ্রাতা। এই রাজাকে ব্রিটিশরা সিংহাসনচ্যুত করেন। এই মেয়েগুলিকে স্বদেশে ফিরে যেতে দেওয়া হয় না। তারা এলাহাবাদে অমানুষিক জীবন যাপন করছে।

যমুনা ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমে হিন্দুদের স্নানক্ষেত্র দেখতে গেলাম একদিন প্রাতে। এই যাত্রাটি গোপনে যেতে হয়েছিল কারণ এই যাত্রা

নাকি বিপজ্জনক এবং আমাকে অনুমতি দিতে রাজী করানো যাচ্ছিল না। এই যাত্রার জন্য আমি ভারতীয় জীবনের এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি আহরণ করেছি, সেই সঙ্গে পেয়েছি কয়েকটি চমৎকার ফটোগ্রাফ।"

ক্রাউন প্রিন্সের ভারত ভ্রমণ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং এতদ্বারা সাধারণভাবে একটা অনুকূল মনোভংগী সৃষ্টি হয়।

ইতিমধ্যে জার্মানদের গোচরে আরেক ভারতবর্ষ এল, যার মধ্যে ব্রিটিশ-রাজের কোন ছাপ নেই। Leipziger Nachrichten পত্রিকার ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে জাতীয়তাবাদের জনৈক বেনামী প্রবক্তা নিম্ন-মন্তব্য করলেন :

> জার্মানী, মিশর, পারস্য, ভারত ও চীন প্রভৃতি দেশে তার উদ্যোগ প্রসারিত করে সুনিশ্চিত ফল লাভ করতে পারেন। সেই উদ্যোগ যত বৃহৎ হবে ততই তা সকল দলের পক্ষে কল্যাণকর হবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় ভারতে জার্মানরা যত কারখানা স্থাপন করেছেন তার ফলে তাঁরা অজস্র মিত্রলাভ করবেন। সাধারণভাবে এশিয়া এবং বিশেষভাবে ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। এই সমস্তই উৎসাহী ও উদ্যোগী জার্মানদের দ্বারা স্বর্ণে রূপান্তরিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

পুনরায় বাণিজ্যিক বিষয়টিতে ব্রিটিশরা কড়া নজরে রাখলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে চেম্পকরমন পিল্লাই জ্যুরিখে Pro India নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ একই নামের একটি সমিতির এটি মুখপত্র। প্রথম সংখ্যায় প্রফেসর পল দেউসেনের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। প্রবন্ধটির নাম "Our Brother in the East" ইন্দো-জার্মান গোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা ও দর্শনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতি তিনি বিশেষ জোর দিলেন।

ইতিমধ্যে আর্চডিউক অব ফার্ডিন্যাণ্ডের হত্যা ব্যাপারে য়ুরোপে যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। সারা পৃথিবীতে এর কঠোর প্রতিক্রিয়া হল। এদিকে বার্লিন প্রবাসী জনৈক ভারতীয় এ, রমন পিল্লাই একটি গ্রন্থ লিখলেন—"Germany India's Hope" এবং Westermanns Monatshefte (ওয়েষ্টারমানের মাসিক পত্র) নামক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখলেন তার মধ্যে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে জার্মানীর সমর্থন প্রার্থনা করা হল। তার শিরোনাম ছিল—India and the European Crisis। ২৯শে অক্টোবর ১৯১৪ তারিখে

কলিকাতায় The Englishman পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হল আহমেদ-নগরের কাছে জার্মান অসামরিক ব্যক্তি ও যুদ্ধবন্দীদের রাখা হয়েছে এবং জার্মান যুদ্ধজাহাজ "এমডেনে"র ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে অভিযোগ করা হল। এই পত্রিকায় বলা হল এই যুদ্ধজাহাজ ভারত মহাসাগরে ব্রিটিশ বাণিজ্যকে ব্যাহত করছে। পরবর্তী বৎসরে কলিকাতার সাময়িকপত্র Capital (১১ই মার্চ ১৯:৫) বিবেচনা করলেন যে জার্মান-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যদি নির্মমভাবে ধ্বংস করা যায় তাহলে ভারতের উদ্বৃত্ত কাঁচা মালের কি হবে?

প্রায় সেই কালেই ব্রিটিশরা হেঁয়ালিমূলক আফগান কাণ্ডকারখানায় বিশেষ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। লোভাই ফ্রেজার ছিলেন Times of India পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক। তিনি Daily Mail পত্রিকায় যে জার্মান এজেন্ট ডাঃ পুগিন পারসিয়া হয়ে আফগানিস্থানে গমনের চেষ্টা বিফল হওয়ার পর তিনি কাবুলে জার্মানদের কোনো সুবিধা হবে মনে করেন না।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে অনেকগুলি সংবাদপত্র (Pester Lloyd, Neue Zurcher Nachrichten এবং অন্যান্য) ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল পার্টির কার্যকরী সমিতি, পাশ্চাত্য দেশ সমূহে ভারতীদের ওপর ব্রিটিশ আধিপত্যের বিপক্ষে একটি ইস্তেহার প্রকাশ করলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট এই সমিতি—এর নাম ছিল Indian Independence Committee—জার্মান যুদ্ধ প্রচেষ্টার সমর্থনে একটি জাতীয় সেচ্ছাবাহিনী গঠনের প্রস্তাব করলেন। যাই হোক, জার্মান কর্তৃপক্ষদের এই বিষয়ে সতর্ক প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। তাঁরা বললেন এশিয়ায় জার্মানীর মিত্রদেশ তুর্কীদের সঙ্গে পরামর্শ প্রয়োজন। কতক-গুলি পত্রিকা (যথা: Konigsberger Hartungsche Zeitung—১৯শে আগস্ট) এই Indian Independence Committee বিষয়ে বিশেষভাবে অতিরঞ্জিত করে বললেন যে এই ঘোষণার অর্থ গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ ঘোষণা। ২১শে আগস্ট তারিখের লণ্ডনের Times পত্রিকা এইসব সংবাদ পত্রের রিপোর্টের প্রতি তীব্র আক্রমণ করলেন এবং তাঁরা জার্মান প্ররোচিত ভারতীয় নৈরাজ্যবাদের কথা উল্লেখ করলেম।

প্রথম দিকে এই সংগঠনটি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি গুপ্ত সমিতির মত ছিল। তারপর যখন এর অস্তিত্ব আর গোপন রইল না—তখন এর নাম পরিবর্তন করে করা হল—Indian Nationalist Committee European Centre।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জার্মানী ভারতীয় বিদ্রোহে প্রেরণা দিয়েছে এই অভিযোগ প্রসঙ্গত প্রত্যাখ্যান করেছেন হেনরী মেয়ার্স হাইণ্ডম্যান তাঁর The Awakening of Asia নামক গ্রন্থে। হাইণ্ডম্যান ইংলণ্ডে কার্ল মার্কসের প্রধান শিষ্য এবং তাঁর নিজস্ব কিছু কম্যুনিষ্ট ভাবনা ছিল। যাইহোক, তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে (যা মহাযুদ্ধের অবসানের পূর্বেই ঘটেছিল) হাইণ্ডম্যান তাঁর মতবাদ পরিবর্তিত করেন এবং তাঁর কম্যুনিষ্ট অনুগামীদের তীব্র জাতীয়তাবাদী অভীপ্সাসম্পন্ন একটি নতুন পার্টিতে সামিল করার চেষ্টা করেন, এই পার্টির নামকরণ করা হয় "National Socialist Party" যে নাম পরে টেমস থেকে ইসার নদীতে আমদানী করা হয়।

ইতিমধ্যে, প্রথম ব্রিটিশ ও ভারতীয় যুদ্ধবন্দী রুলেবেন ক্যাম্পে এসে প্রবেশ করলেন, প্রথম মহাযুদ্ধের কাহিনীতে এই ব্যাপারটির গুরুত্ব কিছু কম নয়।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারীর দিকে প্রফেসর মৌলানা বরকতুল্লা-কে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সানফ্রানসিসকোর রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় ভারতীয়গণ জার্মানীতে পাঠালেন, এইখানে দয়ালের অধীনে গদর (বিপ্লবী) দল গঠিত হয়েছিল। বরকতুল্লা বলেছিলেন তিনি আফগানের আমীরের একজন বন্ধু, এবং কাবুলের একমাত্র পত্রিকা "সিরাজ-উল-আখবর" পত্রিকার সম্পাদক। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখের জার্মান ফরেন অফিসের একটি গোপন দলিলে এই কথা বলা হয়েছে:

> "প্রফেসর বরকতুল্লা এবং মিঃ চট্টোপাধ্যায় এই রিপোর্ট দিয়েছেন যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীগণ, (যাঁরা অচিরে কাবুলে আছেন স্থির করেছেন) তাঁদের কর্তব্য পালনে মতিস্থির করেছেন; পারসীয়ান জাতীয়তাবাদীদের সহায়তায় এই দল কাবুলে পৌছাবেন এবং সেইখান থেকে তাঁরা পাঞ্জাবে প্রবেশ করবেন। প্রফেসর বরকতুল্লা, আফগানিস্তানের আমিরের ও তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে উত্তম সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন অনেক কাল ধরে তিনিই এই দলের নেতৃত্ব করবেন।"

প্রায় এই সময় থেকেই কুমার মহেন্দ্র প্রতাপের নাম ফাইলে প্রবেশ করে। তিনি উচ্চবংশীয় ভারতীয় হাথরাসের পুত্র—ব্রিটিশরা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং তিনি মহারাজ মুরসনের দত্তক পুত্র, এবং কয়েকজন পাঞ্জাবী শিখ রাজন্যবর্গের তিনি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে আমি নয়াদিল্লীতে মহেন্দ্র প্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তখন তিনি বৃন্দাবন থেকে পার্লামেন্টের সদস্য

নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁকে বেশ শান্ত অথচ দৃঢ়চিত্ত মানুষ বলে মনে হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে জার্মানীতে নির্বাসিত রাজনীতি-বিদগণের মধ্যে তিনি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি সুইজারল্যাণ্ড থেকে বার্লিনে এসে উপস্থিত হন তখন তাঁর নাম মহম্মদ পীর, তিনি ভারতকে সাহায্য করার জন্য জার্মানীর হয়ে কাজ করার বাসনা প্রকাশ করেন এবং দ্বিতীয় ভিলহেলম একটি গোপন সাক্ষাৎকারে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। সেই বছর ১০ই এপ্রিল তারিখে প্রতাপ এক দুঃসাহসিক অভিযানে আফগানিস্তানে গেলেন, তার সঙ্গে রইলেন মৌলানা বরকতুল্লা। লিগেশ্যন সেক্রেটারি ওটো ভেরণার ফন হেনটিগ এবং একটি ক্ষুদ্র কর্মচারীদল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তাঁরা কাবুলে পৌছলেন। মহেন্দ্র প্রতাপ আমীর হবিবুল্লাহকে কাইজারের একটি ব্যক্তিগতপত্র দিলেন, আর ফন হেনটিগ জার্মান চ্যান্সেলার লিখিত আরেকটি পত্র তাঁকে দিলেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর মহেন্দ্র প্রতাপ কাবুল থেকে প্রথম অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠার সংবাদ ঘোষণা করলেন। আপনাকে তিনি প্রেসিডেন্ট, বরকতুল্লা হলেন প্রধানমন্ত্রী, এবং ওবেদুল্লা যিনি সবেমাত্র ভারত থেকে এসেছিলেন তাঁকে করা হল আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী। এই প্রথম ভারতীয় সরকারের অস্তিত্ব প্রায় বিস্মৃত—যদিও আফগানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে "সরকারী স্তরে" এর সংযোগ ছিল। মহেন্দ্র প্রতাপ বলেছিলেন "যখন আমাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা ইতিহাসে বিধৃত হবে তখন আমাদের এই অস্থায়ী সরকারের পরিচ্ছদটি নিশ্চয়ই বিবেচিত হবে।" এখানে উল্লেখ করা যায় যে ২৪শে নভেম্বর তারিখের Times-এ একটি ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনে মহেন্দ্র প্রতাপের খোঁজ খবর সন্ধান করা হয়।

রাশিয়া থেকে ফেরার পর প্রতাপ জার্মানদের একটি আন্তর্জাতিক সেনাদল গঠনে আগ্রহী করার প্রয়াস করেন। এই সেনাদল তাঁদের মিত্র রাষ্ট্র এবং রাশিয়ানদের নিয়ে গঠিত হবে। এই সেনাদল ভারত ও তুর্কেস্তানকে আক্রমণ করবে। কিন্তু জার্মানরা রাশিয়ানদের মতই এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন।

এই বিদ্রোহী রাজা এক বিশ্বজনীন ধর্ম ও বিশ্ব সংগঠনের প্রস্তাব প্রচার করেন। তাঁর পত্রিকা "World Federation" পত্রিকার শিরোনামে এই কথাগুলি মুদ্রিত করতেন—

> "১৯২৯-এর সেপ্টেম্বর জার্মানীর বার্লিন শহরে প্রতিষ্ঠিত, কয়েকটি সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত। নভেম্বর ১৯৩০ থেকে

মার্চ ১৯৪২ জাপান ও চীনে প্রকাশিত হয়, তবে বেশীর ভাগ জাপানে। এখন এই পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে মাসিক পত্র হিসাবে ১৯৪৬-এর নভেম্বর মাস থেকে।"

কিন্তু আমরা ঘটনা অনুমান করেছিলাম। মহেন্দ্র প্রতাপ ছিলেন এক রোমান্টিক ব্যক্তিত্ব। তিনি স্বয়ং কাইজার প্রদত্ত Red Eagle order নামক সম্মানচিহ্ন পরে বেড়াতে ভালোবাসতেন। ১৯১৮-র এক সুন্দর এপ্রিল দিনে তিনি প্রেসিডেণ্ট অব দি প্রভিসন্যাল গভর্ণমেণ্টের পোষাক পরিধান করে মাথায় পাগড়ী এঁটে এবং অঙ্গে রেড ঈগল অর্ডার ধারণ করে বার্লিনের জনগণের কাছে ভাষণ দান করেন। Dea Tag নামক দৈনিক পত্র ৭ই এপ্রিল তারিখে ভারতীয় এই নির্বাসিত রাজনীতিবিদের "সরকারি আলোকচিত্র" প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে কাইজার এবং কম্যুনিষ্ট উভয় পক্ষেরই তিনি মিত্র আবার সেই সঙ্গে তিনি "মানব সমাজের দাস"।

এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আভ্যন্তরীণ সংহতি বিশিষ্ট এক অবিভক্ত ভারত। এর ফলে, তিনি বার্লিন ইণ্ডিয়ান কমিটির একটি অনুরোধ জার্মান ফরেন অফিসে পাঠালেন। এই অনুরোধ হল "রেভোল্যুসনারী মুসলিম ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়টস্ লীগ" "হেনহেক্" বা সংক্ষেপে "হু" প্রভৃতির যে কোনো রকম প্রস্তাব উপেক্ষা করতে। ব্যক্তিত্বের শক্তি প্রভাবে প্রতাপ এই ব্যাপারে সাফল্যলাভ করেন।

ইতিমধ্যে জার্মানী প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত হল, আর ইতিমধ্যে কয়েকটি ভারতীয় প্রদেশ ভীষণ অশান্ত হয়ে উঠ্‌ছিল। প্রাণোচ্ছল পাঞ্জাবের লাহোর আদালতে কয়েকটি বর্ধনশীল গোষ্ঠীকে রাজদ্রোহের অপরাধে কাঠগড়ায় হাজির করা হল, এঁরা সংখ্যায় প্রায় একাশীজন। মুলতান শহরে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধীদের "কালা জার্মান" বা "বাদামী জার্মান" এই নামে পরিহাস করে সম্বোধন করা হত। যাইহোক, বিচারপতিগণ, এই সব বিপ্লবীদের "দস্যু" শ্রেণীভুক্ত করলেন। হাফিজ কোর নামক উত্তর পশ্চিম সীমানায় এক অঞ্চলে মোহনন্দর ব্রিটিশ ঘাঁটি আক্রমণ করলেন হাজার-হাজার উপজাতি যোদ্ধাদের নিয়ে এদিকে বুনেরওয়াল মালান্দ্রী পাসের-কাছাকাছি রুস্তামের নিকট হামলা চালাতে লাগল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা শিখদের হৃদয় জয় করার জন্য সচেষ্ট হলেন। শেষ রাজা দিলীপ সিং-কে নির্বাসনে পাঠানোর পর তিনি সেইখানে আলেক-

অাস্ট্রিয়ার এক জার্মান ব্যবসাদারের কন্যা "বাম্‌বা"কে বিবাহ করলেন—বহু শিখ ছিলেন জার্মানদের পক্ষে। তাঁরা শুধু একা নয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর তারিখের The Times of India পত্রিকা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে তার বিবরণ প্রকাশ করলেন। তিনি তখন 'আল হিলাল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং পরে বর্তমান ভারতের শিক্ষা মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—"সম্রাটের শত্রুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ণ সম্পর্কে লিপ্ত"।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের The Manchester Guardian পত্রিকায় একটি সংবাদদাত প্রেরিত সংবাদ প্রকাশিত হল "The Kaiser as an Indian Deity" (কাইজার একজন ভারতীয় দেবতার ভূমিকায়) এই সংবাদের বক্তব্য হ'ল এই যে ছোটনাগপুরের ওঁরাওগণ সেই অঞ্চলের মালানদানাল দানবদের সমুদ্রের জলে বিতাড়ন করার জন্য "জার্মান বাবা" নামক দেবতার পূজা করছেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ আফগানিস্তান থেকে বার্লিনে ফিরে এলেন। তিনি নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফিরলেন, তার বিবরণ আমি পরে বিস্তারিত ভাবে দেব।

বহু সংখ্যক প্রখ্যাত ভারতীয় রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিক মহাযুদ্ধের কালে জার্মানীতে বসবাস করতেন, সেইখানে বসে স্বদেশের মুক্তি যুদ্ধের জন্য কাজ করার উদ্দেশ্যে। প্রখ্যাত পণ্ডিত, ডাঃ তারকনাথ দাস অপর দিকে এঁদের মত যুক্তরাষ্ট্রে ঘর বেঁধেছিলেন। জার্মানীতে সুদক্ষ রাজনীতিবিদ হিসাবেও তিনি পরিচিতি লাভ করেন পরে তিনি ইন্দো-জার্মান সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে একটি সমীক্ষা করেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই এবং হেগেলীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে যিনি আধুনিক রাজনীতির বিচার করেন সেইকালে তিনিও জার্মানীতে অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর একজন ভারতীয় সাংবাদিক ছিলেন চম্পকরমন পিল্লাই, তিনি বর্তমান কেরালার ত্রিবাঙ্কুরের অধিবাসী ছিলেন। জনৈক অষ্ট্রিয়ান মহিলাকে বিবাহ করে তিনি বার্লিন থেকে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে লিখতেন। নির্বাসিত জনৈক শিখরাজনীতিবিদ ছিলেন মাজিথার উমরাও সিং শেরগিল। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া জনৈক অষ্ট্রিয়ান মহিলাকে বিবাহ করেন। এই পরিবারের নাম গটেশমান। তিনি বুদাপেষ্টে বাস করতেন—সেইখানে তাঁর বাড়িটি ছিল

ভিয়েনা ও অষ্ট্রিয়ার এক সংমিশ্রণ। এই বিবাহের ফলে জন্মগ্রহণ করেন ভারতে প্রথমতম আধুনিক চিত্রশিল্পী অমৃত শেরগিল। জার্মানীতে ভারতীয় গোষ্ঠীর অপর একজন সদস্য হলেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন সরোজিনী নাইডুর সহোদর ভ্রাতা, সরোজিনী নাইডু আবার ছিলেন গান্ধীজীর একজন প্রমুখ শিষ্যা, এবং তাঁর রাজনৈতিক কবিতাবলীর জন্য "Indian Nightingale" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

যুদ্ধ যখন শেষ হল; বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় জার্মানীতে রয়ে গেলেন, তাঁদের মধ্যে রাজনীতিবিদ্ প্রভাকর, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এস আচার্য, এ রমণ পিল্লাই, শিবদেব সিং আলুওয়ালিয়া, ও হরদয়াল উল্লেখযোগ্য। এই শেষোক্ত ব্যক্তি সুচতুর ও কুশাগ্র বুদ্ধি নেতা ছিলেন চরমপন্থী গোষ্ঠীর, কিন্তু যুদ্ধান্তে বৃটেনের ভারতীয় নীতির সঙ্গে বোঝাপড়া করলেন।

বিপ্লবী এবং প্রচারবিদ্গণ যাঁরা ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার জন্য জার্মানীতে ঘাঁটি করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়েন এবং তাঁদের কার্যকলাপ সংক্রান্ত সংবাদাদি রহস্যজালে জড়িত। এই শ্রেণীর একজন ছিলেন ঠাকুর যেশরাজজী, তাঁর কাজ ছিল জার্মান রাষ্ট্র নেতাদের চিঠি পত্রাদি ভারতীয় রাজন্যবর্গের কাছে নিয়ে পৌছে দেওয়া। সেগুলিকে তিনি আকারে ক্ষুদ্র করে নেকটাই-এর বন্ধনীর মধ্যে গোপন করে রাখতেন। রাজা কুশলপাল সিং ও সরকারি জার্মান চিঠিপত্র যা ইংরাজীতে, হিন্দিতে ও উর্দুতে রচিত হত সেগুলি তাঁর দেহের মধ্যে গোপন করে পাচার করতেন। এই সব পত্রাদির মধ্যে বিজয় হলে জার্মান জাতির সাহায্যের প্রতিশ্রুতি থাকত। এই জাতীয় পত্রবাহকের কাজে যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি ছিল। হেলমুথ ফন গ্লাসেনাম নামক প্রখ্যাত ভারতবিদ এই সব ভারতীয় নির্বাসিতদের অনেকভাবে জার্মান সরকারি দপ্তরে যোগাযোগের সুবিধা করে দিয়েছিলেন। আনন্দবর্ধন শাস্ত্রী এই ছদ্মনামে (যে পণ্ডিত আনন্দ বর্ধন করেন) তিনি Der Neue Orient নামক পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন, এই পত্রিকা ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সেই কালে জার্মানীর ভারতীয়বৃন্দ অন্য দেশস্থ তাঁদের সমগোত্রীয় স্বদেশীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন, যেমন রাসবিহারী বসু বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতীয় ও জার্মান রাজনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গতঃ ঠাকুর উপাধিধারী আরও একজন বহুকাল জার্মানীতে ছিলেন, তাঁর নাম রাজা শ্যাম কুমার

ঠাকুর। লাইপজিগ থেকে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থের নাম "জার্মানী-কাব্য"। লেখক এই গ্রন্থটি ক্রাউন প্রিন্স ভিলহেলমকে উৎসর্গ করেন। ক্রাউন প্রিন্স ভারত ভ্রমণ করে স্বদেশে ফিরেছিলেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে Bund der Freunde Indiens (ভারতের মিত্রগণের সমিতি) বার্লিন শহরে প্রতিষ্ঠিত হল, এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল ভারত সম্পর্কিত জ্ঞান বিতরণ করা। অনেক খ্যাতনামা জার্মানও ভারতীয় এই Bund বা সমিতিতে যোগদান করেন (তাঁদের মধ্যে এ. আর. পিল্লাই, চম্পকরমন পিল্লাই, নায়েক, ভূপেন দত্ত, এ্যাডমিরাল রেকে, হেরমান ফন স্তাদেন এবং এল. ভিয়েরক উল্লেখযোগ্য)। এই সমিতি বিষয়ে তাঁরা উচ্চ আশা মনে পোষণ করতেন। এই নূতন প্রতিষ্ঠানের সর্ব প্রথম কাজ হল রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের সম্মানার্থে ১৩ই এপ্রিল ১৯১৮ তারিখে এক সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হল।

জার্মানীতে যত ভারতীয় ছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ছিলেন সর্বাপেক্ষা বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব—তাঁকে অনেক সময় "মার্কোপোলো অব দি ইষ্ট" বা প্রাচ্যের মার্কোপোলো বলা হত। আফগানিস্তান থেকে ফেরার পথে তিনি তুর্কিস্তান ও রাশিয়া ঘুরে এসেছিলেন। তাসখন্দ থেকে তিনি তুর্কিস্তানের গভর্ণর কোলজেসাউ-এর সঙ্গে মস্কো ও পিটাসবার্গ গিয়েছিলেন। যাই হোক, তাঁর বার্লিনে ফিরে যাওয়ার তাড়া ছিল কারণ জার্মানীর ভারতীয় রাজনীতি-বিদ্গণ ব্রেষ্ট লিটভসকের রুশো-জার্মান চুক্তির তৃতীয় অনুচ্ছেদ বিষয়ে অতিশয় অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তাঁদের মতে এই ধারাটি যে সব জাতীয় রাষ্ট্রীয় মর্যাদা নেই তাদের বিষয় অতি সামান্যই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ যখন পিটাসবার্গে বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় তখন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে কিছু বলতে অনুরোধ করা হয় এবং তাঁর বক্তৃতা রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন যে মন্ত্রী সভাপতিত্ব করছিলেন তিনি স্বয়ং। ভারতীয় রাজনীতিবিদ উদাত্তকণ্ঠে সেই স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন যেদিন জার্মান ও রুশগণ ভারতের মুক্তির সংগ্রামে একযোগে কাজ করবেন। প্রতাপের এই আবেগপূর্ণ কথাগুলি অন্যান্য ভারতীয় রাজনীতিবিদদের প্রভাবিত করে। রাশিয়া ও জার্মানীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ক্রমশই ভাবাবেগপূর্ণ হয়ে উঠ্ছিল। ১৯২০তে ভারতীয়গণ মনে করেছিলেন

তাঁদের পরিকল্পিত "ভাবাবেগের ত্রিকোণ" ব্যবস্থায় ভারত-রাশিয়া-জার্মানীর মৈত্রী এক সুদৃঢ় ব্যবস্থা।

কিন্তু পুনরায় রাজা মহেন্দ্র প্রতাপে ফিরে আসা যাক। জার্মান ফরেন অফিস ফাইলে তাঁর কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ তারিখে লিখিত হয়েছে—"হাতরাস ও মুসরানের ভারতীয় রাজকুমার মহেন্দ্র প্রতাপ, যাঁকে কাবুল যাত্রার প্রাক্কালে মহামান্য সম্রাট সদয় হয়ে লেগেস্যন সেক্রেটারি ফন হেনটিগ সহ অভ্যর্থনা করে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি আফগানিস্তান থেকে বার্লিনে ফিরে এসেছেন।"

এরপর রিপোর্টে লিখিত হয়েছে :

> "হের ফন হেনটিগ যখন চীনে যাত্রার জন্য কাবুল ত্যাগ করেন, কুমার তখন কাবুলে আমির হবিবুল্লা খানের রাজসভায় প্রায় এক বছর ছিলেন। এর পর তিনি প্রাচীন ঐস্লামীয় পবিত্র স্থান মেশুর-ই-সেরিফ এ বাস করেন, সেখানে কাপ্তেন নিদের-মেয়ার অবস্থানকালে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করেন। প্রথম দিকে কুমার স্থির করেছিলেন ভন হেনটিগের সঙ্গে চীন দেশে যাবেন, কিন্তু তিনি চীনের সীমানায় পৌঁছে শোনেন চীন মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যোগদান করেছে, তখন তিনি স্থির করেন রাশিয়ায় ফিরে যাবেন। রুশ তুর্কীস্তানে আফগানি রুটি বিতরণের ছল করে তিনি কোনো রকমে তাসখন্দে পৌঁছান, সেই সময় বলশেভীষ্টগণ ক্ষমতা অধিকার করেছিলেন। ষ্টকহোম শহরে অধিষ্ঠিত ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান কমিটির বার্লিনস্থ ট্রাষ্টি ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—ট্রটস্কির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হন এবং তাঁকে ভারতীয় আন্দোলনে গভীর আগ্রহ প্রদর্শনে উৎসহিত করেন। ট্রটসকি নাকি ভারতীয় এই জাতীয়তাবাদীকে তাঁর সামর্থ্যমত সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করেন। মহেন্দ্র প্রতাপ তাঁর সমগ্র রাশিয়া অবস্থানের কালে সরকারি অতিথি হিসাবে গৃহীত হন। পিটাসবার্গের সুইডিস কনসাল সুইডেনের ভিতর দিয়ে কুমারকে ট্রানজিটভিসা দিতে অসুবিধা সৃষ্টি করলে ট্রটস্কি কুমারকে জার্মান লাইন ধরে বার্লিনে ফিরে গিয়ে সেখানকার ইণ্ডিয়ান কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করতে পরামর্শ দেন। কুমার অবশেষে ফুনাবুর্গ হয়ে ২৩ তারিখে বার্লিনে এসে পৌঁছলেন।

মহেন্দ্র প্রতাপ তাঁর সঙ্গে আফগানিস্তানের আমির হবিবুল্লা খাঁনের একটি করে চিঠি নিয়ে এসেছেন মহামান্য সম্রাট কাইজার এবং মহামান্য সুলতানকে এই দুটি পত্র লিখিত।

Vossische Zeitung—পত্রিকায় ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ তারিখে মহেন্দ্র প্রতাপের একটি সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। এই সাক্ষাৎকারী একজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক। তিনি ভারতীয় দূত আমির কর্তৃক কাইজারকে তাঁর চিঠির একটি লিখিত জবাব সঙ্গে এনেছেন এই কথাটি বিশেষ ফলাও করে প্রকাশ করেন সেই অধ্যাপক। তিনি জোর দিয়ে আরও বললেন যে মহেন্দ্র প্রতাপ আরও একবার চ্যান্সেলার বেথমান হলভেগের চিঠি ভারতীয় রাজন্যবর্গের কাছে নিয়ে গেছেন।

জার্মানীতে ভার্সাই সনদে দস্তখতকারীর মধ্যে ভারত অন্যতম, অবশ্য গান্ধীর ভারত এই সনদকে বাধ্যতামূলক বলে স্বীকার করেনি।

ইন্দো-জার্মান সম্পর্ক শুধু মাত্র রাজনৈতিক জগতের ক্ষেত্রে যে পরিচালিত হয়েছে তা নয় বরং অনেক সময় আশ পাশেও ঘটেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় জার্মান ইষ্ট আফ্রিকায় ভারতীয়দের অনেক সময় জার্মান পাসপোর্ট দেওয়া হ'ত কারণ তাদের জার্মান কলোনীর তথাকথিত মর্যাদা অনুসারে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে নির্বাসিত ভারতীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরমুজুদ কেরসাসপ, আবদুস সত্তার সিদ্দিকি এবং চম্পকরমন পিল্লাই—এঁরা সকলেই "জার্মান ইষ্ট আফ্রিকান" এই নামে বিশেষ কাজের ভার প্রাপ্ত হন, এঁদের নামকরণ হয় যথাক্রমে মহম্মদ বিন সাদি, আহমেদ বিন নাসির, ইব্রাহিম বিন মামুদ ও আবদুল্লা বিন মনজুর।

ইষ্ট আফ্রিকান কলোনী সমূহে জার্মান কর্তৃপক্ষ সর্বদাই ভারতের সঙ্গে অল্প বিস্তর মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন হয়ত ভারতীয় মহাসাগরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা বিবেচনায়। এই একটি কারণেই জার্মান ইষ্ট আফ্রিকার মুদ্রা ব্যবস্থার নাম ভারতীয় রূপী বা রূপেয়ার নামানুসারে। ব্রিটিশ অবশ্য এই সব ব্যাপার বিষয়ে অন্ধকারে ছিলেন তা নয়। "জার্মান ইষ্ট আফ্রিকা এ্যান ইণ্ডিয়ান কলোনী"—এই নামে Kölnische Zeitung ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর ১০ই স্যার থিওডোর মরিসন (Times পত্রিকায় ২৪. ৮. ১৮) একটি প্রস্তাবে বলেছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে কাজ করার জন্য ভারতীয়দের ইষ্ট আফ্রিকায় জার্মান কলোনী দেওয়া হোক, সেইখানে তারা নিজস্ব

কলোনী গড়ে তুলুক। যাই হোক, এই প্রস্তাব অবশ্য অচিরেই চাপা দেওয়া হ'ল।

জার্মানীয় নির্বাসিত ভারতীয় রাজনীতিবিদ্‌গণ কিছু পরিমাণ শ্রদ্ধা অর্জন করেন, জার্মানীতে ভারত ও জার্মান সম্পর্কের ব্যাপারে ভাইমার-রিপাবলিকের কালেও।

জার্মানীর ভারতীয় সম্প্রদায়ে কয়েকটি নূতন নাম সংযোজিত হল এম. এন. রায়, তাঁরাচাঁদ রায়, বিনয়কুমার সরকার, আরাথিল ক্যানডেথ নারায়নান নাম্বেয়ার, এ হুসেন প্রভৃতি।

এঁরা Industrial and Trade Review for India নামক একটি মাসিক পত্র বার্লিনে প্রকাশ করলেন। সরকার বিশেষ ভাবে একজন বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে উল্লেখ্য, তিনি বিবাহ করেছিলেন অষ্ট্রিয়ান মহিলা ইডা ষ্টাইলারকে। প্রোফেসার হেরমান •সথুমাখেরের অধীনে তিনি বার্লিমে অর্থ নীতির পাঠ গ্রহণ করেন এবং বাংলা, জার্মান, ও ইংরাজী ভাষায় অজস্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। এইসব গ্রন্থে জার্মান সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগের পরিচয় প্রকাশিত। ১৯২৬-এর এপ্রিল মাসে সরকার কলিকাতায় "আর্থিক উন্নতি" নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় একটি নিয়মিত বিভাগ ছিল "দুনিয়ার ধন-দৌলত"। জার্মান শব্দ "Weltwirtschaft" কথাটির আক্ষরিক অনুবাদ বাংলা ভাষায় এই কথাটি গৃহীত হয়েছে।

ম্যুনিখের কারিগরি বিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর সরকার ১৯৩১-এ "বঙ্গীয় জার্মান বিদ্যা-সংসদ" বা জার্মান সংস্কৃতি সমিতি স্থাপন করেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে আমি স্বয়ং সরকারকে পত্র লিখে তাঁর পরবর্তী জার্মানী পরিদর্শনে আমন্ত্রণ জানাই আমার বাবা-মা-র অতিথি হওয়ার জন্য। এই যাত্রা অবশ্য সম্ভব হল না। কারণ পরবর্তী বৎসরে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে ওয়াশিংটনে পরলোকগমন করেন করেন। হয়ত আমি অন্য এক প্রসঙ্গে বিনয় কুমার সরকার সম্পর্কে যা লিখেছিলাম তার কিছু উধৃত করতে পারি:

"বিনয়কুমার সরকার ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মালদহে জন্ম গ্রহণ করেন। এবং ১৯৪৯-এর ২৪শে নভেম্বর তারিখে ওয়াশিংটনে পরলোক গমন করেন। সেই সময় তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র ছিলেন। আমাকে লিখিত শেষ পত্রগুলিতে আরেকবার জার্মানীতে আসার জন্য তার মনের প্রবল বাসনা প্রকাশ পায়। আমাদের দেশে তাঁকে অভ্যর্থনার সুযোগ

পাইনি। কিন্তু এই মহান পণ্ডিতের পবিত্র স্মৃতি জার্মান সাংবাদিকদের মন থেকে অস্পষ্ট হতে দেওয়া যায় না। তিনি নিজেও একজন সাংবাদিক ছিলেন এবং এদেশের প্রকৃত সন্তান। আমাদের দেশের মানুষের এই মনীষীর বিষয় আরো জানা প্রয়োজন। ভারতীয় সংস্কৃতির শহর থেকে এই নীরব "ঋষি"— যিনি বিশ্বরাজনীতির রাজধানীতে লোকান্তরিত হলেন তাঁর পাওনা কিছু কম নয়।"

সেই কালে, তখন তরুণ কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের পক্ষ থেকে জনৈক তরুণ ভারতীয় বিপ্লবী এম. এন. রায় জার্মানীতে এলেন। রায়, তাঁর প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রথম মহাযুদ্ধের কালেই জার্মান মহলে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি 'মাভেরিক' জাহাজ থেকে ভারতীয় জাতীয়তা-বাদীদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেন—সেই জাহাজটি তখন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকায় সমুদ্রযাত্রা করেছিল। 'মাভেরিক' জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন জনৈক জার্মান, তিনি বন্দরের বাইরে তানডজোনক পার্কে জাহাজ নোঙর করলেন। যাই হোক, রায় সে যাত্রা তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারেন নি কারণ জাভার উপকূলে দাঁড়িয়ে একটি ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ 'মাভেরিকে'র উপর কঠোর দৃষ্টি রেখেছিল। জার্মান ক্রুজার 'এমডেনের' দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপ ভারতীয় বিপ্লীদের আশা প্রজ্জলিত হয়, এখন 'মাভেরিকের' প্রতিটি পদক্ষেপ রুদ্ধ শ্বাসে অনুসরণ করা হল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এম. এন. রায় ক্যালিফোর্ণিয়া যাত্রা করলেন। (জনৈক ফাদার মার্টিনের ছদ্মবেশে)—সেখান থেকে মেকসিকো গেলেন—সেইখানে কম্যুনিষ্ট এজেন্ট মাইকেল বোরোদিনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। সেখানে ১৯১৯ সালে, রায় মেক্সিকোতে কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন করেন। সেই বছরই লেনিনের ব্যক্তিগত পরামর্শে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন যাত্রা করলেন। তিনি রায়কে ভ্রমণ পথে জার্মান কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলেন। জার্মানীতে রায় যাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ চরম বামপন্থী ছিলেন—যথা আগস্ট থালহেইমার ও হাইনরিশ ব্রানডলার। রায় জার্মান ভাষা শিখে নিলেন; তাঁর পরবর্ত্তী মস্কো, তাসখন্দ, ও চীন যাত্রাকালে তিনি জার্মান রাজনীতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছিলেন। চীন থেকে মস্কো ফেরার পর তিনি ন্যাশন্যাল সোসালিষ্টদের কম্যুনিজম থেকে বিপদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর এই সব সতর্কবাণীর ফলে তিনি স্তালিনের সুনজর থেকে বঞ্চিত হন এবং ব্যাপারটি এতদূর গড়ায় যে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে রায়ের গুরুতর ব্যাধির

সময় তাঁকে কোনোরূপ ডাক্তারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হয়। কড়া নজরে রাখলেও রায় কোনও ক্রমে বার্লিনে চলে যেতে সমর্থ হন। জার্মানীতে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। পরবর্ত্তীকালে জার্মান ভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁর পরিবর্ধিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। র‍্যাডিক্যাল কম্যুনিষ্ট এখন অধিকতর মানবিক পন্থা অবলম্বন করে। এই ব্যাপারে তিনি তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী এলেন গটস টিপকের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন। কিছুকাল পূর্বে তিনি এলেনকে বিবাহ করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন করে রায় মার্কস প্রভাবিত রাজনীতির সঙ্গে ঐতিহ্যাশ্রয়ী গান্ধীবাদের সংমিশ্রন ঘটিয়ে এবং তার সঙ্গে জার্মান আদর্শবাদের যোগ সাধন করে এক নব্য-মতবাদের প্রচার করেন ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর কাল পর্যন্ত।

রায়ের মত অন্য ভারতীয়গণ, যাঁরা চরম মার্কসবাদী হিসাবে জীবন যাত্রা স্বরু করেছিলেন তাঁরা কালক্রমে কম্যুনিজমের প্রতি আস্থা হারিয়ে জার্মান রাজনৈতিক মহলের সঙ্গে সম্পর্ক করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের বার্লিন ইণ্টারন্যাশন্যাল ওয়ার্কস কনফারেন্সের কাল থেকে ভারতীয়গণ এবং জার্মান মার্কসিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে স্টুটগার্টে যে ওয়ার্কস কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় তাতে বিস্তারিতভাবে ভারতীয় রাজনীতি আলোচিত হয়। এই কন্‌ফারেন্সে পারসী মহিলা মাদাম কামা প্রকাশ্যে ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর কয়েকজন বার্লিনবাসী ভারতীয় চরমপন্থী মতবাদে আকৃষ্ট হন। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বার্লিনে তিনি একজন সহযোগী মার্কসিস্ট এগনেস স্মেডলিকে বিবাহ করেন। ১৯২০তে যখন ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির এক নির্বাসিত গোষ্ঠী তাসখন্দে দল প্রতিষ্ঠা করেন, বার্লিনস্থ ভারতীয়গণ তার সেই ঘটনায় অংশ গ্রহণের জন্য মস্কো যাত্রা করেন। ১৯৬৫-তে প্রকাশিত মজঃফরপুর থেকে প্রকাশিত The Left Wing in India নামক গ্রন্থে এল. পি. সিনহা লিখেছেন সেই যাত্রার কালে নির্বাসিত ভারতীয়দের মধ্যে কি পরিমাণ ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এদিকে কম্যুনিজমের প্রতি তাদের একযোগে অনুরাগ ও বিরাগ প্রকাশ পায়। য়ুরোপ-ভিত্তিক ভারতীয়গণ কার্ল রাডেক এবং থালহাইমারের সঙ্গে যুক্ত জার্মান কম্যুনিষ্টচক্রের প্রভাবে আসেন। সেই কালেই এম. এন. রায় সর্বপ্রথম বার্লিনে এই পত্রিকা ১৯২২-এর মে মাসে Vanguard of Indian

Independence নামে প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের পর ভারতে কমিনটারণের প্রথমদিকের অন্যতম এজেন্ট ডাঃ গঙ্গাধর এম. অধিকারী জার্মানীতে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন। তিনি বার্লিনে লেখাপড়া করেন। অধিকারী ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিকে তীক্ষ্ণ কমিনটার্ণ মুখী পাঠে ব্রতী করলেন। এর কিছুকাল পরেও জার্মান ও ভারতীয় কম্যুনিষ্টগণ তাদের সরকারী সহযোগীতা বজায় রেখেছিলেন। ১৯৩২-এর মে মাসে চীন, গ্রেটব্রিটেন ও জার্মানীর কম্যুনিষ্ট পার্টি তাঁদের সহযোগী ভারতীয় মার্কসিস্টদের কাছে আবেদন জানালেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আরো স্পষ্টভাবে সরে আসার জন্য অপর ব্রিটিশ-বিরোধীগণ আন্দোলন থেকে সরে এসে নিঃসঙ্গ হয়ে ভেসে না বেড়াতেও উপদেশ দেওয়া হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ভারতের চরম বামপন্থীদলকে তাঁদের জার্মান রাজনীতিমুখী মনোভংগী পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য করা হয় স্তালিন-হিটলার চুক্তির পর।

১৯২০-র জার্মানীর ভারত মিত্রসুলভ মনোভংগীর ফলে ভারতীয় কংগ্রেসের কয়েকজন রাজনীতিবিদ জার্মানীতে আগমন করেন। ১৯২৭-এর ১৪ই নভেম্বর জার্মান ফরেন অফিসে একজন মন্ত্রী শ্রেণীর কর্মচারী—ভ হাস ভারতীয় ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সঙ্গে নিম্নলিখিত সাক্ষাৎ-কারের কথা লিপিবদ্ধ করেন:

"আজ ভারতীয় স্বাধীনতা দলের পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ-কার হয়, সঙ্গে ছিলেন তাঁর পুত্র এবং বার্লিন প্রবাসী পিল্লাই।"

মোতিলাল নেহরু এবং তাঁর পুত্র এই সাক্ষাৎকারের আগ্রহ প্রকাশ করেন, জার্মানী কিভাবে ভারতীয় কংগ্রেসকে সাহায্য করতে পারে তা জানার জন্য। জার্মানী থেকে ওঁরা দুজন মস্কো চলে যান; তাঁরা স্থির করলেন জার্মানীতে প্রথমতম ভারতীয় ইনফরমেশন ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হবে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৯ তারিখে এই 'ব্যুরো' প্রতিষ্ঠা করা হয়, এর কর্মভার দেওয়া হল এ, সি, এম নামবেয়ার ও বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই দুজন ভারতীয়ের ওপর। এই পরিকল্পনাটি ছিল জওহরলালের। তাঁর বাসনা ছিল এই ইনফরমেশন ব্যুরোকে ভারতের কোনো প্রকার সরকারি দূতাবাসে পরিণত করা—ভারত তখন স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত। পৌনে এক শতাব্দী পরে, এই প্রথম ডাইরেকটর এ. সি. এম. নামবেয়ার বন-এ ফিরে এলেন তাঁর স্বদেশের প্রথমতম সরকারী রাষ্ট্রদূত হয়ে। জার্মানী ভারতীয় পঠন-পাঠনের আদি কেন্দ্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

কালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সরকারের একমাত্র মন্ত্রী হিসাবে য়ুরোপে কাজ করেছেন।

আরেকটি ভারতীয় কেন্দ্র ১৯২০-তে ম্যুনিখে খোলা হয়, ১৯২৯-এ জার্মান একাডেমির শাখা হিসাবে দি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিট্যুট খোলা হয়—১৯৪৯-এ এই প্রতিষ্ঠানটি তারকনাথ দাস ফাউনডেশানের সহযোগীতায় পূর্ণ-প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রধান ছিলেন অবিস্মরণীয় ডাঃ ফ্রানৎস থায়ের ফেলডার এই কেন্দ্রটি অচিরাৎ ভারতীয় ও জার্মানদের এক অপূর্ব মিলন ক্ষেত্র হয়ে উঠ্‌ল।

সেই কালে, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষপাতপূর্ণ রিপোর্টের দ্বারা কম প্রভাবিত ছিল না। তথাপি এসব অনেকেও ছিলেন যাঁরা ভারতের প্রতি জার্মান মনোভংগীর একটা প্রকৃত চিত্র আঁকতে পেরেছিলেন। একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হবে :

Bombay Chronicle যখন জুলাই ১৯৩০-এ জার্মান পত্র-পত্রিকায় ভারত বিরোধী কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন আয়ি থেনডুলকর সেই পত্রিকায় তিন কলম ব্যাপী জবাব লিখে সমগ্র বিষয়টির যথাযথ বিবরণ দান করেন।

তথাপি একথা সত্য জার্মানীতে একটি সংখ্যালঘু দল ছিল যারা ভারতের রাজনৈতিক সত্যকে লঘু করে দেখতেন। এই সংখ্যালঘু দলে ছিলেন ন্যাশন্যাল সোশ্যালিষ্টগণ, যে দলের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর Mein Kampf নামক গ্রন্থে তাৎপর্য-পূর্ণভাবে মন্তব্য করেন :

> "আমার আজো অনুরূপ শিক্ষাসুলভ এবং অবিশ্বাস্য আশার কথা মনে আছে যখন ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে জাতীয় মহলে ধারণা হয়েছিল যে ইংলণ্ড ভারতবর্ষে একটা আসন্ন পরাজয়ের সম্মুখীন, তাঁরা যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের কথা আশা করছিলেন এবং সেই আসন্ন পরাজয়ের ফলে ইংরাজ রাজশক্তির পরাজয়ের কথা ভাবছিলেন, তাঁরা তখনই মেনে নিচ্ছিলেন যে ভারত ইংলণ্ডের কাছে একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অঞ্চল।
>
> ইংলণ্ড তখনই ভারতকে হারাবে যদি সে তার শাসনযন্ত্রে জাতিগত-বিভেদের জালে জড়িয়ে পড়ে (যে ব্যাপারটি বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে ভারতে এড়িয়ে রাখা হয়েছে) কিংবা কোনো শক্তি-শালী শত্রুর খড়্গের হাতে তার পরাজয় ঘটে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ

কখনই এই অবস্থা সৃষ্টি করতে পারবেন না। ইংলণ্ডকে পরাজিত করা কত কঠিন আমরা যারা জার্মান তারা প্রচুর পরিমানে সে তথ্য আবিষ্কার করেছি।"

যাই হোক এ্যানি বেসান্ট, একজন ইংরাজ মহিলা, তিনি ভারত ও ব্রিটেনে সংগ্রাম করেছেন, শুধু ভারতের স্বাধীনতার জন্য নয় বরং সেই সঙ্গে য়ুরোপের প্রকৃত পরিস্থিতি বিষয়ে একটা সঠিক ধারণা রচনার জন্য। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর লণ্ডনের কুইনস হলে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি য়ুরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র বিষয়ে তাঁর যে পরিকল্পনা প্রকাশ করেন তা ভারতেও বিশেষ সমাদর লাভ করে।

বিশের দশকের সমগ্রকাল ভারতের সঙ্গে জার্মান ব্যালান্স অব ট্রেড আগা-গোড়া জমার দিকে—[১৯২৬ : (ক) জার্মানী থেকে ভারতীয় আমদানি : ২৬০ মিলিয়ন মার্ক। (খ) ভারত থেকে জার্মান আমদানি : ৩২৭ মিলিয়ন মার্ক। ১৯২৭ : (ক) ২৪০ মিলিয়ন মার্ক (খ) ৪৯৩ মিলিয়ন মার্ক ; ১৯২৮ : (ক) ২৪৭ মিলিয়ন মার্ক ; (খ) ৩৯১ মিলিয়ন মার্ক। ১৯২৯ : (ক) ২৪৫ মিলিয়ন মার্ক ; (খ) ৩৯১ মিলিয়ন মার্ক]। পরবর্তী দশকে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। এই ভাবে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় ১৯৩৬-এ ভারত থেকে জার্মান আমদানি মাত্র ১৪২˙১০ মিলিয়ন মার্ক—অন্যদিকে জার্মান থেকে ভারতে রপ্তানির পরিমান মাত্র ১২১˙৬০ মিলিয়ন মার্ক। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে ভারতীয় আমদানি ছিল ১৬৮˙৬০ মিলিয়ন মার্ক, ভারতে জার্মান রপ্তানি ছিল মাত্র ১৪৭˙৬০ মিলিয়ন মার্ক। যুদ্ধ পূর্ব শেষ বর্ষের হিসাব—১৯৩৮-এ জার্মান রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ হ্রাস লক্ষ্য করা যায়। তার মূল্য ছিল ১০৬˙৬০ মিলিয়ন মার্ক, এদিকে জার্মানীতে ভারতীয় আমদানি পূর্ব বৎসরের সমান স্তরে ছিল—১৪২ মিলিয়ন মার্ক।

জার্মানীর স্বার্থে ভারতের সঙ্গে ব্যবসা বৃদ্ধির প্রয়োজন একথা অর্থনীতি-বিদগণ বার বার বলেছেন। বিশের দশকে জার্মানীর সামনে যে অসুবিধা ছিল এই ব্যাপারে তার কথা বলেছেন—এফ. জে. ফুরটভাংলার তাঁর ভ্রমণ বিবরণে :

"ভার্সাই চুক্তি আমাদের জার্মানদের কাছে সম্পূর্ণ পাঁচ বছরের মত ভারতকে অবরুদ্ধ রেখেছিল। পরবর্তীকালে ১৯২৪-এর এ্যাংলো-জার্মান বাণিজ্য-চুক্তি ভিসাগত প্রবেশ বিষয়ে কিছু বিধি নিষেধ

আরোপ করায় ভারতের সঙ্গে জার্মানীর বাণিজ্যিক সম্পর্কে জটিলতা সৃষ্টি হল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জার্মানী শতকরা সাত ভাগ ভারতীয় আমদানী থেকে লাভ করে থাকে তাহলে ভারতীয় আমদানী মূল্যে তার শতকরা ছয়ভাগের বেশী অংশ নেই, যদিও আমদানী যথেষ্ট বেড়ে গেছে। টাকার মূল্যমান হিসাবে যুদ্ধ পূর্ব হিসাব ছিল ১২৭ মিলিয়ন টাকা, ১৯২৮-এ ১৫৪ মিলিয়ন টাকা। এর অর্থ কি কোনো দিক থেকে লাভ করা? না তাও নয়! কেউ যদি যুদ্ধ পূর্ব অঙ্কের প্রকৃত মূল্য হিসাব করে, জার্মান ব্যুরো অব ষ্ট্যাটিসটিকস যেমন করেছেন তাহলে ভারতে জার্মান আমদানী ১৯১৩-তে ২৭১ মিলিয়ন মার্ক, ১৯২৮-এ মাত্র ২২৩ মিলিয়ন। এই হিসাব জার্মানীর মোট রপ্তানির শতকরা ১·৭৫ ভাগ মাত্র। এবং সবচেয়ে অধম অবস্থায় ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে এ দিকটিও আজ বিপন্ন।"

১৯৩০-এ পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু জার্মান কনস্যুলার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন প্রফেসার সাহার মাধ্যমে (১৯৩০-২৮শে জুন তারিখের বোম্বাই কনস্যুলেটের রিপোর্ট)—এই অনুরোধ নিয়ে যে ভারতীয় প্রশ্নটি লীগ অব নেশ্যানস্-এ উত্থাপন করা হোক। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পণ্ডিত মালবীয় দ্বিতীয় প্রখ্যাত ভারতীয় যিনি ১৪ই নভেম্বর ১৯৩০ তারিখে জার্মানদের কাছে অনুরূপ অনুরোধ জানান। (১৪ই নভেম্বর ১৯৩০ তারিখের বোম্বাই কনস্যুলেটের রিপোর্ট)।

বিগত যুদ্ধপূর্বকালীন দশকে জার্মানী কম্যুনিষ্ট এবং চরমপন্থী নাৎসীদের সংগ্রাম ক্ষেত্রে পরিণত হয়। জার্মান বামপন্থী সাময়িকপত্র বার্লিনের Die Linkskurve নামক পত্রিকায় ১৯৩০-এর জুন সংখ্যায় একটি দস্তখতহীন সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়, তার শিরোনাম ছিল—Indien und die Krise des Weltimperialismus—(ভারত এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সংকট)। এই প্রবন্ধে ভারতীয় বিপ্লবের বিশ্লেষণের প্রয়াস ছিল। গান্ধীর সংগ্রাম এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনে চীনা কম্যুনিজমের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে যা লিখিত হয় তার ভঙ্গী ছিল অশ্রদ্ধেয় এবং তথ্যের দিক থেকে ভ্রান্ত:

"ভারতের সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে এই বিষয়ে কোনো সংশয় থাকে না যে ৩৫০ মিলিয়ন ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলন একটা নতুন পর্বে পৌছবে। এই পর্বের বৈশিষ্ট্য চিহ্ন এই যে আমরা

এইখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী অত্যাচারে জর্জর জনগণের অসন্তোষের কোনো সংবাদ রাখিনা। কিন্তু একটি সংহত বৈপ্লবিক আন্দোলন ভারতীয় জনগণের মধ্যে গভীর পরিবর্তন এনে দিয়েছে, যার ফলে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি কম্পমান। এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করা যাক, যথা :

প্রথম : "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ" এই নামে যে আন্দোলন সুরু হয় এবং পরিচালিত হয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হামলার উদ্দেশ্যে তার দ্রুত রূপান্তর। তার অর্থ : এই গণ আন্দোলনের বুর্জোয়া এবং পাতি বুর্জোয়া নেতাদের সম্পূর্ণ দেউলিয়া প্রাপ্তি। কংগ্রেস, গান্ধী এবং গান্ধীবাদ এঁদের প্রতিনিধি স্থানীয়। এই আন্দোলনের বৈপ্লবিক স্বতোৎসারিত্ব 'অহিংসতত্ত্বে'র চাপে এবং প্রতিরোধের শক্তিশালী যন্ত্রের অতিকায় পেষণে নিষ্পেষিত। 'লবন একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে অভিযানের' মাত্র একটি সপ্তাহ অতিক্রান্ত, গান্ধীর 'সত্যাগ্রহ' বিষয়ক ঘোষণা এবং ভারতীয় পরিস্থিতি আজ বিপ্লবের প্রতীক রূপে প্রতীয়মান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং বিপ্লবীজনগণের এক রক্তাক্ত সংগ্রাম।

দ্বিতীয়: এই আন্দোলনের 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' থেকে দ্রুত ক্রমবিকাশ এবং বৃদ্ধি যা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ্য বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপে পরিণত তার ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যায় যে এই আন্দোলনের অভ্যন্তরে সর্বহারা ও শ্রমিকদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিঃসন্দেহে আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রমিক কেন্দ্রগুলিতে তা দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে—কলিকাতা, বোম্বাই, সোলাপুর ইত্যাদি ; অর্থাৎ বলা যায় যে সর্বহারাবৃন্দ অতি দ্রুত গান্ধীর নিষ্ক্রিয় ভাবাদর্শ পরিহার করে বৈপ্লাবিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়েছে…

ভারতের সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটিতে প্রকৃত ভাঙনের সম্ভাবনা এবং ভারতী বিপ্লব বিশ্ব বিপ্লবের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারা উন্মুক্ত করল, বিপ্লব আজ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে কারণ ঔপনিবেশিক বিপ্লববাদের তরঙ্গ আজ সর্বত্র গর্জন করে উঠছে। সর্বোপরি, চীনা বৈপ্লবিক আন্দোলনের নবজাগরণ ভারতীয় বিপ্লববাদের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সমর্থন জুগিয়েছে। চীন দেশের কৃষি বিপ্লব যা সম্প্রতি ভারতে সুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই বেশ পুরোদমে চলছে, বিদ্রোহী কিষাণরা তাদের শক্তির যন্ত্র

সোভিয়েত গ্রামাঞ্চলে ইতিমধ্যেই চালু করেছে—এই সব ক্রিয়াশ সোভিয়েত আজ সম্পূর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছে, বৈপ্লবিক "রেড-আর্মি" হাজার রাইফেলের সমান প্রলেটারিয়াট সর্বহারার দল যদিও প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিনতাং জেনারেলদের দ্বারা কিছু কিছু প্রতিহত হয়েছে, তথাপি তারা বর্ধিততর ক্রিয়া কলাপ প্রদর্শন করছে এবং দক্ষিণ চীনার গ্রামাঞ্চলে নয়া বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এই সবই ভারতীয় বিপ্লবকে পথ প্রদর্শন করছে।

ম্যাকডোন্যালড ও ওয়েজউডবেন শ্রমিক সরকারের "সেক্রেটারি ফর ইনডিয়া" কলিকাতা ও বোম্বাই শহরের শ্রমিকদের গুলি করতে আদেশ দিয়ে নিমকহালালি করেন নি। নোসকে ও জোরগাইবেল জার্মান সর্বহারাদের ক্ষেত্রে যা করেছিলেন তাঁরাও তাই করছেন। এইভাবে তাঁরা আর একবার দেখালেন সোস্যাল ডেমোক্রাটরা কি ভূমিকা গ্রহণ করেছেন—মহান্ শ্রেণী সংগ্রামের অভ্যন্তরে সেকেণ্ড ইনটারন্যাশনাল, অত্যাচারী ও অত্যাচারীতের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম নতুন যুগের সূচনা করছে। যেখানেই একটা সিদ্ধান্ত হোক; যেখানেই "বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটির শৃঙ্খল" ভাঙতে সুরু করে সেইখানে বুর্জোয়ারা সোস্যাল ডেমোক্রাট নেতাদের ঠেলে দেন। বিপ্লবের অধিকতর অগ্রগতি রোধ করার উদ্দেশ্যে তাঁরা পৈশাচিক পন্থা গ্রহণ করেন যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ভয়ংকর রক্তস্নানের ব্যবস্থাও করা হয়।"

কম্যুনিষ্টরা ভারতীয় সংগ্রামকে সমর্থন করার ভাব দেখায়, যদিও প্রকৃতপক্ষে তাদের "গান্ধী সমর্থক" বৃন্দ অনেক ক্ষেত্রে "কমিনটার্ণ এজেন্ট"। এই তাঁদের সমর্থকদের কাছে ইঙ্গিত—জার্মান ন্যাশন্যাল সোস্যালিষ্ট এর থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়ে আছেন।

হিটলারের পার্টি ব্রিটিশ সংবাদপত্রে তাঁদের ভাবমূর্তি ঠিক মত বজায় রেখেছিলেন। এইভাবে হিটলারের সংবাদপত্রে "Volkischer Beobachter ১৯৩১-এর ৮ই ডিসেম্বর তারিখে Morning Post পত্রিকার একটি মন্তব্যের নজীর দেন, তার মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য বজায় রাখার ব্যাপারে নাৎসী-সমর্থনের কথা উল্লিখিত হয়েছিল। জার্মানীস্থ ভারতীয়দের কাছে এই মন্তব্য তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। (১০ই ডিসেম্বর ১৯৩১ তারিখে

হিটলারকে লিখিত চম্পকরমণ পিল্লাই-এর পত্র)। ভারতীয় সংবাদপত্রের একাংশও প্রতিবাদ জানালেন। হিসাবের খাতার অপর দিকে বহু সংখ্যক জার্মান (যথা, মার্গারেট স্পাইগেল এবং হেলেন হুসডিং) গান্ধীজীর আন্দোলনে যোগ দিচ্ছিলেন। যতদিন না এই জাতি গণতন্ত্রের অধিকার পরিত্যাগ করে হিটলারকে ১৯৩৩-এর ৩০শে জানুয়ারী ক্ষমতায় আসীন হতে দিলেন, ততদিন ক্রমান্বয়ে জার্মানীতে বেকারী বেড়ে উঠছিল।

জার্মান কনস্যুলার প্রতিনিধিত্ব তাঁদের তরফে "দর্শকের ভূমিকা"য় রইলেন। বোম্বাই-এর ভাইস কনসাল ডাঃ হেরবার্ট রিখ্‌টার ১৯৩৩-এর ১১ই মে ইন্দোরে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে তরুণ মহারাজা হোলকার বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন:

> "মহারাজা জার্মানী সম্পর্কে এক অসাধারণ তীব্র আগ্রহে আগ্রহ প্রকাশ করলেন, জার্মানীকে তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানেন। আরও অনেক বিষয়ের সঙ্গে তিনি বললেন, বার্লিনের স্থপতি একার্ট মুথেসিউসকে ভার দিয়ে ইন্দোরে একটি নতুন প্রাসাদ নির্মান করবেন। মুথেসিউস তাঁর পূর্ববর্তী কাজে মক্কেলের পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি সাধন করেছেন। তিনি যে গৃহ নির্মান করেছেন তা ভারতে অনন্য বলা যায়। আধুনিক শিল্পের রীতিতে এই প্রাসাদ সম্পূর্ণভাবে একীকৃত এবং পদ্ধতির দিক থেকে নিখুঁত; এর আভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা চমৎকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর উপকরণাদি জার্মান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের।'...

বিশেষ রাজনৈতিক স্থায়িত্ব না থাকলেও, পার্টির কর্তারা বার্লিনস্থ কিছু ভারতীয়কে আটকাতে দেরী করলেন না। বার্লিন ইনফর্মেশন ব্যুরোর প্রধান নামবেয়ারকে কিছুকালের জন্ত গ্রেপ্তার করা হল।

সেই কালে, যখন সকল জার্মান শকুন্তলা সর্বজনীন রোমান্টিকবাদের স্বপ্নে আচ্ছন্ন তখন তার স্থলে এল নয়া ন্যাশন্যাল সোসালিষ্ট ধুয়ো। সেই সময় জার্মানীতে অসামান্ত গুণসম্পন্ন একজন ভারতীয়ের আবির্ভাব ঘটল। দৃঢ়তাপূর্ণ তেজস্বী, স্থির মস্তিষ্ক ও নিখুঁত এই ব্যক্তি ডিক্টেটরদের সঙ্গে মোকাবিলায় উপযুক্ত। এঁর নাম সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯৩৩-এর ২৫শে মে তারিখে কলিকাতাস্থ কনসুলেট জেনারেল সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে নিম্নলিখিত বার্তা পাঠান—"পরিবর্তনপন্থী এই নেতা কংগ্রেসের অন্ততম

শ্রদ্ধেয় নেতা। তিনি এখন ভিয়েনায় আছেন। উষ্ণপ্রস্রবণে চিকিৎসার জন্য জার্মানী যেতে ইচ্ছুক। এর দু' মাস পরে (২৮শে জুলাই) সুভাষচন্দ্র বসু বার্লিনের অসভারটিগেস আমট্ (ফরেন অফিস) কর্তৃক অভ্যর্থিত হলেন। কংগ্রেস নেতা জানার চেষ্টা করেছিলেন হিটলার শাসকচক্রের ভারত বিষয়ে প্রকৃত মনোভংগী। সুভাষচন্দ্র বসু নামবেয়ারের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করলেন। সুভাষচন্দ্র সাধারণভাবে বেশ কৌশল সহকারে কাজ করলেন যার ফলে দল নেতারাও মুগ্ধ হলেন। "Mr. Bose in Berlin" নামক একটি বার্তা ২৯শে আগস্ট ১৯৩৩-এর মাদ্রাজস্থ "The Hindu" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে বার্লিনে একটি নতুন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়, এবং জার্মান সরকারি মহলে ভারত সম্পর্কে নতুন উৎসাহে আনন্দ প্রকাশ করা হয়।

পরবর্তীকালে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবিমিশ্র প্রশংসা দেখা গিয়েছে, ব্রিটেনের কোনো কোনো মহলকে তোষণ করার উদ্দেশ্যে এই কর্ম করা হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় হেরমান গোয়েরিং এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ ১৯৩৪-এর ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে Daily Mail-এ প্রকাশিত হল। গোয়েরিং ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন, বিশেষ করে গান্ধীর বিরুদ্ধে, এই ব্যাপারটিতে ভারতীয় সংবাদপত্রে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে। জার্মান ফরেন অফিসেও প্রতিবাদ ওঠে, বলা হয় এই জাতীয় হঠকারি উক্তি ভারতবাসীদের বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। ডাঃ ফ্রানৎস থায়ের ফেলডার জার্মান একাডেমির ইণ্ডিয়ান কমিটির প্রধান একটি সতর্কবাণী যোগ করেন। ১৯৩৪-এর ২৭শে মার্চ লিখিত এক পত্রে যখন সব কিছু হারায় নি—এমন গুরুভার মন্তব্য অনুরূপ গুরুভার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। পরদিন ২৮শে মার্চ ১৯৩৪ তারিখে সুভাষচন্দ্র বসু পুনরায় ফরেন অফিসে এসে উপস্থিত হলেন। দিয়েকহফের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার রেকর্ড থেকে বোঝা যায় যে সেইকালে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের কি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে—

> "হের সুভাষচন্দ্র বসু আজ আমার কাছে এসেছিলেন এবং নিম্নলিখিত বিবৃতিদান করেন :
>
> তিনি এবং তাঁর ভারতীয় বন্ধুগণ এতাবৎ জার্মানী ও ভারতের মধ্যে যথাসম্ভব উত্তম সম্পর্ক বর্তমান রাখার এবং বন্ধুত্বের মধ্যে

ফাটলকে জোড়ার চেষ্টা করেছেন। তথাপি, গত বছর বা ঐরকম সময় থেকে এই প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছে এই কারণে যে জার্মানীতে একটা অমিত্রজনোচিত আবহাওয়া বইতে সুরু হয়েছে।"

স্তালিন এবং হিটলারের মত ডিক্টেটরবৃন্দ ভারত এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। যাই হোক, এমন এক দিন এল যখন 'হিন্দুস্তান টাইমসে'র পত্রিকার ডাঃ এ. এল. সিনহাকে সাক্ষাৎকারে অনুমতি দিলেন হিটলার। ১৯৩৬-এর ২রা মার্চ তারিখে সেই বিবরণ মুদ্রিত হল এবং ভারতের আশংকা নিবারণে অনেকটা সহায়ক হল। এর জন্য সকল কৃতিত্ব একমাত্র সুভাষচন্দ্র বসুর প্রাপ্য, জার্মান মনোভংগীর উন্নতিসাধন তিনি করেছিলেন।

প্রথম দিকের "প্রাচ্যের মার্কো পোলো", রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের মত সুভাষচন্দ্র বসুরও জনপ্রিয় বিপ্লবীর জ্যোতিচ্ছটা ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে তিনি যখন স্থির করলেন যে ভারতকে শক্তির দ্বারা যুক্ত করতে হবে তখন তিনি সাহায্যের জন্য জার্মানী এলেন। ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আপোষহীণ সংগ্রাম প্রচার করার পর তিনি এখন যুদ্ধ বিদেশে চালনা করার জন্য এলেন।

১৭ই জানুয়ারী ১৯৪১—বিদ্রোহের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি করছেন এই অপরাধে তাঁর বিচারের ঠিক দশদিন পূর্বে তিনি কলিকাতা থেকে পলায়ন করলেন। বিভিন্ন নাম ধারণ করে তিনি কাবুলে এলেন। যেখানে স্বাধীন ভারতের ব্যাপারে প্রতাপের স্বপ্ন শেষ সেইখানে নেতাজীর স্বপ্নের সুরু। ইতালীয়ান পাসপোর্ট নিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু সোভিয়েট ইউনিয়ন হয়ে বার্লিনে এলেন।

পুনরায় উচ্চতর মহলে অতি দ্রুত তাঁকে অভ্যর্থিত করা হল। দুজন বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী ফন রিবেনট্রপ আর কাউণ্ট চিয়ানো সুভাষ বোসের পরিকল্পনা শুনলেন। যাই হোক অক্ষশক্তির তরফ থেকে ভারতের স্বপক্ষে কোনো সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রকাশিত হল না। চার্চিল তাঁর যুদ্ধ-স্মৃতিতে সঠিকভাবে এই আশ্চর্য বিচ্যুতিবিষয়ে বিশ্লেষণ করেন। সোভিয়েত-জার্মান গোপন চুক্তি অনুসারে ভারত সোভিয়েত শক্তির এখ্‌তিয়ারে পড়েন। এইভাবে, হিটলার যদিও "অপারেশন ইণ্ডিয়া" এই নীতির দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন তথাপি তিনি তাঁর প্রচারণায় এই বিষয় নিয়ে কিছু বল্‌তে পারেন নি। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে রুহলেবেন ও উনসডোরফ ছিল ভারতীয় অন্তরীণদের বন্দী শিবির, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে লামসডোরফ ও আন্নাবুর্গ সেই একই ভূমিকা গ্রহণ করে। বসু-র

অনুরোধে জার্মানগণ উর্দিপরিহিত ভারতীয় বন্দীদের ইউনিটগুলিকে Wehr-macht-এ যোগদানে অনুমতি দিলেন। ভারতীয় সৈনিকরা এডলফ হিটলারের প্রতি ও সুভাষচন্দ্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন সংযুক্তভাবে। বসু-র নাম হল নেতাজী, বা শ্রদ্ধেয় নেতা।

আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম ভারতীয় সেনাদল ভারতীয় পতাকার নীচে মার্চ করতে লাগ্‌ল, এই পতাকায় এক উদ্যত শার্দুল কংগ্রেসের জরদা-সবুজ ও শাদা পতাকার উপর আঁকা। পূর্বে যেমন বলা হয়েছে প্রথম আধুনিক ভারতের পতাকা বিদেশে ওড়ানো হয় ষ্টুটগার্টে* ১৯০৭-এর ২২শে আগষ্ট বোম্বাই শহরের ব্যবসায়ী শেঠ সোরাবজী-ফ্রামজী পাতিলের কন্যা মাদাম ভিকাজী পাতিলের দ্বারা। মাদাম কামা জার্মানী ও ফ্রান্স উভয় দেশে পরিচিত ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা ও দ্বিধাহীন চিত্তের মহিলা হিসাবে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে তিনি পতাকা প্রস্তুত করতে দিলেন। একথা উল্লেখ্য যে জার্মানীস্থ ভারতীয়গণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে 'জয়-হিন্দ' বা—ভারতের জয় এই অভিবাদন গ্রহণ করেন।

১৯৪২-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী জার্মান বেতার মারফৎ নেতাজী গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ-ঘোষণা করেন। এ এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি ; বসুকে একজন রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে প্রকৃত ঘোষণা দানের অনুমতিদান করা হয়—এক প্রবল-প্রতাপশালী-সামরিক রাষ্ট্র যার "ফুরার-তন্ত্র" অতিশয় উন্নত তাঁরা অন্য একদেশের সৈনিকের উর্দি পরিধান করবে এবং তাঁদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রধানের প্রতি এবং তৎসহ অন্য একদেশের নির্বাসিত নেতার প্রতি আনুগত্য প্রদানে অনুমতি দান করলেন।

তথাপি জার্মানীতে বসুর ক্রিয়াকলাপ ছিল অল্পকাল স্থায়ী। এম. আর. ব্যাস জার্মানীস্থ আজাদ-হিন্দ সরকারের অন্যতম নেতা যিনি এখন বোম্বাইস্থ ইন্দো-জার্মান কালচারাল সোসাইটির সেক্রেটারী এবং Indo-German Review পত্রিকার সম্পাদক (এই মাসিক পত্রটি ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত)**

---

* প্রসঙ্গতঃ ষ্টুটগার্ট ও বোম্বাই প্রথম ইন্দো-জার্মান সহোদরা-নগরী চুক্তি সম্পন্ন করেন ১৯৬৮-র মার্চ মাসে।

** ১৯৬৮-র জানুয়ারী মাস থেকে এই ইংরাজ-ভাষায় প্রকাশিত মাসিক-পত্র বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এর একটি জার্মান ক্রোড়পত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ-ভাবে প্রকাশিত হয় তার নাম Deutsch-Indische Blatter—(সম্পাদক-ক্লারিসা লাইফার)।

হিটলারের সঙ্গে বসু-র এক গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এর কথা উল্লেখ করেছেন। ফুয়ারের সদর দপ্তর ইষ্ট প্রাসিয়ায় এই সাক্ষাৎকার ঘটে ১৯৪২-এর ২৯শে মে তারিখে। আলোচনা প্রসঙ্গে হিটলার তার Mein Kampf গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে ভারত সম্পর্কিত মন্তব্য পুনর্লিখনের প্রতিশ্রুতিদান করেন। তিনি সর্বপ্রকার সম্ভাব্য উপায়ে ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা দানের প্রতিজ্ঞা করেন। এম, আর ব্যাস বলেছেন :

"নেতাজীর যখন মনে হল কথাবার্তা শেষ হল, হিটলার উঠে দাঁড়ালেন, এবং তাঁর ক্ষুদ্র আলোচনা কক্ষের দেওয়ালগাত্রে শোভিত একটি মানচিত্রের দিকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। এটা ভূমণ্ডলের মানচিত্র। রাশিয়ায় সর্বাধিক অগ্রসর জার্মান ঘাঁটি এবং ভারতের মধ্যস্থ ফাঁকটুকুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন, তারপর ইন্দো-বর্মাস্থ ভারতীয় সীমানার দিকে আঙুল রাখলেন।" এখন বাস্তববাদী হিটলার কথা বলছেন। ওদিকে জাপান ভারতের প্রায় সীমানায় পৌছেচেন, কিন্তু এই সুদীর্ঘ-দূরত্ব কি তিনি অতিক্রম করতে পারবেন? তিনি যেন প্রশ্ন করছেন। নেতাজী অতি তাড়াতাড়ি বুঝ্‌তেন, হিট্লার অঙ্গ-ভঙ্গীর দ্বারা কি বল্‌তে চান তা সুস্পষ্ট। জার্মান ডিক্টেটরের এ এক সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি যে নেতাজী যদি তার স্বপ্ন সফল করতে চান তাহলে তাঁকে বর্মায় যেতে হবে, জার্মানীতে পড়ে থাকলে চল্‌বে না। তাঁর এই প্রশ্ন নেতাজীর মনে কি ভাব সৃষ্টি করবে তা অনুমান করে, হিটলার তৎক্ষণাৎ যোগ করলেন "ইওর এক্‌সেলেন্সী, আমার সরকার সর্বদাই যে কোনো অবস্থায় আপনার দেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে থাকবে।" তিনি স্পষ্টই বলতে চেয়েছিলেন যে ভারতকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাদানের ব্যাপারে তিনি জাপানের সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন। সুতরাং একথা বলা যায় য়ুরোপে নেতাজীর কাজ প্রকৃতপক্ষে শেষ হয়ে গেল। যা বাকী রইল তা হল জার্মানীর জাপান ও নেতাজীর মধ্যে একটা ত্রিপক্ষীয় চুক্তি নেতাজীর কর্মকেন্দ্র দূরপ্রাচ্যে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে।"

১৯৪২-এর ক্রিসমাস বসু ভিয়েনায় তাঁর অষ্ট্রিয়ান স্ত্রী এমিলি সেনকেল ও কন্যা অনিতার সঙ্গে যাপন করলেন। তারপর তিনি দুঃসাহসিক জাপান যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ তারিখে তিনি জার্মান সাবমেরিনে

চাপলেন কীয়েল থেকে। সেই জাহাজে তিনি তোকিও শহরে পৌছলেন, যেখানে আজন্ম বিপ্লবী ভারতের মুক্তি যুদ্ধের সৈনিক রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল। এইখান থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর কাহিনী এশিয় ইতিহাসের একটি অধ্যায় এবং সেই সঙ্গে ইন্দো-জাপানী সংযোগের ইতিহাস। তথাপি যে কেউ নেতাজীর-জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করবেন তিনিই এই মানুষটির মধ্যে অত্যাশ্চর্য আত্মবিশ্বাস, নির্ভীকত্ব এবং উদ্দেশ্য বিষয়ে সুস্পষ্ট চিন্তার সমাবেশ দেখে বিস্ময় বোধ করবেন। ফ্রি-ইনডিয়া বা আজাদ-হিন্দ নামক তাঁর সরকার এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল আর্মি—আজাদ-হিন্দ-ফৌজ—য়ুরোপেও কাজ ও যুদ্ধ করতে লাগল। তথাপি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বিদেশে তাদের এই সংগ্রাম অচিরাৎ স্তালিনগ্রাদ এবং এল আলমিনের ব্যাপারে চাপা পড়ে গেল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালের যে সব সিক্রেট সার্ভিস বিষয়ক কাহিনী আছে তার মধ্যে 'মদেলিন' ঘটিত কাহিনী একটি। এই কোড-নামের অন্তরালে একজন ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র-বিদ্ এবং ধর্মগুরু ইনায়েৎ খানের কন্যা কাজ করেছেন। এই মেয়েটি একজন প্রখ্যাত শিশু মনস্তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ এবং লেখিকা ছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মস্কো-শহরে তাঁর জন্ম। তিনি লণ্ডন শহরে রেডিও মারফৎ বসুর ঘাঁটির অবস্থাদি জানাতেন এবং সেই সঙ্গে সাধারণভাবে জার্মান সেনাদলের সংবাদও দিতেন। তাঁর নাম ছিল নূর ইনায়েৎ খান। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে দাচাউ-অঞ্চলে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন বহু ভারতীয় জার্মানীর দুর্দশা সহানুভূতির সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। ভারতীয় সংবাদপত্রে যে সব কণ্ঠ আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে গান্ধীর পত্রিকা 'হরিজনে' (২০শে এপ্রিল ১৯৪৭) জে. সি. কুমারাপ্পা পরাজিত জাতির প্রতি সুবিচারের আবেদন করেন। জার্মান-শিল্প বস্তুগুলি ভেঙ্গে ফেলার ব্যাপারে অধিকারী শক্তিদের বিরত থাকতে বলেন, তাঁর মতে এ হবে বিজেতার পক্ষে এক নৈতিক ত্রুটি। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি জার্মান-ভাষায় দলিল প্রকাশিত হয় তার নাম—Hermann Schumacher-eine Lebenserinnerung und eine Dankaussprache (হেরমান সখুমাখের একটি জীবনী ও স্বীকৃতি)। এই গ্রন্থের রচয়িতা বিনয় কুমার সরকার একযোগে এই গ্রন্থ একটি দুর্দশাগ্রস্ত জাতি কর্তৃক আরেক দুর্দশাগ্রস্ত জাতির প্রতি নৈতিক সমর্থনের বাণী বলে অভিহিত করেন।।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী জার্মান মিত্রদের পক্ষে একটা বিশেষ আনন্দের

ব্যাপার। সেইদিন, সকল বিরোধী ও আধা-বিরোধী দেশসমূহ জার্মানীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করল। ঐতিহ্যগত-বন্ধুত্ব (এই অতি ব্যবহৃত শব্দ যা নির্দ্বিধায় ব্যবহার করা যায় এই ক্ষেত্রে) পরে এক পরীক্ষার মুখে পড়ল যখন ভারতীয় প্রতিনিধিগণ (বিশেষ করে মিসেস বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত) ইউনাইটেড নেশনসের কাছে জার্মান প্রশ্নের সমাধানের প্রস্তাব পেশ করলেন।

ভারত এবং ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের কিছুকাল পূর্বে এক দল জার্মান স্বেচ্ছাসেবক প্রিন্স লোভেনষ্টাইনের নেতৃত্বে নর্থ-সী আইল্যাণ্ডের হেলগোল্যাণ্ড দ্বীপটি অধিকার করেন। এই সব তরুণ দল তাঁদের সংগ্রামে গান্ধিজীকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করলেন। প্রিন্স লোভেনষ্টাইন Die Zeit-এ ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী তারিখে লিখলেন :

"এই দ্বীপে আমাদের দিনগুলিতে আমরা মাঝে মাঝে গান্ধীর দেশের অভ্যন্তরে মিছিলের কথা বিচার করেছি। যখন তিনি উপকূলে পৌঁছেছেন— তিনি সমুদ্র থেকে জল নিয়ে তা সমুদ্রোপকূলে বাষ্পায়িত করেছেন।"

ইন্দো-জার্মান সংযোগ কি পরিমাণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রবেশ করেছে তার প্রমাণ এই যে ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণ ফেডারেল রিপাবলিকের মৌলিক আইন পর্যালোচনা করেছেন তাঁদের নিজেদের সংগঠন রচনার কালে। আমরা নতুন নীতির প্রভাব প্রথম স্তবকেই লক্ষ্য করেছি যার মধ্যে লিখিত আছে মানবিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা যাবে না। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ম্যুনিখের প্রফেসর ফ্রিৎস বেরবার, আন্তর্জাতিক জলগত আইনের ব্যাপারে যিনি প্রথমতম জার্মান বিশেষজ্ঞ বহুকাল ভারত সরকারের আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। *

কি সঙ্গতির সঙ্গে দুটি দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নতিলাভ করে তা বহুবিধ বৃহৎ ব্যবসার ক্রিয়াকলাপ যা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে দেখা যাবে। একটি বিশেষ দিক হল ২০শে জানুয়ারী ১৯৫৬ তারিখে বোম্বাই শহরে ইন্দো-জার্মান চেম্বার অব কমার্সের উদ্বোধন।

---

* Nachbarn an den Flussen : (নদীর ওপরকার প্রতিবেশী) ম্যুনিখের ফ্রিৎস বেরবার রচিত—৪ঠা আগস্ট ১৯৫৬ তারিখে প্রকাশিত Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung (জার্মান সংবাদপত্র ও অর্থনৈতিক সংবাদপত্র) এই সূত্রে তুলনীয়।

১৯৫১ থেকে জার্মানীর ফেডারেল রিপাবলিকের বাণিজ্যিক জের (ব্যালান্স অব ট্রেড) বিশেষ সক্রিয় ছিল। ভারত থেকে রপ্তানি—

১৯৫১	২১৪ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬০	৮৩৪ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫২	২২৭ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬১	৭৮০ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৩	২৭৭ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬২	৭৩১ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৪	৩৭৫ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৩	৭২৪ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৫	৫৯০ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৪	৭৭৭ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৬	৮১৯ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৫	১০৪৯ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৭	১,১২৬ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৬	৯৫১ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৮	১,১৭৩ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৭	৭৯৬ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৯	৯৬০ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৮	৫৭৫ মিলিয়ন মার্ক
		১৯৬৯	৪৯৮ মিলিয়ন মার্ক

ভারত থেকে জার্মান আমদানী প্রায়ই রপ্তানির চেয়ে নিচে পড়ে আছে—

১৯৫১	১২০ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬০	১৮৪ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫২	১২৫ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬১	২২৩ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৩	১৬৬ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬২	২৬১ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৪	১৫৩ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৩	২৫৪ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৫	২৬৮ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৪	২৭২ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৬	১৮৯ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৫	২৪৪ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৭	২৫২ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৬	২৩৯ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৮	১৯২ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৭	১৮৪ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৯	১৮০ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৮	২১৫ মিলিয়ন মার্ক
		১৯৬৯	২৩৭ মিলিয়ন মার্ক

এই জার্মান পরিসংখ্যান থেকে ভারতের অন্যদিকে একটা চড়া অসাম্য প্রদর্শন করেছে—এর মধ্যে উৎপাদক এবং ব্যবহারকারী দেশ উভয়কেই হিসাবে ধরা হয়েছে। এ-কথা অবশ্য বলা প্রয়োজন যে ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানী অনেক সময় কিছু তৃতীয় দেশ থেকেও ভারতীয় দ্রব্যাদি আমদানি করে থাকেন। এই সব জার্মান আমদানি করা দ্রব্যাদি ভারতীয় পরিসংখ্যানের তালিকাভুক্ত নয় এবং তার মধ্যে অধিকতর বাণিজ্যিক অসাম্য দেখা যাবে।

এই অবস্থা অনেক সময় ভারতে সমালোচিত হয়েছে, অবশ্য একটি সরকারি রিপোর্টে ভিন্ন রকমের দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পাওয়া যায় :

> "১৯৫২ পর্যন্ত জার্মান আমদানি কম বেশী সমান স্তরেই ছিল কিন্তু তারপর ভারতে জার্মান রপ্তানীতে সহসা ওপর দিকে ওঠার ভাব দেখা যায়। এর কারণ ভারতীয় সরকার জার্মানীতে ক্রয় করছেন, রেল বাষ্পীয় ইঞ্জিন, ও অন্যান্য নানাবিধ যন্ত্রপাতি প্রভৃতি :
>
> আমাদের বাণিজ্যিক সাম্যে জার্মান উদ্বৃত্ত জার্মানীর কাছে সন্তোষের কারণ কিন্তু আমাদের তরফে এর জন্য কোনো দায় নেই। প্রথমতঃ এই উদ্বৃত্ত ভারতের বিশেষ আমদানি প্রয়োজনের ফল ; দ্বিতীয়তঃ আমরা এই উদ্বৃত্তকে দেয় অর্থের বক্রীর আলোকে বিবেচনা করি সমগ্র "সফট-কারেন্সী" গোষ্ঠী সহ।"

তথাপি অধিকতর সাম্যযুক্ত বাণিজ্য জার্মান অংশীগণ কর্তৃক কাম্য—যদিও ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্য এবং প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যের প্রতি আশ্বাস-হীনতার দ্বারা এই পথ অনেকটা রুদ্ধ। যাই হোক, উভয় দিকই ভারতের সঙ্গে জার্মানীর বাণিজ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার হলে উভয় পক্ষই উপকৃত হবে। ইণ্ডিয়ান ইনভেষ্টমেণ্ট সেনটারের য়ুরোপীয় কেন্দ্র ২৯শে অক্টোবর ১৯৬৪তে ডাসেলডর্ফে উদ্বোধিত হয় নিঃসন্দেহে অচিরে ওয়েষ্ট জার্মানী মারফৎ ওয়েষ্ট য়ুরোপের সঙ্গে বাণিজ্যকে নিবিড়তর করে তুলবে। ১৯৫৭-খৃষ্টাব্দে ষ্টুটগার্টের দি ইণ্ডো-জার্মান সোসাইটি এই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী করে। পরবর্তী উদ্যম হল ইণ্ডো-জার্মান ট্রেড কাউনসিল ভারতীয় রপ্তানি বৃদ্ধি ও অর্থপুষ্ট করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। সাফল্যের পথে আর একটি স্তর হল কন্টিনেণ্টে প্রথমতম ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার শাখা স্থাপিত হল ফ্রাঙ্কফুর্ট-অম-মেইন-এর ৬ই জুলাই ১৯৬৫ তারিখে। ফেডারেল রিপাবলিক জার্মানীতে প্রতিষ্ঠান—Planungs-gruppe Ritter—প্রতিষ্ঠা করা হল জার্মানীতে ভারতীয় রপ্তানিকে উন্নত করার উদ্দেশে এবং ভারতীয় রপ্তানিকারদের উপদেশ দানের জন্য। এরা পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করছেন তার প্রবর্তক Vollrath Scheme-এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে।

ভারতীয় অর্থনীতিকে জোরদার করার ব্যাপারে ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর ভূমিকা যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক পরেই। জার্মান গ্যারাণ্টি এবং ঋণ-সাহায্য (ক্রেডিট এইড্‌স) ওয়েষ্ট জার্মানীতে নির্মিত জাহাজাদি সাধারণ মূল

বস্ত্র ইত্যাদির আমদানি ও রাউরকেল্লা প্রভৃতি প্রকল্পের জন্য ৩,২১০ মিলিয়ন মার্কে পৌঁছেচে। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৬-র জুলাই পর্যন্ত ক্যাপিটাল এইডস্-এর পরিমাণ ২,৯৯৬'২ মিলিয়ন মার্কে পৌঁছায় আর কারিগরীগত সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৯২'৮ মিলিয়ন মার্ক।

এইসব অর্থ দ্বারা মণ্ডীপ্রকল্প (১৯৬২-র নভেম্বরে সুরু); ওখলার পলি-টেকনিক্যাল ইনষ্টিট্যুট (১৯৬১-এপ্রিল), নয়াদিল্লী টেলিভিসন ষ্টুডিয়ো (রাষ্ট্রদূত ফন মিরবাখ্ কর্তৃক ২৬শে এপ্রিল প্রদত্ত)—এবং ভারতীয় কারিগরি শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। ইন্দো-জার্মান সহযোগীতার এক অনন্য কেন্দ্র মাদ্রাজের ইনডিয়ান ইনষ্টিট্যুট অব টেকনোলজী। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই এই প্রতিষ্ঠানটি খোলা হয়। ১৯৬৬-র মাঝামাঝি প্রাইভেট ইনভেসটমেণ্টের (লগ্নী) পরিমাণ ১০৪'৬ মিলিয়ন মার্কে পৌঁছায়।

•

উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর থেকে ভারতবর্ষে কয়েকটি সরকারি সফর অনুষ্ঠিত হয় যথা ভাইস-চ্যান্সেলার ব্লুখার (জানুয়ারী ১০ই থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত), এবং বৈদেশিক মন্ত্রী ফন ব্রেনটানো (মার্চ ২৮/২৯ তারিখ এবং ১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৬০-এর ২৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত)। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে উভয় দেশের পার্লামেণ্টারি ডেলিগেশন এবং অন্য মন্ত্রীদের সফর—যথা ১৯৫৮-খৃষ্টাব্দে অর্থনৈতিক মন্ত্রী এরবার্ডের সফর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অবশ্য ২৬শে নভেম্বর থেকে ৫ই ডিসেম্বর ১৯৬২-তে প্রেসিডেণ্ট হাইনরিশ লুবকে-র সফর। ফেডারেল রিপাবলিকে ভারতীয় সরকারি অতিথিদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নেহরু (১৩ই জুলাই থেকে ১৭ই জুলাই ১৯৫৬) এবং উপ-রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ (১৮ থেকে ২৫শে জুলাই ১৯৫৯ এবং ২০ থেকে ২৪শে অকটোবর ১৯৬১) উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ডাসেলডর্ফে নেহরুর অবস্থান এবং ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রীর অবস্থিতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের বেসরকারি আগমনের পরিমাণ প্রদর্শনের জন্য উল্লেখ প্রয়োজন। প্রেসিডেণ্ট সর্বপল্লী বিশেষ করে কয়েকবার জার্মানীতে বেসরকারি-ভাবে আগমন করেন, সেখানে তিনি সর্বদাই মহাসমারোহে অভ্যর্থিত হয়েছেন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁকে মহা সম্মানিত রাজসম্মান Pour-le-Merite দান করা হয়। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁকে "গ্যয়টে প্লাক" প্রদান করা হয় এবং অক্টোবর ১৯৬১তে তিনি জার্মান বুক ট্রেড প্রদত্ত পীস-প্রাইজে সম্মানিত হন। বিশেষ

বিদগ্ধতার বন্ধনে জার্মানীর প্রেসিডেন্ট থিওডোর হেস ও রাধাকৃষ্ণণ বাঁধা ছিলেন। ভারতীয় জননেতাদের যে সব জার্মান সম্মান দান করা হয় তার মধ্যে মনোরমা ভারতীয় কূটনীতিবিদ শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করা যাক, তিনি গোটিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫৮-র ডরোথিয়া-সখ্‌লোৎসার মেডালে সম্মানিত হন।

ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর প্রতি ভারতের নীতি প্রায়ই বিভিন্ন-ভাবে ওঠা-নামা করেছে। ১৯৬১-তে দল-নিরপেক্ষ জাতি-সমূহের বেলগ্রেডস্থ কনফারেন্সে দুই রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে নেহরুর মধ্যস্থতা বিশেষ আতংকের কারণ হয়ে ওঠে। যে সব ভারতীয়গণ জার্মানকে বিশেষভাবে জানতেন তাঁরা ক্রুদ্ধ হন, এবং ক্ষুব্ধ হন ভারতীয় ছাত্রগণ ও ভারতীয় কর্মীগণ যাঁরা জার্মানীতে ছিলেন। এই মনোভংগীর দৃঢ় প্রত্যাখ্যান ঘোষণা করে সংবাদপত্রে অনেকগুলি পত্র প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় একটি পত্র Die Welt পত্রিকায় প্রকাশিত পি. কে. রায়নার চিঠি। তিনি অকসফোর্ডের একজন ভারতীয় ছাত্র সেই সময় বার্লিন-সখলাখটেনসীতে ছিলেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬২ তারিখে প্রকাশিত এই পত্রে তিনি বলেন :

> "ইতিহাসে যাঁদের জ্ঞান আছে তাঁদের কেউ-ই "ফ্রী সিটি অব বার্লিন" বা দুটি বিভিন্ন জার্মান রাষ্ট্র রাজী হবেন না। জার্মানরা এক জাতি এবং তাই থাকবে। আমি একজন জার্মান নই, কিন্তু জার্মানী ও তার সমস্যা আমাকে বিচলিত করে, যেমন করত আমার নিজের দেশের ঘটনা।"

অবশ্য একথা এখানে বলা যায় যে ভারতবর্ষ কোনো দিনই অন্যভাবে জার্মান সমস্যা বর্ধনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েনি।

ভিলহেলম ভোলগ্যাং সখউৎস ব্যক্তিগতভাবে নেহরুকে জানতেন—"Unteilbare Freiheit" (অবিভাজ্য স্বাধীনতা) নামক গ্রন্থে তাঁর মনোভংগী বিষয়ে লিখেছেন :

> "জার্মানী বিষয়ে নেহরুর মনোভংগী ছিল জটিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তৎকালীন জার্মান সাম্রাজ্যে তাঁর পিতার সঙ্গে এসেছিলেন, তরুণ মনে তিনি একটি রাষ্ট্রের শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচয় পেয়েছিলেন যে রাষ্ট্র ইংলণ্ডের প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। কেউ তখন যুদ্ধের চিন্তা করেনি। কেউই তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের

পতনের কথা ভাবতেও পারেনি। অবশ্য মোতিলাল নেহরুর মত যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন তাঁরা ছাড়া।

১৯৩৫-এ আরো গভীর এবং কারণঘটিত যোগাযোগ ঘটল জার্মানীর সঙ্গে। তাঁর স্ত্রী জার্মানীতে এলেন চিকিৎসার জন্য। তখন ব্রিটিশ কর্তৃক তিনি নিজে কারাদণ্ড ভোগ করছেন। শ্রীমতী কমলা নেহরুর স্বাস্থ্যের অবস্থার অবনতি ঘটল—সাড়ে পাঁচ মাস পূর্বেই তাঁকে আলমোড়া বন্দীশালা থেকে মুক্তি দেওয়া হল এবং তিনি বাদেন-ভিইলারে এলেন। এর হার্ভের ক্ষুদ্র অতিথিভবনে তিনি বাস করতেন। নেহরু সেদিনের জার্মানীতে কি দেখেছেন?

১৯৩৫-এ ন্যুরেনবার্গ আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৩৬-এ ক্ষমতার লোভ চরমে ওঠে। বাদেনভিইলারে নেহেরুরা প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলেন। কোনো সামাজিক যোগাযোগ নেই—আর জার্মানদের সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক আলোচনাও হয়নি। নিজস্ব দেশের চিন্তা ছিল তাঁদের মনে। ইংলণ্ডে ও স্বদেশে অবস্থিত তাঁদের বন্ধুদের মধ্যে পত্রের আদান প্রদান হত। লিবারেল ও লেবার পার্টির নেতৃস্থানীয় নর-নারীর কাছে পত্র লেখা হত এবং তাদের কাছ থেকে বন্ধুত্ব ও রাজনৈতিক স্থায়ীত্ব বিষয়ে আশ্বাস পেতেন।...প্রকৃতপক্ষে জার্মানীর একীকরণ নেহরুর কাছে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন। রাজনৈতিক দিক থেকে তা যে কতদূর সম্ভব তা সর্বকালেই নেহরুর কাছে ছিল ব্যবহারিক রাজনীতি। সুরুতে বলা যাক, পুনঃএকীকরণের প্রতিশ্রুতিদানের ব্যাপারে তাঁর কোনো জরুরী তাগিদ ছিল না। তাঁর কাছে শুধুমাত্র নিছক কথাবার্তা কখনও নীতির প্রতিভূ নয়। তাই নেহরু জার্মান একীকরণ নীতিকে বিশেষ তীক্ষ্ণভাবে বিবেচনা করেছেন। নয়াদিল্লী অন্য অঞ্চলের মত বিরোধী শক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়...

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে জার্মান ও ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ একত্রিত হয়ে সবরকম অন্ধ সংস্কারকে বর্জন করতে বদ্ধ পরিকর। বৃহৎ পরিমাণে, জার্মানী বিষয়ক কিছু ভাবধারা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের জার্মান-বিরোধী শেষ পর্বের ভঙ্গীতে রঞ্জিত। এইখানে ভবিষ্যৎ পারস্পরিক ঐতিহাসিক সমীক্ষার বিস্তৃত সম্ভাবনার সূত্রপাত। আধুনিক ইতিহাসের অর্থ নিয়ে আমাদের আর কিছু না বলাই ভালো।

যখন একজন ভারতীয় তপেশ্বর জুৎসী গান্ধীজীর সত্যের আবেদনে যিনি পরিপূর্ণ তিনি ১৯৬২-র অক্টোবর মাসে উলব্রিখটের বার্লিন প্রাচীর বিষয়ে প্রতিবাদ করেন। তিনি প্রমাণ দেন যে প্রকৃত জার্মানীকে তিনি ভালোভাবেই জানেন। অবিভাজ্য জার্মানীর কিউরেটরিয়াম এর চেয়ারম্যান ডব্লু ডব্লু সখউৎস কর্তৃক প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায় ৭ই জুলাই ১৯৬৩তে প্রদত্ত ভাষণে শ্রীমতী লক্ষ্মী ভি মেননের কথাগুলি গভীরতায় পরিপূর্ণ। বার্লিন-প্রাচীর সম্পর্কে তিনি যা বলেন তা তাঁর ভারতীয় ও জার্মান শ্রোতৃবর্গের কাছে সকৃতজ্ঞ সমর্থন পায়।

এই ক্ষেত্রে আমি বোধকরি ইণ্ডিয়ান ক্রিমিন্যাল ল' এমেনডমেণ্ট এ্যাক্ট ড্রাফট-২৩-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। এই খসড়া সেই বছর ১৭ই মে তারিখে আইনবদ্ধ করা হয় এবং পরদিনই প্রকাশ করা হয়। এই আইনানুসারে রাজ্যের কোনো অংশ পরিহার করা বিষয়ে প্রচার কার্য ইত্যাদি লিপ্ত থাকা দণ্ডনীয়। তথাপি এমন শাসন ব্যবস্থা আছে যা কোনও জাতির একীকরণ ব্যবস্থা নিরোধ করে। যে ব্যবস্থা খামখেয়ালীভাবে ও কোনোরূপ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসম্পন্ন চুক্তি ব্যতিরেকে আপন দেশের কিছু অংশ ত্যাগ করে, এবং তার স্বদেশস্থ জনগণের স্বাধিকার ক্ষুন্ন করে যে বিশ্বশান্তি সংরক্ষণ সবরকম দায়িত্বপূর্ণ রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত তাকে বিঘ্নিত করে।

সৎ রাজনীতির অপরিহার্য অঙ্গ হল এমন এক সাংস্কৃতিক নীতি নির্ধারণ যার দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সঠিকভাবে মানসিকতা উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। সংবাদপত্রের প্রতি একটা যথাযোগ্য দৃষ্টি থাকে, যা সঠিক সংবাদ প্রকাশ এবং রাষ্ট্রের একদেশদর্শী নীতিতে ভেসে যাবেনা। ভৌগোলিক দিক থেকে সম্প্রসারিত ব্যক্তিপূজার স্বদেশের অতি শক্তিশালী ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আরোপিত না করা। সমভাবে স্বদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নীতির প্রতি দূর প্রসারী-দৃষ্টি থাকবে যা শুধুমাত্র লাভ করার লোভের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবেনা— বরং অন্য দেশের সঙ্গে একটা প্রকৃত সেতু রচনায় সক্ষম।

সর্বোপরি, সব জাতিরই সততার প্রয়োজন আছে, সততার অর্থ অকপট দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করা। এক তরফা দাবী শুধুমাত্র আবহাওয়াকে কলুষিত করে। আজ, জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ পরস্পর সংযুক্ত। রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতি বিজড়িত, সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে সাংবাদিক দৃষ্টিকোণ। আমাদের এখনও ভারত এবং জার্মানীর মধ্যে উন্নতধরণের বোঝাপড়া হওয়া প্রয়োজন। একটি দেশের আভ্যন্তরীণ সংহতিকে শ্রদ্ধাসহ মান্য করতে হবে। রাষ্ট্রগুলিকে

বানানো দৃষ্টান্ত বা আদর্শ অনুসরণ করে স্বদেশের ভূমিতে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বিশেষ বা দালালদের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হলে চলবেনা। কূটনৈতিক দিক থেকে এতদ্বারা "তিন-দেশীয় বিধি" অগ্রাহ্য করা হয়, এই নীতি অনুসারে কারো দেশের অভ্যন্তরে কোনো মিত্ররাষ্ট্র শক্তির বিরুদ্ধে কোনো তৃতীয় দেশ মর্যাদাহানি-কর অভিযান চালাতে পারবে না ; মানবিক সম্পর্ক এবং দু-তরফা যোগাযোগে এত দ্বারা শুধু সুরুচিকে সংহার করা হয়।

কৌশলের দিক থেকে কোনো ত্রুটী থাকা উচিত নয়, এবং সেই কারণে অপর পক্ষকে বিশেষভাবে ভালোভাবে জানতে হবে প্রকৃতপক্ষে, পরস্পরকে উত্তমরূপে চিনতে হবে। এই সবের সুযোগ হল সম্প্রসারিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। ভারতে জার্মান-ভাষা ও জার্মানীতে ভারতীয়-ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে অধিকতর উদার সহায়তা দান, বিশ্ব-বিদ্যালয়, প্রকাশন সংস্থা, সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রগুলির অধিকতর এবং বৃহত্তর অংশীদারীত্ব, আর সেই সঙ্গে অংশীদার দেশের অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস বিষয়ে সুগভীর পঠন-পাঠন প্রয়োজন। এই সূত্রে যে প্রকাশকের কাছে আমি এই গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে কৃতজ্ঞ তাঁর কথা উল্লেখ করতে চাই, তাঁর নাম হোয়ষ্ট এরডমান। তিনি তাঁর ভারত (এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া) ভ্রমণকালে পুরাতন প্রকাশন সংস্থা ও নব প্রতিষ্ঠিত প্রকাশন সংস্থাগুলির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ পাকা করে গেছেন, একদা হয়ত ভারত এবং জার্মানীর মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের ব্যাপারে এই সংযোগ গম্ভীর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। "Geistige Begegnung" (সাংস্কৃতিক সংযোগ) এই নামে তিনি যে পর্যায় সুরু করেছেন সাংস্কৃতিক অংশীদারীত্বের ব্যাপারে সেটিই এক আবেদন বলা চলে।

ইন্দো-জার্মান সম্পর্ক দুই মহান জাতির মধ্যে এক চমৎকার বিস্ময়কর-ব্যাপার হয়ে উঠেছে। জার্মানরা যে ভাবে ভারতের অভিমুখী হয়েছে তা একদিক থেকে রোমান্টিক আবার অন্যদিকে বাণিজ্যিক। মুক্তি যুদ্ধের কালে এই সম্পর্ক ছিল আবেগময় সহানুভূতির সম্পর্ক। এবং সমবায় ও উন্নয়নের যুগে এবং সংশয়ময়তা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর মূল্য প্রীতিপদ ও শান্ত। এই সম্পর্ক কি এক সহজ সখ্যতায় পরিণত হতে পারে না, যে সখ্যতা সত্য ও স্পষ্ট কথন থেকে বিরত হবেনা? ইন্দো-জার্মান সংযোগ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ যাদ্বারা উভয় পক্ষ এই জাতীয় সহযোগীতার জন্য সচেষ্ট হতে পারে যা হয়ত কালে অন্যদের কাছে আদর্শ হয়ে দাঁড়াবে।

এই সম্পর্কের রাজনৈতিক গুরুত্বের পরিচয় দেওয়া হয় যখন সর্বপ্রথম জার্মান রাষ্ট্রের প্রধান, স্বয়ং চ্যান্সেলর ডাঃ কিসিংজার ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ভ্রমণে আসেন, তিনি এক ঐতিহ্যাশ্রয়ী মিত্রতায় রাজনৈতিক স্পর্শ এনে দিয়েছেন—যা পরিপূরক এবং পরস্পরের সহায়ক। এই যাত্রার সময়কার আলোচনায় এই ধারণা সমর্থিত হয় যে স্থায়ী আলাপ-আলোচনা উভয় দেশের পক্ষেই কল্যাণকর। আমাদের সর্ববিধ শক্তি প্রয়োগ করে আমরা চেষ্টা করব রাইন আর গঙ্গার এই পারস্পরিক মিত্রতার রাখীবন্ধন যেন ভবিষ্যতের মানুষের কাছে একটা নিরন্তর প্রেরণা স্বরূপ হয়ে থাকে। মানব সমাজ যেন স্বাধীনভাবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মিত্রতায় পরস্পরের পরিপূরক হয়ে এক শান্তি ও সম্প্রীতি ভরা এক বিশ্বে বাস করতে পারে।

সমাপ্ত